অধ্যাপক গোলাম আযম

জীবনে যা দেখলাম

ষষ্ঠ খন্ড

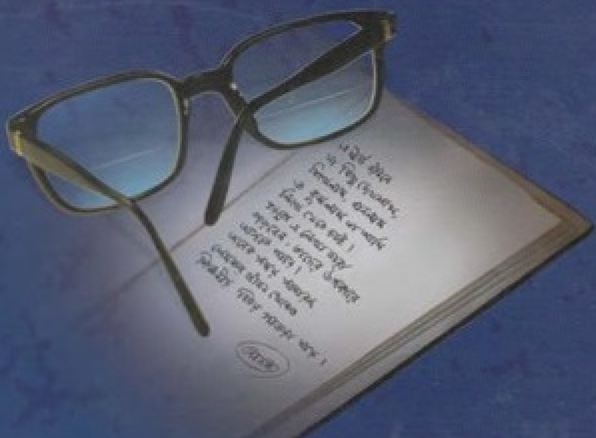

জীবনে যা দেখলাম

ষষ্ঠ খণ্ড

(১৯৮৪-১৯৯৩)

অধ্যাপক গোলাম আযম

জীবনে যা দেখলাম

ষষ্ঠ খণ্ড

(১৯৮৪-১৯৯৩)

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

পঞ্চম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৬

জীবনে যা দেখলাম (ষষ্ঠ খণ্ড) ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক : মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৫১,৫১/এ রিসোর্সফুল পল্টন সিটি, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ স্বত্ব : লেখক ❖ প্রচ্ছদ : দি ডিজাইনার, বাংবাজার, ঢাকা ❖ মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র
৫১,৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
৪২৩ ওয়ারলেস রেল গেট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : একশত ষাট টাকা মাত্র

ISBN 984 8285 53 2

সূচিপত্র

সংলাপ ব্যর্থ হওয়ার প্রতিক্রিয়া ১৭
আবার যুগপৎ আন্দোলন ১৭
১৯৮৫ সালে এরশাদের নব উদ্যম ১৮
এরশাদের আমেরিকা সফর ১৮
এরশাদের একটি বিরাট সাফল্য ১৯
এরশাদ আমলে বারবার রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করা হয় ২০
দেশকে সংসদ নির্বাচনমুখী করার সরকারি উদ্যোগ ২০
যুগপৎ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও নির্বাচন ২১
জামায়াতের রাজনৈতিক স্বীকৃতি ২২
নির্বাচন সম্পর্কে জামায়াতের মনোভাব ২৩
এক আজব রাজনৈতিক পরিবেশ ২৩
ধমকে কাজ হলো ২৪
বিএনপির টেকনিক্যাল কারণটি কী? ২৫
তৃতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে জামায়াতের সিদ্ধান্ত ২৬
৭ মে তারিখের সংসদ নির্বাচন ২৬
প্রতীক বরাদ্দ নিয়ে সমস্যা ২৭
দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের গুরুত্ব ২৭
৭ মে তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ২৮
নির্বাচনী ফলাফলের মূল্যায়ন ২৯
জামায়াতের নির্বাচনী ফলাফল ২৯
কারচুপির প্রত্যক্ষ প্রমাণ ৩০
আমার নাগরিকত্ববিহীন অবস্থান ৩১
নাগরিকত্ববিহীন অবস্থায় সাংগঠনিক দায়িত্ব ৩২
সাংগঠনিক সফর শুরু করলাম ৩২
আমার সাংগঠনিক সফরে এরশাদ সরকারের আপত্তি ৩৩
আমার নাগরিকত্ব সমস্যা ৩৪
'৮৬ সালের বড় বড় রাজনৈতিক ঘটনা ৩৫
আবার আন্দোলনের প্রচেষ্টা ৩৫
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা ৩৬
১৯৮৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ৩৭
নির্বাচনী ফলাফল ৩৭
নির্বাচনের পর ৩৭

বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির ঐক্যপ্রচেষ্টা ৩৮
ইসলামী ঐক্য আমার সবচেয়ে বেশি আবেগের বিষয় ৩৯
এ ফর্মুলার পেছনের মূল পরিকল্পনা ৩৯
আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন নস্যাৎ হয়ে গেল ৪২
ইত্তেহাদুল উম্মাহ কীভাবে ভেঙে যাওয়ার সূচনা হলো? ৪২
মাওলানা সাঈদী সাহেবকে আন্দোলনের নেতা বানানোর পরিকল্পনা ৪৩
তাদের ইজতিহাদী ভুল ৪৪
তাঁদের নিয়ত সম্পর্কে আমি সন্দেহ করি না ৪৪
বিষয়টা আমরা বিলম্বে জানতে পেরেছি ৪৫
ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রেস কনফারেন্স ৪৫
পরের দিনের কাহিনী ৪৬
পরিণামে ইত্তেহাদুল উম্মাহ অচল হয়ে গেল ৪৮
'ইসলামী ঐক্য' ময়দানের দাবি ৪৯
বৃহত্তর ঐক্যের নতুন উদ্যোগ ৪৯
শীর্ষ সম্মেলনের বিবরণ ৫০
সভাপতির মন্তব্য ৫১
চরমোনাইর পীর সাহেব আমার বাড়িতে এলেন ৫২
কারাগারে বন্দী থেকেও ইসলামী ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টা ৫৪
ইসলামী শক্তির ঐক্যমঞ্চ চাই ৫৪
ঐক্যমঞ্চের উদাহরণ ৫৫
ইসলামী ঐক্যের দুই দফা কর্মসূচি ৫৬
ঐক্যপ্রচেষ্টার চূড়ান্ত লক্ষ্য ৫৭
ইসলামী ঐক্যের বাস্তব ফর্মুলা ৫৮
ঐক্যমঞ্চের বিকল্প ঐক্যপদ্ধতি ৫৮
চরমোনাইর মুহতারাম পীর সাহেবের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ৫৮
ইসলামী ঐক্যের উদ্দেশ্যে নেতৃস্থানীয় আলেমগণকে চিঠি ৬০
আমার চিঠির জবাব ৬১
তাঁদের চিঠির জবাব ৬৩
আমার চিঠির পর ৬৪
চরমোনাইর পীর সাহেবের জামায়াতবিরোধী অভিযান ৬৪
কায়েদ সাহেব ও মুফতী সাঈদ আহমদের ঐক্যপ্রচেষ্টা ৬৫
এক বৈঠকে আমার যোগদান ৬৬
পীর সাহেবের একতরফা চ্যালেঞ্জ ৬৭
দারুস সালামের বৈঠকের পর ৬৭
ড. মুস্তাফিজুর রহমানের চিঠি ৬৮

ড. মুস্তাফিজকে লেখা জবাব ৬৯
ড. মুস্তাফিজুর রহমানের হতাশাব্যঞ্জক ফোন ৭০
মাওলানা মুজীবুর রহমান যুক্তিবাদীর প্রচেষ্টা ৭০
আরো কয়েকজনকে ঐক্যের উদ্দেশ্যে চিঠি ৭১
এসব চিঠি লেখার পটভূমি ৭২
ঝালকাঠির দ্বিতীয় সম্মেলন ৭৩
সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তাবলি ৭৪
কতিপয় ইস্যুর উপর দস্তখত সংগ্রহ অভিযান ৭৪
দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী নেতৃবৃন্দের আবেদন ৭৪
আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীগণ ৭৬
ইসলামী ঐক্যের উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাররমের খতীব সাহেবের প্রচেষ্টা ৭৮
ঐক্যপ্রচেষ্টার নতুন উদ্যোগ ৭৯
জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের আহ্বায়ক কমিটি ৮০
লিয়াজোঁ কমিটির সদস্যবৃন্দ ৮০
নতুন ঐক্যপ্রচেষ্টায় ফুরফুরার পীর সাহেবের অব্যাহত অবদান ৮১
জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের ২০০৩ সালের বার্ষিক সম্মেলন ৮১
মজলিসে আমেলার সদস্যগণ ৮২
জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের পরবর্তী সম্মেলন ৮৫
সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরামের ঐক্য চাই ৮৫
জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলই সর্বদলীয় একমাত্র ঐক্যমঞ্চ ৮৬
ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে যোগাযোগ-প্রচেষ্টা ৮৭
বিএনপির সাথে যোগাযোগের সূচনা ৮৮
শায়খুল হাদীসের সাথে প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ ৮৮
যুগপৎ আন্দোলনের প্রস্তাব ৮৯
শায়খুল হাদীসের সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ৯০
সকল ইসলামী শক্তির ঐক্যের প্রচেষ্টা ৯১
পাকিস্তানে ইসলামী ঐক্যের সুফল ৯২
বাংলাদেশে কি পাকিস্তানের স্টাইলে ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়? ৯২
জামায়াতে ইসলামীর সাথে ঐক্য স্থাপনে আপত্তি ৯৩
ইসলামী দলগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে কেন? ৯৪
জামায়াতকে বাদ দিয়ে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা! ৯৫
ইসলামী ঐক্যজোট ভাঙনের নেপথ্যে ৯৬
মাওলানা আমিনী জামায়াতবিরোধী কেন? ৯৬
কাওমী মাদরাসার নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ৯৭
এ ফতোয়াবাজির পটভূমি ৯৯

একটা বড় উদাহরণ ১০০
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিতনাবাজ আলেমদের একই ভূমিকা ১০১
সাধারণ জনগণের কাছে আলেম সমাজই দীনী ইলমের উৎস ১০২
ইংরেজ আমলে মাদরাসার মান ১০২
আমার দীনী জিন্দেগী গড়ার কাহিনী ১০৪
তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের অবদান ১০৫
জামায়াতে ইসলামীতে এসে যা শিখলাম ১০৬
কাওমী মাদরাসার আলেমগণের ভূমিকা ১০৮
তাঁদের প্রতি আমার দুটো আবেদন ১০৮
একটা সত্য ঘটনা ১০৮
বড় আলেমগণের রাজনৈতিক ভূমিকা কী ছিল? ১০৯
ওলামায়ে কেরাম ইকামাতে দীনের আন্দোলন করেননি কেন? ১১০
ইকামাতে দীন ও খিদমতে দীন ১১১
ইকামাতে দীন কী? ১১২
হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অনিবার্য কেন? ১১২
দীনী খিদমতের সাথে এ সংঘর্ষ হয় না কেন? ১১৪
কয়েকটি ভুল ধারণা ১১৬
জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্ব ১১৯
জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান ১২০
জামায়াতের সাথে কোনো কোনো ইসলামী দলের আচরণ ১২২
মাওলানা মওদূদী (র)-বিরোধী ফতোয়া ১২৩
মাওলানা ফরিদপুরী (র)-এর বই সম্পর্কে মাওলানা ইউসুফ ১২৬
কাওমী মাদরাসার উস্তাদগণের প্রতি আবেদন ১৩০
আমার প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে হামলা ১৩১
আমার চেম্বারের স্থান পরিবর্তন ১৩১
এরশাদ মযবুতভাবে গদিতে আসীন হলেন ১৩২
পুনরায় যুগপৎ আন্দোলন ১৩৩
বন্যা-পরবর্তী আন্দোলন ১৩৪
জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ ১৩৫
আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ১৩৬
নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতি ১৩৬
বিদেশ সফর ১৩৭
ইংল্যান্ড সফরের দাবি ১৩৮
দেশে ও বিদেশে বিচ্ছিন্ন পরিবারের সমস্যা ১৩৯

আমার বড় নাতি ১৪০
নাবীলের বিয়ের কথা ১৪০
মুরব্বি পর্যায়ে প্রথম বৈঠক ১৪২
ম্যানচেস্টারের আবহাওয়া ১৪৩
সফরে লেখার কাজ ১৪৪
আমার স্বাস্থ্যগত অবস্থা ১৪৫
লন্ডনে আমার কর্মসূচি ১৪৬
ফোরামের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ ১৪৭
আরো দুবার লন্ডন গমন ১৫০
প্রায় তিন মাস বিদেশে কাটালাম ১৫১
তিনটি মৃত্যু সংবাদ ১৫২
নাবীল-নাসরীনের বিয়ে ১৫৫
পারস্পরিক সম্বোধনের সমস্যা ১৫৭
নাত-বউ নিয়ে ম্যানচেস্টার ফিরে এলাম ১৫৮
নাবীলের ওয়ালীমা অনুষ্ঠান ১৫৯
আবার লন্ডন যেতে হলো ১৬০
ম্যারেজ রেজিস্ট্রির অনুষ্ঠান ১৬১
নাবীল-নাসরীনের বিয়ে কবে বৈধ হবে? ১৬২
মামূনের বড় মেয়ে লুবাবা ১৬২
লন্ডনে মুসলিম কমিউনিটি ১৬৩
মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন ১৬৩
ইস্ট লন্ডন মসজিদ ১৬৪
লন্ডন মুসলিম সেন্টার ১৬৬
লন্ডন মুসলিম সেন্টারের বিবরণ ১৬৭
দুজন বিশিষ্ট লোকের সাথে বিশেষ সাক্ষাৎ ১৬৮
প্রফেসর খুরশিদ আহমদ ১৬৮
ড. মোহর আলী ১৬৯
লন্ডনে বোমা হামলা ১৭১
ইংল্যান্ডে আমার ভিডিও ইন্টারভিউ ১৭২
ইসলামী আন্দোলন ১৭৪
রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ১৭৪
আমার লেখা বই ১৭৪
স্মরণীয় ঘটনা ১৭৫
আমার কারাজীবন ১৭৫

বিদেশ সফর ১৭৫
উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ ১৭৫
ইসলামী পুনর্জাগরণের পদ্ধতি ১৭৬
শিক্ষা সম্পর্কে অভিমত ১৭৬
আধ্যাত্মিকতা ১৭৬
রাজনীতি সম্পর্কে অভিমত ১৭৭
যুবকদের ভূমিকা ১৭৭
মহিলাদের ভূমিকা ১৭৭
বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি ১৭৭
মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ১৭৮
পাশ্চাত্যের যুবকদের প্রতি উপদেশ ১৭৯
লন্ডন থেকে এক ডজন যুবকের আগমন ১৮১
ইংল্যান্ডে সন্তানাদিকে গড়ে তোলা ১৮১
ড. মুস্তাফিজের মেয়ের বাসায় বেড়াতে গেলাম ১৮৩
STV চ্যানেলে সালমানের প্রোগ্রাম ১৮৪
চৌধুরী মুঈনুদ্দীনের ছেলের ওয়ালীমা ১৮৫
আমাদের বিদায়বেদনা ১৮৭
ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা সফল হচ্ছে না কেন? ১৮৯
ইসলামী দল ও নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর নীতি ১৯০
এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর দৃঢ়তা ১৯১
জামায়াতে ইসলামীকে কি দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব? ১৯২
ফাযিল ও কামিলের স্বীকৃতির পদ্ধতি নিয়েই বিতর্ক ১৯২
ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার মারাত্মক পরিণতি ১৯৪
মন্ত্রিসভা কমিটিতে বিষয়টি আটকা পড়ে আছে ১৯৪
২০০২ ও ২০০৩ সালে জোটবিরোধী অপপ্রচার ১৯৫
মাদরাসা ছাত্রদের এ ন্যায্য দাবি কি এভাবে ঝুলেই থাকবে? ১৯৬
ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কায়েমের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব কার? ১৯৬
জামায়াতের সাথে দৈনিক ইনকিলাবের বৈরী সম্পর্ক অস্বাভাবিক ১৯৭
বিরোধের আসল ইস্যু কি ইসলাম? ১৯৮
জমিয়তুল মুদাররেসীন ১৯৮
মাওলানা আবদুল মান্নানের সাথে আমার মহব্বতের সম্পর্ক ১৯৯
দৈনিক ইনকিলাবের ভূমিকায় আমি বিব্রত ২০০
ফাযিল-কামিলের স্বীকৃতির পদ্ধতিই বিরোধের মূল ২০১
কাওমী মাদরাসার স্বীকৃতি ২০২

একই মঞ্চ থেকে দুই ধরনের মাদরাসার স্বীকৃতি দাবি ২০৩
যুগপৎ আন্দোলনের নবায়ন-প্রচেষ্টা ২০৩
জাতীয় সংসদে আমার নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন ২০৪
আমার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন ২০৫
সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত আমার বক্তব্য ২০৫
নাগরিকত্ব বহালের চেষ্টা ২০৫
বিষয়টি ঝুলে আছে কেন? ২০৫
ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারণা ২০৬
যারা আমাকে মহব্বত করেন তাদের প্রতি আরয ২০৬
কারো প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই ২০৭
দেশবাসী সবার প্রতি আবেদন ২০৮
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব ২০৯
সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি ২০৯
পলাশী থেকে বাংলাদেশ ২১০
২০০১ সালের নির্বাচনপরবর্তী অবস্থা ২১০
১৯৮৯ সালের গতানুগতিক আন্দোলন ২১১
১৯৮৯ সালে ইসলামের ইস্যুতে ঐতিহাসিক হরতাল ২১১
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় আমার নাগরিকত্ব সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ২১২
এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন ২১৩
কেয়ারটেকার সরকারের ফর্মুলা চূড়ান্তকরণ ২১৪
আন্দোলন যখন তুঙ্গে ২১৪
আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে ২১৫
কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান কে হবেন? ২১৫
এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণা ২১৬
কেয়ারটেকার সরকারের ফর্মুলা ঘোষণা ২১৬
ক্ষমতা থেকে এরশাদের বিদায় ২১৭
টিভি ও রেডিওতে নেতৃবৃন্দের ভাষণ ২১৮
সব ভালো, যার শেষ ভালো ২১৮
কেয়ারটেকার সরকারের উপদেষ্টা নিয়োগ ২১৯
ইরাকের কুয়েত দখল ২২০
কুয়েত দখলের প্রতিক্রিয়া ২২০
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ভূমিকা ২২১
ঢাকাস্থ কুয়েতি দূতের মাধ্যমে পত্রালাপ ২২২
গোটা দেশ নির্বাচনমুখী হয়ে গেল ২২২

নির্বাচনী সমঝোতা প্রচেষ্টা ২২৩
নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ২২৩
১৯৯১ সালের নির্বাচন পলিসি ২২৪
নির্বাচন পলিসি সম্পর্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ২২৪
পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী পরিবেশ ২২৫
জামায়াতের নির্বাচনী অভিযান ২২৫
পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২২৬
আমার চেম্বারে ড. জি ডব্লিউ চৌধুরীর আগমন ২২৭
সরকার গঠনপ্রক্রিয়া ২২৮
বিএনপি-জামায়াত কোয়ালিশন প্রস্তাব ২২৯
জামায়াতের হিসাব আলাদা ২২৯
২০০১ সালে জামায়াত সরকারে শরীক কেন? ২৩০
বেগম খালেদা জিয়া সহযোগিতা চাইলেন ২৩১
প্রেসিডেন্টের সাথে জামায়াতনেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ ২৩৩
বিএনপির পক্ষ থেকে চিঠি এল ২৩৪
মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন ২৩৪
জামায়াতের সম্মতিসূচক চিঠি নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ ২৩৫
সরকার গঠনে জামায়াতের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা ২৩৬
জামায়াতে ইসলামী মনোনীত নির্বাচিত এমপিগণ ২৩৭
জামায়াতের মহিলা এমপি ২৩৯
পর্দার প্রশ্ন ২৩৯
পঞ্চম সংসদের প্রথম অধিবেশন ২৪০
সরকারপদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য ২৪০
সরকারপদ্ধতি নিয়ে সমস্যা ও তার সমাধান ২৪১
একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস ২৪২
গণতন্ত্রের শুভ সূচনা ২৪২
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার জুলাই (১৯৯১) মাসের অধিবেশন ২৪৩
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর উপর হামলা ২৪৩
আমার নাগরিকত্ব ইস্যু ২৪৪
আমীরে জামায়াত নির্বাচনের প্যানেল ঘোষণা ২৪৫
আমীরে জামায়াতের সমাপনী ভাষণ ২৪৫
১৫ সেপ্টেম্বরের গণভোট ২৪৬
৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২৪৭
সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ২৪৮

সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন পদ্ধতি	২৪৯
বিভিন্ন দেশে এ সমস্যার সমাধান	২৪৯
বাংলাদেশে কীভাবে ব্রিটিশ ক্রাউনের বিকল্প জোগাড় করা যায়?	২৪৯
মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন	২৫০
নির্বাচিত আমীর হিসেবে আমার নাম প্রকাশ্যে ঘোষণা করা	২৫১
ইস্যুটি আমিই তুলে ধরি	২৫১
বিচারপতি সাহাবুদ্দিন সুপ্রিমকোর্টে ফিরে গেলেন	২৫২
বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের অবসরগ্রহণের পর	২৫২
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আচরণ	২৫৪
আমীরে জামায়াত হিসেবে আমার নাম প্রকাশের ইস্যু	২৫৪
মজলিসে শূরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ	২৫৫
উক্ত অধিবেশনে সমাপনী ভাষণ	২৫৬
১৫ বছর পর ১৯৯১ সালের ঘটনাবলি লিখছি	২৫৭
উপনির্বাচনে বেগম জিয়ার ওয়াদা খেলাফি	২৫৭
জামায়াতের আমীর হিসেবে নাম প্রকাশের প্রতিক্রিয়া	২৫৮
আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন	২৫৮
গণ-আদালত গঠন	২৫৯
গণ-আদালতের সদস্যবৃন্দ	২৬০
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা	২৬০
যে নোটিশ দিয়ে সরকার গ্রেফতারের সূচনা করল	২৬০
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নোটিশের জবাব	২৬১
সরকারের অমানবিক আচরণের প্রতিবাদ	২৬৩
দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত আমার সাক্ষাৎকার	২৬৪
গ্রেফতার হওয়ার প্রস্তুতি	২৬৭
আমি গ্রেফতার হলাম	২৬৮
গ্রেফতারের পূর্বে	২৭০
গ্রেফতারের সময়কার তথ্যাবলি	২৭১
গ্রেফতার মুহূর্ত	২৭১
গ্রেফতারের পূর্বমুহূর্তে প্রদত্ত ভাষণ	২৭২
পুলিশের গাড়িতে	২৭৩
গ্রেফতারের খবর	২৭৪
যেভাবে তাঁকে গৃহবন্দী করে নোটিশ দেওয়া হয়	২৭৫
গ্রেফতার সম্পর্কে সরকারি প্রেসনোট	২৭৫
নির্মূল কমিটির প্রতি নোটিশ জারি– সরকারের নমনীয় আচরণ	২৭৬

গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়া ২৭৭
জামায়াতের প্রেস কনফারেন্স ২৭৭
গণ-আদালতের আইনগত ও নৈতিক মর্যাদা ২৮০
গণ-আদালতের পক্ষের পত্রিকার বিবরণ ২৮০
এ বিবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্য ২৮৩
গণ-আদালতের বিচার প্রক্রিয়া ২৮৩
অভিযোগনামা ২৮৪
গণ-আদালতের রায় ২৮৫
সরকারের লোকদেখানো গ্রেফতারি পরোয়ানা ২৮৫
সরকার গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয় ২৮৬
গণ-আদালত সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য ২৮৭
গণ-আদালতের উদ্যোক্তা কারা? ২৮৯
তারা আসলে কী চান? ২৮৯
সরকার নীরব কেন? ২৮৯
আরো একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা ২৯০
অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যাচার ২৯০
বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্ষক কারা? ২৯০
বাংলাদেশের সবাই স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ২৯১
জামায়াতের আকুল আবেদন ২৯১
কয়েকজন আপন লোকের ইনতিকাল ২৯২
আমার বোন আনওয়ারা ২৯২
জনাব মু. নূরুয্যামান ২৯৪
কাযী শামসুর রহমান ২৯৬
মাওলানা একিউএম ছিফাতুল্লাহ ২৯৬
রিয়াযুদ্দীন আহমদ ২৯৭
জেলে প্রবেশ করলাম ২৯৯
২৬ সেলে উঠলাম ৩০০
মন্ত্রীদের জেলখানা ৩০০
মন্ত্রীরা আমার রুমমেট ৩০১
জেলারের আতিথেয়তা ৩০১
মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন ৩০২
মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত ৩০৩
সমাপনী ভাষণ ৩০৪
জামায়াতে ইসলামীর বলিষ্ঠ ভূমিকা ৩০৪

ইসলামী শক্তির প্রদর্শনী সমাবেশ ৩০৫
সমাবেশে কে কী বলেন ৩০৭
সমাবেশের প্রতিক্রিয়া ৩০৯
মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন ৩০৯
অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা ৩১০
সফল হরতালের রিপোর্ট ৩১০
তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ৩১১
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বিশেষ অধিবেশন ৩১১
হাইকোর্টে মামলা দায়ের ৩১১
মামলায় যারা ওকালতি করেন ৩১২
মজলিসে শূরার জুলাই অধিবেশন ৩১২
নাগরিকত্ব মামলার আরো তথ্য ৩১৩
তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ৩১৩
আমার জেলজীবন ৩১৪
লেখার পরিকল্পনা ৩১৪
লেখা শুরু করতে বিলম্ব হয়ে গেল ৩১৫
কারাগারের প্রথম লেখা ৩১৫
জেলে পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ ৩১৬
বিআইসির কৃতিত্ব ৩১৬
সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ ৩১৭
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৩১৮
বইটির ভূমিকা ৩১৯
ওয়ায-মাহফিলে দেওয়া সূরা বাকারার ৪র্থ রুকূ'র প্রচলিত অর্থ ৩১৯
এ তরজমার ভিত্তিতে ভুল ব্যাখ্যা ৩২০
এ ব্যাখ্যা গ্রহণে সমস্যা ৩২১
এ ভুল ব্যাখ্যা যা শিক্ষা দেয় ৩২২
মারাত্মক শিক্ষা ৩২৩
জেলে লেখা অন্যান্য বই ৩২৩
আমার নিকটাত্মীয়দের প্রতি আকুল আবেদন ৩২৩
কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের ৪ দফা কর্মসূচি ৩২৪
বিয়ে তালাক ফারায়েয ৩২৪
মুসলিম নেতাদের এ দশা কেন? প্রতিকারই বা কী? ৩২৫
মুমিনের জেলখানা ৩২৬
মনটাকে কাজ দিন ৩২৭

আল্লাহর দরবারে ধরনা ৩২৮
ইসলামী আন্দোলন : কর্মীদের সহীহ জযবা ৩৩০
দেশ গড়ার ডাক ৩৩১
স্টাডি সার্কেল ৩৩৩
জেলের অধিবাসীদের বিবরণ ৩৩৫
কর্মকর্তাদের সাথে আমার সম্পর্ক ৩৩৬
আতর হুযূর ৩৩৬
আমার প্রিয় ফালতু ৩৩৭
জেলখানায় আমার উকিলের সাথে সাক্ষাৎ ৩৩৮
জেলখানায় জেনারেল এরশাদের সাথে সালাম বিনিময় ৩৩৮
বন্দী অবস্থায় হাইকোর্টে আমার হাজিরা ৩৩৯
বিচারপতির নিকট আমার বক্তব্য ৩৪০
দ্বিতীয়বার হাইকোর্টে আগমন ৩৪৩
নবীনগর ফোরামের ঐতিহাসিক সেমিনার ৩৪৪
আমার গ্রেফতারে জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া ৩৪৫
জেল থেকে মুক্তি ৩৪৭
মিছিল অব্যাহত রইল ৩৪৯
মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন ৩৪৯
প্রস্তাব গ্রহণ ৩৫২

২১৯.

সংলাপ ব্যর্থ হওয়ার প্রতিক্রিয়া

১৫ দলীয় ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর যুগপৎ আন্দোলনের সাথে সরকারের সংলাপ ১৯৮৪ সালের ২৯ এপ্রিল ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ফলে স্বাভাবিক কারণেই এরশাদবিরোধী আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায় এবং জেনারেল এরশাদ দাপট দেখানোর সুযোগ পেয়ে যান। ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন অত্যন্ত জোরদার হওয়ার ফলেই তো সামরিক শাসনকর্তা উপজেলা নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হন এবং আন্দোলনরত জোট ও দলের সাথে সংলাপের প্রয়োজন বোধ করেন।

সংলাপের সময় জেনারেল এরশাদ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়ে সামরিক শাসনকে আবার মযবুত করতে সক্ষম হন।

একটি আন্দোলন জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হলেও আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দের দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ার ফলে যদি আন্দোলন থেমে যায় তাহলে নতুন করে আবার আন্দোলনকে চাঙ্গা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় সরকার পূর্বের চেয়েও বেশি মযবুত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়।

১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতের যুগপৎ আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এরশাদ চেয়েছিলেন প্রথমে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন করে তার গণভিত্তি রচনা করতে। সংলাপ ব্যর্থ হওয়ার কারণে তিনি তার পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোতে লাগলেন। উপজেলা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেও কয়েকবার পরিবর্তন করেন। ১২ জুলাই ঘোষণা করেন, ৮ ডিসেম্বর সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অক্টোবরে আবার তারিখ ঘোষণা করেন। কিন্তু ১৯৮৪ সালে কোনো নির্বাচনই হয়নি।

আবার যুগপৎ আন্দোলন

১৯৮৪ সালেই জুলাই পর্যন্ত আন্দোলন স্তিমিত থাকার পর আগস্টে আবার কর্মসূচি শুরু করা হয়। জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটির অব্যাহত যোগাযোগের ফলে ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতের ডাকে ২৭ আগস্ট সারা দেশে হরতাল পালনের মাধ্যমে আন্দালনের সূচনা করা হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর আবার হরতাল ডেকে আন্দোলনকে চাঙ্গা করার প্রচেষ্টা চলে। ১৪ অক্টোবর ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াত পৃথকভাবে ঢাকায় মহাসমাবেশ করে। তাতেও আন্দোলনে তেমন গতি সঞ্চার হয়নি।

৮ ডিসেম্বর সারা দেশে ২৪ ঘণ্টার হরতাল পালনের পর আবার ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর একটানা দুই দিনের হরতাল ডাকা হলে সরকার ২০ ডিসেম্বর রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এ সত্ত্বেও হরতাল পালন করা হয়।

এভাবেই ১৯৮৪ সাল অতিক্রান্ত হয়। আন্দোলন চলতে থাকে, কিন্তু সরকার মোটেই বিব্রতবোধ করেনি।

১৯৮৫ সালে এরশাদের নব উদ্যম

১৯৮৫ সালের ১৫ জানুয়ারি এরশাদ মন্ত্রিসভা বাতিল করে পরদিন সাত সদস্যবিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১ মার্চ এরশাদ তার প্রতি জনগণের আস্থাসূচক রায় হাসিল করার উদ্দেশ্যে ২১ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। এটা স্বৈরশাসকদের একটা বিশ্বজনীন কৌশল। গণভোটে জনগণকে সরকারের পক্ষে 'হ্যাঁ ভোট' বা বিপক্ষে 'না ভোট' দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জনগণ জানে যে, 'না ভোট' দিলেও স্বৈরশাসক পদত্যাগ করবেন না। তাই এ প্রহসনমূলক ভোটে জনগণের কোনো আগ্রহ থাকে না। সরকারি প্রচেষ্টায় কিছু লোককে হ্যাঁবোধক ভোট দেওয়ার জন্য ভোটকেন্দ্রে হাজির করা হয়। যারা হ্যাঁবোধক ভোট দিতে চায় না, তারা কেন্দ্রে যায়-ই না। এভাবে জনগণের আস্থাভোট লাভের একটি রীতি সকল স্বৈরশাসকই অনুসরণ করে থাকেন। গণভোটকে বাধামুক্ত করার উদ্দেশ্যে ১ মার্চ থেকেই রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়।

৯ এপ্রিল ('৮৫ সাল) সরকার ঘোষণা করে, ১৬ ও ২০ মে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের যে দাবি যুগপৎ আন্দোলনের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল, এ ঘোষণা ঐ দাবির সুস্পষ্ট বিরোধী হওয়ায় আন্দোলনের পক্ষ থেকে এ নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। '৮৪ সালের মার্চ মাসে উপজেলা নির্বাচন মুলতবি করায় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এরশাদের সাথে সংলাপে যেতে সম্মত হন। কিন্তু সংলাপে নেতৃবৃন্দের দুর্বলতা টের পেয়ে যখন উপজেলা নির্বাচন ঘোষণা করা হলো, তখন তা ঠেকানোর কোনো সাধ্যই রইল না।

১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটি উপজেলা নির্বাচন প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নিলেও তা বাস্তবায়ন করার কর্মসূচি গ্রহণে ব্যর্থ হলো। ফলে দুই জোটের দলীয় লোকদের পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা সম্ভব হলো না। অবশ্য জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হতে দেওয়া হয়নি। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন হরতাল দিয়ে যুগপৎ আন্দোলনকারীরা দায়সারাভাবে নির্বাচনবিরোধী ভূমিকা পালন করে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়।

এরশাদের আমেরিকা সফর

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র (USA) বর্তমানে নিজেদেরকে বিশ্বের রাজনৈতিক নেতা মনে করে এবং যেসব দেশ এ নেতৃত্ব মেনে নেয় সেসব দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান আমেরিকার কূটনৈতিক স্বীকৃতি হাসিল করাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান হিসেবে জেনারেল এরশাদ ১৯৮৫ সালের ১২ অক্টোবর আমেরিকায় রাষ্ট্রীয় সফরে যান এবং ২১ অক্টোবর ফিরে আসেন। ঐ বছর মার্চ মাসে তিনি হ্যাঁভোটে জনগণের আস্থা হাসিল করায় আমেরিকায় কোনো মর্যাদা পেয়েছিলেন কি না জানি না। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলন সত্ত্বেও ক্ষমতায়

টিকে থাকার প্রমাণ অবশ্য দিতে সক্ষম হয়েছেন, তা না হলে সেখানে যাওয়ার সুযোগই পেতেন না।

ঐ সফরে তিনি বাংলাদেশের জন্য কী কী সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাও আমার সঠিক জানা নেই। তবে সেখান থেকে দুটো শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, যা তিনি এ দেশে প্রয়োগ করা প্রয়োজন বোধ করলেন :

১. ইসলামী আন্দোলনকে 'মৌলবাদ' নামক গালি দেওয়ার মৌলিক শিক্ষা। আমার অত্যন্ত ভালোভাবে স্মরণ আছে যে, এ দেশে এ 'মহান' গালিটি এর পূর্বে চালু ছিল না। শব্দটির অর্থ যা-ই হোক, যারা এটাকে ব্যবহার করেন তারা নিন্দাবাচক শব্দ হিসেবেই তা উচ্চারণ করেন।

২. আমেরিকার রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের স্ত্রীর জন্য 'ফার্স্ট লেডি' নামে একটা সরকারি পদবি রয়েছে। তিনি ঐ পদবিটি তাঁর স্ত্রী রওশন এরশাদকে দান করেন। এমনকি বঙ্গভবনে ফার্স্ট লেডির সরকারি অফিস পর্যন্ত স্থাপন করা হয়। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে এরশাদ পদত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী ঐ পদবির সকল সুবিধা ভোগ করেন।

এরশাদের একটি বিরাট সাফল্য

এরশাদের শাসনামলে বাংলাদেশের গৌরবজনক অধ্যায় রচিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরের ৭ তারিখ থেকে তিন দিনব্যাপী এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সার্ক (SAARC— South Asian Association for Regional Co-operation) নামক সংগঠনটি জন্মলাভ করে।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উপমহাদেশের সাতটি রাষ্ট্রের একটি সংস্থা কায়েমের উদ্যোগ নিয়ে যোগাযোগ শুরু করলেন; সাড়াও পেলেন। কিন্তু তিনি তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার সুযোগ পেলেন না। ১৯৮১ সালে তিনি নিহত না হলে হয়তো তাঁর সময়ই সংস্থাটি জন্মলাভ করত। ঢাকায় সার্কের শুভযাত্রা শুরু হওয়ায় জিয়ার স্বপ্ন তাঁর জন্মভূমিতেই পূরণ হলো।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপ– এ সাতটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ দেশ সংস্থাভুক্ত হয়। সার্কের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব পাস হয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তা বাস্তাবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্রই উপকৃত হতো। যদি তা সফল করার জন্য সবাই সম্মত হতো তাহলে সার্কের উদ্দেশ্য অবশ্য পূরণ হতো। যেহেতু সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ভারতই সর্ববৃহৎ, সেহেতু এর সহযোগিতার অভাবেই এ সংস্থাটি এগোতে পারছে না।

২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে সার্কের শীর্ষ সম্মেলনের মহা-আয়োজন খোঁড়া অজুহাতে ভারত বানচাল করে দেয়। সার্কের জন্ম ঢাকায়– এটা সত্যিই গৌরবের বিষয়। এ গৌরব অর্জনে জেনারেল এরশাদের সাফল্য অনস্বীকার্য। তবে সার্কের সাফল্য ভারতের সদিচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

এরশাদ আমলে বারবার রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করা হয়

এরশাদের শাসনামলে ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত কয়েকবারই রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করা হয়। রাজনৈতিক কার্যকলাপের ব্যাপারে এরশাদের কৌশল ছিল নিম্নরূপ :

তিনি যা করতে চাইতেন, তা সম্পাদন করার প্রয়োজনে রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ ঘোষণা করতেন। কার্যোদ্ধার হয়ে গেলেও ময়দানে রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেওয়ার পূর্বে কিছু দিন রাজনৈতিক দলগুলোকে ঘরোয়া পর্যায়ে রাজনীতি করার অনুমতি দিতেন। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনৈক্য ও দুর্বলতা থাকার কারণেই তিনি এ কৌশল প্রয়োগ করেন। যদি রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করার ঘোষণাকে উপেক্ষা করার সাহস রাজনৈতিক দলগুলো প্রদর্শন করতে সক্ষম হতো তাহলে রাজনীতি নিয়ে এ জাতীয় খেল-তামাশা করার হিম্মত তিনি পেতেন না।

১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ হ্যাঁ-নাবোধক গণভোটকে সফল করার উদ্দেশ্যে ১ মার্চ তিনি রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ঐ বছর ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি ঘোষণা করেন, ১ অক্টোবর থেকে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু করা যাবে।

১০ ডিসেম্বর সার্ক সম্মেলন সফলভাবে সমাধা হওয়ার পর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি '৮৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেন।

দেশকে সংসদ নির্বাচনমুখী করার সরকারি উদ্যোগ

১৯৮৫ সালের মার্চে গণভোট ও মে মাসে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠান ও ডিসেম্বরে সাফল্যের সাথে সার্ক সম্মেলন সম্পন্ন করার পর জেনারেল এরশাদ ক্ষমতার মসনদে মযবুত অবস্থান হাসিল করেছেন বলে আত্মবিশ্বাসী হয়ে গেলেন।

রাজনৈতিক জোট ও দলগুলো তো সর্বাগ্রে সংসদ নির্বাচনের দাবি ১৯৮৩ সাল থেকেই জানিয়ে এসেছে। যদিও তাদের দাবি অগ্রাহ্য করে উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে, তবু সংসদ নির্বাচনে তাদের আপত্তি না হওয়ারই কথা। এ বিবেচনা অনুযায়ী এরশাদ রাজনৈতিক দলগুলোকে তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যে নির্বাচনমুখী করার কৌশল অবলম্বন করলেন। স্বাভাবিক কারণেই রাজনৈতিক দল নির্বাচনের সুযোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে, যাতে ক্ষমতায় অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত হয়। নির্বাচনের টোপ ফেললে তাদের সরকারবিরোধী ঐক্যও ভেঙে যাওয়ার কথা।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, এরশাদ সরকারের পরিচালনায় যদি রাজনৈতিক দলসমূহ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাহলে সরকার আরো স্থিতিশীল হবে। নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য অবশ্যই বিনষ্ট হবে।

এ পরিকল্পনা অনুযায়ী জেনারেল এরশাদ ফেব্রুয়ারি মাসেই ঘোষণা দিলেন, ১৯৮৬ সালের ৭ মে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

যুগপৎ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও নির্বাচন

নির্বাচনের ঘোষণার পর ১৫ ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে লিয়াজোঁ পর্যায়ে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি সম্পর্কে যোগাযোগের মাত্রা আরো বেড়ে গেল।

প্রাথমিক আলোচনায় এ বিষয়ই প্রাধান্য পেল যে, এরশাদ সরকারের পরিচালনায় নির্বাচনে আদৌ সামান্যতম নিরপেক্ষতা ও থাকবে কি না? সবাই এ আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, নিরপেক্ষ নির্বাচনের কোনো সম্ভাবনাই নেই। এ অবস্থায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ অর্থহীন।

জামায়াতের পক্ষ থেকে দুই জোটকে বলা হলো, এরশাদকে পদত্যাগ করে কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানাতে পারলে নির্বাচন বর্জন করার অজুহাত সৃষ্টি হতে পারে। আমরা এরশাদের পদত্যাগ দাবি না করলে নির্বাচন বয়কট করার পক্ষে কোনো যুক্তিই থাকে না। এরশাদকে ক্ষমতাসীন রেখে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে তাঁকে ক্ষমতায় স্থিতিশীলই করা হবে।

এরশাদের পদত্যাগ দাবি না করায় রাজনৈতিক দলগুলো সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে রীতিমতো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। পরস্পর সন্দেহ করাও শুরু হলো। জোট ও জামায়াত যখন লিয়াজোঁতে বসে তখন সবাই নির্বাচনের বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করে। নির্বাচন নিরপেক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই; নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে এরশাদের গদি আরো মযবুত হবে বলে মন্তব্য করা হয়।

১৫ দলীয় জোটে বাম দলগুলোও শরীক ছিল। তাদের কারণেই জোটে দলের সংখ্যা এত বেশি হয়। নির্বাচন হলে বামদের তেমন কোনো সুবিধা হবে না বলে তারা সচেতন। তাদের পক্ষ থেকে একটা চাল ময়দানে চালাতে চেষ্টা করা হয়েছে। সিপিবির সভাপতি কমরেড ফরহাদ আহমদ দাবি জানালেন, একটা প্রতীকী নির্বাচন হোক। শেখ হাসিনা ও বেগম জিয়া সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে প্রত্যেকে দেড় শ' আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তারা যদি অধিকাংশ আসনে বিজয়ী হন তাহলে তারাই সরকার গঠন করবেন। এরশাদের দল পরাজিত হলে তিনি পদত্যাগ করবেন।

ভাবসাবে মনে হলো দুই নেত্রীই এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। এরশাদ আতঙ্কিত হয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করলেন, কোনো প্রার্থী একসাথে পাঁচটির বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। এভাবে ফরহাদ সাহেবের কূটচাল বানচাল হয়ে গেল।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কেউ উড়িয়ে দিতে পারছিলেন না। গণ-আন্দোলন করে এরশাদকে অপসারণ করার মতো পরিস্থিতি যুগপৎ আন্দোলন দ্বারা সৃষ্টি না হওয়ায় সবাই অনুভব করছিলেন যে, এ নির্বাচন ঠেকানো যাবে না। কিন্তু আন্দোলনরত জোট ও দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্তে না পৌঁছায় এবং নির্বাচনবিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেতে থাকায় রাজনৈতিক পরিবেশ সন্দেহযুক্ত হয়েই রইল।

এ পরিস্থিতিতে কমরেড ফরহাদের প্রস্তাব প্রধান দুই দল বিবেচনাযোগ্য মনে করায় স্বাভাবিক কারণেই জামায়াত অত্যন্ত বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ হয়। যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ময়দানে জামায়াতের অগ্রগতিতে হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই কমরেড

ফরহাদ এমন এক প্রস্তাব পেশ করলেন, যাতে জামায়াত সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের কোনো সুযোগই না পায়। এরশাদ এ প্রস্তাব সমর্থন না করায় ঐ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়।

নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জামায়াতের সাথে বিএনপির নির্বাচনী সমঝোতার প্রয়োজন উভয় দলই অনুভব করল। এ উদ্দেশ্যে বিএনপির অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা কর্নেল (অব.) মুস্তাফিজুর রহমানের বাসভবনে বেগম খালেদা জিয়ার সাথে আমার প্রাথমিক আলোচনা হয়। আমি বেগম সাহেবার নিকট প্রস্তাব রাখলাম, বিএনপি ২০০ আসনে প্রার্থী দিক এবং জামায়াতকে ১০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দিক। বেগম সাহেবা বললেন, কতক ছোট ছোট দলের জন্যও কিছু আসন রাখতে হবে। আমি বললাম, ১৫/২০ আসন রেখে ৮০টি জামায়াতকে ছেড়ে দিন। তিনি বললেন, বিএনপির পক্ষ থেকে জামায়াতের সাথে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য কর্নেল (অব.) মুস্তাফিজুর রহমানের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সরকারে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন।

জামায়াতের রাজনৈতিক স্বীকৃতি

কেয়ারটেকার ফর্মুলা দুই জোট গ্রহণ না করায় নির্বাচন বর্জনের পক্ষে আন্দোলনের কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে জামায়াতের মনে হয়নি। এরশাদ অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন এবং তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে বলে দাবি করাই আন্দোলনের প্রধান বিষয় হওয়া উচিত ছিল। এটাই জনগণের নিকট একমাত্র বোধগম্য ইস্যু হতে পারত। কিন্তু পদত্যাগের পরে ক্ষমতা কার হাতে যাবে, এর কোনো প্রস্তাবনা কারো কাছেই ছিল না। কেয়ারটেকার ফর্মুলাই একমাত্র যুক্তিপূর্ণ দাবি হতে পারত।

রাজনৈতিক ময়দানে কোনো দলের পক্ষ থেকে পেশ করা বড় ধরনের কোনো ইস্যুকে সমর্থন করা বড় দলগুলোর জন্য অত্যন্ত কঠিন। এতে ঐ ইস্যুর প্রবক্তার মর্যাদা স্বীকার করে নেওয়া হয় বলে বড় দল এটাকে দলীয় প্রেস্টিজের জন্য ক্ষতিকর মনে করে থাকে। জামায়াতকে ঐ মর্যাদা দিতে কেউ রাজি হলেন না; অথচ তাদের নিকট কোনো বিকল্প প্রস্তাবও ছিল না।

দুই জোটের লিয়াজোঁ কমিটির সাথে জামায়াতের নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমেই আন্দোলনের কর্মসূচি পৃথকভাবে ঘোষণা করা হতো। দুই জোট ও জামায়াত একমঞ্চে সমবেত হতো না। দুই জোটও এক মঞ্চে কর্মসূচি পালন করত না। একমত হয়ে একই কর্মসূচি আলাদাভাবে ঘোষণা করা হতো। সাংবাদিকরা দুই জোটকে জিজ্ঞেস করতেন, আপনাদের কর্মসূচি গ্রহণের বেলায় কি জামায়াতও শরীক থাকে? জবাবে উভয় জোটই অস্বীকার করত এবং বলত, কোনো দল আমাদের কর্মসূচি অনুকরণ করলে আমরা বাধা দিই না। এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুই জোট জামায়াতকে রাজনৈতিক দল হিসেবে তখনো প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ছিল না।

আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণে জামায়াত লিয়াজোঁ পর্যায়ে দুই জোটের সাথে নিয়মিত শরীক থাকা সত্ত্বেও তারা জামায়াতকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিতেই প্রস্তুত ছিলেন না। জামায়াতের পেশ করা কেয়ারটেকার ফর্মুলা গ্রহণ করা তাদের পক্ষে কেমন করে সম্ভব?

নির্বাচন সম্পর্কে জামায়াতের মনোভাব

রাজনৈতিক ঐ পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের তিন দিনব্যাপী এক বৈঠক হয়। ব্যাপক আলোচনার পর জামায়াত সিদ্ধান্ত নেয় যে, যুগপৎ আন্দোলনের কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য না থাকায় স্বৈরশাসককে অপসারণের কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাই জনগণকে নির্বাচনমুখী করা ছাড়া অন্য কোনো কর্মসূচির প্রতি তেমন সাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। দুই জোটকেও নির্বাচনমুখী করার চেষ্টা করতে হবে। নির্বাচনে যাতে এরশাদের দল কিছুতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হতে না পারে, সে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অন্য কোনো বিকল্প কর্মসূচির সম্ভাবনা নেই।

বিশেষ করে জামায়াতের জন্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ সবচেয়ে জরুরি। কারণ, বাংলাদেশে জামায়াতের নামে তখন পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশে আইনগতভাবে রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। কোনো দল পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে এবং নির্বাচন কমিশন সে দলের জন্য প্রতীক বরাদ্দ করলে দলটি আইনগতভাবে রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেয়ে গেল। যদি নির্বাচনে অন্তত ১০টি আসনে জয়ী হয়ে পার্লামেন্টারি পার্টির মর্যাদা পেয়ে যায় তাহলে জনগণের নিকটও একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য হয়ে গেল। নির্বাচনে কোনো আসন না পেলেও আইনগত সার্টিফিকেট পেয়ে গেল। এ মর্যাদা পেলে রাজনৈতিক ময়দানে সে দলটিকে স্বীকৃতি দিতে সবাই বাধ্য। শেষ পর্যন্ত কর্মপরিষদের সকল সদস্য একমত হলেন যে, জামায়াতের অস্তিত্বের স্বার্থেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

এত বড় ইস্যুতে কর্মপরিষদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের গঠনতান্ত্রিক ইখতিয়ার না থাকায় জামায়াতের মজলিসে শূরা আহ্বান করা হলো। মজলিসে শূরা সদস্যগণ বিষয়টির গভীর তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রাণ খুলে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মজলিসে শূরায় দুই দিন বিস্তারিত আলোচনার পর নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২২০.

এক আজব রাজনৈতিক পরিবেশ

রাজনৈতিক জোটভুক্ত দলসমূহ ভেতরে ভেতরে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, অপরদিকে প্রকাশ্যে নির্বাচনবিরোধী বক্তব্যও দিয়ে যাচ্ছিল। বড় দুই দলের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকাই স্বাভাবিক। কোনো দলই নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা না বলায় পারস্পরিক সন্দেহ বিরাজ করছিল। এ পরিবেশে শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম লালদিঘি ময়দানে দলীয় জনসভায় বলেন, এরশাদ সরকারের পরিচালনায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা অর্থহীন। যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এরশাদের গদি মযবুত করবে তারা 'জাতীয় বেঈমান' হিসেবে গণ্য হবে।

অথচ ময়দানে গুজব রটেছে যে, ১৫ দলীয় জোটের শরীক দলগুলো নির্বাচনে আসন দাবি করে রীতিমতো দর কষাকষি চালাচ্ছে।

তখন জামায়াত ও বিএনপির মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতার আলোচনা চলছে। বেগম জিয়ার পক্ষ থেকে কর্নেল মুস্তাফিজ ও জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটির মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠকাদি চলল। প্রথমে বিএনপির পক্ষ থেকে জামায়াতকে মাত্র ২০টি আসন ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কয়েক দিনের দর কষাকষির পর কর্নেল মুস্তাফিজ ৫০টি আসন জামায়াতকে ছেড়ে দিতে সম্মত হলে শেষ পর্যন্ত জামায়াত তা মেনে নেয়।

পরে জানা গেল, জামায়াতকে এত বেশি আসন ছেড়ে দিতে সম্মত হওয়ায় নিজ দলীয় বৈঠকে কর্নেল মুস্তাফিজ রীতিমতো নাজেহাল হন। ফলে বিএনপির সাথে নির্বাচনী সমঝোতার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহের কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ঘোষণা না হওয়ায় জেনারেল এরশাদ ধমকের সুরে ঘোষণা করলেন, ১৯ মার্চ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। ২০ মার্চ তিনি জাতির উদ্দেশে নির্বাচন সম্পর্কে ভাষণ দেবেন। যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না তাদেরকে নির্বাচনবিরোধী কোনো তৎপরতা চালাতে দেওয়া হবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার খবর তিনি হয়তো জানতেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরোধী কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি ময়দানে না থাকায় এরশাদ পূর্ণ আস্থার সাথেই ঐ সতর্কবাণী উচারণ করলেন।

ধমকে কাজ হলো

এরশাদের এ ধমকে কাজ হলো। জানা গেল, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ১৯ মার্চ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে বৈঠকে বসবে। জামায়াতও ঐ একই তারিখে বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নিল।

১৯ মার্চ (১৯৮৬) আমার সভাপতিত্বে কর্মপরিষদের বৈঠক শুরু হলো। কর্মপরিষদ তো পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, দুই জোটের এক জোটও যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাহলে জামায়াত অবশ্যই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তাই বৈঠকে আলোচনার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমরা যে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম তা-ই যথেষ্ট ছিল। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রইলাম। জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বায়ক জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সাথে ফোনে যোগাযোগ রাখছিলেন।

আমাদের সিদ্ধান্ত পত্রিকায় পাঠানোর পূর্ণ প্রস্তুতি সত্ত্বেও ঐ দুই দলের সিদ্ধান্ত না জানা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বাধ্য ছিলাম। রাত ১১টা পর্যন্ত তাদের সিদ্ধান্ত জানা গেল না। তাই আমি বৈঠক সমাপ্ত ঘোষণা করে লিয়াজোঁ কমিটিকে দায়িত্ব দিয়ে বাড়িতে চলে এলাম। ঐ দুই দলের সিদ্ধান্ত জানার পর আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পত্রিকায় খবর দেওয়ার কথা।

দৈনিক সংগ্রামের দুজন সাংবাদিক ৩২ নং ধানমন্ডির বাড়িতে আওয়ামী লীগের সংবাদ সংগ্রহের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। বিএনপির খবর মুজাহিদ সাহেব ফোনে নিচ্ছিলেন। রাত ২টার সময় দৈনিক সংগ্রামের সাংবাদিকদ্বয় মোটর সাইকেলে খবর নিয়ে এলেন।

খবর এল যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে; কিন্তু বিএনপি তখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌছেনি। বিএনপির তদানীন্তন সেক্রেটারি জেনারেল ওবায়দুর রহমানের সাথে মুজাহিদ সাহেব অব্যাহতভাবে ফোনে যোগাযোগ রাখছিলেন। রাত তিনটায় ওবায়েদ সাহেব মুজাহিদ সাহেবকে জানালেন, একটা টেকনিক্যাল কারণে আমরা এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। আগামীকাল সিদ্ধান্ত নেব। আপনাদের সিদ্ধান্ত পত্রিকায় দিয়ে দিন।

সকল পত্রিকা অফিস তখন পর্যন্ত খবরের প্রতীক্ষা করছিল। দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ রাত তিনটায় এ খবর পত্রিকায় প্রকাশের নির্দেশ দিয়ে বাড়িতে গেলেন।

২০ মার্চ (১৯৮৬) বড় বড় হেডিং-এ পত্রিকায় খবর বের হলো, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বিএনপি এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।

বিএনপির টেকনিক্যাল কারণটি কী?

মুজাহিদ সাহেব ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ করে ঐ কারণটি জেনে নিলেন। বিএনপির প্রথম সারির নয়-দশজন নেতা প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তারের মন্ত্রী ছিলেন। সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ সামরিক শাসন কায়েম করার পর তাদের বেশ কয়েকজনকে কারাবদ্ধ করেন এবং তাদেরকে পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য বলে অন্যায়ভাবে অর্ডিন্যান্স জারি করেন। তাদের মধ্যে ওবায়দুর রহমানও একজন।

বিএনপিকে নির্বাচনমুখী করার উদ্দেশ্যে ঐ অর্ডিন্যান্স বাতিল করে তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার ওয়াদাও নাকি এরশাদ সাহেব করেছিলেন। ১৯ মার্চ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পর্যন্ত ঐ ওয়াদা পূরণ না করায় বিএনপি সমস্যায় পড়ে গেল। পরের দিন ওয়াদা পূরণের অপেক্ষায় থাকার পর বিএনপি বুঝতে পারল, এরশাদ সাহেব তাদের ধোঁকা দিয়েছেন। তখন বিএনপি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিল এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কারণে হাসিনার দেওয়া 'জাতীয় বেঈমান' উপাধিটি আওয়ামী লীগের প্রতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করল। আসল যে কারণে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারল না, তা তো জনগণের নিকট প্রকাশ করা চলে না।

উভয় জোট এতদিন পর্যন্ত এরশাদ সরকারের পরিচালনায় নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় বলে প্রচার করেছে। এখন বিএনপি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে নির্বাচন বর্জনকে গৌরবের সাথে প্রচার করতে থাকল; স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আপসহীন দল হিসেবে আবির্ভূত হলো।

'জাতীয় বেঈমান' গালি খেয়ে আওয়ামী লীগ দাবি করল, বিএনপি তাদের সাথে প্রতারণা করেছে। তারা আরো দাবি করল, বিএনপির সাথে তাদের নির্বাচনী প্রার্থীদের তালিকার বিনিময়ও হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে আমরা কিছুই জানতাম না।

জামায়াত বিএনপির সাথে এবং তাদের সেক্রেটারি জেনারেলের সম্মতি নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের খবর পত্রিকায় পরিবেশন করেছে। তাই জামায়াতের নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে বিএনপি কোনো বিরূপ মন্তব্য করেনি। জামায়াত তো নিশ্চিতই ছিল যে, বিএনপিও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে।

তৃতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে জামায়াতের সিদ্ধান্ত

১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী ছাড়াও অনেক দল অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে আসন বণ্টন নিয়ে ১৫ দল থেকে পাঁচটি বামদল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এরশাদ সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন নিরপেক্ষ হওয়ার তো কথাই নেই। তদুপরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিএনপি ব্যাপক প্রচারাভিযান চালায়। নির্বাচনে জামায়াতের অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমাদের জনশক্তি বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন ডাকা হয়।

১৯৮৬ সালের ৯ এপ্রিল এ জরুরি অধিবেশন বসে। ময়দানের খবরে জানা গেল, জামায়াতের জনশক্তির মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি নেই বটে, ভোটারদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে। বিএনপি নির্বাচনে গেল না অথচ আমরা গেলাম, এ বিষয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় মজলিসে শূরার অধিবেশন জরুরিই ছিল বলে সবাই অনুভব করলেন।

বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সর্বসম্মতভাবে এবং এতমিনানের সাথে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়।

যেসব আসনে জামায়াতের নমিনি নেই, সেখানে ভোট দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় যে, আমাদের ভোটারদের পরামর্শ দিতে হবে, যাতে প্রার্থীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম মন্দ প্রার্থীকে ভোট দেওয়া হয়; কিন্তু কোনো অবস্থায়ই আওয়ামী লীগ ও বামদলগুলোর কোনো প্রার্থীকে ভোট দেওয়া যাবে না। সবাইকে অবশ্যই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে।

৭ মে তারিখের সংসদ নির্বাচন

১৯৭৯ সালের মে মাসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রথমে রাজনৈতিক অঙ্গনে পদার্পণ করে। ইসলামবিরোধী গোটা রাজনৈতিক মহল থেকে হৈ চৈ করে বলা হলো, বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই। এ সময় '৭১ সালের প্রসঙ্গ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি চলল এবং জামায়াতের বিরুদ্ধে বিবৃতির পর বিবৃতি প্রকাশিত হতে থাকল।

জামায়াত ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত সাত বছর ইসলামবিরোধী মহলের তীব্র বিরোধিতার মোকাবিলায় দাওয়াতী কাজ ও সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে গেল। বিরোধী রাজনৈতিক মহলের হাজারো বিরোধিতা সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে জামায়াতের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় জামায়াত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল।

এ ভূখণ্ডে জামায়াতে ইসলামী সর্বপ্রথম ১৯৭০ সালে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৮৬ সালের পূর্বে নির্বাচনে শরীক হয়নি। ১৯৭৯ সালে আইডিএল (ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ) নামে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ছয়টি আসনে বিজয়ী হয়।

বাংলাদেশে জামায়াতের নিজস্ব নামে এটাই প্রথম নির্বাচনে অংশগ্রহণ। তাই কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হলো। রাজনৈতিক মহলেও যথেষ্ট ঔৎসুক্য সৃষ্টি হলো। জামায়াতবিরোধী মহলে স্বাভাবিক কারণেই কৌতূহল দেখা গেল।

প্রতীক বরাদ্দ নিয়ে সমস্যা

নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সূচনাতেই নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনী প্রতীকের তালিকা ছবিসহ পত্রিকায় প্রকাশ করে থাকে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা অনেক বেশি বলে নির্বাচন কমিশন পত্রিকায় প্রতীকের বিরাট এক তালিকা প্রকাশ করল। জামায়াত ১৯৭০ সালে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে ছিল; অথচ দেখা গেল, ঐ তালিকায় এ প্রতীক নেই। জামায়াত সমস্যায় পড়ল।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এটিএম মাসউদের শরণাপন্ন হতে হলো। জামায়াত দাঁড়িপাল্লা প্রতীক চায় শুনে তিনি মন্তব্য করলেন, 'এটা হতে পারে না। দাঁড়িপাল্লা সুপ্রিম কোর্টের প্রতীক, কোনো রাজনৈতিক দলের এ প্রতীক কেমন করে হবে?'

জামায়াতের পক্ষ থেকে তাঁকে বলা হলো, ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জামায়াত এ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছে। তিনি তখন সে কথার প্রমাণ দাবি করলেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে ঐ নির্বাচনের সময় মুদ্রিত একটি পোস্টার পাওয়া গেল। এ প্রমাণ দাখিল করার পর নির্বাচন কমিশন আরো কতক নতুন-প্রতীকের সাথে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের নাম ও ছবি পত্রিকায় প্রকাশ করল। শেষ পর্যন্ত জামায়াতের এ সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

১১৯টি রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রতীক চেয়ে দরখাস্ত করায় কমিশন কয়েক দফায় প্রতীক তালিকা প্রকাশ করে। স্বতন্ত্র প্রার্থীও অনেক হতে পারে। তাই প্রতীকের তালিকা এত দীর্ঘ হলো যে, পাকঘর এমনকি বাথরুম থেকেও প্রতীক নিতে হয়েছে। থালা, বাসন, পেয়ালা, বেলুন, চালুন, বালতি এবং বদনাও সে তালিকায় স্থান পেল।

দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন, 'আমি আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণ সহকারে পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মীযান নাযিল করেছি, যাতে মানুষ ইনসাফের উপর কায়েম হতে পারে ....।' কুরআনে ইনসাফের জন্য দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, 'আদল' ও 'কসত'। এর অর্থ সুবিচার বা ন্যায়বিচার। আল্লাহ তাআলা সকল মানুষের জন্য অধিকার নির্দিষ্ট করেছেন। প্রত্যেক মানুষ যাতে তার অধিকার পায়, সে ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করা হয়।

রাসূলগণের নিকট যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাতে সকলের অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সে অধিকার মানুষকে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালনের জন্য রাসূলগণের উপরই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করা জরুরি। ঐ আয়াতের পরবর্তী অংশে ঐ রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক হিসেবেই লোহা নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের আসল উদ্দেশ্যই হলো, যার যে অধিকার তা যেন সে পায়। এটাই রাষ্ট্র ও সরকারের আসল দায়িত্ব।

গোটা বিশ্বে দাঁড়িপাল্লাকে সুবিচারের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বিল্ডিংয়ের পূর্ব দেয়ালে দাঁড়িপাল্লার নকশা আঁকা রয়েছে। এর তৎপর্য অবশ্যই স্পষ্ট। এ নকশার মাধ্যমে আদালতের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এখানে বাদী ও বিবাদীর মধ্যে ইনসাফ করা হয়। আসামি ও ফরিয়াদীর মধ্যে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয় না। দাঁড়িপাল্লায় মাপার সময় যেমন দুই দিকে সমান ওজনে মাপতে হয়, তেমনি আদালতেও দুপক্ষকেই সমানভাবে দেখা হয়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের জন্য যে প্রতীক বাছাই করে তা তাৎপর্যহীন নয়। সবাই যার যার দৃষ্টিতে বিশেষ অর্থপূর্ণ প্রতীকই গ্রহণ করে থাকে। নৌকা, ধানের শীষ, লাঙ্গল, মশাল ইত্যাদি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ প্রতীক।

কিন্তু আল্লাহর দীন কায়েম করা বা ইসলামী হুকুমত চালু করার আসল যে উদ্দেশ্য, সেদিক বিবেচনা করলে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকটি সবচেয়ে বেশি তৎপর্যপূর্ণ ও উপযোগী।

সূরা হাদীদের উপরিউক্ত আয়াতে যে 'কিতাব' ও 'মীযান' নাযিল করার কথা বলা হয়েছে তাতে মীযান শব্দের অর্থও দাঁড়িপাল্লা। এখানে দাঁড়িপাল্লা মানে কিতাবের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাখ্যা, যা আল্লাহ তাআলা রাসূলকে শিক্ষাদান করেছেন। সে হিসেবে শেষ রাসূলের বেলায় কিতাব ও মীযান মানে কুরআন ও সুন্নাহ।

৭ মে তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

ঐ নির্বাচনে জামায়াত মাত্র ৭৬টি আসনে নমিনি দেয়। জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান ঢাকা মহানগরের মতিঝিল এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। দুপুরের আগেই বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তিনি যে অবিশ্বাস্য ধরনের কারচুপি দেখতে পান এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি সরাসরি জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে সাংবাদিকদের নিকট এর বিবরণ দিয়ে নির্বাচন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করেন।

উক্ত নির্বাচনে ১১৯টি রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রতীকের আবেদন জানালেও শেষ পর্যন্ত ৭৯টি দল নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করায়; কিন্তু মাত্র ১১টি দলের প্রার্থী বিজয়ী হয়। তাদের আসনসংখ্যা নিম্নরূপ :

১. জাতীয় পার্টি (সরকারি দল) ১৫৩ আসন
২. আওয়ামী লীগ ৭৫ আসন
৩. জামায়াতে ইসলামী ১০ আসন
৪. সিপিবি (কমিউনিস্ট পার্টি) ৫ আসন

৫. ন্যাপ (ভাসানী-মশিউর রহমান) ৫ আসন
৬. মুসলিম লীগ ৪ আসন
৭. জাসদ (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল– রব) ৪ আসন
৮. জাসদ (সিরাজ) ৩ আসন
৯. বাকশাল ৩ আসন
১০. ওয়ার্কার্স পার্টি ৩ আসন
১১. ন্যাপ (মুজাফফর) ২ আসন

এছাড়া অবশিষ্ট ৩৩টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হয়।

নির্বাচনী ফলাফলের মূল্যায়ন

নির্বাচনের ফলাফল থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, এত রকম কারচুপি করা সত্ত্বেও সরকারি দল কোনো রকমে সংসদের মাত্র অর্ধেক আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে। যদি যুগপৎ আন্দোলনরত দলগুলো সমঝোতা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করত তাহলে সরকারি দল খুব কমসংখ্যক আসনই পেত। যদি বিএনপি নির্বাচন বর্জন না করত তাহলে সরকারি দল কোনোক্রমেই অর্ধেক আসন দখল করতে পারত না। তাহলে বাধ্য হয়ে এরশাদকে পদত্যাগ করতে হতো।

বিএনপি ও জামায়াত যদি সমঝোতা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করত তাহলে হয়তো কমপক্ষে অর্ধেক আসনে বিজয়ী হতো। বিএনপি অবশ্যই আওয়ামী লীগের চেয়ে বেশি আসন লাভ করত।

জামায়াতের নির্বাচনী ফলাফল

জামায়াত নির্বাচনে ২৫/৩০টি আসনে বিজয়ী হওয়ার আশা করেছিল। বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় এমন সম্ভাবনাই ছিল। নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হলে হয়তো এ আশা পূরণ হতো। তবে জামায়াত মাত্র ১০টি আসন পেলেও তখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছে যে, পার্লামেন্টারি পার্টি হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য কমপক্ষে যতগুলো আসন প্রয়োজন তা পাওয়া গেল। ১০-এর কম আসন পেলে পার্লামেন্টারি গ্রুপ বলা হয়, যেমন ১৯৯৬ সালের সপ্তম সংসদ নির্বাচনে মাত্র তিনটি আসন পাওয়ায় পার্লামেন্টারি পার্টির মর্যাদা পেল না।

বেশ কয়েকটি আসনে জামায়াতের বিজয়কে অত্যন্ত জঘন্য পন্থায় ছিনতাই করা হয়েছে। একটি আসনের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য থেকে কারচুপির নমুনা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলা (রংপুর ১ নং আসন) এলাকায় জামায়াতের নমিনি ছিলেন পাকুরিয়া শরীফের পীর শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম। ভোট গণনার পর রিটার্নিং অফিসার পীর সাহেবকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন। রেডিওতেও এ খবর প্রচারিত হয়। কিন্তু রাতেই সব ব্যালট পেপার রংপুর সেনানিবাসে নিয়ে পরদিন এরশাদের দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

কারচুপির প্রত্যক্ষ প্রমাণ

এ খবরের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। ১৯৯৬ সালে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ড. নাজমুদ্দীন আরবাকানের দাওয়াতে আমি ইস্তাম্বুল যাই। ১৪৯২ সালের তুরস্ক বিজয় উপলক্ষে আয়োজিত কতক অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ইস্তাম্বুলে এক হোটেলে অন্যান্য মেহমানের মধ্যে আমিও ছিলাম।

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে রাজধানী আঙ্কারা থেকে তুরস্কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসানের ফোন এল। তিনি বললেন, আপনাকে আঙ্কারায় আমার বাসায় দাওয়াত দিচ্ছি। আমি কখন গাড়ি পাঠাব জানান। আমার সাথে তাঁর কোনো পূর্বপরিচিতি না থাকায় বিস্মিত হলাম। আমি তাঁকে জানালাম, আমি আঙ্কারায় যাচ্ছি। আপনার গাড়ি পাঠাতে হবে না।

ঐ সফরে জামায়াতে ইসলামীর বিদেশ বিভাগের সেক্রেটারি জনাব আবূ নাসের মোহাম্মদ আবদুজ্জাহের আমার সফরসঙ্গী ছিলেন। আমাদের আঙ্কারায় সৌদি কনস্যুলেটের দায়িত্বশীল ড. আলী আলগামেদীর মেহমান হওয়ার কথা ছিল। ড. গামেদী ঢাকায় সৌদি দূতাবাসের কাউন্সিলর থাকাকালে নাসের সাহেবের পরম ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আমার সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

তাঁর বাসায় যাওয়ার পূর্বে এক বাংলাদেশি আবেগের সাথে আমাকে গ্রহণ করলেন। পরিচয় দিলেন আত্মীয় হিসেবে। বললেন, আপনার ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যাম আমার খালুশ্বশুর। আমাদের দেশের ঐতিহ্য অনুযায়ী তার স্ত্রী আমার আপত্তি সত্ত্বেও আমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। বিস্তারিত শোনার পর আত্মীয়তার পরিচয় জানলাম।

প্রাথমিক আপ্যায়নের পর মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান আমাকে নিয়ে এক কামরায় একান্তে বসলেন। আমার হাত ধরে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, একটা বিশেষ কথা বলার জন্য আপনাকে কষ্ট দিতে বাধ্য হলাম। তাঁর এ কথা শুনে আমি বিস্ময়ের সাথে সে কথা জানতে আগ্রহী হলাম। বললেন, হায়াত-মউতের কোনো ঠিক নেই। অনেক দিন থেকে আপনাকে সে কথাটি বলব ভাবছি। দেশে কবে যাব বলা যায় না। আপনি তুরস্কে আসায় আমি সুযোগ নিলাম। আমি কিঞ্চিৎ অধৈর্য হয়ে বললাম, কথাটা বলে ফেলুন না।

তিনি আবেগের সাথে বললেন, ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে আপনাদের প্রার্থী পাকুরিয়ার পীর সাহেব নির্বাচনে অনেক ভোটে বিজয়ী হন। প্রেসিডেন্ট এরশাদের নির্দেশে সেনানিবাসে ব্যালট নিয়ে গিয়ে এরশাদের দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়। আমার জীবনে এমন জঘন্য অন্যায় কাজ কখনো করিনি। আল্লাহর কাছে কী জবাব দেব সে কথা ভেবে অনুতপ্ত হয়েছি। এখন আপনি এবং পীর সাহেব যদি আমাকে ক্ষমা না করেন তাহলে আখিরাতে মহাবিপদে পড়ব। আপনার নিকট আকুল আবেদন, পীর সাহেবকে আপনি বুঝিয়ে আমাকে মাফ করতে বলবেন।

তাঁর চেহারা দেখে আমার করুণা হলো। বুঝতে পারলাম, যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা না পেলে যে উপায় নেই– সে কথা তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন।

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম যে, পীর সাহেবকে আমি আপনার অনুশোচনার কথা জানাব। পীর সাহেব আমার ভায়রা-ভাই এ কথাও তিনি জানতেন; ভায়রা-ভাই হওয়ার আগে তিনি যে রংপুর কলেজে আমার ছাত্র ছিলেন সে কথা জানতেন না।

দেশে ফিরে আসার পর প্রথম সাক্ষাতেই শাহ রুহুল ইসলামকে আমি তাঁর বিনীত আবেদনের কথা জানালাম। তিনি প্রথমে একটু গম্ভীর হলেন, একটু পরেই মুচকি হাসলেন। আমি বললাম, ঐ লোক শাস্তি পেলে তোমার তো কোনো লাভ নেই। ক্ষমা করা আল্লাহ পছন্দ করেন। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। মাফ করার বদলা হিসেবে আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেই তো বড় লাভ। আমার সাথে তিনি একমত হলেন।

আমরা যদি চাই যে আল্লাহ তাআলা আমাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করুন, তাহলে মানুষের দোষ-ত্রুটিও আমাদের মাফ করা উচিত। আল্লাহ এটা খুবই পছন্দ করেন বলে কুরআনে ঘোষণা করেছেন।

মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান হার্টের রোগী ছিলেন। তিনি তুরস্কে হৃদরোগে ইনতিকাল করেছেন।

২২১.

আমার নাগরিকত্ববিহীন অবস্থান

১৯৭৩ সালের এপ্রিলে আমার জন্মগত বাংলাদেশি নাগরিকত্ব হরণ, ১৯৭৬ থেকে '৭৮ সাল পর্যন্ত তিনবার নাগরিকত্ব বহালের আবেদন প্রত্যাখ্যান, বিদেশি নাগরিক হিসেবে নিজের দেশে ১৯৭৮ সালের জুলাইয়ে ভিসা নিয়ে প্রত্যাবর্তন, ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে আমার জন্মভূমি থেকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে যেতে বাধ্য করার সরকারি অপচেষ্টা, সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে যেকোনো পরিণামের জন্য প্রস্তুত হয়ে কোনো লিখিত অনুমতি ব্যতীতই ঢাকায় নিজের বাড়িতে অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

১৯৮০ ও ১৯৮৮ সালে আমার নাগরিকত্ব নিয়ে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়। ১৯৯২ সালে সংসদে রীতিমতো বিতর্ক চলে। জাতীয় সংসদের বর্তমান (২০০৫) মাননীয় স্পিকার ব্যারিস্টার মুহাম্মদ জমিরুউদ্দিন সরকার সংসদে আইনের বই নিয়ে আদালতে যুক্তি পেশ করার ভঙ্গিতে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন।

আমি জানি না দুনিয়ার কোনো দেশে এমন কোনো উদাহরণ আছে কি না যে, একজন নাগরিকের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়; বিদেশি হিসেবে সে ভিসা নিয়ে জন্মভূমিতে ফিরে আসে; ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বিনা ভিসায় সে দেশে অবস্থান করছে। সে লুকিয়ে-পালিয়ে নেই। রাষ্ট্রপ্রধানসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্তাই তাকে চেনেন।

কোনো দেশে কোনো ব্যক্তির অবস্থান দুই রকমের হতে পারে– হয় সে ঐ দেশের নাগরিক, আর না হয় সে ঐ দেশের ভিসা নিয়ে আছে। ১৯৭৮ সালের ১১ ডিসেম্বর

থেকে ১৯৯৪ সালের ২২ জুন পর্যন্ত সাড়ে পনেরো বছর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় বিনা ভিসায় অবস্থান করলাম; অথচ সরকার আমাকে এ দেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য করেনি। এমন কোনো অদ্ভুত নজির কোথাও আছে বলে এ পর্যন্ত আমি শুনিনি।

নাগরিকত্ববিহীন অবস্থায় সাংগঠনিক দায়িত্ব

পাকিস্তান আমলের শেষদিকে আমার উপর এ অঞ্চলের আমীরের দায়িত্ব ছিল। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে যখন আমি ঢাকায় পৌঁছলাম তখন জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেনি। আইডিএল নামে জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চলছিল। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম আইডিএল-এর চেয়ারম্যান ও জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

বাংলাদেশ সরকার আমাকে দেশে আসার অনুমতি দেওয়ার পর মাওলানা আবদুর রহীম আমাকে লিখে জানালেন, দেশে এসে আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আগস্ট মাসেই জামায়াতের মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন ডাকা হয়। মাওলানা আবদুর রহীমের সভাপতিত্বে মজলিসে শূরায় সিদ্ধান্ত হয় যে, তিন বছর মেয়াদি ইমারতের বর্তমান মেয়াদ শেষ হবে '৭৯ সালের ডিসেম্বরে, তাই এখন উপনির্বাচন করতে হবে। রুকন তালিকায় আমার নাম শামিল করা হলো এবং রুকনগণ আমাকে আমীর নির্বাচিত করায় সেপ্টেম্বর ('৭৮) মাসেই আমি সাংগঠনিক দায়িত্ব গ্রহণ করি।

১৯৭৯ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে জামায়াত প্রকাশ্য কর্মতৎপরতা শুরু করার পর সাংগঠনিক জটিলতা সৃষ্টি হলো। সরকার আমার নাগরিকত্ব স্বীকার না করায় আইনগতভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে আমার পরিচয় দেওয়া চলে না। এ সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে জনাব আব্বাস আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে ঘোষণা করা হলো। রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি জামায়াতের আমীরের দায়িত্ব পালন করতে থাকলেন। আর আমি জামায়াতের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতে থাকলাম। মজলিসে শূরা ও কর্মপরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করা ছাড়া কোনো কর্মী সম্মেলনেও প্রথমদিকে আমি যাইনি। খান সাহেব ভারপ্রাপ্ত আমীর। সবাই জানল, আসল আমীর অন্য কেউ আছেন। ঐ অন্য কেউটা কে, তা কারো জানার বাকি থাকার কথা নয়।

সাংগঠনিক সফর শুরু করলাম

মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলা পর্যায়ে ১৯৮০ সালে আমার সাংগঠনিক সফরে যাওয়া শুরু হলো। ১৯৭১ সালের পর বিভিন্ন জেলায় পূর্বপরিচিত ঘনিষ্ঠ দীনী ভাইদের সাথে প্রায় এক দশক পর দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম।

জেলা পর্যায়ে রুকন সম্মেলন, ট্রেনিং ক্যাম্প, জেলা-শহরভিত্তিক কর্মী সম্মেলন ইত্যাদিতে আমি শরীক হতে থাকলাম। তখনো মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়নি। মহকুমা শহরেও আমার সফর চালু হয়ে গেল। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত আমার তৎপরতা এ জাতীয় কর্মসূচি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকল। অবশ্য ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ সামরিক শাসন জারি করার পর সফর বন্ধ ছিল।

১৯৮৩ সালের এপ্রিল থেকে রাজনীতি চর্চা আবার চালু হওয়ায় আমার সাংগঠনিক সফরও শুরু হলো। আমার কর্মসূচির মধ্যে জেলাভিত্তিক কর্মী সম্মেলনও যোগ করা হলো। ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে জেনারেল এরশাদের সাথে জামায়াতের সংলাপের পর আমার কর্মসূচিতে সুধী সমাবেশও শামিল করা হলো। ১৯৮৬ সালের ৭ মে জাতীয় সংসদের নির্বাচন পর্যন্ত উপরিউক্ত কর্মসূচি অনুযায়ীই আমার সফর চালু থাকে।

১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনের পর পরিবেশ অনুকূল বিবেচনা করে জামায়াতের ঢাকা মহানগর শাখা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনে এক কর্মী সম্মেলনে আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির করল। সেখানে আমাকে জামায়াতের আমীর বলে পরিচয় দেওয়া হয়নি। কিছু দিন পর ঐ হলেই এক বিরাট সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রধান বক্তার নাম ঘোষণার সময় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর হিসেবে আমার পরিচয় দেওয়া হয়। পরের দিনই এরশাদ সরকারের মন্ত্রী ও মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের উপদেষ্টা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেন।

আমার সাংগঠনিক সফরে এরশাদ সরকারের আপত্তি

১৯৮৬ সালের ১৫ নভেম্বর থেকে মাগুরা, ঝিনাইদহ ও ফরিদপুরে ময়দানে বিরাট আকারে প্যান্ডেল করে কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মাগুরা ও ঝিনাইদহে সম্মেলন সুন্দরভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অংশগ্রহণ শেষে ১৮ নভেম্বর সকালে ফরিদপুর রওয়ানা হওয়ার কথা। তাই রাত ১১টায় শুয়ে পড়েছি। সাড়ে ১১টায় ঘুম থেকে ডেকে ওঠানো হলো। দেখলাম মুজাহিদ সাহেব উপস্থিত। তিনি ফরিদপুর থেকে এসেছেন। তিনি জানালেন, জেলা প্রশাসন জামায়াতের দায়িত্বশীলকে বলেছে, 'জামায়াতের কর্মী সম্মেলনে সরকারের আপত্তি নেই; কিন্তু অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে আমরা ফরিদপুর শহরে আসতে দেব না।'

পরামর্শ হলো, সরকারের সাথে সংঘর্ষ করা জামায়াতের নীতি নয়। তাই আমি ফরিদপুর যাব না। ঝিনাইদহ থেকে সরাসরি ঢাকা চলে আসব।

১৮ নভেম্বর সকালে নাশতা করে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। খুলনা-ঢাকা মহাসড়কের যে স্থান থেকে গাড়ি ফরিদপুর যায় সেখানে দেখা গেল, সশস্ত্র পুলিশের এক বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। তারা এ সড়কের সকল গাড়িই থামিয়ে জিজ্ঞেস করছে, গাড়ি কোথায় যাবে? 'ঢাকা যাব' বললে সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিচ্ছে। আর যদি 'ফরিদপুর যাব' বলে তাহলে তল্লাশি চালাচ্ছে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। গোলাম আযমকে ফরিদপুর ঢুকতে দেওয়া হবে না।

আমার গাড়ি থামিয়ে পুলিশ ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন? ড্রাইভার বলল, ঢাকা। কয়েকজন পুলিশ গাড়ি ঘেরাও করে থাকল। আমি ড্রাইভারের পাশের আসনেই বসা। মাথায় সাদা টুপি ও গায়ে সাদা পাঞ্জাবি। তাদের দিকে তাকালাম না। তারা আমাকে দেখলেও বুঝতে পারলাম যে, আমাকে চিনতে পারেনি। ড্রাইভারের মুখে 'ঢাকা' শুনেই হাতের ইশারায় যেতে বলল। পরে শুনেছি যে, বেচারা পুলিশ বাহিনী বিকেল পর্যন্ত প্রতিটি গাড়ি তল্লাশিকার্যে ব্যস্ত ছিল। আমি ঢাকা চলে এসেছি জানলে তারাও ফরিদপুর চলে যেত। শুনে তাদের জন্য মায়াই লাগল।

২৩ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসকদের প্রতি আমার ব্যাপারে নির্দেশনামূলক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত জনৈক সহানুভূতিশীল ব্যক্তি ঐ বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পরের দিনই পেয়ে গেলাম। তাতে লেখা, 'জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, অধ্যাপক গোলাম আযমকে যেন কোথাও জনসভা ও কর্মী সমাবেশে বক্তব্য রাখতে দেওয়া না হয়। আরো নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, জামায়াতের দায়িত্বশীলগণকে যেন অনুরোধ করা হয়, যাতে তারা অধ্যাপক সাহেবকে কোনো সমাবেশে উপস্থিত না করেন।'

১৯৮৩ থেকে '৮৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে আমার সফরে কোনো বাধা সৃষ্টি করা হয়নি। প্রায় সব জেলায়ই জামায়াতবিরোধী রাজনৈতিক মহল আমার উপস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করেছে। কোথাও কোথাও শহরে ঢুকতে না দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েক জায়গায় কর্মী সম্মেলনে হামলাও করা হয়েছে। জামায়াত তাদের প্রতিহত করে সর্বত্রই কর্মসূচি পালন করেছে।

ফরিদপুরের কর্মী সম্মেলন থেকেই সরকার আমার বিরোধিতার সূচনা করল। সরকারের ইঙ্গিতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মেলনে আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার দাবি জানানো হলো। ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট মিছিল করে আমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে সরকারের নিকট দাবি উত্থাপিত হলো। তারা জানে যে, এ দাবি অর্থহীন। তবুও হয়তো জামায়াতকে চাপের মুখে রাখার জন্য এ দাবি জানানো প্রয়োজন মনে করেছে, যাতে জামায়াত আমাকে নিয়ে ময়দানে কোনো কর্মসূচি পালনের চেষ্টা না চালায়।

আমার নাগরিকত্ব সমস্যা

আমার নাগরিকত্ব বহাল না হওয়া সত্ত্বেও আমি সাংগঠনিকভাবে জামায়াত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছিলাম। ১৯৮৬ সালের নভেম্বরে আমার সাংগঠনিক সফর সরকার বন্ধ করে দিলে জামায়াতের সামনে আমার নাগরিকত্ব সমস্যা বিরাট হয়ে দেখা দিল। নাগরিকত্ব বহাল হলে সরকার আমার সফরে বাধা দিতে পারত না।

বিশিষ্ট আইনজীবীদের পরামর্শ চাওয়া হলো। তাঁরা বললেন, সরকার যদি আপনার বিরুদ্ধে কোনো লিগ্যাল অ্যাকশন নেয় যেমন– আপনাকে গ্রেফতার করে বা বিদেশে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়, তাহলে আপনি উচ্চ আদালতে এর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন। আপনার ব্যাপারটা এখন যে, পর্যায়ে আছে তাতে আদালতে অভিযোগ করার কোনো সুযোগ নেই।

সরকার আমাকে বিদেশি নাগরিক মনে করে। অথচ আমি বিনা ভিসায়ই অবস্থান করছি। ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে বলে দেশ থেকে চলে যাওয়ার জন্য বাধ্যও করছে না। তাহলে কোন্ অভিযোগ নিয়ে আদালতে যাব? এটাই সমস্যা।

ভিসা নিয়ে দেশে আসায় আইনগতভাবে আমি বিদেশি নাগরিক বলে গণ্য হয়ে গেছি। আমার সাংগঠনিক তৎপরতা রোধ করার বিরুদ্ধে মামলা করলে সরকার বলবে, বিদেশি

নাগরিক কোনো রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে না। সরকার যদি আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগে মামলা দায়ের করত তাহলেও আদালতের শরণাপন্ন হওয়া সম্ভব হতো।

তাহলে দেখা গেল, আমাকে নিয়ে সরকারও সমস্যায় পড়েছে, আমিও ভিসা নিয়ে দেশে এসে সমস্যায় পড়লাম। অথচ ভিসা না নিলে দেশে আসতেই পারতাম না। দেশে আসায়ই তো বিনা ভিসায় থাকার সুযোগ নিতে পারলাম।

'৮৬ সালের বড় বড় রাজনৈতিক ঘটনা

সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈক্যের কারণে ক্রমেই তার গদি মযবুত করতে সক্ষম হলেন; উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন করে কিছুটা গণভিত তৈরি করতে পারলেন; জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বড় ধরনের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করলেন। জাতীয় সংসদে তিনি নিজ দলীয় বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম না হলেও স্বতন্ত্র সদস্য ও ছোট কয়েকটি দলের সমর্থন জোগাড় করে মোটামুটি মযবুত সরকার কায়েম করতে সক্ষম হলেন।

এখন এরশাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, তার ক্ষমতা দখল এবং তার সরকার এ পর্যন্ত যত অবৈধ কাজ ও রাজনৈতিক অসততা করেছে, এসবের পক্ষে জাতীয় সংসদের অনুমোদন লাভ। মযবুত সরকার গঠনের পর সহজেই এ লক্ষ্যও অর্জিত হয়ে গেল।

যদি আন্দোলনরত দলগুলো সমঝোতা করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে পারত তাহলে নির্বাচনে শত কারচুপি করেও এরশাদ মেজরিটি আসন দখল করতে সক্ষম হতেন না। এ পরিস্থিতিতে তাকে পদত্যাগ করতে হতো এবং তিনি তার ক্ষমতা দখল ও অন্য কার্যাবলির জন্য আদালতে বিচারের সম্মুখীন হতেন। তখন হয়তো আবার সামরিক আইন জারি করেই তাকে টিকে থাকতে হতো। কিন্তু তাতে দেশে ও বিদেশে তিনি সকল মর্যাদা হারাতেন।

এর পরের বড় রাজনৈতিক ঘটনা হলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় ও সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ের নিশ্চয়তা বোধ করাই স্বাভাবিক। এ বিজয়ের প্রয়োজনে সংসদ নির্বাচনের চেয়েও বড় ধরনের কারচুপি করতে দ্বিধা করার কথা নয়।

আবার আন্দোলনের প্রচেষ্টা

জামায়াতে ইসলামীর সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের টার্গেট পুরা হয়ে গেল। কিন্তু জামায়াত অনুভব করল, এরশাদ সরকারের পক্ষপাতমূলক নির্বাচনকে মেনে নিলে স্বৈরশাসন দীর্ঘায়িত হবে। বিএনপি নির্বাচন বর্জন করায় তাদের আন্দোলনমুখী হওয়াই স্বাভাবিক। জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটি আবার উভয় জোটের সাথে আন্দোলনের জন্য যোগাযোগ শুরু করল। আন্দোলনের পক্ষে জামায়াতের যুক্তি সুস্পষ্ট। ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান তো নির্বাচনের দিনই সকল রাজনৈতিক দলকে কারচুপির নির্বাচন বাতিলের

আন্দোলন করার আহ্বান জানিয়েছেন। জামায়াতের যুক্তি একটাই– ৭ মে ১৯৮৬ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচন বাতিল করে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন চাই। কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি কায়েমের দাবিতে দুই জোট সম্মত হলেই এ আন্দোলন গণসমর্থন পেতে পারে।

যোগাযোগ করতে গিয়ে বিএনপিনেত্রীকে বলা হলো, আপনারা নির্বাচন বর্জন করেছিলেন বলে নির্বাচন বাতিলের আন্দোলনে আপনাদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হলো যে, আন্দোলন কোনো যৌক্তিক পর্যায়ে পৌঁছলে জামায়াতের এমপিগণ পদত্যাগ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। আওয়ামী লীগ আন্দোলনে শরীক হবে কি না, সে বিষয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করলেন। জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হলো, ৭ দলীয় জোট ও জামায়াত আন্দোলনে নেমে গেলে এবং জনগণ আন্দোলনে একটু সাড়া দিলে আওয়ামী লীগ জনসমর্থন হারানোর ভয়ে সংসদের ভেতরে ও বাইরে আন্দোলনকে সমর্থন করতে বাধ্য হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিএনপিনেত্রী নিশ্চিত হতে পারছিলেন না।

জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটি নির্বাচন বাতিলের আন্দোলনের দাওয়াত নিয়ে আওয়ামী লীগ ও ১০ দলীয় নেত্রীর সাথে যোগাযোগ করল। সংসদে তাদের মোট ১০১টি আসন থাকায় নির্বাচন বাতিলের প্রস্তাব তিনি পছন্দ করলেন না। তিনি বললেন, তিনটি কারণে সংসদ বাতিলের দাবি করা ঠিক নয়–

১. বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে অভিজ্ঞতা অর্জন,
২. দেশি-বিদেশি শুভাকাঙ্ক্ষীরা এটা পছন্দ করবে না,
৩. রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসনব্যবস্থায় সংসদ ভেঙে গেলেও সরকারের পতন হয় না।

জামায়াতের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আন্দোলন শুরু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা

আন্দোলন পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টায় দু-তিন মাস চলে গেল। এরশাদ অত্যন্ত আস্থার সাথেই ১৫ অক্টোবর (১৯৮৬) প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করলেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বর্জন করা যায় কি না– এ বিষয়েও জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটি আবার যোগাযোগ করল। কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি কায়েমের দাবি মেনে নিলে সংসদ নির্বাচন বাতিল এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বর্জনের আন্দোলন করার যৌক্তিকতা বৃদ্ধি পেত। দুই জোট তা মেনে না নেওয়ায় আন্দোলনের ভিত্তিও মযবুত হওয়ার কথা নয়।

এক নেত্রী বললেন, অমুক নেত্রী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ালে আমাকেও দাঁড়াতে হবে। অপর নেত্রী বললেন, ঐ নেত্রী দাঁড়িয়ে গেলে তো মাঠ ছেড়ে দিতে পারব না।

ব্যাপক যোগাযোগের পর যখন উভয় নেত্রীকে এ বিষয়ে নিশ্চিত করা গেল যে তাদের কেউ নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন না, তখন উভয় জোটই নির্বাচন বর্জনের আন্দোলনে সম্মত হলো। নির্বাচন প্রতিহত করার মতো জোরদার আন্দোলন করা সম্ভব না হলেও নির্বাচনের

দিন মোটামুটি সফল হরতাল করা গেল। কিন্তু যত কম ভোটারই ভোট দিক, নির্বাচন তো হয়েই যায়; বরং ভোটার যত কমসংখ্যায় ভোটকেন্দ্রে আসে কারচুপি করার সুযোগ ততই বেশি পাওয়া যায়।

১৯৮৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

জিয়া হত্যার পর ১৯৮১ সালের নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৩৯ জন প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ১২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন :

১. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ
২. মুহাম্মদুল্লাহ (হফেযজী হুযূর)
৩. লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান
৪. স্কোয়াড্রন লিডার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী
৫. আলহাজ্ব মেজর আফসারুদ্দীন
৬. মাওলানা খাইরুল ইসলাম যশোরী
৭. মুঃ খলীলুর রহমান মজুমদার
৮. মুঃ আব্দুস সামাদ
৯. মুঃ জহির খান
১০. সাইয়েদ মনিরুল হুদা চৌধুরী
১১. মুঃ আনসার আলী মস্তান (আযম)
১২. আজিজুল ইসলাম ছক্কু মিয়া

নির্বাচনী ফলাফল

১. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ২ কোটি ১৪ লাখ ৬৭ হাজার ভোট
২. মুহাম্মদুল্লাহ (হাফেযজী হুযূর) ১৪ লাখের উপর এবং
৩. লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান ১১ লাখ ৬৭ হাজার ভোট পেয়েছিলেন।

নির্বাচনের পর–

নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে এরশাদ সাহেবের গদি আরো মযবুত বলে তিনি নিশ্চিত হলেন। সংসদে আওয়ামী লীগনেত্রী শেখ হাসিনা বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিলেন।

কিছুদিন পর জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে আবার যোগাযোগ শুরু করল। দেখা গেল, বড় দুই দল আন্দোলনের নিম্নদশার জন্য পরস্পর দোষারোপ করছে। আওয়ামী লীগ বলছে, বিএনপি সংসদ নির্বাচন বর্জন করে এরশাদকে অনেক আসনে বিজয়ী হওয়ার সুযোগ করে দিল। বিএনপি বলছে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এরশাদের গদি মযবুত করল।

জামায়াত দুটো বড় দলকে আন্দোলনের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করতে গিয়ে লক্ষ করল, ১৫ দল থেকে বিচ্ছিন্ন পাঁচদলীয় জোট এক কদর্য রাজনীতিতে লিপ্ত।

তারা বিএনপিকে বোঝাতে লাগল, জামায়াত আওয়ামী লীগের সাথে আঁতাত করে নির্বাচনে গিয়েছে। তাই এরশাদবিরোধী আন্দোলনে জামায়াতকে সাথে নেবেন না। আর আওয়ামী লীগকে বলছে, জামায়াত স্বাধীনতাবিরোধী। তাদেরকে সাথে নিয়ে নির্বাচনে যাওয়া এবং সংসদে তাদের সাথে বসার কারণে আপনাদের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাই যদি গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতেই হয় তাহলে জামায়াতকে কিছুতেই সাথে নেবেন না।

এভাবে ১৯৮৬ সাল চলে গেল। আন্দোলনের পরিবেশই সৃষ্টি হতে পারল না। বড় দুই দল পরস্পরকে দোষারোপ করেই তৃপ্তিবোধ করল।

২২২.

বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির ঐক্যপ্রচেষ্টা

ইতঃপূর্বে (পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৬) বাংলাদেশের সকল ইসলামী মহলকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আমি যে প্রচেষ্টা চালিয়েছি, এর পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭৮ সালের জুলাইয়ে দেশে ফিরে আসার পর সর্বপ্রথম ইসলামী ঐক্যের ফর্মুলা পেশ করে একটা বই লিখেছি। তিন বছর ব্যাপক যোগাযোগের পর ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ' নামে একটি ঐক্যমঞ্চ গঠিত হয়েছিল। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এ ঐক্যসংস্থার অগ্রগতিতে অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করেছিলাম। সর্বত্র যেভাবে সাড়া পড়ে গিয়েছিল তাতে বিরাট আশার সঞ্চার হয়েছিল।

জেলা ও মহকুমা শহরগুলোতে ইত্তেহাদুল উম্মাহর যে সম্মেলন হয়, তাতে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও চরমোনাইর পীর মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করীম একসাথেই শরীক হন। ইত্তেহাদুল উম্মাহর সেক্রেটারি হিসেবে বরিশাল জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর মাওলানা ফজলুর রহমান সংগঠকের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি মাওলানা সাঈদী সাহেবের সেক্রেটারি হিসেবেও সর্বত্র তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। তিনি ঐসব সম্মেলনের সাফল্য, জনগণের বিপুল সাড়া এবং মাওলানা সাঈদীর অদ্ভুত জনপ্রিয়তার বিবরণ আমাকে নিয়মিত শোনাতেন। আমিও অত্যন্ত উৎসাহবোধ করতাম।

মাওলানা সাঈদীও ইত্তেহাদুল উম্মাহর মাধ্যমে সকল ইসলামী মহলের ঐক্যের সম্ভাবনা লক্ষ করে আমার নিকট অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করতেন। একাধিকবার তিনি আমার সামনে মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছেন, 'আপনি এমন এক চমৎকার ফর্মুলা দিয়েছেন, যার ফলে এ সংগঠনের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির নেতৃত্ব নয়, সামষ্টিক নেতৃত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। আর অরাজনৈতিক সংগঠন হওয়ায় দলাদলির কোনো আশঙ্কাও দেখা যাচ্ছে না।'

একবার তিনি আবেগের সাথে মহব্বতপূর্ণ সুরে বললেন, 'আপনার তো ময়দানে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে না। এমন সুন্দর পরিকল্পনা দিলেন, যা ময়দানে ক্রিয়াশীল রয়েছে। আপনি ঘরে বসে থেকে বিভিন্ন মহলকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হলেন। আলহামদুলিল্লাহ!'

ইসলামী ঐক্য আমার সবচেয়ে বেশি আবেগের বিষয়

ইতঃপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি, ইসলামী ঐক্যের যে ফর্মুলা অনুযায়ী ইত্তেহাদুল উম্মাহ কায়েম হয়েছে, তা আমার দীর্ঘ সাধনার ধন। বাংলাদেশে বিরাট ইসলামী শক্তি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকার কারণে দেশের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব এমন সব লোকের হাতে রয়েছে, যারা ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে জানলেও ব্যক্তিজীবনে তাও খুব কম লোকই মানে। ১৯৭১ সালের পর ইসলামী শক্তির ঐক্যের গুরুত্ব আরো তীব্রভাবে অনুভব করি। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে '৭৮ সালের জুলাই পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমাকে বিদেশে থাকতে হয়েছে, যা আমার এ লেখার পাঠক-পাঠিকাগণ জানেন।

এ সাড়ে ছয় বছর বাংলাদেশের ইসলামী শক্তির ঐক্যচিন্তাই আমার মন-মগজ দখল করে ছিল। ইত্তেহাদুল উম্মাহ সম্পর্কে আমার পূর্বের আলোচনায় (পঞ্চম খণ্ড) লিখেছি, আমার বাধ্যতামূলক প্রবাস জীবনের প্রত্যেক বছর লন্ডন থেকে হজ্জের মৌসুমে আমাকে মক্কা-মদীনায় যেতাম এবং দোআ কবুলের সকল বিশিষ্ট স্থানেই ঐক্যের জন্য কী করা কর্তব্য, সে বিষয়ে সঠিক ধারণায় পৌঁছানোর তাওফীক চেয়ে মহান মা'বুদের দরবারে আকুল আবেদন জানাতাম। বিশেষ করে মসজিদে নববীর যে স্থানটিকে রাসূল (স) জান্নাতের একটি বাগান (রওযাতুল জান্নাত) বলে অভিহিত করেছেন, সেখানে ১৯৭৬ সালে দিনের পর দিন আল্লাহর দরবারে ধরনা দিতে থাকি। এর পরেই ঐক্যের ফর্মুলাটা ধারণায় এসে যায়। ১৯৭৭ সালে মাওলানা সাঈদী সাহেব লন্ডন গেলে সর্বপ্রথম তাঁর কাছেই তা প্রকাশ করি। তিনি ফর্মুলাটা খুবই পছন্দ করলেন। তাঁকে আমি অনুরোধ করলাম যে তিনি যেন আলেম সমাজে এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

'ইসলামী ঐক্য : ইসলামী আন্দোলন' নামক যে বইয়ে এ ফর্মুলা আলোচনা করা হয়েছে, তা ১৯৭৮ সালে দেশে আসার পরপরই সেপ্টেম্বর মাসে ই'তিকাফ অবস্থায় আল্লাহর ঘরে বসে লেখা। এ পর্যন্ত এ বইটি ১১বার মুদ্রিত হয়েছে। ইসলামী ঐক্য সবারই কামনা। তাই বইটির চাহিদা শেষ হচ্ছে না।

এ ফর্মুলার পেছনের মূল পরিকল্পনা

বর্তমান চারদলীয় জোটের শরীক ইসলামী ঐক্যজোট নেতৃত্বের কোন্দলে ২০০১ সালের নির্বাচনের পরপরই দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এ বছরের (২০০৫) শুরুতে মুফতী আমিনী গ্রুপের মহাসচিব মাওলানা ইজহারুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে তৃতীয় আরেকটি গ্রুপের সৃষ্টি হয়েছে। এ বছর মে মাসে শায়খুল হাদীস গ্রুপ থেকে খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমীর মাওলানা ইসহাকের নেতৃত্বে ঐক্যজোটের চতুর্থ গ্রুপ জন্মলাভ করেছে। গত বছর ২০০৪ সালে নেজামে ইসলাম পার্টির নির্বাহী সভাপতি মাওলানা ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী মূল পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর সভাপতিত্বে পৃথক নেজামে ইসলাম পার্টি গঠন করেছেন। 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন' নামের ছোট দলটি দুই বছর আগেই (২০০৩) দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হাফেযজী হুযূরের প্রতিষ্ঠিত 'খেলাফত আন্দোলন'ও গত মাসে (জুন ২০০৫) দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে।

এ জাতীয় কোন্দলের কারণে যাতে 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ'র ঐক্য বিনষ্ট না হয়, সেজন্য সংস্থাটিকে অরাজনৈতিক রাখা হয়েছিল। বিভিন্ন মহল থেকে যে নেতৃবৃন্দ এতে শরীক আছেন, তাদের কোনো একজনকে সংগঠনের সভাপতি বানালে নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এ সংকট থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে 'মজলিসে সাদারাত' (সভাপতিমণ্ডলী) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

আমার আশা ছিল, ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্লাটফর্মে জামায়াতের লোকদের সাথে অন্যান্য মহলের দীনী খাদেমগণের ওঠা-বসা অব্যাহত থাকলে জামায়াত সম্পর্কে তাঁদের কারো কারো মনে যে ভুল ধারণা বিরাজ করছে তা ক্রমে দূর হতে থাকবে।

দীনের মৌলিক বিষয়ে মজলিসে সাদারাতের সদস্যদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে যাতে চিন্তার ঐক্য সৃষ্টি হয়, সেজন্যও কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। মগবাজারের কাছে দিলু রোডে ইত্তেহাদুল উম্মাহর অফিসে ৩০/৪০ জনের বৈঠক হওয়ার মতো একটি প্রশস্ত কামরা ছিল। সম্ভবত ১৯৮৪ সালে উক্ত কামরায় তিন দিনব্যাপী এক আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৈঠকে এমন তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়, যা চিন্তার ঐক্য সাধনে অত্যন্ত সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে। যেমন–

১. রাসূল (স)-এর সর্বপ্রধান দায়িত্ব কী ছিল?
২. খিদমতে দীনই কি যথেষ্ট, না ইকামাতে দীনও জরুরি?
৩. রাসূল (স)-এর দীনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অনুসরণযোগ্য কারা?

এ আলোচনা বৈঠকে 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ'তে সক্রিয় পীর সাহেবান ও আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় জামায়াতের কয়েকজন যুবক আলেমকে শরীক হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের ইলমী ও যৌক্তিক আলোচনা সবাই পছন্দ করেছিলেন।

প্রথম বিষয়টির আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয় যে, দীন ইসলামকে অন্যসব জীবনবিধানের উপর বিজয়ী করাই রাসূল (স)-এর আসল দায়িত্ব ছিল। তাই এ দায়িত্ব পালন করা উম্মতেরও প্রধান কর্তব্য।

দ্বিতীয় বিষয়টির আলোচনায় সবাই স্বীকার করেছেন যে, মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, ওয়ায ও তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমে দীনের বড় বড় খিদমত হলেও নায়েবে রাসূল হিসেবে আলেম সমাজের জন্য শুধু খিদমতে দীনই যথেষ্ট নয়; বরং দীন কায়েমের দায়িত্ব পালন করাও তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

তৃতীয় বিষয়টির আলোচনায় এ কথা প্রমাণিত হয় যে, যারা সরাসরি রাসূল (স)-এর সাথী হিসেবে তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন, তাঁরাই আমাদের আসল আদর্শ। কেননা, তাঁরাই সঠিকভাবে রাসূল (স)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করেছেন। বিশেষভাবে প্রথম চার খলীফা হচ্ছেন রাসূল (স)-এর পর উম্মতের মাঝে শ্রেষ্ঠ দীনী ব্যক্তিত্ব। পরবর্তীকালের কোনো ব্যক্তিত্বকে যত বড়ই মনে করা হোক, ঐ চারজনের সাথে তুলনা করার যোগ্য অন্য কেউ হতে পারেন না।

আমাদের দেশে যারা ব্যাপকভাবে গাউসুল আযম বড় পীর ও খাজা বাবাকে মানতে গিয়ে বহু বিদআতে লিপ্ত আছে, তারা এ আলোচনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে ঐ চার খলীফার চর্চাই তাদের কাছে অধিক প্রয়োজনীয় মনে হবে।

আমি মজলিসে সাদারাতের সদস্য ছিলাম না; কিন্তু ঐ আলোচনায় আমি অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলাম। এ তিন দিনের আলোচনার এক ফাঁকে আমি একটি জরুরি বিষয়ে আলোচনা রেখে উপস্থিত পীর সাহেবান ও আলেমগণের অভিমত কামনা করলে তাঁদের কেউই আমার কথায় দ্বিমত পোষণ করেননি।

বিষয়টি ছিল মাদরাসা ও খানকাহ্ সম্পর্কে। আমি বললাম, আমাদের দেশের মাদরাসা ও খানকাহ সম্পর্কে হয়তো কেউ বলতে পারেন, রাসূল (স) এ ধরনের কোনো মাদরাসা ও খানকাহ্ কায়েম করেননি, তাই এগুলো বিদআত। আমি তাদের এ মত কিছুতেই সমর্থন করি না।

রাসূল (স) দীনের ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। দীনের ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্যেই তো মাদরাসা কায়েম করা হয়। তাই এটাকে বিদআত বলা অন্যায়। কিন্তু যদি কেউ এ কথা দাবি করেন যে, মাদরাসায় না পড়লে আলেম হওয়া যায় না, তাহলে এ দাবিটি বিদআত। কারণ, মাদরাসায় না পড়েও সাহাবায়ে কেরাম দীনের আলেম ছিলেন। তাঁরা ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে দীনের ইলম হাসিল করেছিলেন। আজও ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে দীনের ইলম হাসিল করা সম্ভব। তাই এ ধারণা ঠিক নয় যে, মাদরাসায় পড়া ব্যতীত দীনের ইলম হাসিল করা যায় না। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহর, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মাওলানা আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারীর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ মাদরাসায় শিক্ষালাভ না করলেও বড় আলেম হিসেবে স্বীকৃত।

খানকাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও আল্লাহর মহব্বত শিক্ষা দেওয়া। 'তাকাররুব ইলাল্লাহ' বা 'ইনাবাত ইলাল্লাহ' হাসিল করার উদ্দেশ্যেই মানুষ পীরের খানকায় যায়। রাসূল (স) ঠিক এ ধরনের খানকাহ কায়েম না করলেও আমি খানকাহকে বিদআত মনে করি না। কিন্তু যদি এ দাবি করা হয় যে, পীর না ধরলে আল্লাহওয়ালা হওয়া যায় না, তাহলে এ দাবিটি অবশ্যই বিদআত। যারা দীন কায়েমের জন্য জান-মাল কুরবানী দিচ্ছে, বাতিলের নির্যাতন সত্ত্বেও দমে যাচ্ছে না, তারা আল্লাহর নৈকট্যবোধ না করলে এ পথে টিকে থাকতে পারত না। দীনের কারণে যারা জেলে যায়, তারা সেখানে আল্লাহকেই কাছে পেয়ে সান্ত্বনাবোধ করে। তাই পীরের মুরীদ না হয়েও আল্লাহওয়ালা হওয়া যেতে পারে।

আমার বড় আশা ছিল, ইত্তেহাদুল উম্মাহর মাধ্যমে জামায়াতের লোকেরা অন্যান্য দীনী মহলের ভাইদের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেলে দীনের ভিত্তিতে তাদের পারস্পরিক মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে উঠবে। হয়তো একসময় মজলিসে সাদারাতের সবাই একমত হয়ে দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করতেও সক্ষম হবেন। যারা দীনকে শুধু ধর্ম মনে করেন তারাও বুঝতে পারবেন যে, রাসূল (স) যদি ইসলামী

রাষ্ট্র কায়েম করা জরুরি মনে করে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশেও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা ফরয। যারা যিকর-আযকারের গুরুত্ব বুঝেন, তারাও আল্লাহর আইন সমাজে চালু করা কর্তব্য বলে মনে করবেন। এভাবেই সকল দীনী মহলের মধ্যে চিন্তার ঐক্য সৃষ্টি হবে বলে আমি আশা করেছিলাম।

আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন নস্যাৎ হয়ে গেল

১৯৮৬ সালের শেষদিকে এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে ১৯৮৭ সালে ইত্তেহাদুল উম্মাহ হঠাৎ করেই স্তব্ধ হয়ে গেল। আমি আমার জীবনে অন্য কোনো দুর্ঘটনায় এত গভীর ও স্থায়ী মর্মবেদনা অনুভব করিনি। ইসলামী ঐক্যের দীর্ঘকালের স্বপ্ন ইত্তেহাদুল উম্মাহর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভের প্রবল আশা নিয়ে যখন আমি পরম উৎসাহবোধ করছিলাম তখনই এমন একটা বিপর্যয় ঘটে গেল, যা আমার কাছে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত বলে মনে হয়েছে। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য যেখানে আশা করেছিলাম, সেখানেই আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার সম্মুখীন হলাম।

যারা আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে তারা আমার জীবনের বড় সাফল্য ও বড় ব্যর্থতার কথা জিজ্ঞেস করলে আমি চরম মর্মবেদনা নিয়ে এ ব্যর্থতার কথাই অকপটে প্রকাশ করি। দেশ-বিদেশে অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, ইত্তেহাদুল উম্মাহর কী হলো? এর সুনাম যারা শুনেছেন তাদের জানার অধিকার আছে যে, ইত্তেহাদুল উম্মাহ কীভাবে মরে গেল।

আমার মনের জ্বালা লাঘব করার জন্য এ বিষয়ে লেখা প্রয়োজন মনে করছি। যারা আমাকে প্রশ্ন করেছেন এবং যাদের মনে এ প্রশ্ন রয়েছে তারা এ থেকে জানতে পারবেন যে, কিছু লোকের ভুলের কারণে এত বড় ক্ষতিটা হয়ে গেল। অবশ্য তারা এ সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যেই ঐ কাজ করেছেন বলে আমি মনে করি না।

যত নেক নিয়তেই কেউ কোনো ভুল করুক, ভুলের মাশুল তাকে দিতেই হয়। ভুল কাউকেই ক্ষমা করে না। ভুলের পরিণাম যা হওয়ার তা-ই হয়। কেউ তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। এরপরও ইসলামী ঐক্যের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। কিন্তু ঐ ফর্মুলা চালু না থাকায় নেতৃত্বের খাহেশ যাদের আছে তাদেরকে সাথে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সামষ্টিক নেতৃত্বের পদ্ধতি পুনরায় চালু করতে পারলে ইসলামী ঐক্যের সম্ভাবনা আবারো দেখা দিতে পারে।

ইত্তেহাদুল উম্মাহ কীভাবে ভেঙে যাওয়ার সূচনা হলো?

দীনের ভিত্তিতে সকল ইসলামী মহলকে একমঞ্চে সমবেত করার পরিকল্পনা নিয়েই ইত্তেহাদুল উম্মাহ কায়েম করা হয়েছিল। ঐক্য পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর মজলিসে সাদারাত (সভাপতিমণ্ডলী) যখন রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা সমীচীন মনে করবে তখন দেশের পরিস্থিতি, জনগণের সাড়া ও সাফল্যের সম্ভাবনা বিবেচনা করে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত

নেবে। সকল মহলকে ঐক্যবদ্ধ করার পূর্বে রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে ঐক্যের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। এ কারণেই ইত্তেহাদুল উম্মাহর গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সংগঠনটি একটি অরাজনৈতিক সংস্থা।

দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে ইত্তেহাদুল উম্মাহর মজলিসে সাদারাতের এক বৈঠকে প্রস্তাব উত্থাপিত হলো যে, বাংলাদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের দাবিতে আন্দোলন করা জরুরি। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ইত্তেহাদুল উম্মাহকে অরাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে মজলিসে সাদারাতের অন্তর্ভুক্ত জামায়াতে ইসলামীর যে দুজন সদস্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন তাঁরা হলেন মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ ও মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী। ঘটনাক্রমে মজলিসে সাদারাতের ঐ বৈঠকে এ দুজনই অনুপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত অন্য কেউ খেয়াল করলেন না যে, ঐ প্রস্তাব গঠনতন্ত্রের বিরোধী। ইত্তেহাদুল উম্মাহর জেলা সম্মেলনগুলোতে জনগণের বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার ফলে সবার মধ্যেই প্রবল জোশ বিদ্যমান ছিল। ফলে ঐ প্রস্তাব সেখানে পাস হয়ে গেল। এমনকি জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়ার তারিখও নির্দিষ্ট হয়ে গেল। এমনকি সেদিন প্রেস কনফারেন্সে কে কে বক্তব্য রাখবেন, সে সিদ্ধান্তও হয়ে গেল।

মাওলানা সাঈদী সাহেবকে আন্দোলনের নেতা বানানোর পরিকল্পনা

বাংলাদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র দাবির আন্দোলনে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণের পরিকল্পনা যারা করেছিলেন তারা জামায়াতে ইসলামী বলয়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইসলামকে আধুনিক শিক্ষিতদের নিকট যোগ্যতার সাথে পরিবেশন করতে সক্ষম হওয়ায় তাঁদের সাথে আমার মহব্বতের সম্পর্ক রয়েছে। তাঁরাও আমাকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করেন। মহব্বত তো একতরফা হয় না। তাঁরা আলেম হওয়া সত্ত্বেও মাওলানা মওদূদী রচিত তাফসীর ও বিশাল ইসলামী সাহিত্যভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করার ফলে যে যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তা বিভিন্নভাবে দেশবাসীর নিকট পরিবেশন করছেন।

মাওলানা সাঈদী ওয়ায়েয ও মুফাস্‌সিরে কুরআন হিসেবে বাংলাদেশে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের নিকট যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তার ফলে ইসলামী শাসনতন্ত্র দাবির আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁকে বাছাই করাটাই ছিল স্বাভাবিক। মজলিসে সাদারাতের সদস্যরা জানতেন যে, জামায়াতে ইসলামীর রুকন হিসেবে সংগঠনের প্রতি মাওলানা সাঈদীর নিরঙ্কুশ আনুগত্য রয়েছে। তাই তাঁরা মাওলানা সাঈদীকে নেতৃত্ব গ্রহণে সম্মত করার জন্য একটি চমৎকার যুক্তি তাঁর সামনে পেশ করেছিলেন। যুক্তিটি নিম্নরূপ :

"দেশের জনগণ ইসলাম চায়। আপনার মাহফিলে যেকোনো সময় দলে দলে নারী-পুরুষ পরম আবেগ নিয়ে হাজির হয়। তারা মাহফিলে 'আল কুরআনের আলো, ঘরে ঘরে

জ্বালো' স্লোগান শিখে এবং এ স্লোগানটি দিতে দিতেই বাড়িতে ফিরে যায়। কুরআনের শাসন কায়েমের দাবিতে তাদেরকে আপনি ডাক দিলে তারা জান দিতেও পরোয়া করবে না। ফলে কোটি কোটি তাওহীদী জনতা পাগলপারা হয়ে এ আন্দোলনে শরীক হবে এবং এ আন্দোলনের ফসল জামায়াতে ইসলামীর ঘরেই উঠবে। জনগণের ময়দানে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো জনশক্তি যেহেতু জামায়াতই তৈরি করেছে, সেহেতু এর ফসল অন্য কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

ইত্তেহাদুল উম্মাহর সম্মেলনগুলোতে জনগণের মধ্যে যে সাড়া দেখা যাচ্ছে, তাতে এ আন্দোলনের জন্য ময়দান সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। গাছে ফল পেকে আছে। ঝাঁকি দিলেই পড়বে। তাই এ আন্দোলন আর বিলম্বিত করা চলে না।"

তাঁদের ইজতিহাদী ভুল

এ পরামর্শদাতাগণ যে ইজতিহাদী ভুল করেছেন, তা তাঁরা টের পাননি। যে জামায়াত এ আন্দোলনের ফসল ঘরে তুলবে বলে নিশ্চয়তা দেওয়া হলো সে জামায়াত এ ফসল গ্রহণ করতে প্রস্তুত কি না, তারা ফল পেকে গেছে মনে করে কি না এবং তারা এ আন্দোলনের সাথে সহযোগিতা করতে সম্মত কি না, পরামর্শদাতাগণ তা জানার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন না। এত বড় ভুল তাঁরা কেমন করে করলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর।

তাঁদের নিয়ত সম্পর্কে আমি সন্দেহ করি না

এ আন্দোলনে মাওলানা সাঈদীকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁদের কোনো কুমতলব ছিল বলে আমি মনে করি না। তাঁরা হয়তো আন্তরিকতার সাথেই এ পথে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। তাঁরা কে কে বা কতজন এর সাথে জড়িত ছিলেন, তা আমার জানা নেই। তাঁদের যে কজনের নাম আমার কানে এসেছিল এর মধ্যে একজন মাওলানা কামালুদ্দীন জাফরী। তাঁর সাথে আমার বহু বছর থেকে মহব্বতের সম্পর্ক। তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই এ সম্পর্ক শুরু হয়েছে বলে তিনি আমার সাথে এমন আচরণ করেন, যেন তিনি আমার ছাত্র এবং আমি তাঁর উস্তাদ; যদিও সম্পর্ক এ ধরনের নয়।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত নরসিংদীর প্রখ্যাত জামেয়া কাসেমিয়ায় তিনি আমাকে বহুবার যেতে বাধ্য করেছেন। তিনি দাবি করলে আমি যেতে আপত্তি করতে পারি না বলেই বাধ্য হয়ে গিয়েছি। গত বছর (২০০৪ সালে) তিনি নিজের গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার পথে আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ঐ বিষয়ে জানতে চাইলাম যে, 'এ রকম যে কথা শুনেছিলাম তা কতটুকু সত্য?' তিনি অত্যন্ত খোলামনে উৎসাহের সাথে তাঁর ঐ সময়কার প্রচেষ্টার কথা আমাকে বিস্তারিত জানালেন।

যদি এ ব্যাপারে তাঁর নিয়তে সামান্য ত্রুটিও থাকত, তাহলে কি তিনি এভাবে প্রাণখুলে কথাটি বলতে পারতেন? তাহলে হয়তো পাশ কাটানোর চেষ্টা করতেন বা এমন সরলভাবে স্বীকার না করে কৌশল করে অস্বীকার করতে পারতেন। এমন মুখলিস মানুষের নিয়তে কি সন্দেহ করা সম্ভব?

২২৩.

বিষয়টা আমরা বিলম্বে জানতে পেরেছি

এটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ইত্তেহাদুল উম্মাহর মজলিসে সাদারাতের বৈঠকে গৃহীত ঐ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমরা ১৯৮৭ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে জানতে পেরেছি। ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে যখন সিদ্ধান্ত হয়েছে তখন সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারলে আবার একটা বৈঠক ডেকে ঐ রাজনৈতিক কর্মসূচিকে গঠনতন্ত্রবিরোধী হওয়ার কারণে প্রত্যাহার করা হয়তো সম্ভব হতো।

আধুনিক প্রকাশনীর তদানীন্তন সেক্রেটারি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য জনাব আবদুল গাফফারের শ্বশুর মাওলানা খন্দকার আবুল খায়ের যশোরীর নিকট থেকে জানা গেল, ইরানি দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের আন্দোলনের কর্মসূচি তৈরির ঐ বৈঠকে যশোরী সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা যশোরী জামায়াতের অনেক পুরনো রুকন এবং বহু বছর জামায়াতে ইসলামী যশোর জেলার আমীর ছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক বহু পুস্তক তিনি রচনা করেছেন।

ইরানি দূতাবাসের কেউ এতে জড়িত হয়ে থাকলে আমি তাদেরকে দোষী মনে করব না। তারা হাফেযজী হুযূরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন ইসলামের স্বার্থেই। তারা যদি বাংলাদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের আন্দোলনে সহযোগিতা করে থাকেন তাহলে ইসলামের জন্যই তা করেছেন।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন হওয়া সত্ত্বেও ৩১ জানুয়ারি মজলিসে শূরার এক জরুরি অধিবেশন ডাকা হয়। আমাদের আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট গোটা জনশক্তি মাওলানা সাঈদীকে মহব্বত করেন। তাই মজলিসে শূরাকে এ সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে, যাতে জনশক্তিকে ড্রিল করতে সমস্যা না হয়। মজলিসে শূরাকে বলা হলো, মাওলানা সাঈদী সফরে আছেন। তিনি ফিরে এলেই তাঁর সাথে যোগাযোগ করা হবে। সংগঠনের প্রতি তাঁর আনুগত্যের যে প্রমাণ এ পর্যন্ত তিনি দিয়েছেন, তাতে তাঁর প্রতি জামায়াতের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তিনি যখনই জানতে পারবেন যে, জামায়াত ও শিবির ঐ নতুন আন্দোলনে শামিল হবে না তখনই তিনি বিরত হয়ে যাবেন। যারা তাঁকে এ পথে এতদূর টেনে নিয়ে গেছেন তাদেরকে ত্যাগ করে ফিরে আসতে তিনি এতটুকুও দ্বিধাবোধ করবেন না বলে আশা করা যায়।

তবুও খোদা না করুন, যদি এ আন্দোলন শুরু হয়ে যায় এবং তিনি তাতে শরীক থাকেন তাহলে আমাদের জনশক্তি যেন নীরবে তাতে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকে। এর চেয়ে বেশি কোনো প্রতিক্রিয়া যেন কেউ না দেখায়। সবাইকে এতটুকু অবহিত করেই শূরার জরুরি অধিবেশন সমাপ্ত করা হয়।

ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রেস কনফারেন্স

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যেদিন 'আগামীকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে ইত্তেহাদুল উম্মাহর প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে' বলে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলো সেদিন

মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সাথে একান্তে কথা বললেন। মাওলানা ইউসুফ মাদরাসায় মাওলানা সাঈদীর শিক্ষক। তদুপরি তিনি তখন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল। এ কারণেই জামায়াতের পক্ষ থেকে মাওলানা সাঈদীর সাথে আলোচনা করার দায়িত্ব তাঁর উপরই অর্পণ করা হয়েছে।

উভয়ের মধ্যে যে আন্তরিক মহব্বতের সম্পর্ক রয়েছে সে পটভূমিতে মাওলানা ইউসুফ কোনো কৈফিয়ত তলব না করে শুধু এটুকু কথা জানিয়ে দিলেন, 'আগামীকাল প্রেস কনফারেন্স করে যে আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়ার কথা রয়েছে, তাতে আপনি যদি শরীক হন তাহলে তা আপনার নিজস্ব ফায়সালা। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে এ আন্দোলনে আপনার সাথে পাবেন না। কারণ, জামায়াত এ আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। আপনি আজীবন জামায়াত ও শিবিরের সাথে ইসলামী আন্দোলন করে এসেছেন, এখন জামায়াত ও শিবিরকে বাদ দিয়ে এ আন্দোলনে যাবেন কি না চিন্তা করে দেখুন।'

এ সিদ্ধান্ত জানার পর মাওলানা সাঈদীর এক মিনিটও বিলম্ব হলো না। তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলে উঠলেন, 'জামায়াত ও শিবিরকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।'

আমরা তাঁর কাছ থেকে এটাই আশা করেছিলাম। সংগঠনের প্রতি তাঁর আনুগত্য নিরঙ্কুশ বলেই আমরা জানতাম। তিনি জামায়াত ও শিবিরকে ছেড়ে গেলে যে এ ময়দানে কিছুই করতে পারতেন না, এমনও নয়। তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে একটা আন্দোলন অবশ্যই তিনি খাড়া করতে পারতেন। কিন্তু এ আন্দোলনের ফসল জামায়াতের ঘরে উঠবে বলে যে ধারণা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তা যে হবে না– এ কথা বুঝতে তাঁর এক মুহূর্তও বিলম্ব হয়নি।

সারা দেশে আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে বিশাল জনপ্রিয়তা দিয়েছেন তাতে তিনি যেকোনো সময় ইচ্ছা করলে নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলতে পারেন। তিনি জামায়াতের পুরনো রুকন হিসেবে খুব ভালো করেই জানেন যে, জামায়াত যে পদ্ধতিতে সংগঠন পরিচালনা করে এবং যে কঠোর নিয়ম মেনে চলে এমন সংগঠন করা খুবই কঠিন কাজ। তাই তিনি সংগঠনের আনুগত্যে কোনো সময়ই দুর্বলতা দেখাননি।

পরের দিনের কাহিনী

পরের দিন জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন হওয়ার কথা। মাওলানা সাঈদী সেখানে যাবেন না বলে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। সেখানে কী ঘটবে সে বিষয়ে আমাদের ঔৎসুক্য অবশ্যই ছিল।

সেদিন বেলা ১০টায় হঠাৎ বেগম সাঈদী আমার বাড়িতে এসে হাজির। আমি রীতিমতো অপ্রস্তুত। তিনি পেরেশান হয়ে বলতে লাগলেন, 'একদল লোক মাওলানা সাঈদীকে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য একটি আন্দোলনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। গত মধ্যরাত পর্যন্ত তারা আমাদের বাড়িতে তাঁর পা ধরে ধরনা দিয়েছে। আপনি তাঁকে ওদের খপ্পর থেকে বাঁচান।'

আমি ধীরকণ্ঠে বললাম, 'ভাবী! আপনি পেরেশান হবেন না। তিনি ওদের সাথে যাবেন না বলে গতকালই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম যে, বেগম সাঈদী এতটা রাজনীতি-সচেতন কেমন করে হলেন? তিনি তো সংগঠনেও তেমন কোনো দায়িত্বে নেই। অথচ এ সময় মাওলানা সাহেবকে কতক লোক জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করছে বলে কেমন করে বুঝতে পারলেন? আমি তাঁর বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হলাম।

বিকেলে বিনা খবরে অত্যন্ত সম্মানিত ও আমার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত দুজন ব্যক্তি আমার বাড়িতে এসে হাজির হলেন। তাঁরা হলেন চট্টগ্রামের বায়তুশ শরফের পীর সাহেব মাওলানা আবদুল জাব্বার ও চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা শাহী মসজিদের তদানীন্তন খতীব মাওলানা আবদুল আহাদ আল-মাদানী। আমি তাঁদেরকে সসম্মানে গ্রহণ করে বললাম, হঠাৎ বিনা খবরে তাশরীফ আনলেন, ব্যাপার কী? মাওলানা মাদানী বললেন, 'মাওলানা সাঈদীকে আপনারা কোন্‌খানে লুকিয়ে রেখেছেন?' বললাম, তিনি কোথায় আছেন আমার জানা নেই। তাঁরা বললেন, 'তাঁকে বের করে আনেন। আমরা প্রেসক্লাবে গেলাম, অথচ তিনিই সেখানে গেলেন না।' তিনি কোথায় আছেন জানি না বলে আমি তাঁদেরকে নাশতা করিয়ে বিদায় দিলাম। তিনি কোথায় তা তো আমার জানা থাকার কথাও নয়।

১৫ জুন ২০০৫ তারিখে এ বিষয়ে লেখার সময় মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবের সাথে আলোচনা করে আরো কতক তথ্য পেলাম, যা আমার জানা ছিল না। আমি বেগম সাঈদীকে ফোন করে জানতে চেয়েছি, ঐদিন মধ্যরাত পর্যন্ত যারা মাওলানা সাহেবের নিকট ধরনা দিয়েছিলেন তাদের নাম তিনি বলতে পারেন কি না। এ ফোনের কথা জানতে পেরেই মাওলানা সাঈদী আরো কিছু তথ্য দিয়ে গেলেন।

১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে ঢাকার শাহজাহানপুর রেলওয়ে ময়দানে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী তাফসীর মাহফিলে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। কাছেই কোথাও বামপন্থিদের সভা হচ্ছিল। ওখানকার মসজিদে যখন নামাযের জামাআত হয় তখন তাদের মাইকের আওয়াজে নামাযীদের অসুবিধা হওয়ায় কতক মুসল্লী তাদেরকে কিছুক্ষণ মাইক বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু তারা আরো জোরে মাইক চালু রাখে। এতে মুসল্লীরা পুনরায় আপত্তি জানালে ওরা মসজিদে হামলা চালানোর মতো ধৃষ্টতা দেখায়।

মাওলানা সাঈদী এর প্রতিবাদে তাফসীর মাহফিলে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তব্য রাখেন এবং পরের দিন বায়তুল মুকাররাম থেকে প্রতিবাদ মিছিলের ঘোষণা দেন। নির্দলীয় এ বিশাল মিছিলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি শরীক হন। অনেক প্রখ্যাত আলেম ও পীর মিছিলপূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এবং মাওলানা সাঈদী সাহেবের নেতৃত্বে তারা মিছিলেও যোগদান করেন। তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পরের দিন তাফসীর মাহফিলে মাওলানা সাঈদী ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৩ মার্চ মানিক মিয়া এভিনিউতে ইসলামী মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। অনেক উল্লেখযোগ্য দীনী ব্যক্তিত্ব মাওলানা সাঈদীর নেতৃত্বে এক বিরাট আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত বলে বোঝা গেল। কারণ, এ ঘোষণার পর তাঁরা মাওলানার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে আরো উদ্বুদ্ধ করতে

লাগলেন। পত্রিকায় ১৩ মার্চ মহাসমাবেশ হবে বলে খবর প্রকাশিত হলো এবং ঐ সমাবেশ থেকে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও আভাস দেওয়া হলো।

উল্লেখযোগ্য আলেম ও পীরগণ যারা তাঁর বাসায় গিয়ে ধরনা দিয়েছিলেন এবং বারবার গিয়েছিলেন তাদের নামও তিনি সেদিন আমাকে জানালেন। তবে সেসব নাম প্রকাশ না করার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বারবার ফোনে মাওলানা সাহেবকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, জামায়াত ও শিবিরের কেউ যেন মঞ্চে না ওঠে; যদি ওরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় তাহলে তারা সেখানে থাকবেন না।

মাওলানা সাঈদী আমার নিকট এ কথা বলার সময় আবেগপ্রবণ হয়ে বললেন, জামায়াত-শিবিরকে বাদ দিয়ে আমাকে নেতা বানিয়ে তারা আন্দোলন করতে চান। আমি এ কথা টের পাওয়ার সাথে সাথেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ঐ সমাবেশে আমি নিজেই যাব না।

ইত্তেহাদুল উম্মাহর মজলিসে সাদারাতের বৈঠকে কে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সে কথা মাওলানা সাঈদী স্মরণ করতে পারলেন না। তখন তাঁর এ কথাও মনে হয়নি যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের আন্দোলনে তাঁকে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। অবশ্য ১৩ মার্চের মহাসমাবেশের আয়োজন থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

তিনি বললেন, জামায়াত-শিবিরই আমার ভিত্তি। আমি এ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা কখনো চিন্তাও করতে পারি না। তাই যারা আমাকে নেতা মেনে জামায়াত থেকে আলাদা করতে চায় তাদের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য ১৩ মার্চের অনেক আগেই আমি বিদেশে চলে গিয়েছি। ঐ সমাবেশ আর হতে পারল না।

মাওলানা ইউসুফ সাহেবের সাথে তাঁর সাক্ষাতের যে বিবরণ আমি উল্লেখ করেছি তা তিনি স্মরণে রেখেছেন। এতে বোঝা গেল, প্রেস কনফারেন্স ঠিক ঐ সময় হওয়ার কথা ছিল, যখন ১৩ মার্চের ব্যাপারে লোকজন তাঁর নিকট ধরনা দিয়েছিলেন। এতদিন পর সব কথা দিন-তারিখসহ তাঁর স্মরণে না থাকাই স্বাভাবিক।

পরিণামে ইত্তেহাদুল উম্মাহ অচল হয়ে গেল

মাওলানা সাঈদী প্রেসক্লাবে না যাওয়ার ফলে সাংবাদিক সম্মেলন হলো না এবং পরের দিন পত্রিকায় এ সম্পর্কে কোনো খবরও প্রকাশিত হলো না। কিছু দিন পর চরমোনাইর পীর সাহেবের নেতৃত্বে 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন' নামে একটা রাজনৈতিক দল কায়েম হলো। সাঈদী সাহেব পিছিয়ে না এলে হয়তো 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ' নাম ব্যবহার করেই এ আন্দোলন শুরু করা হতো।

মাওলানা সাঈদী সাহেব ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে শরীক না হওয়ায় চরমোনাইর পীর সাহেব স্বাভাবিক কারণেই অসন্তুষ্ট হতে পারেন। ইত্তেহাদুল উম্মাহর মজলিসে সাদারাতের বৈঠকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মাওলানা

সাঈদী এর পক্ষেই ছিলেন। তাই ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি তাতে শরীক না হওয়ায় তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাই বলে পীর সাহেব বিভিন্ন মাহফিলে সাঈদী সাহেবকে অশালীন ভাষায় যেরূপ গালাগালি করছেন তা কোনো দীনী ব্যক্তির মুখে মোটেই মানায় না।

এ ঘটনার পর ইত্তেহাদুল উম্মাহর অকাল মৃত্যু ঘটল। এ ঐক্যমঞ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত দ্রুত উন্নতি করতে করতে হঠাৎ যেন বজ্রপাতের আঘাতে একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

এরপরও ঐক্যপ্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়নি। কিন্তু যে ফর্মুলায় 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ' সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল সে ফর্মুলা আর চালু হয়নি। ঐ ফর্মুলার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সামষ্টিক নেতৃত্ব (Collective Leadership)। অর্থাৎ সংগঠনের নেতৃত্ব এক ব্যক্তির হাতে নয়, সভাপতিমণ্ডলীর (Presidium) হাতে থাকবে। কেননা, এক্ষেত্রে কোনো দলের একজনকে নেতা মানা অন্যান্য দলের নেতাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া নিজের নেতৃত্ব কায়েমের উদ্দেশ্যে যারা সংগঠনকে বিভক্ত করেন, তারা কেমন করে অন্য কাউকে নেতা মেনে নেবেন?

'ইসলামী ঐক্য' ময়দানের দাবি

কোটি কোটি মুসলিম জনতার মধ্যে যারা ইসলামের বিজয় কামনা করেন, যারা ইসলামী ঐক্যের কথা শুনলে উৎসাহবোধ করেন এবং নেতৃস্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিবর্গকে একমঞ্চে দেখলে আবেগে উচ্ছ্বসিত হন তাদেরকে ইসলামী জনতা বা তাওহীদী জনতা নামে অভিহিত করা হয়। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, 'ইসলামী ঐক্য' ময়দানের তীব্র দাবি।

মুসলিম মিল্লাতের এ দীনী জযবা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ইসলামী নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা একমঞ্চে সমবেত হলেই ইসলামী ঐক্য বাস্তবে কায়েম হতে পারে, তাদের কারণেই ঐক্য সম্ভব হচ্ছে না; বরং তাদের নেতৃত্বের লোভের কারণেই জোট ও দলে ভাঙন ঘটে চলেছে। ঐক্য না হওয়ার জন্য ইসলামী জনতার নিকট মূলত তারাই দায়ী।

১৯৮৭ সালে ইত্তেহাদুল উম্মাহর মঞ্চ ভেঙে যাওয়ার পর ময়দানের দাবির কথা বিবেচনা করে আমি নতুন করে ঐক্যপ্রচেষ্টা চালাই। জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলামকে আমি ইসলামী ঐক্যের ব্যাপারে সবচেয়ে আন্তরিক ও সিরিয়াস বলে মনে করেছি। তাই তাঁর উপর দায়িত্ব দিলাম এ ব্যাপারে আবার যোগাযোগ শুরু করার জন্য। তিনি ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলী ও মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সাথে যোগাযোগ করে নতুন করে প্রচেষ্টা চালালেন। তাঁদের অবিরাম প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯৮৯ সালে একটি সর্বদলীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহত্তর ঐক্যের নতুন উদ্যোগ

১৯৮৯ সালে সকল ইসলামী দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সম্মেলন অনুষ্ঠানের মহান উদ্দেশ্যে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলী ও এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম প্রচেষ্টা চালান। শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হকের উপর

আহ্বায়কের দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁরা তিনজন অবিরাম মেহনত করে ঐ বছরই ১৪ আগস্ট আটটি দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে পুরানা পল্টনের দেওয়ান মঞ্জিলে এক সম্মেলনে সমবেত করতে সক্ষম হন। শিল্পপতি জনাব শফিউদ্দীন দেওয়ান তাঁর নিজ বাড়িতেই বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মেহমানদারি করেন।

সম্মেলনে বিভিন্ন সংগঠনের নিম্নোক্ত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন :

১. খেলাফত মজলিস– শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, মাওলানা আবদুল গাফফার ও অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক।
২. ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন– চরমোনাইর পীর সাহেব মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করীম।
৩. নেজামে ইসলাম পার্টি– মাওলানা আশরাফ আলী ধরমণ্ডলী।
৪. জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম– মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও মাওলানা মুফতি ফজলুর রহমান।
৫. ইসলামী ঐক্য আন্দোলন– ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলী।
৬. তমদ্দুন মজলিস– অধ্যাপক আবদুল গফুর।
৭. শর্ষিনার পীর সাহেবের প্রতিনিধি– মাওলানা রূহুল আমীন খান।
৮. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ– অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম।

শীর্ষ সম্মেলনের বিবরণ

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হকের সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। প্রথমেই তিনি সম্মেলনের আহ্বায়ক হিসেবে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। চরমোনাইর পীর সাহেব সভাপতিকে প্রশ্ন করেন, 'হুযূর! আপনি তো ঐক্যের ডাক দিলেন, কিন্তু জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে যেসব ফতোয়া আছে তা ঐক্যের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না তো? আপনার নিজের লেখার মধ্যেও তো ঐসব ফতোয়ার সমর্থন আছে। এ অবস্থায় ঐক্য কেমন করে সম্ভব হবে?'

এ প্রশ্ন সম্মেলনে যে সমস্যার সৃষ্টি করল তার সমাধানের উদ্দেশ্যে কয়েকজন তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। ঐক্যের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে আমি যে দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করলাম তার সারকথা নিম্নরূপ :

"আমার মতো আধুনিক শিক্ষিতদের ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান পেতে হলে ওলামায়ে কেরামের সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত কোনো উপায় নেই। আব্বা ও দাদা আলেম ছিলেন বলে ছোট সময় থেকেই ধর্মীয় পরিবেশে গড়ে ওঠার সুযোগ পাই এবং বাংলা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে জানার কৌতূহল সৃষ্টি হয়। স্কুলজীবনেই মাসিক 'নেয়ামত' পত্রিকার মাধ্যমে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর ওয়াযের অনুবাদ আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাঁর বইগুলো সংগ্রহ করে পড়ার পর আমার ধারণা হয় যে, ইসলাম অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ধর্ম। এমএ পরীক্ষা দিয়ে ১৯৫০ সালে তাবলীগ

জামায়াতে তিনটি চিল্লা কাটানোর ফলে আমার মধ্যে এ মিশনারি জযবা সৃষ্টি হয় যে, ইসলাম ধর্মের খিদমতে গোটা জীবনটাই উৎসর্গ করা উচিত। ১৯৫২ সালে তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে ইসলামের জ্ঞানচর্চার সুযোগ পেয়ে বুঝতে পারলাম যে, ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল দিক ও সকল বিভাগের জন্যই সবচেয়ে উপযোগী। ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীর সংস্পর্শে এসে উপলব্ধি করলাম যে, ইসলাম এমন এক বিপ্লবী জীবনবিধান, যাকে মানবরচিত যাবতীয় বিধানের উপর বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়ে রাসূল (স)-কে পাঠানো হয়েছে এবং রাসূল (স)-এর অনুকরণে ইসলামী আন্দোলন করা মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এ সময় মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে হিন্দুস্তান থেকে উর্দুতে প্রকাশিত ফতোয়ার অনেক পুস্তিকা আমার কাছে পৌঁছে। তাবলীগ জামায়াতেই আমার উর্দু শেখার সূচনা হয়। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর মাওলানা মওদূদীর তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' অধ্যয়নের প্রয়োজনে উর্দু ভাষা ভালোভাবে শিখতে বাধ্য হই। কতক নামকরা আলেমের নামে প্রচারিত ফতোয়া পড়ে প্রথমে বেশ বিব্রতবোধ করি। তাফহীমুল কুরআন আমাকে এতটা আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয় যে, আমি ঐসব ফতোয়ার বক্তব্য যাচাই না করে গ্রহণ করা সঠিক মনে করিনি। তাই যেসব বইয়ের কথিত উদ্ধৃতির ভিত্তিতে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে মাওলানা মওদূদীর সেসব বই জোগাড় করে ফতোয়ার সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করলাম। এ প্রচেষ্টা আমাকে ব্যাপক পড়াশোনার সুযোগ করে দিল।

বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে জানার ও বোঝার ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীর রচিত সাহিত্য আমাদের মতো আধুনিক শিক্ষিতদের সামনে একটা বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পর্যন্ত এ সাহিত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শাহাদাতের পবিত্র জযবা নিয়ে দাওয়াতে দীনের কাজে এগিয়ে এসেছে এবং অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে।

মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যের এ বিরাট অবদান সত্ত্বেও তাঁর রচনায় ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। তিনি রাসূলকে ছাড়া অন্য কাউকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে না করার জন্য তাকিদ দিয়েছেন। তাই কী করে আমরা তাঁকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করতে পারি? ১৯৮১ সালে আমার লিখিত 'ইকামাতে দীন' বইয়ে ওলামা-মাশায়েখের খিদমতে এই মর্মে আবেদন জানাই যে, সংশোধনের নিয়তে কুরআন-হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে মাওলানা মওদূদীর রচনায় যেসব ভুল পাওয়া যায় তারা সেগুলো চিহ্নিত করে দিলে আমরা এ খিদমতের জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মধ্যে শামিল আছি বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এর খেলাফ কোনো কথা আমরা কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজি নই।"

সভাপতির মন্তব্য

আমার এ দীর্ঘ বক্তব্যের পর সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে শায়খুল হাদীস সাহেব বললেন, 'অধ্যাপক সাহেব বল আমাদের কোর্টে ফেলে দিলেন। এখন এটা আমাদের দায়িত্ব। আমি অধ্যাপক সাহেবকে দীর্ঘকাল থেকে জানি এবং সদর সাহেব হুযূরের

[মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)] সাথে তাঁর সম্পর্কের কারণে আমি এ কথা বিশ্বাস করি যে, আমরা যদি মাওলানা মওদূদীর রচনায় ভুল চিহ্নিত করে দিই তাহলে তিনি জামায়াতের মধ্যে তা কাজে লাগাতে পারবেন। সুতরাং এসব বিষয়ে আর আলোচনা না করে আসুন ঐক্যের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলি।'

সভাপতি সাহেব এ কথা বলার পর ঐক্যের পক্ষে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ঐক্যের প্রক্রিয়া চালু রাখার উদ্দেশ্যে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি রাবেতা কমিটি গঠিত হয়; কিন্তু সদস্যদের প্রয়োজনীয় তৎপরতার অভাবে তখন ঐক্যের কোনো বাস্তব রূপরেখা সামনে আসেনি। ১৯৯০ সালের ১ মে ঈদুল ফিতরের দিন সন্ধ্যায় ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলীর বাসায় শায়খুল হাদীস, চরমোনাইর পীর সাহেব, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, অধ্যক্ষ মাসউদ খান এবং আমি একসাথে মিলিত হওয়ার সুযোগে ইসলামী ঐক্যের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, রাবেতা কমিটি ১০ জনের বদলে পাঁচজন হবে, যাতে যোগাযোগ সহজ হয়।

এ পাঁচজন হলেন–

১. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান,
২. ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলী,
৩. এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম,
৪. জনাব ডা. মুখতার আহমদ (চরমোনাইর পীর সাহেবের প্রতিনিধি),
৫. অধ্যক্ষ মাসউদ খান (খেলাফত মজলিসের প্রতিনিধি),

এরপর এ বিষয়ে আর কোনো তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি।

এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বলেন, 'আমি উদ্যোগ নিলে যোগাযোগ হয় বটে, কিন্তু সবাই সক্রিয় না হলে কেমন করে উদ্দেশ্য সফল হতে পারে?'

২২৪.

চরমোনাইর পীর সাহেব আমার বাড়িতে এলেন

১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এক শুক্রবার সকালে পীর সাহেব ও ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলী আমার বাড়িতে তাশরীফ আনলেন। হঠাৎ করেই হাজির হওয়ায় তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিনা খবরেই কী মনে করে এলেন?'

এর জবাবে দুজনের মধ্যে কে কথা বলবেন তা নিয়ে কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলি হলো। পীর সাহেব বলতে থাকলেন, 'ব্যারিস্টার সাহেব বলেন'। আর ব্যারিস্টার সাহেব বারবার বললেন, 'হুযূর, আপনি বলেন'। শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টার সাহেব বলা শুরু করলেন।

বুঝতে পারলাম, কোন্ বিষয়ে আমার সাথে আলাপ করা হবে তা দুজনেই পরামর্শ করে ঠিক করে এসেছেন। এখন কে কথা বলবেন তা নিয়ে সামান্য একটু ঠেলাঠেলি হলো।

ব্যারিস্টার সাহেব বললেন, 'প্রফেসর সাহেব! আপনি তো বিদেশ থেকে আসার পর থেকেই ইসলামী ঐক্যের জন্য বই লিখলেন এবং অনেক চেষ্টা করলেন; কিন্তু এখনো কাঙ্ক্ষিত ঐক্য গড়ে উঠল না। আপনি কোনো এক ব্যক্তির একক নেতৃত্বের বদলে সামষ্টিক নেতৃত্ব বা সম্মিলিত নেতৃত্বের ভিত্তিতে ঐক্যের চেষ্টা করেছেন; কিন্তু এক ব্যক্তিকে নেতা না মানলে প্রকৃত ঐক্য হতে পারে না। নেতৃত্বের দায়িত্ব এমন একজনের হাতে তুলে দিতে হবে, যিনি একই সাথে আলেম ও পীর। আমি আলেম হলেও পীর নই। আর আপনি তো আলেমও নন, পীরও নন। আমাদের দেশে যে কয়েকজন ব্যক্তিত্ব আলেম ও পীর হিসেবে গণ্য তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এ হুযূরের (পীর সাহেবের দিকে ইঙ্গিত করে) চেয়ে যোগ্য অন্য কেউ নেই।'

পীর সাহেবের উপস্থিতিতে এ কথাগুলো শুনে আমি হতভম্ব অবস্থায় পীর সাহেবের দিকে তাকালাম এবং নির্বাক বিস্ময়ে লক্ষ করলাম যে, ব্যারিস্টার সাহেবের বক্তব্যে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তাঁর উৎফুল্ল চেহারা এখনো আমার চোখে ভাসছে।

আমি বিব্রত অবস্থায় ব্যারিস্টার সাহেবকে বললাম, 'আপনার প্রস্তাব শুনলাম। আমার সহকর্মীদের নিকট বিষয়টা পেশ করব।'

তাঁরা বিদায় নিয়ে গেলে আমি ভাবতে থাকলাম, ব্যারিস্টার সাহেব একা এসেই তো এ কথাগুলো আমাকে বলতে পারতেন। তিনি পীর সাহেবের সামনেই এভাবে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার আহ্বান জানালেন বলে আমি চরমভাবে বিস্মিত হলাম। আর পীর সাহেবই বা কেমন করে তাঁর সামনেই এসব কথা ব্যারিস্টার সাহেবকে বলতে দিলেন, সেটা আরো বেশি বিস্ময়ের ব্যাপার। আর তাঁর পক্ষে এমন ওকালতিতে পীর সাহেবকে খুশি হতে দেখে তো আমি অত্যন্ত বিব্রতবোধ করলাম।

তাঁরা দুজন বিদায় নেওয়ার পরপরই আমি জামায়াতের তদানীন্তন সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে ফোনে ঘটনাটা জানালাম। কুরবান সাহেবকে নিজামী সাহেব বড় ভাইয়ের মতোই শ্রদ্ধা করেন। তিনি তাঁকে ফোনে জিজ্ঞেস করলেন, 'কুরবান ভাই! আপনি আমীরে জামায়াতের নিকট যে কথা বলে এলেন সে কথাটি আগে আমাকে বললেই ভালো হতো।' কুরবান সাহেব নাকি জবাব দিলেন, 'এটাকে আপনি এত সিরিয়াসলি নেবেন না, পীর সাহেবকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আমি এ কথা বলেছি।' এ কথা জেনে আমি আরো বিস্মিত হলাম।

ব্যারিস্টার কুরবান সাহেবের সাথে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বহু বছর থেকে। পঞ্চাশের দশকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে যখন পূর্ব-পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ গঠিত হয়, তখন তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। তিনি পীর সাহেবকে যখন নিয়ে আসেন তখন তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রধান নেতা।

কয়েক বছর পর তিনি আবার এসে প্রস্তাব দিলেন যে, একটা সর্বদলীয় ঐক্যজোট করা হোক এবং প্রত্যেক দলের প্রধানকে নির্দিষ্ট একটি মেয়াদের জন্য জোটপ্রধান করা হোক। তবে প্রথম জোটপ্রধান করা হোক চরমোনাইর পীর সাহেবকে।

আমি বললাম, আপনি আলেম মানুষ। আপনি কি জানেন না যে, ইসলামে নেতৃত্বের খাহেশ রাখা জায়েয নয়? জবাবে তিনি বললেন, অবশ্যই আমি এ কথা জানি। আবার জিজ্ঞেস করলাম, চরমোনাইর পীর সাহেব নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষী কি না? বললেন, তিনি চরম নেতৃত্বলোভী। বললাম, তাহলে আপনি এমন প্রস্তাব নিয়ে এলেন কেমন করে? বললেন, আমি চাই, তবুও ঐক্যজোট হোক।

ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলী সাহেব জীবিত থাকলে (মৃত্যু ২০০৫) আমার উপরিউক্ত বিবরণ সত্যায়িত করতে পারতেন। আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে এসব সত্য প্রকাশ করছি।

কারাগারে বন্দী থেকেও ইসলামী ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টা

১৯৯০ সালের শেষার্ধে কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের দাবিতে দুই বার আন্দোলনের ফলে স্বৈরশাসক এরশাদ ৬ ডিসেম্বর পদত্যাগ করলেন, কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় ১৯৯১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং জামায়াতের সমর্থন নিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়। এ সময় ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা মুলতবিই রইল।

১৯৯২ সালের ২৪ মার্চ বিদেশি নাগরিক হিসেবে আমাকে গ্রেফতার করা হলো। আমি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৯৯৩ সালের জুলাই পর্যন্ত রাজবন্দী হিসেবে ছিলাম। ১৬ মাস বন্দী থাকাকালে ১৬টি বই লিখি। আর 'ইসলামী শক্তির ঐক্যমঞ্চ চাই' বলে একটি প্রবন্ধ রচনা করি। কারামুক্ত হওয়ার পর 'ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করি। সংশ্লিষ্ট মহলে বইটি বিলি করা হয়, যাতে এ বিষয়ে কেউ উদ্যোগ নিতে চাইলে এটাকে একটা ফর্মুলা হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন।

আমার প্রণীত পূর্ববর্তী ফর্মুলা অনুযায়ী আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে ওলামা-মাশায়েখের সাথে যোগাযোগ করার জন্য একজন আলিয়া মাদরাসাপাস আলেমকে নিয়োজিত করি এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগান দেওয়ারও ব্যবস্থা করি। কিন্তু জেলে লেখা ফর্মুলাটির ভিত্তিতে আমি কোনো উদ্যোগ নিতে হিম্মত করিনি।

ইত্তেহাদুল উম্মাহ ভেঙে যাওয়ার পর ১৯৮৯ সালে যে সর্বদলীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার উদ্যোগ আমিই নিয়েছিলাম। সম্মেলনের সাফল্য থেকে ধারণা করা হয়েছিল যে, ১০ জনের রাবেতা কমিটি এবং পরবর্তী সময়ে ৫ জনের রাবেতা কমিটি সক্রিয় হবে এবং তাদের প্রচেষ্টায় আবার একটা ঐক্যমঞ্চ গড়ে উঠবে। কিন্তু সে ধরনের কোনো প্রচেষ্টাই আর চালু হয়নি বলে আমি হিম্মত হারিয়ে ফেলি। জেলে প্রণীত ফর্মুলাটি এখানে পেশ করছি।

ইসলামী শক্তির ঐক্যমঞ্চ চাই

১৯৯২ সালের মার্চ থেকে '৯৩ সালের জুলাই পর্যন্ত ১৬ মাস জেলে থাকাকালে আমি ইসলামী ঐক্যের গুরুত্ব আরো বেশি উপলব্ধি করি এবং সকল দীনী মহলের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে এ আশা নিয়ে একটা ঐক্য-প্রস্তাব রচনা করি। সকলের বিবেচনার জন্য এখানে তা পেশ করা হলো :

আল্লাহর রহমতে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে ইসলাম একটি শক্তি হিসেবে স্বীকৃত। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদসহ সকল বাতিল শক্তি একজোট হয়ে 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতি' নিষিদ্ধ করার দাবি এ কথাই প্রমাণ করে যে, তাদের মধ্যে এ দেশে ইসলাম বিজয়ী হওয়ার আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

তাদের এ আশঙ্কা অমূলক নয়। জনগণের নিকট ভোট ভিক্ষা করার সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও বিসমিল্লাহর আশ্রয় নেওয়াটা তারা নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক মনে করে; কিন্তু ইসলামের কোনো ধার তারা ধারে না। এ অবস্থায় জনগণের সামনে ইসলামী হুকুমতের আওয়াজ জোরদার হলে ময়দান তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এ আশঙ্কা করাই তাদের জন্য স্বাভাবিক। বর্তমানে বিভিন্ন সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন নামে ও স্লোগানে ইসলামী শাসন কায়েমের যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তার লক্ষ্য যে আসলে একই, সে কথা বাতিলপন্থিদের অজানা নয়। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন, ইসলামী খিলাফত, ইসলামী শাসনতন্ত্র ইত্যাদির মর্মকথা যে একই, তা উপলব্ধি করেই শতমুখে তারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা ও মৌলবাদের নামে সবরকমের ইসলামী আন্দোলনকে নির্মূল করার পাঁয়তারা করছে।

আনন্দের বিষয় যে, সকল ইসলামী সংগঠনই বলিষ্ঠ ভাষায় এসব ষড়যন্ত্র ও অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এসব প্রতিবাদ পৃথকভাবে হওয়ায় বাতিলের গায়ে সামান্য আঁচড়ও লাগছে না। বাতিল শক্তি জাতীয় সংসদেও একই কণ্ঠে তাদের এ দাবি জানিয়ে যাচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে ইসলামী শক্তি যদি একই মঞ্চ থেকে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েমের বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলতে সম্মত হয় তবেই জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগবে। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে বায়তুল মুকাররম চত্বরে জাতীয় মসজিদের খতীবের সভাপতিত্বে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব একই মঞ্চ থেকে কথা বলায় যে বিপুল সাড়া পড়েছিল, তা এককভাবে কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না। মাত্র দুই দিনের নোটিশে এভাবে লাখো লোকের সমাবেশ অনেককেই বিস্মিত করেছে। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, একমঞ্চে প্রধান প্রধান ইসলামী ব্যক্তিত্ব যদি সমবেত হন তাহলে গোটা দেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হবে। ইসলামী আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টির জন্য এর প্রয়োজনীয়তা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারে না।

ঐক্যমঞ্চের উদাহরণ

ইন্দিরা গান্ধীর দাপটের সময়ও ভারতের সকল ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ 'মজলিসে মুশাওয়ারাত' নামে একমঞ্চে সমবেত হওয়ায় সেখানকার মুসলিম জনতার তিন দফা দাবি আদায় করা সম্ভব হয়েছিল। দাবিগুলো হলো :

১. মুসলিম পারিবারিক আইনে হস্তক্ষেপ করা চলবে না,
২. উর্দু ভাষাকে শাসনতন্ত্রে দেওয়া মর্যাদা অনুযায়ী বহাল রাখতে হবে,
৩. আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়া চলবে না।

১৯৫১ সালে সর্বদলীয় ওলামা সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার কারণে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে ইসলামী আদর্শ প্রস্তাব স্থায়ী মর্যাদায় বহাল রয়েছে। এমনকি ১৯৭৩ সালে মি. ভুট্টোর আমলে প্রণীত শাসনতন্ত্রেও আদর্শ প্রস্তাব ও ২২ দফাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়নি।

এসব উদাহরণ এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইসলামী সংগঠন ও নেতৃস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের সমবেত সিদ্ধান্তকে শাসকগণ অবহেলা করতে সাহস পান না। বাংলাদেশের ইসলামী শক্তি যদি একমঞ্চে দাঁড়িয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রয়োজনীয় সব ইস্যুতে ঐকমত্য প্রকাশ করে তাহলে জনগণ নিশ্চিতভাবে তা সমর্থন করবে এবং কোনো সরকারের পক্ষেই এ জনমতকে অবহেলা করা সম্ভব হবে না। আর তখন ইসলামবিরোধী এবং অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহকরা ইসলামের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনের সাহসও করবে না।

এ উদ্দেশ্যে গঠিত কোনো মঞ্চে যারা শামিল হবেন তারা তাদের নিজস্ব সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান যথারীতি চালু রেখেই শুধু একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী একমঞ্চ থেকে আওয়াজ তুলবেন। এ কর্মসূচি 'আল আমরু বিল মা'রূফ ওয়াননাহী 'আনিল মুনকার'-এর ভিত্তিতেই প্রণীত হতে হবে। আল্লাহ তাআলা এ কাজের মাধ্যমেই মুসলিম জাতিকে 'খাইরু উম্মাত' তথা শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন।

ইসলামী ঐক্যের দুই দফা কর্মসূচি

'আল আমরু বিল মা'রূফ ওয়াননাহী আনিল মুনকার'-এর ভিত্তিতে দুই দফা কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। এ দফা দুটির একটি করে সহজবোধ্য নামও দেওয়া যেতে পারে। যথা–

১. ইসলামের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন : যেহেতু ইসলাম কতক বাহ্যিক অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ কোনো ধর্মমাত্র নয় বরং একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনবিধান, সেহেতু বিভিন্ন ইস্যুতে ইসলামের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক মতামত বা সিদ্ধান্ত সরকার ও জনগণের সামনে পেশ করা প্রয়োজন। কেননা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অগণিত বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে এমন সব মতামত প্রকাশ করা হয়, যা কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় বলে আলেম সমাজ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তা ছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ইসলামী সমাধান কী, তাও বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন পড়ে।

এ পরিস্থিতিতে ইসলামের পক্ষ থেকে সঠিক ভূমিকা পালন করার কোনো সর্বসম্মত প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন না থাকার ফলে ইসলাম সম্পর্কে যে যা খুশি তা প্রকাশ করে চলেছে। যাদের ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্কই নেই তারাও ইসলামের অথরিটি সাজার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ইসলামকে এ ইয়াতীম-দশা থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো সংস্থার পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট মতামত জাতির সামনে আসা অতীব প্রয়োজন।

যদি ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের ব্যাপকভিত্তিক কোনো ঐক্যমঞ্চ থেকে কোনো বিষয়ে ইসলামের রায় প্রকাশ করা হয়, তাহলে সরকারসহ কোনো মহলই এ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করার কিংবা কোনো দায়িত্বহীন বক্তব্য দেওয়ার সাহস পাবে না।

বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ও ব্যক্তিত্ব যেসব মতামত প্রকাশ করছেন, তাতে ঐ উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না। ইসলামের সত্যিকার প্রতিনিধি বলে সবাই যাকে মেনে নিতে পারে, এমন একটি সম্মিলিত মঞ্চের পক্ষ থেকে মতামত আসা আবশ্যক। যদি ইসলামী শক্তির উল্লেখযোগ্য সকল মহল ঐ ঐক্যে শামিল না হয় এবং কোনো কোনো বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে যদি ঐক্যমঞ্চটি মুসলিম মিল্লাতের পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা না পায় তাহলে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

২. **ইসলামবিরোধী তৎপরতা প্রতিরোধ :** বর্তমানে ইসলামবিরোধী সকল মহল এক বিস্ময়কর ঐক্যশক্তি সৃষ্টি করেছে। এ অশুভ ঐক্যের ছত্রছায়ায় তারা দাপটের সাথে ইসলাম সম্পর্কে নানা কটূক্তি প্রকাশ করছে এবং রাজনৈতিক ময়দান থেকে ইসলামকে উৎখাত করার জন্য নানা ধৃষ্টতামূলক বক্তব্য দিয়ে চলেছে। এ দেশের সকল ইসলামবিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ময়দানে সক্রিয় রয়েছে। ১৯৯২ সালে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবি জাতীয় সংসদে সরকারি দলের উপনেতাও উত্থাপন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এদেরকে প্রতিহত করার জন্য সম্মিলিত মঞ্চ থেকে শুধু সতর্কবাণী উচ্চারণ করাই যথেষ্ট হতে পারে না, প্রয়োজন হলে বিক্ষোভ প্রদর্শনও করা যেতে পারে। এ জাতীয় মঞ্চ থেকে বলিষ্ঠ বক্তব্য পেশ করা হলে সকল ইসলামবিরোধী শক্তি দুর্বল হতে বাধ্য হবে।

ইসলামের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন ও ইসলামবিরোধী তৎপরতা প্রতিরোধ এমন দুটো গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যার জন্য ইসলামী ঐক্য অপরিহার্য। এ দেশের বিরাট ইসলামী শক্তিসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে ইসলাম আজ অন্যায় আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছে। তাই বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হলো ইসলামী ঐক্য।

ঐক্যপ্রচেষ্টার চূড়ান্ত লক্ষ্য

সকল ইসলামী মহলকে ঐক্যবদ্ধ করে পূর্বোক্ত দুই দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে একটি ঐক্যমঞ্চ গড়ে উঠলে সবার মধ্যেই ইকামাতে দীনের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পাবে। এ ঐক্যমঞ্চের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত, আল্লাহর আইন ও ইসলামী নেযাম (সমাজব্যবস্থা) কায়েমের জন্য আন্দোলন করা এবং সংগঠন গড়ে তোলার প্রতি ওলামা-মাশায়েখকে সচেতন ও সক্রিয় করাও সহজ হবে। যারা মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, ওয়ায ও তাবলীগের মাধ্যমে দীনের খিদমত করে যাচ্ছেন তারা ঐক্যপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ পথে এগিয়ে আসতে পারেন। ধর্মদ্রোহী ও মুরতাদদের শাস্তি ও ব্লাসফেমি আইন প্রণয়নের দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তাতে সর্বস্তরের আলেম সমাজে ফরযিয়াতে ইকামাতে দীনের জযবা সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়।

১৯৪১ সালে ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী কায়েম হয়। ১৯৫৩ সালে ইসলামী হুকুমত কায়েমের উদ্দেশ্যে নেজামে ইসলাম পার্টি গঠিত হয়। আশির দশকে আরো কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এসব সংগঠনে ওলামায়ে কেরাম সক্রিয় রয়েছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ আলেম এখনো সংগঠনের

বাইরেই রয়ে গেছেন। এটা অত্যন্ত স্বস্তির বিষয় যে, বিলম্বে হলেও ফরযিয়াতে ইকামাতে দীনের চেতনা আলেম সমাজের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ চেতনার ফলে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ আশা পূরণ করুন। আমীন!

ইসলামী ঐক্যের বাস্তব ফর্মুলা

বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন, প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে কোনো ঐক্যমঞ্চ গঠন করতে হলে এর স্থায়িত্ব ও সঠিক পরিচালনার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই কয়েকটি মূলনীতি মেনে চলা আবশ্যক বলে আমি মনে করি :

১. সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের উপর ঐক্যমঞ্চের নেতৃত্ব যৌথভাবে ন্যস্ত থাকবে; কোনো একজনের উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পিত হবে না।
২. ঐক্যমঞ্চে শরীক সংগঠনসমূহ নিজ নিজ সংগঠনের কার্যক্রম যথারীতি চালু রাখতে পারবে।
৩. ঐক্যমঞ্চের যাবতীয় সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হবে।

ঐক্যমঞ্চের বিকল্প ঐক্যপদ্ধতি

সকল ইসলামী শক্তির একটি ঐক্যমঞ্চ গঠনের প্রচেষ্টা সফল না হওয়া পর্যন্ত একই ধরনের কর্মসূচি যুগপৎভাবে পালনের মাধ্যমে ঐক্যকামী জনগণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

ইসলামী সংগঠনগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে অপ্রয়োজনীয় সমালোচনা না করে যুগপৎ কর্মসূচি চালিয়ে গেলে ক্রমেই তাদের মধ্যে ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকবে।

চরমোনাইর মুহতারাম পীর সাহেবের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত চরমোনাইর মুহতারাম পীর মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করীমের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির কৃতিত্ব পীর সাহেবেরই, আমার নয়।

১৯৭৮ সালে আমার রচিত 'ইসলামী ঐক্য : ইসলামী আন্দোলন' বইটি তাঁর ভগ্নিপতি মাওলানা বেলায়েত হোসাইনের মারফতে তাঁর নিকট পাঠাই। তাঁর সাথে আমার সরাসরি পরিচয় ছিল না। তাঁর সম্মানিত পিতা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসহাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কয়েকটি মাহফিলে আমার বক্তব্য শুনে তিনি আমার সাথে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন।

আমার প্রেরিত বইটি পড়ে কোনোরূপ সংবাদ না দিয়েই তিনি আমার বাড়িতে আগমন করলেন এবং অত্যন্ত খোলামনে বললেন, আপনার বইটি পড়ে আপনার সাথে আমার চিন্তার গভীর মিল রয়েছে দেখে আপনার কাছে ছুটে আসতে বাধ্য হলাম। আমি অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করলাম যে, ইসলামী ঐক্যের ফর্মুলাটি তিনি পছন্দ করেছেন।

ইসলামী ঐক্যের উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সালে যোগাযোগ ও চিন্তা-ভাবনা করার জন্য প্রথমে যে কয়েকজনকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছিল তাতে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে যখন ইত্তেহাদুল উম্মাহ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন সবাই এ পীর সাহেবকেই এর মুখপাত্র নির্বাচিত করেন।

একবার ঘটনাক্রমে পীর সাহেব আমার বাড়িতে এলেন। ইসলামী ঐক্যের অগ্রগতি নিয়ে আলাপ চলছিল। ওলামা-মাশায়েখের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব পালনকারী আলেমে দেওবন্দ ও উজানী কাওমী মাদরাসার সাবেক মুহতামিম মাওলানা মাযহারুল হকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমার আপন ভাগ্নি-জামাই আলেমে দেওবন্দ মাওলানা হাফেয ফযলুল হক আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর পকেট থেকে নোট বই বের করে মাওলানা মওদূদীর বই থেকে এমন একটা উদ্ধৃতি পেশ করলেন, যা শুনে পীর সাহেব স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। যে বইটি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হলো, উর্দুতে লেখা সে বইটি আমি বের করে তাঁর উল্লিখিত পৃষ্ঠা নম্বর বের করলাম। মাওলানা মাযহার সাহেবকে ঐ প্যারাটি পড়তে দিলাম। তিনি পড়ার পর পীর সাহেব ধমকের সুরে আমার ভাগ্নি-জামাইকে বললেন, 'আগে-পিছে বাদ দিয়ে আপনি কেন এমন একটি উদ্ধৃতি পেশ করলেন, যা শুনে অত্যন্ত আপত্তিকর মনে হয়েছিল। বই থেকে পড়ার পর তো তাতে আপত্তিকর কিছু দেখছি না। আপনি এতে দূষণীয় কী পেলেন?'

ঐ ব্যক্তি আরো একটি উদ্ধৃতি পেশ করলেন। বই বের করে দেখার পর সেটারও ঐ একই দশা হলো। পীর সাহেব তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আর দরকার নেই'। আমি অত্যন্ত সন্তুষ্টিবোধ করলাম যে, পীর সাহেব প্রমাণ পেয়ে গেলেন একশ্রেণীর আলেম মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যেই তাঁর লেখা থেকে কাটছাঁট করে বিভিন্ন উদ্ধৃতি পেশ করে থাকে।

১৯৮৩ সালে পীর সাহেব একদিন এসে বললেন, আপনাকে আমি হাফেযজী হুযূরের কাছে নিয়ে যেতে চাই। আমি তাঁর উদ্দেশ্য জানতে চাইলে তিনি বললেন, ইত্তেহাদুল উম্মাহতে জামায়াতের সাথে মিলে আমি যে কাজ করছি সেটা তিনি মোটেই পছন্দ করছেন না। আমি তাঁকে বোঝাতে পারছি না। বললাম, আপনি যদি বোঝাতে না পারেন, তাহলে আমি কেমন করে পারব? তিনি বললেন, আমি চাই আপনার মুখ থেকেই তিনি যেন এ সম্পর্কিত বক্তব্য শুনেন। আমি রাজি হলাম। দিন-তারিখ-সময় ঠিক করে তিনি জানালেন। কথা ছিল তিনি গাড়ি নিয়ে এসে সকাল ১০টায় আমাকে নিয়ে যাবেন। আমি প্রস্তুত হয়ে রইলাম। ৯টার সময় তিনি ফোন করে বললেন, গতরাতে হাফেযজী হুযূর ইরান সফরে চলে গেছেন। অতএব, এ সাক্ষাৎ আর তখন হলো না।

অবশ্য ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে হাফেযজী হুযূরের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় এবং সেখানে পীর সাহেব ঐক্যের পক্ষে হাফেযজী হুযূরের প্রতি আবেদন জানান। অবশ্য হাফেযজী হুযূর সে আবেদনে সাড়া দেননি।

১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পীর সাহেব আমার বাড়িতে এসে বললেন, গোলাম আযম ও হাফেযজী হুযূরকে একত্রিত করতে না পারলে ইসলামী ঐক্য পূর্ণাঙ্গ হবে না।

আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমাকে যা করতে বলবেন আমি তা-ই করব। আর আমার কোনো ত্রুটি হয়ে থাকলে বলুন। তিনি বললেন, হুযূরকে যে বোঝাতেই পারছি না।

এক সাক্ষাতে পীর সাহেবকে আমি বললাম, আপনি জামায়াতের ব্যাপারে আমার সামনেই খোলা মনে সমালোচনা করেন। তাই আমি আপনাকে অন্তর থেকে ভালোবাসি। কেননা, এটাই হলো সংশোধনের সঠিক তরীকা।

এভাবে পীর সাহেবের সাথে দশ বছরে আমার যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেটাকে আমি মহব্বতের সম্পর্ক বলেই মনে করি।

তিনি বহুবার মেহেরবানী করে আমার বাড়িতে এসেছেন। আমি কয়েকবার তাঁকে বলেছি, আপনি সদরঘাটে যেখানে এসে ওঠেন সেখানে আমি যেতে চাই। তিনি বললেন, আপনি সেখানে গেছেন লোকেরা তা টের পেলে ভিড় করবে, তাই আমি আপনাকে সেখানে নিতে চাই না।

একবার বরিশাল থেকে স্টিমারে ঢাকায় আসতে ঘটনাক্রমে একই কেবিনে রাত কাটালাম এবং সেই সুযোগে আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে দীর্ঘসময় আলাপ-আলোচনা হলো।

তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার মতো কোনো ঘটনা কোথাও ঘটেছে বলে আমার মনে পড়ে না। জামায়াতে ইসলামীর প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির কারণও আমার জানা নেই।

পীর সাহেবের উপস্থিতিতে ব্যারিস্টার কুরবান সাহেব তাঁর নেতৃত্বে ইসলামী ঐক্যমঞ্চ গঠনের যে প্রস্তাব দিলেন, তা জামায়াত গ্রহণ করেনি এবং আমিও ব্যক্তির বদলে সামষ্টিক নেতৃত্বের পক্ষে বলে ঐ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারিনি। এ অপরাধটুকু (!) ছাড়া আমার পক্ষ থেকে আর কোনো ত্রুটি হয়েছে বলে জানি না। তাই ঐ ঘটনাটি এত বছর পর প্রকাশ করার প্রয়োজনবোধ করলাম।

২২৫.

ইসলামী ঐক্যের উদ্দেশ্যে নেতৃস্থানীয় আলেমগণকে চিঠি

জামায়াতে ইসলামীর ‘ওলামা ও মাশায়েখ বিভাগ’ থেকে কয়েকজন আলেম ইসলামী ঐক্যের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ওলামায়ে কেরামের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন জেলা সফর করেন। ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে মাওলানা আবদুস্ সুব্হান ও এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম চট্টগ্রাম সফর করেন। চট্টগ্রামের জামায়াতনেতা মাওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন, মাওলানা আবু তাহের ও মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী উপরিউক্ত দুজন কেন্দ্রীয় নেতাকে নিয়ে হাটহাজারী ও পটিয়ার বিখ্যাত দুটো মাদরাসার মুহতামিমদ্বয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা জামায়াতের এ ডেলিগেশনকে সম্মানিত মেহমান হিসেবেই গ্রহণ করেন এবং আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশেই এঁদের সাথে মতবিনিময় করেন। তাঁদের নিকট আমার নিম্নরূপ চিঠি হস্তান্তর করা হয় :

২৪/১১/'৯৫ সাল

'মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ।

দেশের অন্যতম প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান হিসেবে আপনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। এর সাথে সাথে ইসলামী পুনর্জাগরণের বিভিন্ন বিষয়ে আপনি আরো বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করছেন। এজন্য জানাই মুবারকবাদ।

বর্তমানে দেশে ও বিদেশে মুসলিম জনগণের সাথে ইসলামবিরোধী ইহুদী-নাসারাদের দুশমনি সম্পর্কে আপনি অবহিত আছেন।

আমাদের এই দেশে আমরা মনে করি, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র, ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ ও পীর-মাশায়েখ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

আমরা ঐক্যের জন্য সবসময় চেষ্টা করে আসছি। আমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টার একটি কার্যকর পন্থা বের করতে পারি। এ বিষয়ে আপনার মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করে আমার প্রতিনিধির মাধ্যমে আপনার খিদমতে এ চিঠি প্রেরণ করলাম।'

তাঁরা আমার চিঠি গ্রহণ করেন এবং যথাসময়ে জবাব দেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেন। ইসলামী ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁরা জামায়াতের ডেলিগেশনকে চমৎকার মেহমানদারি করেন।

আমার চিঠির জবাব

আমার চিঠি দুজনের নিকট একই ধরনের হলেও দুজনের কাছে আলাদাভাবে পেশ করা হয়। অবশ্য তাঁরা দুজন একই কাগজে আমার চিঠির জবাব দেন। সম্মানিত মুহতামিমদ্বয়ের জবাবের কপি এখানে পরিবেশন করা হলো :

"বরাবর
মুহতারাম জনাব গোলাম আযম সাহেব
আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।
স্মারক নং মৌ/হা-প৩১৩ তাং ১৯/১২/৯৫ ইং

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহূ।

বিষয় : দ্বীনী স্বার্থে ঐক্য প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে।

সূত্র : আপনার প্রেরিত পত্র স্মারক নং ..... তাং ২৪-১১-৯৫ ইং

জনাব,

আপনার উপরিউক্ত তারিখের স্মারক নং সংবলিত পত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে। পত্রে আপনি দেশ ও সমাজের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতিতে ইসলামপন্থিদের ঐক্যের প্রতি যে গুরুত্বারোপ করেছেন তজ্জন্য আপনাকে জানাই ধন্যবাদ। এ বিষয়ে আমাদের মতামত নিম্নরূপ :

ঐক্যের প্রশ্নে পারস্পরিক আলোচনা ও মতবিনিময়ের পূর্বে ঐক্যের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ অপরিহার্য। আপনার পত্রের মর্মানুসারে, দেশ ও সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা, অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের প্রতিরোধ এবং একটি সত্যিকারের ইসলামী সরকার গঠন করাকেই ঐক্যের মূল লক্ষ্য বলা যায়। আপনি এ বিষয়ে অবশ্যই ঐকমত্য পোষণ করবেন যে, সত্যিকারের ইসলাম বলতে সেই দীনকে বোঝায়, যা অবলম্বনে ও প্রতিষ্ঠায় আমরা ফেরকায়ে নাজিয়ার (নাজাতপ্রাপ্ত দল) অন্তর্ভুক্ত থাকার সৌভাগ্য লাভ করি। ফেরকায়ে নাজিয়ার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে নিম্নবর্ণিত হাদীস শরীফে :

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'বনী ইসরাঈল বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি ফেরকা ছাড়া সকলেই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা (ফেরকায়ে নাজিয়া) কোন্ দলটি? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, সেই ফেরকা যেটি আমার ও আমার সাহাবীদের মতাদর্শের অনুসারী হবে।' (তিরমিযী)

এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (স) এবং তাঁর সকল সাহাবায়ে কেরামকে আদর্শ হিসেবে যারা গ্রহণ করবে তারাই ফেরকায়ে নাজিয়া। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জমায়াতের বুনিয়াদী আকীদাগুলোর অন্যতম হচ্ছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সকল নবী-রাসূল মাসুম (নিষ্পাপ) এবং সকল সাহাবায়ে কেরাম আদেল ও মুসলিম উম্মাহর আদর্শ। এটাকে সংক্ষেপে ইসমাতে আম্বিয়া ও আদালতে সাহাবা বলা যায়।

অতএব যদি আপনারা দেশে প্রকৃত ও সঠিক দীন কায়েমের স্বার্থে নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ে একমত আছেন বলে লিখিতভাবে জানান, অর্থাৎ–

১. ইসমাতে আম্বিয়া,
২. আদালতে সাহাবা,
৩. ইসলামী পদ্ধতিতে ইসলামী রাজনীতি করা এবং পাশ্চাত্য কর্মপন্থা বর্জন করা এবং
৪. জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলনের সাথে মাওলানা মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারাকে জড়িত করা হবে না বলে ঘোষণা দেওয়া

–তবে আমরা দীনের বৃহত্তর স্বার্থে বৃহত্তর ঐক্যের লক্ষ্যে আপনাদের সাথে আলোচনায় বসতে সম্মত রয়েছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হক অনুধাবনে ও হক প্রতিষ্ঠার মানসে নিঃস্বার্থ প্রয়াস ও সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের তাওফীক দান করুন। আমীন!"

স্বাক্ষর
মুহতামিম
জামেয়া আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

স্বাক্ষর
মুহাতামিম
আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া, পটিয়া
চট্টগ্রাম

তাঁদের চিঠির জবাব

দুজন মুহতামিমের চিঠি একসাথে পেয়ে আমি অত্যন্ত উৎসাহবোধ করি। কিন্তু ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের দাবিতে আন্দোলনে মহাব্যস্ত থাকায় ঐ চিঠির জবাব দিতে দুই মাস দেরি হয়ে যাওয়ায় আমি লজ্জিত। আমার জবাবের নকল নিম্নরূপ :

"মুহতারামদ্বয়, ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আমার বিগত ২৪/১১/৯৫ তারিখের পত্রের উত্তরে আপনাদের নিকট থেকে উপরিউক্ত বিষয়ে উল্লিখিত পত্রখানা ২৭/১২/৯৫ তারিখে আমার হস্তগত হয়। আপনাদের জবাবে উপরিউক্ত বিষয়ের প্রতি আপনারা যে গুরুত্বারোপ করেছেন সেজন্য আপনাদের মুবারকবাদ জানাই।

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় আমার ব্যস্ততার দরুন আপনাদের চিঠির জবাব দিতে বিলম্ব হওয়ায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আশা করি আপনারা আমার সমস্যা উপলব্ধি করছেন।

আপনাদের পত্রে প্রকৃত ও সঠিক দীন কায়েমের স্বার্থে যে চারটি বিষয়ে আমাদের একমত থাকা সম্পর্কে লিখিতভাবে জানানোর কথা বলেছেন, তন্মধ্যে ১ ও ২ নং বিষয়ে আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সম্পূর্ণ অনুরূপ অর্থাৎ আমরা ইসমাতে আম্বিয়া ও আদালতে সাহাবায় পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি।

শেষোক্ত বিষয় দুটি সম্পর্কেও নীতিগতভাবে আমরা একমত। আমরা ইসলামী পদ্ধতিতেই ইসলামী রাজনীতি করছি। যেসব পাশ্চাত্য কর্মপন্থা ইসলামসম্মত নয় তা অবশ্যই বর্জনীয়। তবে এ বিষয়ে কেউ আমাদের কোনো কর্মপন্থা ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিকর হিসেবে ধরিয়ে দিলে আমরা অবশ্যই তা আলোচনাসাপেক্ষে গ্রহণ করতে দ্বিধা করব না।

চতুর্থ বিষয়ে জানাচ্ছি যে, মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোক্তা বটে, কিন্তু জামায়াতের গঠনতন্ত্র বা কর্মনীতি তাঁর একক চিন্তাপ্রসূত নয়। জামায়াতের জন্মলগ্ন থেকেই শূরা পদ্ধতিতে এর যাবতীয় কর্মতৎপরতা ও নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে। ইসলামের মৌল বিষয়ে মরহুম মাওলানার কোনো ব্যক্তিগত মত, রায় বা বিশ্লেষণকে জামায়াতের মত, রায়, বিশ্বাস বা অনুসরণীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। মরহুম মাওলানাকে জামায়াত কখনো ফিক্‌হ ও আকাঈদের ইমাম হিসেবে গণ্য করেনি। এ বিষয়টি আমি আমার লিখিত পুস্তকাদিতে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছি।

মরহুম মাওলানার অগণিত সাহিত্যভাণ্ডার দ্বারা বহু ভাষায় বিভিন্ন দেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ উপকৃত হচ্ছেন। আমরা শুধু তাঁর বইকেই যথেষ্ট মনে করি না, ইসলামের অন্যান্য মনীষীর লেখা কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিষয়ক এবং

অন্যান্য বিষয়ের উপর লিখিত কিতাবাদি থেকেও ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করি। মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেবের ব্যক্তিগত চিন্তাধারাকে ইসলামের মৌল বিষয়ে জামায়াতের কর্মনীতি হিসেবে জড়িত করা হয়েছে মর্মে কোনো প্রমাণ পেশ করলে তা অবশ্যই আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করব।

ইসলামের সীমারেখার মধ্যে বহু বিষয়ে ইখতিলাফ বা মতবিরোধের অবকাশ ছিল ও রয়েছে। মুসলমানগণ মৌল বিষয়সহ অগণিত বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা সত্ত্বেও ইখতিলাফী বিষয়গুলো দ্বারা অধিক প্রভাবান্বিত হওয়ায় যুগে যুগে মুসলিম বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক। আমার পত্রে আমি উল্লেখ করেছিলাম, 'আমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি কার্যকর পন্থা বের করতে পারি।'

আপনারা আপনাদের পত্রে চারটি বিষয়ে পূর্ব ঘোষণার প্রস্তাব করেছেন। যেকোনো আলোচনায় পূর্বপ্রস্তাব পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ বৃদ্ধি করে। তথাপি আল্লাহর রেজামন্দি হাসিলের লক্ষ্যে এবং দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে নাজাতের উদ্দেশ্যে আমি ও আমার দল আপনাদের উল্লিখিত যৌথ পত্রকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছি। দেশ ও মিল্লাতের বর্তমান নাজুক অবস্থায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার লক্ষ্যে গঠনমূলক পরবর্তী কী কার্যক্রম নেওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত মতামতের ইন্তেযারে রইলাম।

আল্লাহ তাআলা আমাদের দেশের সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার মহান উদ্দেশ্য সফল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আমার পত্রের জবাব দেওয়ার জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানিয়ে ইতি টানছি।"

আমার চিঠির পর–

মুহতামিম সাহেবদ্বয়ের চিঠির জবাব দেওয়ার পর কয়েক মাস নির্বাচনী হাঙ্গামায় কাটল। তাঁদের পক্ষ থেকে আর কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর যোগাযোগ করে জানতে পারলাম, তাঁদের দুজনের একজন আরব দেশে আছেন। তিনি ফিরে এলে পরে পরামর্শ করে তাঁদের মতামত জানাবেন। তারপর দীর্ঘ এক বছর পার হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কোনো খবর পাওয়া গেল না। তাই চট্টগ্রাম থেকে জামায়াতের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন আলেম হাটহাজারী গিয়ে মুহতামিম সাহেবের সাথে দেখা করেন। তিনি তাদের সাদরে গ্রহণ করলেন এবং বেশ উৎসাহের সাথে দেওবন্দ আন্দোলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বললেন, আমরা শিক্ষার ময়দানে কাজ করছি, আর জামায়াতে ইসলামী ঐ উদ্দেশ্যেই রাজনৈতিক ময়দানে কাজ করছে। তিনি আমার চিঠির জবাব লিখবেন বলে তাদের আশ্বাস দিয়ে বিদায় করলেন। কিন্তু মুহতামিমদ্বয়ের পক্ষ থেকে আর কোনো চিঠি আমার নিকট পৌঁছেনি।

চরমোনাইর পীর সাহেবের জামায়াতবিরোধী অভিযান

১৯৯৫ সালেই পত্র-পত্রিকায় চরমোনাইর পীর সাহেবের বক্তব্যে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা প্রকাশ পেতে শুরু করে। আমি এতে অত্যন্ত বিব্রতবোধ

করি। কারণ, আমি তাঁকে মহব্বতের দীনী ভাই বলে মনে করতাম। কী কারণে তিনি এ ভূমিকা নিলেন, চিন্তা করে তার কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি নিজেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করব।

প্রথমে ব্যারিস্টার কুরবান আলীকে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করলাম। একদিন পীর সাহেবের দলের নেতৃস্থানীয় দুই ব্যক্তি মেহেরবানী করে আমার সাথে দেখা করতে এলেন। তাঁরা হলেন জনাব আশরাফ আলী আকন ও হাফেয মাওলানা হেমায়েতুদ্দীন। তাঁদেরকেও সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করলাম। আমি অত্যন্ত আবেগের সাথে বললাম, আমি পীর সাহেবের সাথে একান্তে মিলিত হতে চাই। আমাদের দুজনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ যেন উপস্থিত না থাকেন। আমি আমার এ দীনী ভাইয়ের সাথে গোপনে কথা বলতে চাই, যাতে জামায়াতের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি সরাসরি জেনে নিতে পারি।

আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম যে, পীর সাহেবের সাথে আমার একান্তে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে আমি বলব, 'আমার সাথে ব্যক্তিগত আলাপকালে আপনি জামায়াতের সমালোচনা করলে আমি তাতে আনন্দ প্রকাশ করেছিলাম। আমার সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আপনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে আমার বিশ্বাস। তাই বারবার আপনি মেহেরবানী করে আমার বাড়িতে তাশরীফ এনেছিলেন। জামায়াত সম্পর্কে আপনার সুধারণা থাকার কারণেই আপনি জামায়াতের সাথে মিশে ইত্তেহাদুল উম্মাহতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। আপনি হাফেযজী হুযূরের সাথে আমার সাক্ষাতের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী ও খেলাফত আন্দোলনকে একমঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এসব কিছু থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আপনি জামায়াতকে অপছন্দ করেন না। এখন আপনি জামায়াতের মধ্যে যেসব দোষ-ত্রুটি দেখতে পাচ্ছেন তা আমাকে ডেকে একান্তে বলতে পারতেন। মাঠে-ময়দানে বললে তো ইসলামী ঐক্যের কোনো প্রচেষ্টাই চলতে পারে না।'

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের উপরিউক্ত তিনজন নেতা পীর সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যাপারে চেষ্টা করেছিলেন কি না তা জানতে পারিনি।

কায়েদ সাহেব ও মুফতী সাঈদ আহমদের ঐক্যপ্রচেষ্টা

১৯৯৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঝালকাঠিতে শর্ষিনার 'কায়েদ সাহেব' নামে খ্যাত মাওলানা আযীযুর রহমানের উদ্যোগে তাঁরই মাদরাসায় ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি বৈঠক হয়। মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী হিসেবে ফুরফুরা শরীফের গদ্দীনশীন পীর মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দিকী সাহেব আমন্ত্রিত মেহমান হিসেবে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, চরমোনাইর পীর মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করীম, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এবং ফুরফুরা দরবারের মুফতী মাওলানা সাঈদ আহমদও উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত বৈঠকে দেশের সর্বস্তরের ইসলামপন্থিদের ঐক্যপ্রচেষ্টা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটিতে মাওলানা আযীযুর রহমান, ড. মুস্তাফিজুর রহমান, চরমোনাইর পীর সাইয়েদ ফজলুল করীম এবং মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীও ছিলেন।

তাঁরা ঐক্যের মহান উদ্দেশ্যে ঐ দিন একটা চমৎকার নীতিকথা ব্যবহার করেছিলেন। আর তা হলো 'ইত্তিহাদ মাআল ইখতিলাফ' (মতপার্থক্যসহই ঐক্য)। তাঁরা খুবই বাস্তবভিত্তিক পরিভাষা গ্রহণ করেছিলেন। কেননা, সব রকমের মতপার্থক্য মিটিয়ে দেওয়া সহজসাধ্য নয়, অথচ দীনের মহান স্বার্থে ঐক্য প্রয়োজন।

ঝালকাঠিতে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকের পর ঢাকার বিভিন্ন স্থানে উক্ত কমিটির উদ্যোগে ইসলামী নেতৃবৃন্দের বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়। মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ ঐসব বৈঠকের আয়োজনে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালান। ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ঐ বৈঠকগুলো পরিচালনা করেন।

বৈঠকে বিভিন্ন সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন– বায়তুল মুকাররমের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক, ঝালকাঠির মাওলানা আযীযুর রহমান, শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হক, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, চরমোনাইর পীর মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করীম, মাওলানা আবদুল জাব্বার (চট্টগ্রাম), মাওলানা আবদুস্ সুব্হান, মাওলানা নূরুল হুদা ফয়েজী, অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক, মাওলানা একিউএম ছিফাতুল্লাহ, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

এক বৈঠকে আমার যোগদান

১৯৯৭ সালের ১১ জুলাইয়ের বৈঠকে আমাকে দাওয়াত দিলে আমি উৎসাহ নিয়ে তাতে হাজির হই। ঝালকাঠির কায়েদ সাহেব, ফুরফুরার পীর সাহেব, বায়তুল মুকাররমের খতীব, শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমানসহ অনেকেই ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকটি ঢাকার মীরপুরস্থ দারুস সালাম (ফুরফুরার দরবার শরীফ)-এ অনুষ্ঠিত হয়।

আমি ছাড়াও দাওয়াত পেয়ে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে মাওলানা আবদুস্ সুব্হান ও মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা সাঈদী সাহেব ঝালকাঠির বৈঠক থেকে শুরু করে পরবর্তী অনেক বৈঠকেই হাজির ছিলেন।

সেখানে সবাই লক্ষ করলেন যে, ইসলামী ঐক্যজোটের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব চরমোনাইর পীর সাহেব বৈঠকে হাজির হননি। অবশ্য তাঁর দলের সেক্রেটারি জেনারেল উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কিছু কথাবার্তার পর পরবর্তী বৈঠকের তারিখ ঠিক করা হয়। এর পরম্পরায় পরবর্তী সময়ে আরো কয়েকটি বৈঠক হয়।

পীর সাহেব অনুপস্থিত থাকার কারণও জানা গেল। তিনি যেহেতু প্রকাশ্য ময়দানে বারবার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে 'জামায়াত' কোনো ইসলামী দলই নয়, তাই এর একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত জামায়াতের উপস্থিতিতে তিনি ঐ বৈঠকে আসতে পারছেন না।

পীর সাহেবের একতরফা চ্যালেঞ্জ

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত পীর সাহেবের চ্যালেঞ্জটি নিম্নরূপ : তিনি জামায়াতকে বাহাস (বিতর্ক)-এর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর দলের একদল আলেম নিয়ে হাজির হবেন। জামায়াতও যেন তাদের একদল আলেম নিয়ে বাহাসে হাজির হয়। তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, তিনি যদি প্রমাণ করতে না পারেন 'জামায়াত' কোনো ইসলামী দল নয়, তাহলে তিনি সদলবলে জামায়াতে যোগদান করবেন। আর যদি প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে জামায়াতকে তাঁর দলে যোগদান করতে হবে।

জামায়াত এ জাতীয় বাহাসে কখনো শরীক হয় না। কারণ, এর দ্বারা কোনো মীমাংসা হয় না, ঝগড়া বৃদ্ধি পায় মাত্র। মুসলমানদের পতনযুগে এবং ইংরেজদের শাসনকালে মুসলমানদের বিভিন্ন ফেরকার মধ্যে অনেক ইস্যুতেই বাহাস হতো। এমনকি কোনো ইংরেজ শাসনকর্তাকে বিচারক পদে বসিয়েও এ ধরনের বাহাস অনুষ্ঠানের কথা জানা যায়।

পীর সাহেব এমন চ্যালেঞ্জ দেওয়ার প্রয়োজন কেন বোধ করলেন তা আমার নিকট একটি রহস্য হয়েই রইল। আমার সাথে তাঁর ব্যক্তিগত পর্যায়ে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারতেন। তাতে মীমাংসা না হলে তিনি চ্যালেঞ্জ দিলে সেটা ছিল আলাদা কথা।

তাঁর দল খাঁটি ইসলামী দল হয়ে থাকলে জনগণ তাঁর দলেই শরীক হতে থাকবে। 'জামায়াত' ইসলামী দল কি না সে বিষয়ে দেশবাসী তাঁর কাছ থেকে মতামত চেয়েছে কি না, আমার জানা নেই। তিনি জামায়াতকে ইসলামী দল মনে করেন না বলে কি জামায়াতে জনগণ শরীক হচ্ছে না? হাজার হাজার আলেম জামায়াতে ইসলামীতে রয়েছেন। দেশবরেণ্য ও ব্যাপক জনপ্রিয় বেশ কয়েকজন আলেমও জামায়াতে ইসলামীতে মর্যাদার আসনে রয়েছেন। এ চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কী হতে পারে তা কি পীর সাহেব ভেবে দেখেছেন?

সঙ্গত কারণেই জামায়াত এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। তিনি জামায়াতের বিরুদ্ধে যত খুশি বলতে থাকুন। জামায়াতের নীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে চুপ থাকাই জামায়াত শ্রেয় মনে করে। তাঁর ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে জামায়াত কোনো মন্তব্য করেনি এবং করবেও না। কোনো ইসলামী দল জামায়াতের বিরোধিতা করলে জামায়াত কোনো ইসলামী দলের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে না। অতএব, পীর সাহেবের এই বিরোধিতা ও চ্যালেঞ্জ একান্তই একতরফা।

দারুস সালামের বৈঠকের পর–

১৯৯৭ সালের জুলাই মাসের যে বৈঠকে আমি উপস্থিত হওয়ার কারণে চরমোনাইর পীর সাহেব সেখানে হাজির হলেন না, সে বৈঠকে ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান সভাপতিত্ব করেছেন। তিনি ও মুফতী মাওলানা সাঈদ আহমদ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, চরমোনাইর পীর ও জামায়াতের ব্যাপারটা মীমাংসা করার জন্য তাঁরা চেষ্টা করবেন।

জামায়াতের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে পীর সাহেব নিজেই সমস্যায় পড়লেন। ঝালকাঠিতে অনুষ্ঠিত এপ্রিল মাসের বৈঠকে তিনি জামায়াতনেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর সাথে এক কমিটি বৈঠকে বসতে পারলেন, অথচ ঢাকায় আমীরে জামায়াতের উপস্থিতির কারণে বৈঠকে হাজির হতেই পারলেন না।

কিছুদিন পর মুফতী মাওলানা সাঈদ আহমদ আমাকে জানালেন, পরবর্তী এক বৈঠকে চরমোনাইর পীর সাহেবের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, তিনি ও ড. মুস্তাফিজুর রহমান আমার সাথে পীর সাহেবের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবেন। আমি অত্যন্ত খুশির সাথে এ উদ্যোগের জন্য তাঁকে মুবারকবাদ জানাই। কারণ, এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন, যাতে পীর সাহেব জামায়াতকে চ্যালেঞ্জ করায় তাঁর নিজের জন্য যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা দূর হয়ে যায়। এ চ্যালেঞ্জের কারণে তিনি জামায়াতের উপস্থিতিতে সর্বদলীয় বৈঠকেও হাজির হতে পারছেন না।

২২৬.

ড. মুস্তাফিজুর রহমানের চিঠি

১৯৯৭ সালের ২৮ জুলাই তারিখে লেখা ড. মুস্তাফিজের চিঠি পেয়ে আমি অত্যন্ত উৎসাহবোধ করলাম এবং আশান্বিত হলাম যে, আমার দীনী ভাই চরমোনাইর পীর সাহেবের সাথে আমার পুরনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনর্বহাল হয়ে যাবে। ড. মুস্তাফিজের চিঠি নিম্নরূপ :

২৮/০৭/'৯৭ ইং

মুহতারাম অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব
আমীর,
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ।

জনাব,

আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, 'আল ইত্তিহাদু মা'আল ইখতিলাফ' একটি মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর একটি বৈঠকে আপনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আপনি মুবারকবাদ জানিয়েছেন এবং এর কামিয়াবীও কামনা করেছেন। বিগত ১১.৭.'৯৭ তারিখে দারুস সালাম ফুরফুরা পীর সাহেবের দরবারে এর একটি বৈঠকে জনাব মাওলানা আবদুস্ সুব্‌হান ও এডভোকেট নজরুল ইসলামের উপস্থিতিতে চরমোনাইর পীর সাহেবের ঐক্যের ব্যাপারে একটি কথার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, চরমোনাইর পীর সাহেব এবং আপনি আপনাদের সুবিধামতো সময় ও স্থানে একত্রে মিলিত হয়ে উভয়পক্ষের বক্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য ফায়সালায় উপনীত হবেন। কারণ চরমোনাইর পীর সাহেব জনসমক্ষে বলে ফেলেছেন যে, 'জামায়াতে ইসলামী

খাঁটি ইসলামী দল নয়'। অতএব ঐক্যের খাতিরে এ ব্যাপারে মনখোলা আলোচনার প্রয়োজন। এ কথা থেকে তাঁকে ফিরে আসতে হলে যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দিতে হবে। তাই আপনারা উভয়ে যদি একস্থানে বসে আলোচনা করেন, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় সুরাহা হয়ে যাবে এবং তা হবে মিল্লাতের জন্য অত্যন্ত কল্যাণবহ। এ ব্যাপারে আপনাদের উভয়ের সম্মতিসাপেক্ষে আমি ও মুফতী সাঈদ সাহেব আপনাদের আলোচনায় উপস্থিত থাকতে প্রস্তুত আছি। পরবর্তী কার্যক্রম আপনারা উভয়ে স্থির করবেন।

আমি ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় যথাসময়ে আপনাকে লিখতে ব্যর্থ হয়েছি। এ জন্য আমি নিতান্ত দুঃখিত। আল্লাহ্ তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করার তৌফিক আমাদের সবাইকে দান করুন।

ড. মুস্তাফিজকে লেখা জবাব

২৪/০৮/৯৭

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার অন্যতম উদ্যোক্তা

প্রিয় ভাই,

ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহূ।

আশা করি আল্লাহর ফযলে ভালো আছেন। আপনার ২৮.৭:৯৭ তারিখের পত্রখানা যথাসময়ে আমার হস্তগত হয়েছে। পত্রের জন্য অশেষ শুকরিয়া।

ইসলামের বিরুদ্ধে সরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় যে মারাত্মক ষড়যন্ত্র চলছে এর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টায় আপনার আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা লক্ষ করে আপনার প্রস্তাব আমি সাদরে কবুল করা কর্তব্য মনে করছি।

জামায়াতে ইসলামী দৃঢ়ভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা পোষণ করে। এ বিষয়ে আমার লিখিত পুস্তকে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। তাছাড়া চরমোনাইর মুহতারাম পীর সাহেবসহ দেশের বরেণ্য ওলামা ও মাশায়েখের সাথে আমাদের একক ও যৌথভাবে একাধিক সাক্ষাৎ ও বৈঠক হয়েছে। ঐসব বৈঠক ও সাক্ষাতের মাধ্যমে আকাঈদ সম্পর্কে আমাদের অবস্থানের বিষয়ে যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝি অপনোদনের জন্য চেষ্টা করেছি।

সর্বশেষে বাংলাদেশের দুটি বৃহৎ ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় মুহতামিমদ্বয়ের সাথে সাক্ষাৎ ও পত্র-যোগাযোগ হয়েছে। এ যোগাযোগের মাধ্যমে (১) ইসমতে আম্বিয়া (২) আদালতে সাহাবা এবং আরো কতক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের দলীয় অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এর অনুলিপি আপনার খিদমতে এ সঙ্গে প্রদান করা হলো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর দ্বারা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবেন।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশে ইসলামী শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হলে ইসলামী হুকুমত কায়েমের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। ইসলামী দলসমূহের নেতৃবৃন্দ, ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বশীলগণ এবং পীর-মাশায়েখ সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালালে ইকামাতে দীনের পথে ইনশাআল্লাহ কোনো বাধাই টিকবে না।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আপনার পক্ষ থেকে হযরত পীর সাহেব ও আমার মাঝে বৈঠকের প্রস্তাবের জন্য আপনাকে মুবারকবাদ জানাই। জনাব পীর সাহেব আমার গরীবখানায় বহুবার মেহেরবানী করে তাশরীফ এনেছেন– সে কথা আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তাঁকে আমি আপনার মাধ্যমে আন্তরিক মুহাব্বাতের সাথে আমার গরীবালয়ে তাশরীফ আনার জন্য দাওয়াত দিচ্ছি। তাঁর সাথে ইসলামী ঐক্য সম্পর্কে মতবিনিময়ের এ সুযোগ পেলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব।

আপনার চিঠির জবাব দিতে বিলম্ব হওয়ায় আমি দুঃখিত। আশা করি আপনি মনে কষ্ট নেবেন না। ইতি।

ড. মুস্তাফিজুর রহমানের হতাশাব্যঞ্জক ফোন

কয়েক দিন পর ড. মুস্তাফিজুর রহমান ফোনে আমাকে জানালেন, আপনাকে যেমন চিঠি দিয়ে পীর সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার দাওয়াত দিয়েছি, তেমনি পীর সাহেবকেও আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য চিঠি দিয়েছি। চিঠি পেয়ে তিনি বেশ কয়েকজন আলেমসহ আমার বাসায় এলেন। তিনি বললেন, আমাকে একা অধ্যাপক সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করার দাওয়াত দিয়েছেন। আমার সাথের আলেমগণকে ছাড়া একা সাক্ষাৎ করতে পারব না। আমি বললাম, অধ্যাপক সাহেব তো একাই আসতে রাজি আছেন, আপনি কেন একা আসতে পারবেন না? আমি ও মুফতী সাঈদ সাহেব আপনাদের সহায়তা করার জন্য হাজির থাকব। শেষ পর্যন্ত পীর সাহেব একা সাক্ষাৎ করতে সম্মত হলেন না।

আমি বললাম, পীর সাহেব বাহাস করতে চান বলেই একা আসতে সম্মত নন বলে মনে হয়। আপনারা একটা মীমাংসা করার উদ্যোগ নিলেন; কিন্তু একপক্ষের সহযোগিতার অভাবে তা সফল হলো না।

মাওলানা মুজীবুর রহমান যুক্তিবাদীর প্রচেষ্টা

ইসলামী কাফেলার আমীর প্রখ্যাত ওয়ায়েয মাওলানা মুজীবুর রহমান যুক্তিবাদী পীর সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে আমার ধারণা, আপনি সফল হবেন না; হলে খুশি হব।

তিনি পীর সাহেবের সাথে এ বিষয়ে কথা বলার পর আমাকে জানালেন, পীর সাহেব বিদ্রূপ করে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি আবার কবে থেকে জামায়াতে ইসলামীর দালালি শুরু করেছ?

পীর সাহেব এভাবে কথা বলায় যুক্তিবাদী সাহেব মনে খুব কষ্ট পেয়েছেন বলে আমাকে জানালেন। হাফেয মাওলানা মুজীবুর রহমান যুক্তিবাদী কোনো ফালতু লোক নন। অথচ তাঁর সাথে পীর সাহেব এভাবে কথা বলেছেন জেনে আমিও দুঃখবোধ করেছি।

দুঃখের বিষয় যে, ড. মুস্তাফিজুর রহমান ও মাওলানা মুজীবুর রহমান যুক্তিবাদী উদ্যোগ নিয়েও পীর সাহেবকে আমার সাথে বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য রাজি করাতে সক্ষম হননি। মাওলানা মুজীবুর রহমান যুক্তিবাদী সাহেব অত্যন্ত আবেগ নিয়ে ইসলামী ঐক্যের আশায় পীর সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাতের চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। ইসলামী ঐক্যের বৃহত্তর স্বার্থে আমি তাঁর সাথে বৈঠকের জন্য এখনো আগ্রহী।

আরো কয়েকজনকে ঐক্যের উদ্দেশ্যে চিঠি

১৯৯৮ সালের ২৬ জানুয়ারি দুটি ইসলামী দলের সভাপতি ও মহাসচিবকে ঐক্যের উদ্দেশ্যে চিঠি দিলাম। তাঁরা হলেন–

১. শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুল মান্নান, মুহতামিম গওহরডাঙ্গা মাদরাসা।
সভাপতি, বাংলাদেশ খাদেমুল ইসলাম জামায়াত।

২. মাওলানা আব্দুর রায্যাক
মহাসচিব, বাংলাদেশ খাদেমুল ইসলাম জামায়াত।

৩. মাওলানা কারী আহমদ উল্লাহ্ আশরাফ
আমীরে শরীয়ত, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন।

৪. মাওলানা জাফর উল্লাহ খান
মহাসচিব, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন।

প্রথম ব্যক্তি মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)-এর জামাতা। খাদেমুল ইসলাম জামায়াত মাওলানা ফরিদপুরীই কায়েম করেছিলেন।

তৃতীয় ব্যক্তি হাফেযজী হুযূরের বড় ছেলে। উপরিউক্ত চারজনকে লেখা চিঠির বক্তব্য নিম্নরূপ :

মুহতারামী ও মুকাররামী,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আশা করি আল্লাহ্ তাআলার মেহেরবানীতে সুস্থ আছেন এবং তাঁর দেওয়া তাওফীক মোতাবেক দীনের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তাআলা আপনার যাবতীয় খিদমত কবুল করুন এবং আরো বেশি খিদমতের তাওফীক দান করুন।

আজ আপনার খিদমতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে কিছু কথা পেশ করার উদ্দেশ্যে লিখছি। আপনি নিশ্চয়ই বেদনার সাথে লক্ষ করছেন যে, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ইসলামবিরোধী সকল শক্তি পরিকল্পিতভাবে দেশে এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্ট করে চলেছে, যার ফলে ইকামাতে দীনের ময়দান দ্রুত সংকীর্ণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

অথচ দেশে বিরাট ইসলামী শক্তি রয়েছে, যা ঐক্যবদ্ধ হলে ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়া সম্ভব বলে আমাদের ধারণা। ইসলামী ঐক্যের জন্য কী করা যায়, সে বিষয়ে আপনার চিন্তা-ভাবনা জানার জন্য আমি অত্যন্ত আগ্রহী।

সাত বছর বাধ্য হয়ে বিদেশে নির্বাসন জীবন কাটানোর পর ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে দেশে ফিরে আসার পর ইসলামী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'ইসলামী ঐক্য : ইসলামী আন্দোলন' নামে একটি পুস্তিকার মাধ্যমে ঐক্যের একটি ফর্মুলা পেশ করি। তখন থেকে এ পর্যন্ত ইসলামী ঐক্যের জন্য যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তা 'ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা' নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তিকা দুটো এ সঙ্গে আপনার খিদমতে পাঠালাম।

১৯৯৫ সালের শেষ ভাগে ও '৯৬ সালের প্রথমাংশে ঐক্যের উদ্দেশ্যে হাটহাজারী ও পটিয়ার মুহতারাম মুহতামিমদ্বয়ের সাথে যেসব পত্রের আদান-প্রদান হয়েছে তার নকলও এ সঙ্গে দিলাম।

গত ৩১.১০.'৯৭ তারিখে খুলনায় দক্ষিণবঙ্গের ওলামা সম্মেলনে ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে আমার পক্ষ থেকে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল এর নকলও এ সঙ্গে পাঠালাম। ইসলামী শক্তিসমূহের একটা ঐক্যমঞ্চ এ সময়ের তীব্র দাবি বলে আমি মনে করি। এ বিষয়ে আপনার মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের অপেক্ষায় রইলাম।

এসব চিঠি লেখার পটভূমি

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাওলানা মুফতী আবদুল কুদ্দুস ইসলামী ঐক্যের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে আমাকে জানালেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি চাকরি ও ব্যবসায়ে সময় না দিয়ে সর্বক্ষণ ওলামায়ে কেরামের সাথে যোগাযোগ করছেন বলেও জানালেন। তাঁর বাড়ি বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাটে। গওহরডাঙ্গা মাদরাসা থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি প্রথমে খুলনা শহর ও পরে ফরিদপুর শহরে মাদরাসায় হাদীসের উস্তাদ ছিলেন। খুলনায় তাঁর কিছু ব্যবসাও ছিল।

তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, গওহরডাঙ্গার মুহতামিম শায়খুল হাদীস মাওলানা মুফতী আবদুল মান্নান ও খেলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে সকল ইসলামী দলের ঐক্যের প্রচেষ্টা চালান। তিনি জামায়াতে ইসলামীসহ সকলের ঐক্য প্রয়োজন বলে সবার সাথে আলোচনা করতে থাকেন।

১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি যোগাযোগ অব্যাহত রাখার পর তাঁরই পরামর্শে আমি উপরিউক্ত চারজনকে চিঠি লিখি। চারজনের মধ্যে একজনের সাথে এক দূতাবাসের রিসিপশন অনুষ্ঠানে দেখা হলে তিনি নিজের পক্ষ থেকে বললেন, আপনার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। অবশ্য কেউ চিঠির জবাব দেননি। তবে মুফতী আবদুল কুদ্দুস সাহেব চিঠির প্রতিক্রিয়া ভালো বলেই জানালেন।

কাওমী মাদরাসার ওলামায়ে কেরামের মধ্যে গওহরডাঙ্গা মাদরাসার মুহতামিম শায়খুল হাদীস মুফতী মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেবের নেতৃস্থানীয় মর্যাদা থাকায় মুফতী আবদুল কুদ্দুস তাঁর সম্পর্কে বেশি আশান্বিত ছিলেন এ জন্য যে, তিনি উদ্যোগ নিলে হয়তো ইসলামী ঐক্য সম্ভব হবে। তিনি মুফতী আবদুল কুদ্দুস সাহেবের সরাসরি উস্তাদ।

তিনি বেশ কিছু দিন অসুস্থ থাকার পর যখন ইনতিকাল করলেন তখন মুফতী আবদুল কুদ্দুস হতাশ হয়ে গেলেন।

ঝালকাঠির দ্বিতীয় সম্মেলন

ঝালকাঠি নেছারাবাদ সালেহিয়া আলিয়া মাদরাসা ময়দানে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসের ১৭ ও ১৮ তারিখে সর্বদলীয় দ্বিতীয় ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় সম্মেলনের যে রিপোর্ট সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে তা এখানে উদ্ধৃত করছি :

সর্বদলীয় ইসলামী সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত ওলামা, মাশায়েখ, ইমাম, ইসলামপন্থি ও দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দসহ লাখো জনসমষ্টির মাঝে বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীনের আমীর জনাব আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (কায়েদ সাহেব হুযূর) তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 'দীন রক্ষার স্বার্থে আজ যেমন মুসলমানদের ঐক্যের প্রয়োজন, তেমনি দেশ ও জাতির স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক ভাইয়ের ঐক্যবদ্ধ হওয়াও প্রয়োজন।' আট পৃষ্ঠাব্যাপী তাঁর লিখিত এ ভাষণ পাঠ করে শোনান বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাওলানা রফিকুল্লাহ নেছারাবাদী।

তিনি তাঁর ভাষণে 'ইত্তেহাদ মা'আল ইখতিলাফ' (মতানৈক্যসহ ঐক্য)-এর নীতির আলোকে সকল শ্রেণীর মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধভাবে দীনের খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীনের নির্বাহী আমীর জনাব ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, হুযূরের ঐক্যের ডাকে সাড়া দিয়ে পীর-মাশায়েখ, আলেম-ওলামা এবং আওয়ামী লীগ-বিএনপিসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা উপস্থিত হয়েছেন। আমার জীবনে আমি কোনো মাহফিলে এমনটি দেখিনি।

ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব মহান আল্লাহর দরবারে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য দোআ করেন।

চরমোনাইর পীর সাহেব বলেন, এই মুহূর্তে ইসলামী হুকুমতের জন্য জামায়াত, ছারছীনা, কাওমীসহ সকল পীর-মাশায়েখ ও আলেম-ওলামার একত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলি পাঠ করেন নেছারাবাদ ছালেহিয়া আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা খলিলুর রহমান নেছারাবাদী।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ জনাব মাওলানা মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক জনাব আখতার ফারুক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আলী হায়দার মুর্শিদি, হযরত মাওলানা আরিফ বিল্লাহ (ছারছীনা), ঢাকা তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসার তদানীন্তন উপাধ্যক্ষ জনাব মাওলানা একিউএম ছিফাতুল্লাহ (মরহুম), জনাব মাওলানা মুফতী সাইদ আহমদ, নওয়াপাড়া পীর সাহেবের প্রতিনিধি মুহাদ্দিস জনাব মাওলানা আবু তালহা, জনাব মাওলানা খন্দকার মাহবুবুল হক প্রমুখ।

এ ছাড়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব আলহাজ্জ আমির হোসেন আমু এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সাবেক সংসদ সদস্য জনাব অধ্যক্ষ মোঃ আবদুর রশিদও বক্তব্য প্রদান করেন।

এ সম্মেলনে সমাপনী ভাষণ প্রদান ও দোআ-মুনাজাত পরিচালনা করেন সম্মেলনের সভাপতি জনাব আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী কায়েদ সাহেব হুযূর।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তাবলি

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কারণে দীন ইসলাম আজ বিপন্ন। এ মুহূর্তে প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হলো সার্থকভাবে এ চক্রান্তের মোকাবিলা করা।

এ লক্ষ্যে সম্মেলন প্রস্তাব করছে যে–

যাঁরা বিভিন্নভাবে ইসলামের খিদমত করে যাচ্ছেন যেমন– দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, খানকাহ ও তা'লীমের মাধ্যমে, রাজনীতি ও সেবাকর্মের মাধ্যমে, তাঁরা এমন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করবেন না কিংবা এমন কোনো বক্তব্য-অভিমত প্রকাশ করবেন না, যাতে নিজেদের মাঝে অনৈক্য, বিভেদ ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। এ সম্মেলন আরো প্রস্তাব করছে যে, তাঁরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে 'আল ইত্তিহাদ মা'আল ইখতিলাফ' (মতানৈক্যসহ ঐক্য)-এর ভিত্তিতে নিজেদের মাঝে ইস্পাত-দৃঢ় ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে ইসলামবিরোধী চক্রের সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। দেশি ও বিদেশি স্বার্থান্বেষীদের অভিলাষ চরিতার্থ করার প্রয়াসে দেশ ও জাতি আজ এক ক্রান্তিলগ্নে উপনীত; দেশের অর্থনীতি ও শিক্ষানীতি বিপর্যস্ত; সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধ চরম আগ্রাসনের শিকার। এমতাবস্থায় প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের প্রতি এ সম্মেলন উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে যে, দেশ ও জাতির স্বার্থে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে বাঁচান। ঈমান ও আকীদার ভিত্তিতে চিরায়ত লালিত সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখুন।

কতিপয় ইস্যুর উপর দস্তখত সংগ্রহ অভিযান

পরবর্তী সময়ে ১৯৯৮ সালের জুন মাসের প্রথমদিকে মুহতারাম খতীব মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে প্রণীত কতিপয় ইস্যুর উপর একটি খসড়ায় ওলামা, মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী বুদ্ধিজীবীগণের দস্তখত সংগ্রহের জন্য মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ ও ড. মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা যৌথভাবে দস্তখত সংগ্রহ অভিযান চালান। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা দেশের বিভিন্ন স্থান সফর করেন। তাঁরা উল্লেখযোগ্য ইসলামী নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রায় সকলেরই স্বাক্ষর সংগ্রহে সক্ষম হন। তাঁরা মোট ৬৩ জনের দস্তখত সংগ্রহ করে ১৯৯৮ সালের ১৭ নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রেসবিজ্ঞপ্তি পাঠান, যা ১৮ তারিখে প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রেরিত প্রেসবিজ্ঞপ্তিটি নিম্নরূপ :

দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী নেতৃবৃন্দের আবেদন

পরকালীন মুক্তি ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহর দেওয়া ইসলামী শরীআত অনুসরণ করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। কাওম ও মিল্লাতের এই

ক্রান্তিকালে নিজেদের নাজাতের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের নিমিত্তে আসুন– আমরা যারা আল্লাহকে রব হিসেবে মানি, ইসলামকে একমাত্র সত্য দীন হিসেবে মানি, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিশ্বনবী ও শেষ নবী হিসেবে মানি এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবায়ে কেরামের আদর্শকে সঠিক আদর্শ হিসেবে মানি, তারা সকলে মিলে-মিশে কাজ করি এবং পারস্পরিক মতপার্থক্যগত অনৈক্যের উর্ধ্বে উঠে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহৎ লক্ষ্যপথে সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হই।

১. সমাজে বিরাজমান অপসংস্কৃতি ও অবক্ষয় থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি লাভের লক্ষ্যে কুফর, শিরক ও বিদআত এবং চরিত্র-বিধ্বংসী অশ্লীল ছায়াছবি, গান-বাজনা, উলঙ্গপনা, মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ, সন্ত্রাস, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি সমাজবিরোধী ক্রিয়াকলাপ রোধ করার কার্যকর ব্যবস্থা যাতে গ্রহণ করা যায় তা নিশ্চিত করা প্রতিটি দীনদার মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২. নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ করা প্রতিটি মুসলমানের দীনী দায়িত্ব। সমাজে বর্তমানে নারী ও শিশু নির্যাতন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ইসলামী শরীআত পালন না করার কারণে এ ধরনের অমানবিক আচরণের প্রসার ঘটছে। ইসলামী পারিবারিক আইন ও পর্দাপ্রথা যথাযথভাবে যাতে চালু করা হয়, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

৩. শিক্ষা একটি জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইসলাম শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। একটি দেশের জনগণের ঈমান-আকীদার ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় জনগণের ঈমান-আকীদার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি। ব্রিটিশ-প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার ফলে বর্তমান সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় এক নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় পর্যাপ্ত নৈতিক শিক্ষার অনুপস্থিতি শিক্ষা ক্ষেত্রে ও সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টির অন্যতম কারণ। শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার অর্থবহ প্রচলন অত্যাবশ্যক।

   প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো গতিশীল, আরো কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

৪. তাহযীব ও তমদ্দুন একটি জাতির প্রাণশক্তি। যখনই কোনো জাতি স্বীয় তাহযীব-তমদ্দুন থেকে দূরে সরে যায় কিংবা এর প্রতি অনীহা প্রকাশ করে তখন সে জাতি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। ইদানীং লক্ষ করা যাচ্ছে যে, ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুনপরিপন্থী মূর্তি ও প্রতিমা নির্মাণ করা হচ্ছে, অগ্নিকে সম্মান করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মসজিদ ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, মাদরাসা জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আযানের প্রতি কটূক্তি করা হচ্ছে; যার ফলে কোনো কোনো দেশে মাইকে আযান দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, ইসলামবিরোধী এনজিওসমূহের ইসলামবিরোধী অপতৎপরতা ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন করছে। টেলিভিশন ও রেডিওতে ইসলামবিরোধী নাটক ও উপন্যাস প্রচারিত হচ্ছে, যা মুসলিম মিল্লাতের জন্য ধ্বংসের পথ অবধারিত করে দিচ্ছে। প্রতিটি দীনদরদি মুসলমানের পক্ষে এসবের প্রতিকারের জন্য সাধ্যানুযায়ী কাজ করা অপরিহার্য কর্তব্য।

৫. কাদিয়ানীরা রাসূলে কারীম (স)-কে শেষ নবী বলে মানে না- অতএব তারা মুসলিম হতে পারে না। মুসলিম না হওয়ার কারণে তারা মুসলিম সমাজভুক্তও নয়। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা না থাকার কারণে মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করার ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন !

আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীগণ

১. মাওলানা উবায়দুল হক- খতীব, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।
২. শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক
৩. মাওলানা আযীযুর রহমান কায়েদ সাহেব হুযূর
৪. মাওলানা আহমাদ শফি- মুহতামিম, দারুল উলুম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
৫. মাওলানা আব্দুল মান্নান- মুহতামীম, গওহরডাঙ্গা মাদরাসা, ফরিদপুর।
৬. মাওলানা শায়খ মুহাম্মদ হারুন- মুহতামীম, পটিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
৭. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান- সম্পাদক, মাসিক মদীনা, ঢাকা।
৮. মাওলানা আমিনুল ইসলাম- খতীব, লালবাগ জামে মসজিদ, ঢাকা।
৯. ড. মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান- অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১০. মাওলানা আহমাদুল্লাহ আশরাফ ইবনে হাফেযজী হুযূর, ঢাকা।
১১. মাওলানা ফজলুল হক আমিনী- মুহতামিম, লালবাগ জামেয়া কুরআনিয়া, ঢাকা।
১২. মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার, ফুরফুরার পীর সাহেব।
১৩. মাওলানা কুতুবুদ্দীন- পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ।
১৪. মুফতী সাঈদ আহমদ মুজাদ্দেদী, ফুরফুরা দরবার, ঢাকা।
১৫. মাওলানা সুলতান যওক, দারুল মাআরিফ, চট্টগ্রাম।
১৬. মাওলানা এ. কে. এম. ইউসুফ, প্রাক্তন এমএনএ।
১৭. মাওলানা আবদুস্ সুব্হান- প্রাক্তন এমপি।
১৮. মাওলানা সালাহ্ উদ্দীন- অধ্যক্ষ, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।
১৯. মাওলানা মোহাম্মদ সালেহ- অধ্যক্ষ, খুলনা আলিয়া মাদরাসা, খুলনা।
২০. মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি।
২১. মাওলানা হাফেয খলিলুর রহমান- খতীব, কেন্দ্রীয় মসজিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২২. মাওলানা আনোয়ার শাহ্ ইবনে মাওলানা আতাহার আলী- মুহতামিম, জামেয়া এমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ।
২৩. মাওলানা নূরুল্লাহ- অধ্যক্ষ, হায়বতনগর আলিয়া মাদরাসা, কিশোরগঞ্জ।
২৪. মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান- নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব।
২৫. মাওলানা খলীলুর রহমান- অধ্যক্ষ, নেছারাবাদ আলিয়া মাদরাসা, ঝালকাঠি।
২৬. মাওলানা একিউএম ছিফাতুল্লাহ- উপাধ্যক্ষ, তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা।
২৭. মাওলানা এসএম আবু নোমান- অধ্যক্ষ, দারুল উলুম, চট্টগ্রাম।

২৮. ড. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ– অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
২৯. মাওলানা আবদুল লতিফ– সেক্রেটারি জেনারেল, জমিয়াতুল মুদাররেসীন বাংলাদেশ।
৩০. মাওলানা সাইয়েদ আনোয়ার হোসাইন তাহের আল জাবেরী আল-মাদানী– খতীব, শাহী জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম।
৩১. মাওলানা রফিক আহমদ– খতীব, হাজীগঞ্জ বড় মসজিদ, চাঁদপুর।
৩২. মাওলানা আব্দুর রব কাফী– অধ্যক্ষ, হাজীগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা।
৩৩. মাওলানা কারী উবায়দুল্লাহ– খতীব, চকবাজার জামে মসজিদ, ঢাকা।
৩৪. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ– সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন।
৩৫. মাওলানা কামালুদ্দীন জাফরী– অধ্যক্ষ, জামেয়া কাসেমিয়া, নরসিংদী।
৩৬. মাওলানা অধ্যাপক আখতার ফারুক।
৩৭. মাওলানা মুহাম্মদ ইছহাক– মুহাদ্দিস, পটিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
৩৮. মাওলানা আতাউর রহমান, কিশোরগঞ্জ।
৩৯. মাওলানা আ ফ ম আবু বকর সিদ্দিক– প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪০. মাওলানা ড. আ. র. ম. আলী হায়দার– চেয়ারম্যান, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪১. মাওলানা মুখলিছুর রহমান– পেশ ইমাম, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা।
৪২. মাওলানা মাহবুবুল হক– প্রাক্তন হেড মাওলানা, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।
৪৩. মাওলানা মোফাজ্জল হোসাইন খান– ডাইরেক্টর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪৪. মাওলানা ইয়াহইয়ার রহমান– ডীন, ধর্মতত্ত্ব অনুষদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৪৫. মাওলানা মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম– মাখজানুল উলূম, খিলগাঁও, ঢাকা।
৪৬. মাওলানা নেছারুল হক– শায়খুল হাদীস, দারুল উলূম, চট্টগ্রাম।
৪৭. মাওলানা আহসান সাইয়েদ– অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
৪৮. মাওলানা আহমাদুল হক– খতীব, বায়তুশ শরফ।
৪৯. মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীকুর রহমান, আল-জামেয়াতুস সিদ্দীকিয়া, দারুস সালাম।
৫০. মাওলানা আমিনুল হক– মুহাদ্দিস, দারুস সালাম।
৫১. মাওলানা আবদুল কাইউম– মুহতামিম।
৫২. মাওলানা শফীকুর রহমান– মুহাদ্দিস, জামেয়া এমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ।
৫৩. মাওলানা নূরুস সালাম– পীর সাহেব, সুফিয়া নূরিয়া, চট্টগ্রাম।
৫৪. মাওলানা শামসুল হক– পীর সাহেব, ছোটকুমিরা, চট্টগ্রাম।
৫৫. মাওলানা অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার।
৫৬. মাওলানা আকরাম হোসেন– মুহাদ্দিস, নওগাঁ আলিয়া মাদরাসা, নওগাঁ।
৫৭. মাওলানা মোঃ সোলায়মান– অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৫৮. মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী, চট্টগ্রাম।
৫৯. এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম, সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা।
৬০. মাওলানা যাইনুল আবেদীন– অধ্যক্ষ, তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

৬১. মাওলানা সিরাজুল ইসলাম– অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই মিসবাহুল উলূম, ঢাকা।
৬২. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম– বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।
৬৩. মাওলানা আব্দুল জব্বার– প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ ইমাম সমিতি।

২২৭.

ইসলামী ঐক্যের উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাররমের খতীব সাহেবের প্রচেষ্টা

ইসলামী ঐক্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে যাঁরা সকল ইসলামী দল ও মহলকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নেতৃস্থানীয় ওলামা, মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দকে একমঞ্চে সমবেত করার সাধ্যমতো চেষ্টা করে এসেছেন।

১৯৯৮ সালের জুন মাসে মুহতারাম খতীব সাহেবের সভাপতিত্বে ঐক্যপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, সকল দীনী মহলকে ইসলামের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য এমন ইস্যু বাছাই করতে হবে, যে বিষয়ে মতভেদের কোনো অবকাশ নেই। এ নীতির ভিত্তিতে উক্ত বৈঠকে একটা খসড়া তৈরি করা হয় এবং বৈঠকে উপস্থিত সবাই তাতে দস্তখত করেন।

উক্ত বৈঠকে খতীব সাহেব দুটি বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন :

১. ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য সত্ত্বেও সর্বসম্মত বিষয়ে একমঞ্চে সমবেত হওয়া কর্তব্য। ১৯৫১ সালে করাচিতে ৩১ জন নেতৃস্থানীয় আলেম একমত হয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করেছিলেন। ঐ ৩১ জনের মধ্য থেকে কোনো মহলই বাদ পড়েনি। শিয়া, আহলে হাদীস, ব্রেলভী, দেওবন্দী এবং জামায়াতে ইসলামীসহ সকল ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দের ঐক্য দ্বারা এই ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, দীন ইসলামের প্রয়োজনে এভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ঐ সময় যাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন আজ তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আরো বেশি প্রয়োজন। তাই ঐক্য না হওয়ার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই।

২. ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে ক্ষমতার মূল নেতৃত্ব কোনো মহিলার হাতে থাকা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু স্বৈরশাসকদের অপসারণের উদ্দেশ্যে বিকল্প পুরুষ নেতৃত্ব পাওয়া না গেলে এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে কোনো মহিলার নেতৃত্ব অপরিহার্য হয়ে পড়লে সাময়িকভাবে তা মেনে নেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে ১৯৬৫ সালে সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য সম্মিলিত বিরোধী দল (COP) যখন মুহতারামা ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী মনোনয়ন দিতে চাইল, তখন মুফতীয়ে আযম মাওলানা মুহাম্মদ শফী, মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী (র), মাওলানা আতাহার আলী (র), মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)-সহ অনেক আলেম তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন।

ইসলামী পারিবারিক আইনে হস্তক্ষেপকারী হিসেবে আইয়ুব খান আলেম সমাজের নিকট ইসলামবিরোধী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন। ইংরেজ শাসকরা সকল ইসলামী আইনের বদলে রোমান ল' চালু করলেও তারা ইসলামের পারিবারিক আইনে হাত দেয়নি। আইয়ুব খানই প্রথম এ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছিলেন।

সুতরাং যালিম ও ইসলামবিরোধী সরকার থেকে দেশ ও জনগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে কোনো পুরুষ-নেতৃত্বের পক্ষে সর্বদলীয় ঐক্যের অভাবে নারী-নেতৃত্ব সমর্থনের পক্ষে ঐকমত্যের উদাহরণ রয়েছে।

(জামায়াতে ইসলামী COP-এর অন্তর্ভুক্ত থাকায় প্রেসিডেন্ট পদে মহিলা প্রার্থী দেওয়ার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য মুফতী শফী সাহেবের করাচিস্থ বাসভবনে পাঁচ সদস্যের যে ডেলিগেশন পাঠিয়েছিল, আমি তাদের একজন ছিলাম। মুফতী সাহেব সম্মতি দেওয়ার পর জামায়াতও তাদের বৈঠকে এ বিষয়ে একমত হয়।—লেখক)

গত সেপ্টেম্বরে (১৯৯৮) দেশের কলঙ্ক তসলিমা নামের এক নষ্টা ও ভ্রষ্টা মুরতাদ পলাতক মহিলার গোপনে দেশে ফিরে আসার পর যত দল ও সংগঠন তার শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল সেগুলোর নেতৃবৃন্দের এক বৈঠকে খতীব সাহেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইসলামবিরোধী সকল কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তিনি সকলকে সম্মিলিতভাবে গণসমাবেশ ও আন্দোলন করার জন্য সম্মত করান এবং এ সিদ্ধান্তের পক্ষে তাঁদের দস্তখতও সংগ্রহ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে বৈঠকে সম্মতি দেওয়া সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ কোনো মহল তা থেকে পিছিয়ে যাওয়ার কারণে ঐ ঐক্যপ্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি।

ঐক্যপ্রচেষ্টার নতুন উদ্যোগ

১৯৮৪ সালের এপ্রিলে হাফেযজী হুযূরের সাথে আমার সাক্ষাতেও ঐক্যের কোনো ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা দেখা গেল না। ইত্তেহাদুল উম্মাহ নামের ঐক্যমঞ্চটি ভেঙে যাওয়ার পর ১৯৮৯ সালের এপ্রিলে সর্বদলীয় শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে ঐক্যের প্রচেষ্টাও সফল হলো না। ১৯৯৫ সালে হাটহাজারী ও পটিয়া মাদরাসার মুহতামিমদ্বয়ের নিকট চিঠির আদান-প্রদানের পরও তাতে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। এরপর ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার উদ্যোগ গ্রহণ করার হিম্মত আমার ছিল না।

নৈরাশ্যের ঐ অন্ধকারে ১৯৯৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঝালকাঠি থেকে ঐক্যের এক প্রচেষ্টা শুরু হওয়ার খবর পেলাম। এরই ধারাবাহিকতায় ঐ বছর ১১ জুলাই মীরপুরস্থ ফুরফুরা দরবার শরীফ দারুস সালামের বৈঠকে সকল মহলের (চরমোনাইর পীর সাহেব ছাড়া) নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি দেখে আমার মনে ঐক্যের ব্যাপারে পুনরায় আশার সঞ্চার হলো।

১৯৯৮ সালের ১৮ নভেম্বর সারা দেশের ৬৩ জন নেতৃস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখের যুক্তবিবৃতি জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত হওয়ার পর ঐক্যের সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল মনে হলো।

ঐ বছর ১৫ ডিসেম্বর মীরপুরস্থ ফুরফুরা দরবার মারকাযে ইশাআতে ইসলা দারুস সালামে, উক্ত স্বাক্ষরকারীগণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ মাওলানা আযীযুর রহমান কায়েদ সাহেবের সভাপতিত্বে 'জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের আহ্বায়ক কমিটি

১৯৯৮ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সম্মেলনেই জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবকে প্রধান আহ্বায়ক করে নিম্নলিখিত ওলামা-মাশায়েখকে নিয়ে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয় :

১. মাওলানা উবায়দুল হক (খতীব, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ)।
২. শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক।
৩. মাওলানা আহমাদ শফী (মুহতামিম, হাটহাজারী মাদরাসা, চট্টগ্রাম)।
৪. মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (কায়েদ সাহেব হুযূর)।
৫. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
৬. মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ।
৭. মাওলানা আবদুল মান্নান (শায়খুল হাদীস, গওহরডাঙ্গা)।
৮. মাওলানা আবদুস্ সুব্হান।
৯. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (সম্পাদক, মাসিক মদীনা)।
১০. মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী (মুহতামিম, জামেয়ায়ে ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম)।
১১. মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী, (প্রিন্সিপ্যাল, জামেয়া কুরআনিয়া, লালবাগ)।
১২. মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, এমপি।
১৩. মাওলানা শাহ মুহিব্বুল্লাহ্ (ছারছীনা)।
১৪. মাওলানা সাইয়েদ আনোয়ার হোসাইন তাহের আল জাবেরী আল মাদানী (খতীব, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম)।
১৫. মাওলানা কুতুবুদ্দিন (পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ)।
১৬. মাওলানা সাইয়েদ নজর ইমাম মুহাম্মদ (পীর সাহেব, নারিন্দা)।
১৭. মাওলানা আব্দুল লতিফ (পীর সাহেব, ফুলতলী, সিলেট)।
১৮. মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন আহমদ আবু বকর মিয়া (পীর সাহেব, বাহাদুরপুর)।

তা ছাড়া মুফতী সাঈদ আহমদ সাহেবকে প্রধান করে নিম্নল্লিখিত সদস্যগণকে নিয়ে একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করা হয়।

লিয়াজোঁ কমিটির সদস্যবৃন্দ

১. মুফতী সাঈদ আহমদ মুজাদ্দেদী (প্রধান, লিয়াজোঁ কমিটি)।
২. মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল কামালুদ্দীন জাফরী।
৩. ড. আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর।
৪. অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক।

৫. এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম।
৬. মাওলানা আব্দুল মতিন।
৭. মাওলানা আতাউর রহমান খান (সাবেক এমপি)।
৮. মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান (নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব)।
৯. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ।

নতুন ঐক্যপ্রচেষ্টায় ফুরফুরার পীর সাহেবের অব্যাহত অবদান

১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঝালকাঠিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ফুরফুরার পীর মুহতারাম মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দীকী উপস্থিত ছিলেন। ঐ বছর ১১ জুলাই সর্বদলীয় যে বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম, তা মীরপুরস্থ ফুরফুরার দরবার শরীফেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৯৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত ঐ দরবার শরীফে অনুষ্ঠিত সম্মেলনেই গৃহীত হয়।

প্রতি বছরই মীরপুরস্থ মারকাযে ইশাআতে ইসলাম দারুস সালামে ফুরফুরা শরীফের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন তিন থেকে পাঁচ দিনব্যাপী চলে। এ সম্মেলনের সময়ই পীর সাহেব সেখানে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলন করার সুযোগ করে দেন। পীর সাহেবের সম্মেলনের জন্য তৈরি মঞ্চ ও প্যান্ডেলই শরীয়াহ্ কাউন্সিল ব্যবহার করে। আপ্যায়নের সকল ব্যয়ভার পীর সাহেবই বহন করেন। শরীয়াহ্ কাউন্সিলের এমন আর্থিক সঙ্গতি এখনো হয়নি যে, তারা প্রতি বছর সম্মেলনের আয়োজন করতে পারবে। এ দিক দিয়ে ইসলামী ঐক্যের ব্যাপারে পীর সাহেবের অবদান অব্যাহতভাবে চলছে।

ইসলামের জন্য এ পীর বংশের বিরাট ঐতিহাসিক অবদান রয়েছে। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় যখন দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম ও জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতা মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র) পাকিস্তান দাবির বিরুদ্ধে মি. গান্ধী ও মি. নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিলেন তখন ফুরফুরার ঐ সময়কার পীর সাহেব মাওলানা আবু বকর সিদ্দীকী (র) ১৯৪৩ সালে কলকাতায় গোটা ভারতবর্ষের ওলামায়ে কেরামের এক সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং ঐ সম্মেলনেই পাকিস্তান দাবির পক্ষে 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম পার্টি' গঠিত হয়।

জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের ২০০৩ সালের বার্ষিক সম্মেলন

২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ফুরফুরার পীর সাহেবের মীরপুরস্থ দারুস সালামে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলনে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়। ঐ রিপোর্টে ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঝালকাঠিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে ক্রমে ক্রমে কীভাবে এবং কখন জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয় এর পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। ঐ রিপোর্ট থেকে প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১৬.১০.২০০০ তারিখ জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বৈঠক মুহতারাম মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে ৫৫ বি, পুরানা পল্টনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলকে একটি স্থায়ী কমিটিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত এবং সেই সাথে নিম্নের প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় :

১. পূর্বঘোষিত জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের আহ্বায়ক ও লিয়াজোঁ কমিটির সম্মানিত সকল সদস্যকে মূল কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২. সভায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের প্রস্তাবক্রমে মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবকে স্থায়ীভাবে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সভাপতি মনোনীত করা হয়।

৩. সভায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে সহসভাপতি, মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ মুজাদ্দেদী সাহেবকে মহাসচিব ও মাওলানা হারুনুর রশিদ খানকে যুগ্ম-মহাসচিব মনোনীত করা হয় এবং নিম্নলিখিত শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের কমিটি গঠিত হয়।

জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের পৃষ্ঠপোষকগণ হলেন–

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক।
হযরত মাওলানা আবদুল কাহ্হার সিদ্দীকী (পীর সাহেব, ফুরফুরা)।
হযরত মাওলানা আহমাদ শফী (মুহতামিম, হাটহাজারী)।
হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান (কায়েদ সাহেব)।
হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল মান্নান (শায়খুল হাদীস ও মুহতামিম, গওহরডাঙ্গা মাদরাসা)।

সভায় মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

১০.০৭.২০০১ তারিখ পুরানা পল্টনে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে নয় সদস্যবিশিষ্ট একটি মজলিসে আমেলা (কর্ম-পরিষদ) গঠিত হয়।

মজলিসে আমেলার সদস্যগণ

মাওলানা উবায়দুল হক।
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।
মুফতী সাঈদ আহমদ।
মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ।
মাওলানা আবদুস্ সুব্হান।
মাওলানা ফজলুর রহমান।
অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীন।
মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন আহমদ আবু বকর মিয়া।
এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম।

০৯.০৮.২০০১ তারিখ শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বৈঠক মুহতারাম মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রেডিও-টিভিতে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু, ভাস্কর্যের নামে মূর্তি নির্মাণ বন্ধ এবং যে সকল আলেম এখনো জেলে রয়েছেন তাঁদের মুক্ত করার প্রচেষ্টা জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০.০৯.২০০২ তারিখ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল বাংলাদেশের উদ্যোগে একটি জাতীয়ভিত্তিক ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং এ জন্য মুফতী সাঈদ আহমদ, মাওলানা যাইনুল আবেদীন, মুফতী আব্দুল কুদ্দুস ও মাওলানা আব্দুল লতিফ নেজামীর সমন্বয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

০৩.১১.২০০২ তারিখ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে জাতীয় সম্মেলনের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং খতীব সাহেবের বিশেষ দাওয়াতনামা নিয়ে ওলামা-মাশায়েখের সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খতীব সাহেব ও মুফতী সাঈদ সাহেবের স্বাক্ষরিত চিঠি নিয়ে ওলামা-মাশায়েখের সাথে বিশেষভাবে যোগাযোগ করা হয়।

০১.০১.২০০৩ তারিখ বুধবার সকাল ১০টায় মারকাযে ইশাআতে ইসলাম, ২/২ দারুস সালামে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল বাংলাদেশের জাতীয় ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল বাংলাদেশের চেয়ারম্যান হযরত মাওলানা উবায়দুল হক। সম্মেলনে দেশবরেণ্য ৬৭ জন ওলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন সম্মানিত চেয়ারম্যান মুহতারাম মাওলানা উবায়দুল হক। বিগত বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করেন সেক্রেটারি জেনারেল মুফতী সাঈদ আহমদ। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন মাওলানা আবদুস্ সুব্হান এমপি। ঘোষণাপত্র পাঠ করেন সহসভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। সম্মেলনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং সারা বিশ্বের বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের সকল সমস্যার সমাধান ও কল্যাণের জন্য ওলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উক্ত জাতীয় ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনে বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন–

১. হযরত মাওলানা উবায়দুল হক।
২. শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক।
৩. হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।
৪. মুফতী সাঈদ আহমদ মুজাদ্দেদী।
৫. হযরত মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল কামালুদ্দিন জাফরী।
৬. হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, এমপি।

৭. হযরত মাওলানা আবদুস্ সুব্হান, এমপি।
৮. হযরত মাওলানা আবুল কালাম আযাদ।
৯. হযরত মাওলানা সুলতান জাওক নদভী (চট্টগ্রাম)।
১০. হযরত মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল যাইনুল আবেদীন।
১১. হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ নেজামী।
১২. এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম।
১৩. হযরত মাওলানা একিউএম ছিফাতুল্লাহ।
১৪. হযরত মাওলানা আজিজুল হক মুরাদ।
১৫. হযরত মাওলানা ইসহাক।
১৬. হযরত মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী।
১৭. হযরত মাওলানা ইমদাদুল হক আড়াইহাজারী।
১৮. হযরত মাওলানা ড. আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর।
১৯. হযরত মাওলানা ড. এ. এইচ. এম. ইয়াহইয়ার রহমান।
২০. হযরত মাওলানা আশিকুর রহমান কাশেমী।
২১. হযরত মাওলানা আব্দুর রহিম ইসলামাবাদী (ঢাকা)।
২২. হযরত মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল শাহজাহান (ঢাকা)।
২৩. হযরত মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল ইলিয়াছ (চট্টগ্রাম)।
২৪. হযরত মাওলানা কে. এম. আব্দুস সুবহান।
২৫. হযরত মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল ইউনুছ (ঢাকা)।
২৬. হযরত মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল মফিজুর রহমান (রাঙামাটি)।
২৭. হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান (সাবেক এমপি)।
২৮. হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম।
২৯. হযরত মাওলানা আব্দুল হাই মেশকাত।
৩০. হযরত মাওলানা অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান।
৩১. হযরত মাওলানা সালেম ওয়াহিদী।
৩২. হযরত মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম।
৩৩. হযরত মাওলানা আতাউর রহমান, এমপি।
৩৪. হযরত মাওলানা মোঃ সালমান।
৩৫. হযরত মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল এইচ. এম. শহীদুল ইসলাম (রাজশাহী)।
৩৬. হযরত মাওলানা আবুল কালাম (ঢাকা)।
৩৭. হযরত মাওলানা আবদুস সাত্তার (ফেনী)।
৩৮. হযরত মাওলানা প্রিন্সিপ্যাল মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ (খুলনা)।
৩৯. হযরত মাওলানা ভাইস মুহাম্মদ ইসমাঈল (নোয়াখালী)।
৪০. হযরত মাওলানা এ. টি. এম. আব্দুল হাই আল মাদানী।
৪১. হযরত মাওলানা মাহবুবুর রহমান।
৪২. হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ।

৪৩. হযরত মাওলানা আবদুস সালাম কাশেমী (সাতক্ষীরা)।
৪৪. হযরত মাওলানা মুঃ কুতুবউদ্দীন।
৪৫. হযরত মাওলানা মনিরুল আহসান মাদানী (যশোর)।
৪৬. হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল কুদ্দুছ।
৪৭. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া (ঢাকা)।
৪৮. হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান (ঢাকা)।
৪৯. হযরত মাওলানা আব্দুস সালাম (ঢাকা)।
৫০. হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান (ঢাকা) প্রমুখ।

সম্মেলনের খবর জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের পরবর্তী সম্মেলন

২০০৩ সালের ১ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনের অনেক তথ্য এ পর্যন্ত পরিবেশন করা হলো। পরবর্তী সম্মেলন ২০০৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। ফুরফুরা শরীফের মারকাযে ইশাআতে ইসলাম দারুস সালাম, মীরপুরেই জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের অধিবেশন বসে। এ সম্মেলনের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি নিম্নে পরিবেশন করছি :

সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরামের ঐক্য চাই

২০০৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বার্ষিক সম্মেলন ২০০৪, মারকাযে ইশাআতে ইসলাম, দারুস সালাম (ফুরফুরা দরবার শরীফ) মিরপুরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হযরত মাওলানা উবায়দুল হক– খতীব, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের প্রধান উপদেষ্টা শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক। তিনি কুরআন-হাদীসের উপর সকল মুসলমান বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামকে অটল থাকার আহ্বান জানান।

বিশেষ মেহমান হিসেবে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ তাঁর বক্তব্যে বলেন, মুসলমানদেরকে তাদের দুশমন সম্পর্কে জানতে হবে এবং ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তিনি আফগানিস্তান ও ইরাক থেকে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।

ড. মুস্তাফিজুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বিভিন্ন মতভেদ পরিত্যাগ করে কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান বলেন, ওলামায়ে কেরামকে সকল বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সেক্রেটারি জেনারেল মুফতী সাঈদ আহমদ সকল মতের ওলামায়ে কেরামকে একত্রে বসে সব সমস্যার সমাধান করার আহ্বান জানান।

হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি শিরক-বিদআত বাদ দিয়ে সকল মতের ওলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

মাওলানা আশিকুর রহমান কাশেমী বলেন, দেশের জনগণ জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের নিকট থেকে মতপার্থক্যের শরীয়াভিত্তিক সমাধান প্রত্যাশা করে। তাই শরীয়াহ্ কাউন্সিলের আরো বিস্তৃতি ঘটাতে হবে।

বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম মোঃ শামছুল আলম বলেন, সকল স্তরের ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের এ সম্মেলন ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করবে। জনাব মতিউর রহমান (এমপি) ওলামায়ে কেরামের ঐক্যের আহ্বান জানান। মাওলানা ইমদাদুল হক আড়াইহাজারী জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের মাধ্যমে সকল মতের ওলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে আরো আলোচনা করেন প্রফেসর মাওলানা নূর মোহাম্মাদ, মাওলানা একিউএম ছিফাতুল্লাহ, এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মাওলানা যাইনুল আবেদীন, ড. হাসান মঈন উদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, মাওলানা রফিক আহমদ ও ড. আমিনুল হক।

সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস, মাওলানা সরদার আব্দুস সালাম, ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম, মাওলানা আ ন ম আব্দুর রশীদ, মাওলানা রশিদ ফেরদাউস, মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, মাওলানা রহমাতুল্লাহ, মাওলানা শহীদুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম ও মাওলানা নিজাম উদ্দীন।

সভাপতি হযরত মাওলানা উবায়দুল হক জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের মাধ্যমে খুঁটিনাটি সকল মতভেদ ভুলে ওলামায়ে কেরামকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান এবং সকল মতপার্থক্য জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের মাধ্যমেই সমাধান করার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। শাহতলীর (কুমিল্লা) পীর হযরত মাওলানা আবুল বাশার সাহেবের মুনাজাতের মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়।

জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলই সর্বদলীয় একমাত্র ঐক্যমঞ্চ

বাংলাদেশে ইসলামী শক্তিসমূহের ঐক্যের একমাত্র প্ল্যাটফর্ম হিসেবে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলই উল্লেখযোগ্য। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতীব মাওলানা উবায়দুল হকের নেতৃত্বে এবং ফুরফুরা শরীফের গদ্দীনশীন পীর মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহ্হার সিদ্দীকীর পৃষ্ঠপোষকতায় এ সংগঠনটি উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশে আরো বেশ কিছু মহল বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে আছে। আশা করি, জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল তাদেরকেও এ সংগঠনভুক্ত করার প্রয়াস চালাবে, যাতে ইসলামী ঐক্য পূর্ণতা লাভ করে। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অত্যন্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। তিনি সকল মহলকে ঐক্যবদ্ধ করতে অত্যন্ত আগ্রহী। কোনো মহলকেই

তিনি ঐক্যের বাইরে দেখতে চান না। কারণ, কোনো মহল বাইরে থাকলে এ ঐক্য পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

যারা এমন মনোভাব পোষণ করেন যে, অমুক দলকে বাদ দিতে হবে বা অমুক দলের সাথে ঐক্য করব না, তারা সার্বিক ঐক্যই চান না।

মতবিরোধ চিরকালই ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। মতপার্থক্য আছে বলেই তো আমরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের নীতি হচ্ছে 'ইত্তিহাদ মাআল ইখতিলাফ'। মতভেদের জায়গায় মতভেদ থাকুক। ভিন্ন ভিন্ন দল ও সংগঠন বহাল থাকুক। কিন্তু দীনের দুশমনদের মোকাবিলা ও দীনের বিজয়ের প্রয়োজনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কারণ, কোনো দল বা মহলই একা এ বিরাট দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নয়। আর এ দায়িত্ব পালন না করলে আল্লাহ তাআলার দরবারে সবাইকেই কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হবে। এটাই জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের দাওয়াত। এটাই ঐক্যের দর্শন। এটাই ঐক্যের ভিত্তি।

আল্লাহ না করুন, এমন কিছু ব্যক্তিত্বও যদি থাকেন, যারা নেতৃত্বের প্রতি এতটা লোভী যে অন্য কোনো ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলে শরীক হতে সম্মত হতে পারছেন না, তাহলে তারা জনগণের নিকট চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। তাদের ছাড়াই এ কাউন্সিল ইসলামী জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাবে বলে আশা করা যায়। কারণ, জনগণ ঐক্যের জন্য পাগল।

২২৮.

ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে যোগাযোগ-প্রচেষ্টা

শেখ হাসিনার দুঃশাসনে দেশের সকল মহল বিশেষ করে ইসলামী মহলে চরম অস্থিরতা দেখা দেয়। ফলে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগবিরোধী সকল শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হয়। জামায়াত সিদ্ধান্ত নিল যে, ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে এ ব্যাপারে প্রথম যোগাযোগ করা দরকার। আর এ জন্য জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটকে প্রথমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে বিএনপির সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

জামায়াত ১৯৯৭ সালের শুরুতেই চিন্তা করল যে, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েমের উদ্দেশ্যে ইসলামী ইস্যুগুলোর তালিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। ইসলামী ঐক্যজোটকেও এই তালিকা রচনার পরামর্শ দিতে হবে। এরপর উভয় তালিকা সামনে রেখে জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোট একটা সমন্বিত তালিকা তৈরি করবে। একমঞ্চ থেকে সমন্বিত তালিকা প্রচার করা সম্ভব না হলে যুগপৎ পদ্ধতিতে প্রচার করা হলেও ইসলামী ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। সাথে সাথে জনগণের মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হবে।

১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসেই জামায়াত ১৭ দফার তালিকা চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করে; কিন্তু ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা সম্ভব না হওয়ায় ১৯৯৭ সালের মে মাসের ১৩ তারিখে দেশবাসীর বিবেচনার জন্য 'জামায়াতে ইসলামীর ১৭ দফা' শিরোনামে চার পৃষ্ঠার একটি বড় হ্যান্ডবিল প্রকাশ করা হয়।

সারা দেশে জামায়াত ছোট-বড় সমাবেশ করে এই ১৭ দফা প্রচার করে। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে ছোট আকারে ১৭ দফার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রকাশ করা হয় এবং তা সকল ইসলামী মহলে পৌঁছানোর প্রচেষ্টাও চালানো হয়।

বিএনপির সাথে যোগাযোগের সূচনা

১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে বিএনপি নেতা জনাব এম মোরশেদ খান [বর্তমান (২০০৬) পররাষ্ট্রমন্ত্রী]-এর সাথে বিমানে পাশাপাশি বসায় অনেক আলাপ হলো। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার কি কোনো পরিকল্পনা আপনাদের আছে, নাকি এখনকার মতো বিরোধী দলে থেকেই সন্তুষ্ট থাকবেন? তিনি বললেন, বলেন কি? জিততে না পারলে দলকে টিকিয়ে রাখাই কঠিন হবে। বললাম, গত নির্বাচনের মতো একলাই নির্বাচন করবেন, না জোট বাঁধার চিন্তা আছে? তিনি বললেন, ঢাকা ফিরে গিয়ে আপনার সাথে দেখা করব। বললাম, আপনি সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাথে যোগাযোগ করুন। তিনি বললেন, আরে! তিনি তো আমার বন্ধু মানুষ। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একসময়েরই ছাত্র ছিলাম।

তিনি কয়েক দিন পরই মাওলানা নিজামীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। এভাবেই বিএনপির সাথে যোগাযোগের সূচনা হয়ে গেল।

শায়খুল হাদীসের সাথে প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ

আমি তীব্রভাবে অনুভব করলাম, বিএনপির সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির পূর্বে ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। কর্মপরিষদে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলাম। জামায়াতের ১৭ দফা প্রচারের আগে যোগাযোগ করার সুযোগ পাওয়া গেল না। কেমন করে এ সুযোগ করা যায়, সে ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মীর কাসেম আলী দায়িত্ব নিয়ে বললেন যে, ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হকের সাথে তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠতা আছে; পারিবারিক পর্যায়ে আসা-যাওয়াও আছে। এ কথা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। অবিলম্বে আমার সাথে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য মীর সাহেবকে আমি বারবার তাকিদ দিতে থাকলাম।

১৯৯৮ সালের মে মাসের কোনো এক দিন জনাব মীর কাসেম আলীর মীরপুরস্থ বাড়িতে গেলাম। এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলামও সেখানে হাজির ছিলেন। জানতে পারলাম, তিনি অতি গোপনে ও সতর্কতার সাথে এসেছেন। নিজের গাড়িতে আসেননি, যাতে তাঁর ড্রাইভার ওখানে আসার খবর জানতে না পারে। বাড়িতেও কাউকে জানাননি যে, তিনি ওখানে আসবেন। মীর কাসেমের ছেলে সালমান গাড়ি চালিয়ে তাঁকে নিয়ে এসেছে।

যাহোক, ওখানে শায়খুল হাদীসের সাথে আমার একান্তে আলাপ শুরু হলো। ঐ পক্ষে তিনি একা, আর এ পক্ষে আমরা দুজন। কথা শুরু করে আমি বললাম, 'শেখ হাসিনার শাসনামলে যা কিছু হচ্ছে তাতে আওয়ামী লীগবিরোধী সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে আমরা যোগাযোগও শুরু করেছি। আমরা মনে করি, ইসলামী ঐক্যজোট ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে প্রথম ঐক্য হওয়া প্রয়োজন, যাতে আমরা একসাথে একসুরে বিএনপির সাথে দর কষাকষি করতে পারি। রাজনৈতিক ঐক্যের স্বার্থে এবং আন্দোলনের প্রয়োজনেই দাবি-দাওয়ার দফাওয়ারি তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। সে তালিকায় ইসলামী ইস্যুগুলো আমরা একসাথে পেশ করলে দাবির তালিকায় তা অন্তর্ভুক্ত করা সহজ হবে। তাই আমাদের মধ্যে প্রথমে ঐক্য হওয়া প্রয়োজন।'

তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে বললেন, বিষয়টা অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ। আমরা কয়েক দল মিলে ঐক্যজোট করেছি। এ ব্যাপারে জোটের শরীক দলের মতামত জোগাড় করার আগে আমি কোনো মতামত দিতে পারছি না।

তাঁর এ বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করে বললাম, 'আমাদের মধ্যে ঐক্য অবশ্যই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার; কিন্তু আমরা কি এমন একটা কাজ করতে পারি না, যা ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং জনগণও তাতে উৎসাহবোধ করবে?'

যুগপৎ আন্দোলনের প্রস্তাব

আমি বললাম, রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনে একমঞ্চে না গিয়েও একই কর্মসূচির ভিত্তিতে যুগপৎ আন্দোলন করা যেতে পারে। আমরা কেয়ারকেটার সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সাথে বিগত সরকারের আমলে যুগপৎ আন্দোলন করেছি। ইসলামবিরোধী দলের সাথেও যদি কোনো রাজনৈতিক ইস্যুতে যুগপৎ আন্দোলন করা যায়, তাহলে আমরা ইসলামী দলগুলো ইসলামী ইস্যুতে কি যুগপৎ আন্দোলন করতে পারি না? ইসলামী ঐক্যজোট ও জামায়াতে ইসলামী যদি কতক ইসলামী ইস্যু নিয়ে যুগপৎ আন্দোলন করে তাহলে কেমন হয়?

তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে বললেন, এটা তো করাই যায়। তাঁর সম্মতি জেনে আমিও উৎসাহবোধ করে বললাম, তাহলে আপনার পক্ষ থেকে তিনজনের নাম ঠিক করেন, জামায়াতের পক্ষ থেকেও তিনজন লোক ঠিক করা হবে। এ ছয়জন একত্রে বসে ইসলামী ইস্যুগুলোর তালিকা তৈরি করবেন। তাঁরা যুগপৎ আন্দোলনের দাবিনামা হিসেবে একটা প্রস্তাবনা প্রণয়ন করবেন। এ প্রস্তাব ইসলামী ঐক্যজোট ও জামায়াত নিজ নিজ ফোরামে অনুমোদন করলে অথবা সংশোধন করে অনুমোদন দিলে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি শুরু হতে পারে।

আমার প্রস্তাবিত এ পদ্ধতির সাথে একমত হয়ে তিনি তাঁর জোটের পক্ষ থেকে তিনজনের নামও জানিয়ে দিলেন। আমি বললাম, জামায়াতের পক্ষ থেকে তিনজনের

নাম আমি ফোরামে পরামর্শ করে পরে জানাব।

এরপর তিনি প্রস্তাব দিলেন, আপনি এটা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। যুগপৎ আন্দোলনের লক্ষ্যে ইসলামী ইস্যুর তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইসলামী ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে আপনার নিকট একটা লিখিত প্রস্তাব পাঠানো হবে, যাতে ইসলামী ঐক্যজোটের পক্ষ থেকেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে বোঝা যায়। আমি বিনা দ্বিধায় তাঁর এ কথা মেনে নিলাম। আমি চাই যে, কাজটা হোক। জামায়াতের কৃতিত্বের প্রয়োজন নেই। অন্য কেউ কৃতিত্ব দাবি করলেও আপত্তি নেই।

আমি জানতে চাইলাম, আপনাদের পক্ষ থেকে কতদিন পর লিখিত প্রস্তাব আশা করতে পারি? তিনি বললেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই পাবেন। সপ্তাহ পার হয়ে ১৫ দিন চলে গেল। মীর কাসেম সাহেবকে জানালাম, কোনো সাড়া পাওয়া গেল না; আর কত অপেক্ষা করা যায়?

শায়খুল হাদীস সাহেব চেয়েছিলেন, আমি যেন আমাদের দুজনের আলোচনার বিষয় কারো কাছে প্রকাশ না করি। যাতে এ কথা প্রমাণ হয় যে, তাঁরই উদ্যোগে যুগপৎ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। তাঁর এ দাবি মেনে নিয়ে আমি সত্যিই কারো কাছে পূর্বেকার ঐ সাক্ষাতের খবর প্রকাশ করিনি। এমনকি আমার নিকটতম সাথী জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল নিজামী সাহেবকেও জানাইনি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানাতে হলো।

শায়খুল হাদীসের সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ

১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিএনপির সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার পর আবার শেষ চেষ্টা হিসেবে পুনরায় জনাব মীর কাসেমকে তাঁর বাড়িতে শায়খুল হাদীস সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য বললাম। শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয়। এ সাক্ষাতের সময় জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমেই আমি চার মাস আগে ঐ বাড়িতে আমাদের যে বৈঠক হয়েছে, সে কথা উল্লেখ করি। কিন্তু যখন তাঁর পক্ষ থেকে আমার কাছে চিঠি পাঠানোর কথা মনে করিয়ে দিলাম তখন তিনি কিছুতেই তা স্মরণ করতে পারলেন না। আমি বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে গেলাম। তিনিই দাবি করেছিলেন যে, উদ্যোগী ভূমিকা তাঁর হবে এবং অনুরোধ করেছিলেন, আমি যে উদ্যোগ নিয়েছি সে কথা যাতে কাউকে না বলি। অথচ তিনিই বিষয়টি ভুলে গেলেন। তিনি সে কথা মনে করতেই পারলেন না– এটা বিশ্বাস করা অস্বাভাবিক হলেও বিশ্বাস না করে উপায় কী? তাই নতুন করে ঐ পুরাতন কথাই তাকে আবার বললাম।

মাওলানা ইউসুফ সাহেব ১৯৫১ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় ৩১ জন আলেমের ঐতিহাসিক ২২ দফার কথা উল্লেখ করে ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরলেন। শায়খুল হাদীস সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ২২ দফার কপি আছে কি না? মাওলানা জবাবে বললেন, মূল উর্দু কপি এবং এর বাংলা অনুবাদ আমরা প্রচার করি।

আমার আগের কথার জের ধরে বললাম, এবার বলুন আপনার পক্ষ থেকে যুগপৎ আন্দোলনের প্রস্তাব দিয়ে কবে চিঠি পাঠাবেন? তিনি বললেন, পাঠাতে দেরি হবে না;

তবে চিঠির ড্রাফট তৈরি করে দিলে ভালো হয়। বিস্ময়ের কথা, তিনি চিঠি দেওয়ার ড্রাফটাও করতে অক্ষম; তবু রাজি হলাম।

তিনি বললেন, ঐ ২২ দফার কপিও সাথে পাঠাবেন। বললাম, আমরা ইসলামী ও জাতীয় ইস্যু নিয়ে ১৭ দফা প্রণয়ন করেছি। বললেন, এর কপিও পাঠাবেন। বললাম, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই এসব মীর কাসেম সাহেবের হাতে পৌছে যাবে। তিনি আপনাকে পৌছাবেন।

যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মীর কাসেম সাহেবের কাছে পৌছিয়ে দিয়ে ফোনে খবর নিলাম, তা যথাস্থানে পৌছানো হলো কি না। তিনি জানালেন, শায়খুল হাদীস সাহেব সফরে থাকায় তা কিছুটা বিলম্বে পৌছেছে।

দুই সপ্তাহ পরও আমার কাছে চিঠি না আসায় মীর কাসেম সাহেবকে খবর নিতে বললাম। তিনি আমাকে জানালেন, শায়খুল হাদীস সাহেব আপনাকে ফোন করবেন। দুই দিন পর ফোন এল। যে ফোন ধরল সে আমাকে জানাল, মীর কাসেম সাহেব ফোন করেছেন। আমি ফোন ধরে আওয়াজ থেকে বুঝলাম, শায়খুল হাদীস সাহেব কথা বলছেন। বোঝা গেল, আমার বাড়িতে যে ফোন ধরল সেও যাতে জানতে না পারে যে, তিনি আমাকে ফোন করেছেন। তিনি জানালেন যে, তাঁর আরো সময় প্রয়োজন। আমি আর চাপাচাপি করা সমীচীন মনে করলাম না। কত সময় প্রয়োজন– জিজ্ঞেস করাও ঠিক মনে করিনি। বুঝতে পারলাম যে, তিনি আর এগোবেন না। এরপর আর তাঁকে বিরক্ত করিনি।

সকল ইসলামী শক্তির ঐক্যের প্রচেষ্টা

১৯৯৭ সাল থেকে ঝালকাঠির বয়োবৃদ্ধ আলেম মাওলানা আযীযুর রহমানের (কায়েদ সাহেব) উদ্যোগ, ফুরফুরার গদ্দীনশীন পীর সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতা ও বায়তুল মুকাররমের খতীব সাহেবের অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ নেতৃত্ব সকল ইসলামী দল ও মহলকে যাতে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয় সেজন্য আল্লাহর দরবারে ধরনা ধরে আছি। আমার ইসলামী শক্তিসমূহের ঐক্যের স্বপ্ন সফল হওয়ার ব্যাপারে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলই শেষ ভরসা। নতুন করে আর কোনো প্রচেষ্টার সম্ভাবনা দেখছি না। ময়দানে আর যে ক'জন ইসলামী ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, তাঁরা সকলের ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এমন কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই।

আমার উদ্যোগে জামায়াতে ইসলামী ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত সর্বদলীয় ব্যাপকভিত্তিক ঐক্যের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তার বিবরণ প্রকাশ করা কর্তব্য মনে করেই আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। তা না হলে এ আন্তরিক প্রচেষ্টার কোনো রেকর্ড থাকবে না এবং দেশবাসীও এ ইতিহাস জানতে পারবে না।

আমি আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী রেখে এবং আখিরাতে তাঁর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে বলে সে হিসাব কষেই বলছি, আমার বিবরণীতে সামান্য অসত্যও নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে কারো উপর দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে আমি এসব কথা লিখিনি। এই অতি সত্য বিবরণ থেকে পাঠক-পাঠিকাগণ কাউকে দোষী সাব্যস্ত করলে ইতিহাসের বিচারেই তা করা হবে। আমার নিকট এর কোনো প্রতিকার নেই। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না।

পাকিস্তানে ইসলামী ঐক্যের সুফল

২০০২ সালে পাকিস্তানে ছয়টি ইসলামী দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'মুত্তাহিদা মজলিসে আমল' (MMA— সম্মিলিত কর্মপরিষদ) গঠন করে। ২০০২ সালের অক্টোবরে পার্লামেন্ট নির্বাচনে তারা ইসলামী হুকুমত কায়েমের উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জাতীয় সংসদে ৬৮টি আসন দখল করে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করে। এর আগে বিচ্ছিন্নভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়ে তারা সকলে মিলে ২০টি আসনও পায়নি।

MMA সীমান্ত প্রদেশে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সেখানে ইসলামী হুকুমত কায়েম করেছে। তারা বেলুচিস্তানেও সরকারি দলের সাথে কোয়ালিশন করে সরকার কায়েম করেছে। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে মাওলানা মওদূদী (র)-এর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে আমি লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে অতিথি হিসেবে গিয়েছিলাম। সীমান্ত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমত দেখার লোভ সামলাতে না পেরে সেখানে গেলাম। মন্ত্রীদের সাথে তাঁদের কার্যক্রম সম্পর্কে জানার সুযোগ হলো। আমার ঐ সফরের বিবরণ ৪৮ পৃষ্ঠার একটা পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম 'পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন– ঐতিহাসিক ২২ দফা ঘোষণা– পাকিস্তানে ইসলামী ঐক্যের সুফল– সীমান্তে ইসলামী হুকুমত'। 'জীবনে যা দেখলাম'-এর চতুর্থ খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাকিস্তানে নিম্নোল্লিখিত ছয়টি ইসলামী দল নিয়ে MMA গঠিত হয়েছে :

১. জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান।
২. জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (মাওলানা ফযলুর রহমান)
৩. জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (মাওলানা সামীউল হক)
৪. জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তান।
৫. জমিয়তে আহলে হাদীস।
৬. মিল্লাতে জাফরিয়া।

এ ছয়টি দল যেসব মহলের প্রতিনিধিত্ব করে তার বিবরণ নিম্নরূপ :

উল্লিখিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল দেওবন্দীদের প্রতিনিধিত্ব করে। চতুর্থ দলটি ব্রেলভীদের প্রতিনিধিত্ব করে। পঞ্চম দলটি আহলে হাদীসের প্রতিনিধিত্ব করে। আর সর্বশেষ দলটি শিয়াদের প্রতিনিধিত্ব করে। জামায়াতে ইসলামী ইকামাতে দীনের সমর্থক ঐসব জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা নিজেদেরকে উপরিউক্ত কোনো ফেরকার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না; যদিও সব ফেরকার লোকই তাতে শামিল আছেন।

বাংলাদেশে কি পাকিস্তানের স্টাইলে ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়?

বাংলাদেশে যেসব দলকে ইসলামী দল হিসেবে গণ্য করা যায়, তাদের মধ্যে শিয়াদের কোনো দল নেই। তাদের সংখ্যাও নগণ্য। ব্রেলভী-খেয়ালের বিরাট জনশক্তি এ দেশে আছে। তাঁদের ওলামায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে সংগঠিত হলেও তাঁদের কোনো রাজনৈতিক

প্ল্যাটফর্ম নেই। তাঁদের কোনো দলই নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করায় না। তাঁদের অনুসারীদের নির্বাচনে কোনো নির্দিষ্ট দলকে ভোট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় কি না তা আমার জানা নেই।

আহলে হাদীসের সংখ্যাও কম নয়। তাঁদের একাধিক সংগঠন রয়েছে; কিন্তু কোনোটিই রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য নয়। কারণ, তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না। ছোট ছোট কয়েকটি ইসলামী দল এমন আছে, যারা রাজনৈতিক বক্তব্য রাখলেও নির্বাচনে প্রার্থী দেয় না। কয়েকটি ইসলামী দল মিলে 'ইসলামী ঐক্যজোট' হিসেবে গঠিত দলটি চারদলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ২০০১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এর বাইরেও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কিছু দল রয়েছে।

ইসলামী ঐক্যজোট বর্তমানে (২০০৫) চার ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে তিন ভাগের নেতৃত্বই দেওবন্দী আলেমগণের হাতে রয়েছে। পাকিস্তানে ওলামায়ে দেওবন্দ দুই গ্রুপে বিভক্ত হলেও উভয় গ্রুপ MMA-তে শরীক রয়েছে। বাংলাদেশের ওলামায়ে দেওবন্দও পৃথকভাবেই ইসলামী ঐক্যের প্ল্যাটফর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামী ঐক্য পাকিস্তানের চেয়েও সহজ। এখানে শিয়া, আহলে হাদীস ও ব্রেলভীদের পৃথক পৃথক রাজনৈতিক মঞ্চ নেই। এখানে ইসলামী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা পাকিস্তানের চেয়ে কম। তাই এখানে ঐক্য স্থাপন মোটেই অসম্ভব কিছু নয়।

পাকিস্তানে এত রকম ফেরকা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এ কারণে ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম হয়েছেন যে, তাঁরা সকল মতভেদ ভুলে ইসলামী সরকার কায়েমের দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিজ নিজ ফেরকার একক প্রচেষ্টায় এ মহান উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না বলে উপলব্ধি করার ফলেই তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছেন।

বাংলাদেশে যাঁরা আল্লাহর আইন, আল্লাহর খিলাফত ও ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের জন্য পৃথকভাবে যে আন্দোলন করছেন তাতে তাঁরা কেউ-ই সফল হবেন না। তবে তাঁরা সবাই যদি ইসলামী হুকুমত কায়েমের ফরযিয়াত সম্পর্কে সচেতন হন তাহলে তাঁদের ঐক্যের পথে কোনো বাধাই থাকার কারণ নেই।

জামায়াতে ইসলামীর সাথে ঐক্য স্থাপনে আপত্তি

জামায়াতে ইসলামীর সাথে ঐক্যের ব্যাপারে যারা আপত্তি তোলেন, তারা মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত কতক অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়েই তা করেন বলে মনে হয়। উর্দু ভাষায় লেখা মাওলানার বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার তো পাকিস্তানেই ব্যাপকভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত। বাংলাদেশে তো উর্দু ভাষার অনেক সাহিত্য পাওয়াই যায় না। পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরাম মাওলানা মওদূদীর লেখায় এমন আপত্তিকর কিছু পাননি, যার কারণে জামায়াতের সাথে ঐক্য করাই চলে না। ছয় দলীয় ইসলামী ঐক্যজোটের বর্তমান সভাপতি হচ্ছেন জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর কাযী হোসাইন আহমদ।

এককালে যারা জামায়াতের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রচার করতেন তাঁরাও জামায়াতের সাথে মিলে সীমান্তে ইসলামী হুকুমত পরিচালনা করছেন। তাঁরা শুধু রাজনৈতিক ঐক্য

করেননি, আদর্শিক ঐক্যও করেছেন। দেওবন্দী ও ব্রেলভী এককালে বাহাস ও পরস্পর ফতোয়াবাজিতে লিপ্ত ছিলেন। এখন তাঁরা একসাথে ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের পারস্পরিক সকল মতপার্থক্য দূর হয়ে যায়নি; তবে তাঁরা দীনের বিজয়কে গুরুত্ব দিয়ে মতবিরোধকে পেছনে ফেলে রেখেছেন।

বাংলাদেশেও পাকিস্তানের মতো ঐক্য হতে পারে, যদি সবাই ইকামাতে দীনকে প্রাধান্য দেন।

২২৯.

ইসলামী দলগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে কেন?

এ কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে, ইসলামী জনতা সকল ইসলামী দলের ঐক্যের জন্য পাগল। ঐক্যের কোনো প্রচেষ্টা দেখলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবেগের সাথে তাতে সাড়া দেয়। আর আলেমদের মধ্যে বিভেদ ও ইসলামী দলগুলোর মধ্যে বিরোধ দেখলে তারা তাতে অত্যন্ত বেদনাবোধ করে।

ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যারা মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে জামায়াতে ইসলামীর সাথে 'রাজনৈতিক ঐক্য করেছি, আদর্শিক ঐক্য করিনি' বলে ঘোষণা দেন, তারা তাহলে ইসলামী ঐক্যজোটে কেন ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারলেন না? চারদলীয় জোটের শরীক ইসলামী ঐক্যজোট চার ভাগে বিভক্ত হলো– রাজনৈতিক কারণে, নাকি আদর্শিক কারণে? হাফেযজী হুযূরের প্রতিষ্ঠিত খেলাফত আন্দোলন থেকে শায়খুল হাদীস সাহেব আলাদা হয়ে খেলাফত মজলিস গঠন করলেন কী কারণে? তাঁর দলের দুজন নায়েবে আমীর আলাদা খেলাফত মজলিস কায়েম করলেন কোন্ যুক্তিতে? হাফেযজী হুযূরের ছেলেদের নেতৃত্বে পরিচালিত ক্ষুদ্র দলটিকে দুই ভাই সম্প্রতি বিভক্ত করে নিলেন; 'নেজামে ইসলাম পার্টি' নামের ক্ষুদ্র দলটির নির্বাহী সভাপতি মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঐ নামেই পৃথক দল গঠন করলেন। তাদের এই দল ভাঙার কারণ কি আদর্শিক, না রাজনৈতিক?

জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের একজন নেতা, যিনি এর চেয়ারম্যান মাওলানা উবায়দুল হকের অনুপস্থিতিতে বহুবার শরীয়াহ্ কাউন্সিলের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছেন, তিনি পাল্টা জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল কায়েম করে নিজেকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করলেন; কিন্তু তা তিনি টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হননি। সর্বদলীয় একমাত্র ইসলামী ঐক্যমঞ্চ হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি শরীয়াহ্ কাউন্সিলে শরীক থাকাটাই স্বাভাবিক। আর এর প্রতিবাদেই নাকি খতীব সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত মঞ্চ তিনি ত্যাগ করেছেন। তিনি ভিন্ন নামে মঞ্চ কায়েম করে চেয়ারম্যান হওয়ার চেষ্টা করতে পারতেন, কিন্তু 'জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল' নামটি দখল করার ব্যর্থ চেষ্টা কেন করলেন তা বোঝা গেল না। তিনি কি এখন জামায়াতে ইসলামী ছাড়া বাকি সকল ইসলামী দল ও মহলকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করছেন?

জামায়াতকে বাদ দিয়ে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা!

২০০৫ সালের ১২ মে দৈনিক ইনকিলাবের প্রথম পৃষ্ঠায় দুই কলাম খবরের শিরোনাম ছিল 'জামায়াত ব্যতীত সকল ইসলামী দলের গোলটেবিল বৈঠক'। এর আয়োজক 'ইসলামী পত্রিকা পরিষদ বাংলাদেশ'।

ঐদিনের পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় উক্ত গোলটেবিল বৈঠকের বিজ্ঞাপনে অতিথিদের তালিকায় প্রথম নাম দেখা গেল বায়তুল মুকাররমের খতীব সাহেবের। অংশগ্রহণকারী অতিথিদের তালিকায় মোট ২৬ জনের নাম ছিল।

পরের দিন দৈনিক ইনকিলাবে এ গোলটেবিল বৈঠকের যে খবর বের হলো তা দেখে বিস্মিত হলাম। কারণ, বায়তুল মুকাররমের খতীব সাহেব ঐ বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন এবং জামায়াতের বিরুদ্ধে কোনো বক্তার বক্তব্যই উক্ত খবরে প্রকাশিত হয়নি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান এবং মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোবায়েদুর রহমান। প্রধান বক্তা ছিলেন দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক জনাব এ এম এম বাহাউদ্দীন।

এ গোলটেবিল বৈঠকটি 'ইসলামী পত্রিকা পরিষদ'-এর নামে আহ্বান করা হলেও এতে জামায়াতের সাথে সম্পর্কিত কোনো দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার প্রতিনিধিকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। অথচ ইসলামী রাজনৈতিক দল হিসেবে দাবি করে এমন ক্ষুদ্রতম সকল দলকেও দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোকে দাওয়াত করায় মুহতারাম খতীব সাহেব সেখানে যাননি। কেননা, তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত নন। জামায়াত ছাড়া সকল দলকে দাওয়াত করায় এটাই ধারণা ছিল যে, কেউ কেউ নিশ্চয়ই জামায়াতের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখবেন। কেউ তেমন কোনো বক্তব্য না রাখার কারণ হিসেবে জানা গেল, মডারেটর জনাব মোবায়েদুর রহমান শুরুতেই সমবেত সবার নিকট একটি প্রস্তাব পেশ করেন যে, 'আমরা ঐক্যের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছি। এখানে সবাই ঐক্যের পক্ষেই কথা বলব। কোনো দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলব না।'

সমবেত সবাই সর্বসম্মতভাবে এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তাই কোনো বক্তা ইশারা-ইঙ্গিতেও তেমন কিছু বলার চেষ্টা করলে মডারেটর সাহেব ঐ প্রস্তাবের দোহাই দিয়ে তাকে নিবৃত্ত করেন।

ইসলামী ঐক্যজোট ভাঙনের নেপথ্যে

২০০১ সালের নির্বাচনে চারদলীয় জোট বিজয়ী হওয়ার পর জোটের শরীক দুটো ইসলামী দলের মধ্যে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হবে বলে আশা করেছিলাম। কেননা, এর মাধ্যমে অন্যান্য ইসলামী শক্তিকেও ঐক্যে শামিল করার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু ১০ অক্টোবর (২০০১) চারদলীয় জোটের মন্ত্রিসভা গঠনের দিনই ইসলামী ঐক্যজোটে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল।

ইসলামী ঐক্যজোট থেকে প্রথমে মাত্র দুজন এমপি নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হককে মন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানলাম। তখন আমি ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার শহরে ছিলাম। ফোনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মুজাহিদ সাহেবের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে খবর পাচ্ছিলাম। ৯ অক্টোবর তিনি জানালেন, শায়খুল হাদীস মন্ত্রী হচ্ছেন।

১০ তারিখে ইন্টারনেট থেকে মন্ত্রীদের নামের তালিকা সংগ্রহ করে দেখলাম, শায়খুল হাদীসের নাম নেই। মুজাহিদ সাহেব থেকে জানা গেল, গতরাতে মাওলানা ফজলুল হক আমিনী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান বলে ঘোষণা দিয়েছেন, যাতে তাঁকে ঐক্যজোট থেকে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাঁকে মন্ত্রী নিয়োগ করছেন না। আরো জানা গেল, যে কয়টি গ্রুপ ও দল নিয়ে ইসলামী ঐক্যজোট গঠন করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে খেলাফত মজলিস ছাড়া বাকি গ্রুপগুলো আমিনী সাহেবের সাথে চলে গেছে।

জানতে চাইলাম, আমিনী সাহেবকে মন্ত্রী নিয়োগ করা হচ্ছে না কেন? তিনি বললেন, বেগম জিয়া নাকি নির্বাচনে নমিনেশন চূড়ান্ত করার পূর্বেই মাওলানা আমিনীকে নির্বাচনে না দাঁড়ানোর পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, আপনাকে মন্ত্রী নিয়োগ করব– যদি এমপি হিসেবে নমিনেশন না নেন। আমিনী সাহেব তখন বলেছিলেন, আমি মন্ত্রী হতে চাই না, এমপি হতে চাই।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় পূর্বের তিনটি নির্বাচনে বিএনপি নেতা উকিল আবদুস সাত্তার ভূঞা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। এলাকায় তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ সত্ত্বেও আমিনী সাহেব এমপি হওয়ার দাবি জানানোর কারণে তাঁকেই এ আসনটি ছেড়ে দেওয়া হয় এবং বিএনপির দলীয় প্রতীক ধানের শীষই তাঁকে বরাদ্দ দেওয়া হয়। বেগম জিয়ার নির্দেশে সাবেক এমপি উকিল সাহেবও মাওলানা আমিনীর পক্ষে নির্বাচনী অভিযানে সক্রিয় হন এবং এমপি হওয়া থেকে বঞ্চিত রাখার বিনিময়ে উকিল সাহেবকে প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। এ পরিস্থিতিতে আমিনী সাহেবের মন্ত্রিত্ব দাবি করার তো কোনো নৈতিক ভিত্তি থাকে না।

গত বছর চারদলীয় জোটের শীর্ষ বৈঠকে মাওলানা আমিনী ইসলামী ঐক্যজোট থেকে মন্ত্রী না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি এমপি হতে চেয়েছিলেন বলে তাঁকে এমপি হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে; মন্ত্রী হতে চাননি বলেই তো তাকে এমপি হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল; এখন আবার মন্ত্রী হতে চান কেন? শীর্ষ বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের নিকট তিনি পদত্যাগ করার হুমকি দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এমপি পদ ত্যাগ করেননি।

মাওলানা আমিনী জামায়াতবিরোধী কেন?

২০০৪ সালের এপ্রিলের ২৬ তারিখে 'প্রথম আলো' নামক একটি ধর্মনিরপেক্ষবাদী পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলো, আলিয়া মাদরাসাসমূহের লাইব্রেরিতে মাদরাসার শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমে সহায়ক বইয়ের তালিকায় মাওলানা মওদূদীর লেখা তাফসীরও রয়েছে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব বই কিনে মাদরাসাগুলোতে বিতরণ করবে।

পত্রিকায় এ খবর দেখে সর্বপ্রথম মাওলানা ফজলুল হক আমিনী এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। চিহ্নিত ইসলামবিরোধী পত্রিকাগুলো ফলাও করে তাঁর বলিষ্ঠ বিবৃতি প্রকাশ করে। ইসলামী ঐক্যজোটের অপর গ্রুপের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস সাহেব কয়েকদিন পর একই ধরনের বিবৃতি দিলেন। তাঁর বিবৃতিও ঐসব পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করা হয়।

ইসলামী ঐক্যজোটের দুই গ্রুপের দুই চেয়ারম্যান কাওমী মাদরাসার নেতা ও শিক্ষক। আলিয়া মাদরাসার কোনো শিক্ষক বা জমিয়তুল মুদাররেসীনের কোনো নেতা এ জাতীয় বিবৃতি দেননি। আলিয়া মাদরাসার ছাত্ররা মাওলানা মওদূদীর তাফসীর পড়ে গুমরাহ হয়ে যাবে বলে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেননি। কারণ, তাঁরা মাওলানা মওদূদীর লেখা তাফসীর পড়ে এতে আপত্তিকর কিছুই পাননি; বরং তাঁরা মনে করেন যে, মাদরাসার ছাত্রদের এ তাফসীর পড়া উচিত, যাতে তারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত মহলের নিকট কুরআনের আলো বিতরণের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

মাওলানা মওদূদী আজীবন এ শিক্ষা প্রদান করে গেছেন যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ছাড়া অন্য কোনো মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই মাওলানা মওদূদীর লেখায় ভুল থাকতেই পারে। ১৯৮৯ সালের এপ্রিলে সকল ইসলামী দলের শীর্ষ বৈঠকে আমি আবেদন জানিয়েছিলাম, মাওলানা মওদূদীর বইসমূহের ভুলগুলো ধরিয়ে দিলে বাধিত হব। বৈঠকের সভাপতি শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক মন্তব্য করলেন, 'অধ্যাপক সাহেব বল আমাদের কোর্টে ফেলে দিলেন। এখন এটা আমাদের দায়িত্ব....। আমরা যদি মাওলানা মওদূদীর রচনায় ভুল চিহ্নিত করে দিই তাহলে তিনি জামায়াতের মধ্যে তা কাজে লাগাতে পারবেন।' এ উদ্দেশ্যেই আমি ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে হাফেযজী হুযূরের নিকট এই দায়িত্ব গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিলাম, যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আমার ধারণা যে, যদি তাঁরা এ দায়িত্বটি গ্রহণ করতেন তাহলে মাওলানার রচনাবলি পড়ার সুযোগ পেতেন এবং আলিয়া নেসাবের আলেমগণ এগুলো পড়ার কারণেই যেমন জানেন এতে আপত্তিকর কিছু নেই, তেমনি তাঁরাও জানতে পারতেন।

কাওমী মাদরাসার নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

মাওলানা মওদূদীর রচিত সাহিত্য কাওমী মাদরাসার নেতৃবৃন্দ নিজেরা তো পড়েনই না, মাদরাসার কোনো শিক্ষক ও ছাত্র যাতে তা না পড়েন সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। যদি তাঁরা জানতে পারেন যে, কেউ তা পড়েন, তাহলে শিক্ষক হোক বা ছাত্র হোক তাকে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার করা হয়। দীন ইসলামের মহান খাদিম হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁরা এমন ভূমিকা পালন করছেন তা আমি জানার চেষ্টা করেছি। তাঁদের নেক নিয়তের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। আমি মনে করি, তাঁরা ইসলামবিরোধী ভূমিকা পালন করতে পারেন না। তাহলে তাদের ঐ ভূমিকার ব্যাখ্যা কী?

আমি ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে এমএ পরীক্ষা দিয়ে তাবলীগ জামায়াতে তিন চিল্লায় বের হই। দিল্লিতেও চিল্লা দিই। ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে জামায়াতে যোগদানের পূর্বে আমি

এ দেশের তাবলীগ জামায়াতের দায়িত্বশীলগণের মধ্যে গণ্য ছিলাম। তাই হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের অনেক বড় বড় আলেম– বিশেষ করে বাংলাদেশের তাবলীগ জামায়াতের আমীর মাওলানা আবদুল আযীযের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি জানতে পারলাম, তাঁরা অনেকেই ধারণা করছেন যে, আমি জামায়াতে যোগদান করে গুমরাহ হয়ে গিয়েছি।

আমি তখন রংপুর কারমাইকেল কলেজে শিক্ষকতা করছি। আমার ঠিকানায় দিল্লি, করাচিসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বহু ফতোয়া ও তীব্র সমালোচনামূলক পুস্তক-পুস্তিকা পৌঁছে গেল। এ সম্পর্কে 'জীবনে যা দেখলাম'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

রংপুর কলেজে থাকাকালে পড়ার জন্য প্রচুর সময় পেতাম। তখনই আমি ঐসব বই পড়ে নিলাম এবং মাওলানা মওদূদীর যেসব বই থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেসবও সংগ্রহ করে যাচাই করলাম। ঐ যাচাইয়ের ফলাফল এখানে উদ্ধৃত করছি :

১. কোনো কোনো লেখকের সমালোচনায় মোটেই বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। তাঁরা নিরপেক্ষ হয়ে এবং যুক্তি দেখিয়ে মাওলানার কোনো কোনো বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। এর দ্বারা আমি এ শিক্ষা পেলাম যে, মাওলানা মওদূদীকে সম্পূর্ণ নির্ভুল মনে করে অন্ধভাবে তাঁর সব কথা গ্রহণ করা উচিত নয়। যেহেতু নবী ছাড়া কেউই ভুলের উর্ধ্বে নয়, তাই যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করেই তাঁর লেখা পড়তে হবে।

২. কতক লেখকের ভাষা বিদ্বেষপূর্ণ। যুক্তি দিয়ে ভুল ধরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে পাঠককে বিভ্রান্ত করাই তাদের উদ্দেশ্য। এর জন্য তারা নিম্নোক্ত তিন ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছেন–

   ক. মাওলানার লেখা থেকে উদ্ধৃত করার সময় কোথাও বাক্যের পূর্বের কথা বাদ দিয়ে আবার কোথাও পরের বাক্য উল্লেখ না করে কোনো বাক্যের শুধু ঐ অংশটুকু তুলে ধরা হয়েছে, যা যে কারো কাছে আপত্তিকর মনে হবে।

   খ. কোথাও কোথাও মাওলানার কথার সাথে শুরু বা শেষে এমন শব্দ যোগ করা হয়েছে, যা মাওলানার বক্তব্যকে বিকৃত করে দিয়েছে।

   গ. কোথাও এমন কোনো বাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা অন্য লোকের বক্তব্য হিসেবে মাওলানার বইয়ে তিনি উদ্ধৃত করে তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। অথচ ঐ বাক্যটি মাওলানার বইয়ে থাকার কারণে তা তাঁর বক্তব্য হিসেবেই দেখানো হয়েছে।

৩. একজন লেখক এমন পেলাম, যিনি বিদ্বেষ পোষণ করেন না বটে; কিন্তু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের যে তাৎপর্য মাওলানা মওদূদী পেশ করেছেন, তার সাথে তিনি একমত নন। আমার ধারণা হলো, তিনি ইসলামকে 'ধর্ম' হিসেবে বিশ্বাস করেন। ইসলাম যে একটি বিপ্লবী আন্দোলন তা তিনি মনে করেন না।

যাহোক, বিরোধীদের লেখা বই থেকে আমি নিম্নরূপে উপকৃত হয়েছি :

১. ঐ বইগুলো আমাকে মাওলানা মওদূদীর বহু বই অল্প সময়ের মধ্যে পড়তে বাধ্য করেছে। এ সময়ের মধ্যে এত বই স্বাভাবিকভাবে পড়া হতো না। এতে ইসলামী আন্দোলন, সংগঠন ও ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

২. মহব্বত ও আবেগের তাড়নায় যেন মাওলানা মওদূদীর সকল মতামত ও বক্তব্যকে নির্ভুল মনে না করি, সে ব্যাপারে আমাকে সচেতন থাকতে ঐ বইগুলো সাহায্য করেছে। কুরআন ও হাদীসের যুক্তি ব্যতীত কোনো কথা যেন শুধু মাওলানার বক্তব্য বলে দলীল হিসেবে গ্রহণ না করি, সে বিষয়েও আমাকে সাবধান থাকতে উপদেশ দিয়েছে।

৩. ইখলাসের সাথে সংশোধনের নিয়তে সমালোচনার ভাষা এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি ও বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। ঐ বইগুলো থেকে দ্বিতীয় প্রকার লেখার বক্তব্য উপেক্ষা করা ও প্রথম প্রকার লেখার যুক্তি বিবেচনা করার কৌশল শিখেছি।

এ ফতোয়াবাজির পটভূমি

বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতারাম মুহতামিম ও জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ-প্রধান মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র) 'মুত্তাহিদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম' নামক এক পুস্তিকায় ভারতের হিন্দু-মুসলিম-শিখ-বৌদ্ধ ইত্যাদি মিলে এক ভারতীয় কাওম (জাতি) বলে দাবি করেছেন। এ দাবি মূলত ভারতীয় কংগ্রেস দলের। মি. গান্ধী ও নেহরু এ মতবাদের নেতা। অথচ মাওলানা মাদানী (র) এ মতবাদকেই ঐ পুস্তিকায় ইসলামসম্মত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন।

১৯৩৯ সালে মাওলানা মওদূদী এ মতবাদের সমালোচনা করে 'মাসআলায়ে কাওমিয়াত' নামে একটি বই লেখেন। তাতে তিনি কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের যুগের দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেন যে, মুসলিম আলাদা জাতি। হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে মিলে মুসলিমরা এক জাতি হতে পারে না। এ মতবাদ মুসলিম লীগের পক্ষে যায়। মাওলানা মওদূদীর এ বইটি বাংলায় 'ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ' নামে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

লাহোরে অনুষ্ঠিত ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মুসলিম লীগ সম্মেলনে ভারত বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর গোটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ময়দান উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তখন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের দাবিদার এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারত বিভাগের দাবিদার হিসেবে একে অপরের বিরুদ্ধে প্রচারণায় লিপ্ত হয়।

কংগ্রেস দল মুসলমানদের সমর্থন হাসিলের জন্য মাওলানা মাদানী (র)-এর 'মুত্তাহিদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম' বইটি তাদের জনসভায় পড়ে শোনাতে থাকে। আর মুসলিম লীগ মাওলানা মওদূদীর 'মাসআলায়ে কাওমিয়াত' বইটি তাদের জনসভায় পড়ে মুসলিম জনগণকে জাতীয়তার প্রকৃত অর্থ বোঝাতে থাকে।

মাওলানা মওদূদীর বইটিতে তিনি মাওলানা মাদানীর নাম নিয়ে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর মতামতকে ইসলামবিরোধী হিসেবে প্রমাণ করার জন্য অত্যন্ত জোরালো যুক্তি পেশ করেছেন।

এ পরিস্থিতিতে মুসলিম জনগণের নিকট স্বাভাবিক কারণেই মাওলানা মাদানী (র)-এর ভাবমর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। মাওলানা মাদানী (র)-এর শাগরেদ ও মুরীদগণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা। মাওলানা মাদানী শুধু মাদরাসার উস্তাদই নন, পীরও বটে। তাই তাঁর প্রতি যাদের গভীর মহব্বত রয়েছে তারা মাওলানা মওদূদীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

পরবর্তীকালে মাওলানা মওদূদীর বিভিন্ন পুস্তক ও তাঁর লেখা তাফসীর থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেওবন্দ, সাহারানপুর ও বিভিন্ন মাদরাসার মুফতীগণের নিকট ফতোয়া চাওয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয় যে, তারা ফতোয়া তলবের সেই আবেদনে উদ্ধৃতি পেশ করার সময় মাওলানা মওদূদীর লেখা থেকে কিছু অংশ বাদ দেয় বা তাঁর বক্তব্যের সাথে কিছু অংশ যোগ করে। ফলে মাওলানা মওদূদীর মূল বক্তব্যের অর্থ বিগড়ে যায় এবং মুফতীগণ ঐসব ভুল উদ্ধৃতিকেই সঠিক ধারণা করে ফতোয়া দিয়েছিলেন। মুফতীগণ জেনে-বুঝে মাওলানা মওদূদীকে হেয় করার নিয়তে ঐ ফতোয়া দিয়েছিলেন বলে আমরা মনে করি না। তাঁরা যে রকম উদ্ধৃতি পেয়েছেন এর ভিত্তিতেই ফতোয়া দিয়েছেন। মাওলানা মওদূদী মুফতী সাহেবদের নিকট অপরিচিত নন। আল জমিয়ত পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তাঁর লেখা নিশ্চয়ই তাঁরা পড়েছেন। সুতরাং মাওলানার নামে এমন সব জঘন্য কথার উদ্ধৃতি দেখার পর তাঁদের উচিত ছিল, মাওলানার মূল বই পড়া।

মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতাকারী একশ্রেণীর আলেম মাওলানা মওদূদীর লেখা কিতাবাদির মিথ্যা উদ্ধৃতি বহু বছর থেকে প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আমার বাড়িতে চরমোনাইর পীর সাহেবের উপস্থিতিতে আমার আপন ভাগ্নি-জামাই (দেওবন্দ মাদরাসাপাস) দুটো উদ্ধৃতি নোট বই থেকে শোনালে মূল বই দেখার পর তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

মাওলানা মওদূদীর লেখা পুস্তকাদি না পড়েই কাওমী মাদরাসার একশ্রেণীর আলেম ঐসব মিথ্যা উদ্ধৃতি অব্যাহতভাবে প্রচার করে চলেছেন।

একটা বড় উদাহরণ

কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার 'আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম'-এর 'আফতাব' নামে প্রকাশিত ২০০৩ সালের বার্ষিক স্মরণিকায় মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে কয়েকটি মিথ্যা উদ্ধৃতি প্রকাশ করা হয়।

স্থানীয় আলেম বরুড়া ধনীশ্বর জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমান ঐ স্মরণিকার সম্পাদক ও মাদরাসার দায়িত্বশীল শিক্ষকদের নিকট আপত্তি জানান যে, মাওলানা মওদূদীর বই থেকে যেসব উদ্ধৃতি প্রচার করা হয়েছে তা মিথ্যা। অতএব আপনারা প্রমাণ করুন যে, তাঁর বইয়ে এসব জঘন্য কথা লেখা আছে। এতে তারা

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমানের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হন। তিনি তখন তাদের কাছে উকিল-নোটিশ পাঠান এবং তারা তাতে সাড়া না দেওয়ায় তিনি কুমিল্লার দেওয়ানি আদালতে প্রথম শ্রেণীর হাকীমের কোর্টে ২০০৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর একটি মামলা দায়ের করেন। (মামলা নং ২১৯/২০০৪)

মামলার বাদী নয়জন আলেমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তারা মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এলাকার জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। তারা মাওলানা মওদূদীর পুস্তকের নাম উল্লেখ করে যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা জঘন্য মিথ্যা। কারণ, এমন কোনো কথাই মাওলানা মওদূদী লিখেননি।

আদালত মামলা গ্রহণ করে বরুড়া থানার ওসিকে তা তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেন। থানার ওসি তাদেরকে তলব করলে প্রথমে তারা পরোয়াই করেননি। গ্রেফতারের ভয় দেখালে তাদের মধ্যে পাঁচজন থানায় লিখিতভাবে জানান যে, স্মরণিকার সম্পাদক কোনোরূপ সম্মতি না নিয়েই তাদের নাম ব্যবহার করেছেন। তাই তারা এর সাথে জড়িত নন। সম্পাদক এলাকা থেকে অনেক আগেই পালিয়ে গেছেন। বাকি তিনজনও এলাকার বাইরে। এমতাবস্থায় থানার পূর্ববর্তী ভারপ্রাপ্ত অফিসার কোর্টে যে রিপোর্ট পাঠান তা পূর্ণাঙ্গ নয় বলে বর্তমান (জুন, ২০০৫) ওসির প্রতি আদালত পুনরায় তদন্তক্রমে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিতনাবাজ আলেমদের একই ভূমিকা

বরুড়া থানার ফিতনাবাজ আলেমদের মতো ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়ও কতক ফিতনাবাজ আলেম ঐসব মিথ্যা উদ্ধৃতি প্রচার করেছেন। তাদের প্রচারিত বিজ্ঞাপনটির মধ্যে চারটি উদ্ধৃতি রয়েছে, যা বরুড়ায় প্রকাশিত স্মরণিকায়ও ছিল।

বরুড়ায় মামলা দায়েরকারী বাদী মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমান ২৫.০৬.০৫ তারিখে তাঁর মামলার কাগজপত্র আমার কাছে দিয়ে গেলেন। তাঁকে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজ্ঞাপনে প্রচারিত চারটি উদ্ধৃতি যাচাই করার জন্য মাওলানার লেখা তাফসীর ও অন্যান্য বই বের করে দেখলাম। তাদের দেওয়া পৃষ্ঠা ঠিকই মিলল। কিন্তু উদ্ধৃতিতে বেঈমানীর আলামত পেলাম। যেমন– তারা উদ্ধৃত করেছেন, 'হযরত ইবরাহীম (আ) ক্ষণিকের জন্য শিরকের গুনাহে নিমজ্জিত ছিলেন।'

অথচ মাওলানা লিখেছেন, 'কতক লোক এ ভুল ধারণা করতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ক্ষণিকের জন্য শিরকের গুনাহে নিমজ্জিত ছিলেন।'

যারা ইচ্ছাকৃতভাবে এ রকম অপবাদ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে ঈমান, আল্লাহর ভয় ও আখিরাতে জবাবদিহিতার চেতনা আছে বলে মনে হয় কি?

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়ও এ জাতীয় ফিতনাবাজ আলেমদের বিরুদ্ধে কেউ মামলা দায়ের করলে তাদেরও বরুড়ার আসামিদের দশাই হবে– এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মাওলানা আবদুর রহমান সেদিন বলে গেলেন, মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ায় ফিতনাবাজ আলেমরা অন্যত্র চলে গেছেন। বর্তমানে মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রগণ মাওলানা

মওদূদীর বই পড়তে আগ্রহী হয়েছেন। এমনকি মাওলানা মওদূদীর লেখা তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' মাদরাসার লাইব্রেরিতে রাখার সিদ্ধান্তও নাকি গৃহীত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের ন্যায় সত্যের পথে চলতে সাহায্য করুন। আমাদের দেশে এমন অনেক যোগ্য আলেম রয়েছেন, যাঁরা মাওলানা মওদূদীর বই পড়লে ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারতেন।

২৩০.

সাধারণ জনগণের কাছে আলেম সমাজই দীনী ইলমের উৎস

আমাদের দেশে কোটি কোটি মুসলমান আল্লাহকে বিশ্বাস করে, রাসূল (স)-কে মহব্বত করে এবং আল্লাহর কিতাব কুরআনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। যারা মাতৃভাষা পড়তে জানে না, তাদের মধ্যেও অনেকে কুরআন তিলাওয়াত করে। কেউ রাসূল (স) ও কুরআনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে বেনামাযীরাও তা সহ্য করে না। ভোট পেতে হলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ' বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ধানের শীষে বিসমিল্লাহ' স্লোগান দিয়ে জনগণকে আশ্বাস দিতে হয় যে, এ স্লোগানদাতারাও আল্লাহ-রাসূলের ভক্ত। ইসলামের প্রতি জনগণের এই যে ভালোবাসা, তাদের মধ্যে এই যে ইসলামী চেতনা তা নিঃসন্দেহে আলেম সমাজেরই মূল্যবান অবদান।

মসজিদের ইমাম, খানকাহর পীর, মাদরাসার মুদাররিস, ওয়ায়েয ও তাবলীগ জামায়াতের মুবাল্লিগগণ যেটুকু দীনের আলো জনগণের নিকট পৌঁছাচ্ছেন সেটুকু ছাড়া তারা আর কোথা থেকে আলো পাবে!

প্রায় দুই শ' বছর এ দেশ ইংরেজদের গোলাম ছিল। ওরা যেখানেই শাসনক্ষমতা পেয়েছে সেখানেই জনগণকে খ্রিস্টান বানাতে সক্ষম হয়েছে। ইংরেজরা এ দেশে যত লোককে খ্রিস্টান বানাতে পেরেছে তারা প্রধানত হিন্দু-বৌদ্ধ বা উপজাতি ছিল; তারা মুসলমানদের খ্রিস্টান বানাতে পারেনি। এটা ওলামায়ে কেরামেরই বিরাট অবদান।

ইংরেজ আমলের আগে এ দেশে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে কম ছিল। ইংরেজ আমলেই হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বেড়েছে। এটাও আলেমদেরই অবদান।

আলেমগণ জনগণের সহযোগিতা নিয়ে মাদরাসাগুলোর মাধ্যমে আলেমবাহিনী গড়ে না তুললে মসজিদগুলোও বিরান হয়ে যেত। আমাদের দেশে জনগণের মধ্যে যে দীনী জযবা, ইসলামী জোশ ও মুসলিম চেতনা রয়েছে এর সবটুকুর কৃতিত্বই আলেম সমাজের। তাঁরা মাদরাসাসমূহে দীন সম্পর্কে যেটুকু ধারণা পেয়েছেন তা-ই জনগণের নিকট পরিবেশন করছেন।

ইংরেজ আমলে মাদরাসার মান

এ দেশে ইংরেজ শাসনের পূর্বে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ শ' বছর মুসলিম শাসন ছিল। তখন একই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। ঐ শিক্ষায় শিক্ষিতরা এমন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পেতেন, যার ফলে

সরকারি ও বেসরকারি সকল বিভাগে তাঁরা দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করতেন। একাধারে ধর্মীয় ও সরকারি দায়িত্ব পালনের উপযোগী শিক্ষাই তাঁরা পেতেন।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকালীন যাবতীয় খরচ এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতা মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি থেকেই নির্বাহ করা হতো। ১৭৫৭ সালেই ইংরেজদের রাজত্ব কায়েমের পর তাদের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার সাথে সাথে ঐসব ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় মুসলিমদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। আলেম সমাজ দীনী শিক্ষা ও মুসলিম জাতির ঈমানের হেফাযতের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে আবার সেই মাদরাসা শিক্ষা চালু করেন।

আমাদের দেশে সরকার বিরাট অংকের টাকা ব্যয় করেও শিক্ষার আশানুরূপ উন্নতি করতে পারছে না। বাস্তব কারণেই ইংরেজ আমলে সরকারি সাহায্য ছাড়া মাদরাসা শিক্ষাকে মুসলিম আমলের মতো উন্নত করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া মাদরাসা-শিক্ষিতদের সরকারি চাকরির কোনো সুযোগও তখন ছিল না। মসজিদের ইমাম ও মাদরাসার শিক্ষক পদ ছাড়া অন্য কোনো পদে তাদের চাকরি পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। যে শিক্ষার পর দুনিয়ায় উন্নতির কোনো সুযোগ নেই, সে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সচ্ছল লোকেরা তাদের সন্তানদেরকে পাঠাতেন না। মেধাবীদেরও এ শিক্ষার প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না। এ শিক্ষায় শুধু তারাই নিজেদের সন্তানদেরকে পাঠাতেন, যারা দুনিয়ার বদলে আখিরাতের সাফল্যই কামনা করেন।

যেকোনো শিক্ষাব্যবস্থা ময়দানের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যেই লোক তৈরি করে। কিন্তু তখন ময়দানে ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদির কোনো চর্চাই ছিল না। তাই মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত না হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। অতএব মাদরাসা তখন শুধু মসজিদের ইমামতি, মাদরাসায় কুরআন-হাদীস-ফিক্‌হের শিক্ষকতা এবং নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত ও বিয়ে-তালাক-ফারায়েয ইত্যাদি বিষয়ে মুসলিম জনগণের ধর্মীয় দাবি পূরণের দায়িত্ব পালন করত।

আমার দাদা ঢাকার বিখ্যাত মুহসেনিয়া মাদরাসাপাস আলেম ছিলেন। আমাদের এলাকায় বহুদূর পর্যন্ত এত বড় কোনো আলেম ছিলেন না। তাই অনেক দূর থেকেই মসজিদের ইমাম ও সমাজের গণ্যমান্য লোক দাদার কাছে আসতেন। তালাক ও ফারায়েযের মাসআলা নিয়েই বেশি লোক আসতেন। দাদা আরবী ভাষায় লেখা ফিক্‌হের বড় বড় কিতাব খুলে তাদের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সময় দিতেন। হজ্জ-যাকাতের চর্চাও মাঝেমধ্যে হতো। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত কোনো মাসাআলা নিয়ে কেউ তাঁর কাছে এসেছেন বলে শুনিনি।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান মাদরাসার সিলেবাসে থাকার প্রয়োজন ছিল না। ইতিহাস, ভূগোল, অংক শেখারও প্রয়োজন ছিল না। ময়দানের দীনী প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পালনের যোগ্য লোকই মাদরাসায় তৈরি করা হতো। এসব মাদরাসায় পড়া আলেমগণই

যদি মসজিদ, খানকাহ ও ওয়ায মাহফিলে ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষাটুকু জনগণের নিকট বিতরণ না করতেন তাহলে জনগণ মুসলিম চেতনাই হারিয়ে ফেলত। আর মাদরাসাগুলো যদি না থাকত তাহলে এ দেশে কুরআন-হাদীসের কোনো চর্চাই থাকত না।

ইংরেজদের গোলামি থেকে আমরা ১৯৪৭ সালে মুক্তি পেয়েছি। ১৯৭১ সালে আমরা পাঞ্জাবিদের থেকেও স্বাধীন হয়েছি। এ পর্যন্ত আমাদের দেশে এমন কোনো সরকার কায়েম হয়নি, যারা শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামী জীবনবিধানের আলোকে গড়ে তোলার যোগ্যতা রাখে বা সেজন্য ইচ্ছা পোষণ করে। আলিয়া মাদরাসাগুলোতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যতটুকু শেখানো হয় তা স্কুল-কলেজের সেক্যুলার শিক্ষারই অনুরূপ। এটা শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামীকরণ নয়। মাদরাসায় দাখিল ও আলিম পাস করে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিতে পারে শুধু সে ব্যবস্থাটুকুই এতে রাখা হয়েছে। কাওমী মাদরাসায় আলিয়া মাদরাসার মতো ব্যবস্থাও চালু হয়নি। প্রাচীন ব্যবস্থাই বহাল রয়েছে। অবশ্য বর্তমানে কিছু বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা আগে ছিল না।

যারা এ প্রশ্ন তোলেন যে, কাওমী মাদরাসায় ইসলামী জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ-শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই কেন, তারা ঐসব মাদরাসা-কর্তৃপক্ষের প্রতি অন্যায় দোষারোপ করেন। কেননা, ঐ রকম শিক্ষাব্যবস্থা সরকারি উদ্যোগ ছাড়া কিছুতেই গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ইংরেজ আমল থেকে এ পর্যন্ত মাদরাসা-শিক্ষিত আলেম সমাজ কুরআন ও হাদীসকে বাঁচিয়ে রাখা এবং মুসলিম জনগণের ইসলামী চেতনা জাগ্রত রাখার ক্ষেত্রে যে বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, সেজন্য আধুনিক শিক্ষিত সকলকে তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কেননা, তাঁরা না থাকলে বিয়ে পড়ানোর লোকও পাওয়া যেত না। উচ্চশিক্ষিতদের জানাযা-দাফন-কাফনও ইসলামী নিয়মে সম্ভব হতো না। উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে যাঁরা কুরআন তিলাওয়াত ও নামায আদায় করেন তারাও মূলত ঐ আলেম সমাজের কাছে ঋণী। তাই আলেম সমাজের দীনী খিদমতকে নগণ্য মনে করা জঘন্য অপরাধ।

আমার দীনী জিন্দেগী গড়ার কাহিনী

আমার আব্বা আমার দাদার বড় ছেলে ছিলেন। তিনি ঐ মাদরাসা থেকেই আলিম হয়েছেন, যেখানে দাদা পড়েছেন ও পড়িয়েছেন। আমি দাদার বড় নাতি। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত বয়সকাল দাদার সুহবতেই কেটেছে। তাঁর সাথেই খেতাম, তাঁর হাত ধরেই মসজিদে যেতাম। তিনি আমাকে মুখে মুখে অনেক কিছুই শেখাতেন। দাদার ইনতিকালের সময় আমার বয়স ছিল সাড়ে তেরো বছর। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ওঠার পর আরবী শেখার জন্য নিউ স্কিম জুনিয়র মাদরাসায় তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য দূরে যেতে হলো। সেখানেও আমি একজন আদর্শ শিক্ষকের স্নেহধন্য হই।

আমার দাদা ঐ বয়সেই আমার অন্তরে এতটুকু ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, আমাকে অনেক শিক্ষিত হতে হবে। বাংলা, আরবী ও ইংরেজি ভাষা পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে হবে। রাসূল (স) যে শিক্ষা দিয়েছেন তা শিখতে হবে ও পালন করতে হবে,

যাতে মরণের পর বেহেশতে যাওয়া যায়। দাদার শেখানো এসব কথা আমি ভুলিনি। তাই আল্লাহ, রাসূল ও ইসলাম সম্পর্কে কোনো বই কোথাও দেখলে পড়ে শেষ না করে ক্ষান্ত হতাম না। জুনিয়র মাদরাসায় আমার ঐ আদর্শ শিক্ষক 'শিয়াল পণ্ডিত' বই যেমন পড়তে দিয়েছেন, তেমনি 'নামায শিক্ষা' বইও দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কিত বই তখন খুব কমই ছিল। জুনিয়র মাদরাসার লাইব্রেরিতে যে ক'টি বই ছিল তা স্যার আমাকে পড়তে দিতেন।

সপ্তম শ্রেণীতে কুমিল্লা হোচ্ছামিয়া হাই মাদরাসায় ভর্তি হই। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় দশম শ্রেণীর একজন ধার্মিক ছাত্রের নিকট মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর লেখা বই ও ওয়াযের বাংলা অনুবাদ (মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র) কর্তৃক অনূদিত) পড়ার সুযোগ পাই।

দাদার সংস্পর্শে থেকে ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে বুঝতে শিখেছিলাম; মাওলানা থানভী (র)-এর লেখা পড়ে অনুভব করলাম যে, ইসলাম অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ধর্ম। তিনি কুরআন ও হাদীস উদ্ধৃত করে তা এমন চমৎকার যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন যে, আমি দারুণভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হই। তাঁর লেখায় নকলী ও আকলী দলীলের সমাবেশ আমাকে সেগুলো পড়তে উদ্বুদ্ধ করে।

১৯৪০ সালে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান কবি নজরুল কলেজ) নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে আমি অবিলম্বে চকবাজার মসজিদে মাওলানা থানভী (র)-এর রচনাবলির অনুবাদক মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)-এর সাথে যোগাযোগ করি। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। তাঁর জীবন থেকে আমি বহু কিছু শিখেছি। 'জীবনে যা দেখলাম'-এর প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছি।

তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের অবদান

১৯৫০ সালের মার্চে এমএ পরীক্ষা দিয়েই তিন চিল্লা (চার মাস) সময় এ দেশে ও দিল্লিতে কাটাই। তাবলীগ জামায়াত আমার মধ্যে এ জযবা সৃষ্টি করল যে, ইসলাম এমন এক মহান ধর্ম, যার প্রতি জনগণকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য গোটা জীবন উৎসর্গ করা কর্তব্য। ১৯৫২ সালে তমদ্দুন মজলিসে যোগদান করে জানতে পারলাম যে, ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয়– এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকসহ জীবনের সকল দিক সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বিধান পাঠিয়েছেন, যা রাসূল (স) বাস্তবে চালু করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এ শিক্ষা আমি তাবলীগ জামায়াতে পাইনি। তাবলীগ জামায়াতে অনেক বড় বড় আলেমের বয়ান শুনেছি; কিন্তু এ জাতীয় কথা তো কখনো শুনিনি। এমনকি সেখানে কুরআন মাজীদ বোঝার কোনো তাকিদও কেউ দেননি।

তাবলীগ জামায়াতে ইসলামের ধর্মীয় দিক আমাকে এতটা আকৃষ্ট করেছিল যে, তমদ্দুন মজলিসের শিক্ষা তাবলীগে না থাকা সত্ত্বেও আমি তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিসের সাথে সমান গুরুত্বসহকারে কাজ করেছি। এমনকি রংপুরে আমি এ দুটোরই প্রতিষ্ঠাতা দায়িত্বশীল ছিলাম।

তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমেই আমি প্রথম মাওলানা মওদূদীর তিনটি বই পাই। দুটো ইংরেজিতে ও একটি বাংলায়। The Process of Islamic Revolution (ইসলামী বিপ্লবের পথ), The Political Theory of Islam (ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ) ও 'একমাত্র ধর্ম'– এ কয়েকটি বইয়ে ইসলামের যে খোরাক পেলাম তা আমার ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণা আরো বৃদ্ধি করে দিল।

জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে তখনো আমি কিছু জানতাম না। মাওলানা মওদূদীর লেখা বই পড়ে অত্যন্ত প্রেরণা লাভ করলাম বটে, কিন্তু তাঁর কোনো সংগঠন আছে বলে আমার জানা ছিল না। ১৯৫৪ সালে গাইবান্ধায় গিয়ে জানতে পারলাম যে, জামায়াতে ইসলামীই মাওলানা মওদূদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংগঠন।

তমদ্দুন মজলিস ধর্মীয় অনুশাসন পালনের দিক দিয়ে অত্যন্ত ঢিলা মনে হতো বলেই তাবলীগ জামায়াতের আকর্ষণ আমার মন-মগজে অব্যাহত ছিল। জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে যখন আমার এই ধারণা হলো যে, এখানে ইসলামের সবদিকের প্রতিই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় তখন আমি তাবলীগ জামায়াত ও তমদ্দুন মজলিস ছেড়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করি। তবে আমি এখনো ঐ দুটি সংগঠনকে ভালোবাসি ও আমার জীবনে সংগঠন দুটির অবদানকেও স্বীকার করি।

জামায়াতে ইসলামীতে এসে যা শিখলাম

বাপ-দাদার নিকট থেকে ইসলামকে ধর্ম হিসেবেই জানতাম। মাওলানা থানভী (র) থেকে শিখলাম, ইসলাম অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ধর্ম। তাবলীগ জামায়াতে এসে প্রেরণা পেলাম যে, ইসলাম ধর্মকে জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তমদ্দুন মজলিসে এসে জানলাম, ইসলাম শুধু ধর্ম নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। আর জামায়াতে ইসলামীতে এসে উপলব্ধি করলাম যে, দীন ইসলাম আল্লাহর দেওয়া এমন এক জীবনবিধান, যা অন্য কোনো বিধানের অধীনে বেঁচে থাকতে পারে না। মানবরচিত সকল বিধানের উপর এ দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যেই রাসূল (স)-কে পাঠানো হয়েছে এবং যে-ই এ রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে তাকেও জান-মাল দিয়ে এ দীনকে বিজয়ী করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করতে হবে। তাই দীন ইসলাম শুধু ধর্ম বা মিশন নয়, মুভমেন্ট বা আন্দোলনও বটে।

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর চার-পাঁচটি সাপ্তাহিক বৈঠকে দারসে কুরআন শুনে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। জানতে পারলাম, রাসূল (স)-কে যে বিরাট দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল তা পালনের জন্য ধাপে ধাপে কুরআন মাজীদ কীভাবে তাঁকে পরিচালনা করেছে সে দৃষ্টিভঙ্গিতেই এ কুরআন মাজীদকে অধ্যয়ন করতে হবে। রাসূল (স)-এর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনের সাথে মিলিয়েই কুরআনকে বুঝতে হবে। রাসূলের জীবনই বাস্তব ও জীবন্ত কুরআন। রাসূলের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের কোন্ স্তরে কোন্ সূরা নাযিল হয়েছে তা না জানলে কুরআন সঠিকভাবে বোঝা যাবে না।

জনাব আবদুল খালেক-এর দারস থেকে জানা গেল, মাওলানা মওদূদী ঐ দৃষ্টিভঙ্গিতেই 'তাফহীমুল কুরআন' নামক তাফসীর লিখেছেন। আমি এ তাফসীর পড়ার প্রয়োজনে উর্দু

ভাষা শিখলাম। তাবলীগ জামায়াতে কাজ করার সময় সামান্য উর্দু শিখেছিলাম। এরপর সিরিয়াস হয়ে তাফসীর অধ্যয়ন করতে লাগলাম। ফলে কুরআন বোঝার প্রকৃত মজা পেলাম এবং এর প্রতি দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হলাম। তখনো এ তাফসীর বাংলায় অনুবাদ হয়নি।

মাওলানার বিরুদ্ধে লেখা বইগুলোর বক্তব্য যাচাই করার প্রয়োজনে সাত-আট মাস ব্যাপক অধ্যয়ন করতে বাধ্য হই। পড়ার নেশা পেয়ে বসল। মানবজীবনের যত দিক রয়েছে সকল দিকের জন্য ইসলাম যে বিধান দিয়েছে তা জানার আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। হাকীকত সিরিজের ঈমান, ইসলাম, নামায-রোযা, যাকাত, হজ্জ ও জিহাদ সম্পর্কে বইগুলো পড়ে মন আলোকিত ও পুলকিত হয়ে উঠল। এসব বিষয়ের এমন গভীর ও হৃদয়গ্রাহী অর্থ এর আগে কখনো শুনিনি।

আলেম বংশে আমার জন্ম। আমার নানা-মামারাও আলেম ও পীর ছিলেন, তাই আলেম পরিবেশেই আমি বড় হয়েছি। আলেমদের হেদায়াতমতোই নামায-রোযা করেছি। কিন্তু এর হাকীকত বা তাৎপর্য এমন চমৎকারভাবে তাঁরা আমাকে শেখাননি। তাবলীগ জামায়াতে একটানা সাড়ে চার বছর কাজ করেছি। সেখানেও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে নামায-রোযার ফযীলত ছাড়া আর কোনো তাৎপর্য জানতে পারিনি।

আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব বা দীনকে বিজয়ী করার কর্তব্য সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীতে এসেই একটা পরিষ্কার ধারণা পেলাম। ইসলামী শাসনতন্ত্র, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইসলামী সরকারের কর্মসূচি, ইসলামী অর্থনৈতিক বিধান ইত্যাদির কোনো ধারণাই মাওলানা মওদূদীর বই পড়ার আগে আমার অন্তরে সৃষ্টি হয়নি।

ইসলামী জীবনবিধান সম্পর্কে এই যে ব্যাপক ধারণা পেলাম তা আমাদের আলেম সমাজে যদি চালু থাকত তাহলে আমি আরো আগেই এ সম্পর্কে জানতে পারতাম। এ জাতীয় বই ইতঃপূর্বে কোথাও দেখিনি।

বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সব দেশেই ইসলামী চিন্তাবিদ রয়েছেন। ঐসব সম্মেলনে যেসব বড় বড় চিন্তাবিদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁরা মাওলানা মওদূদীকে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে মর্যাদা দেন। আরব বিশ্বের আলেম সমাজে তিনি খুবই সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য। তিনি জীবিত থাকাকালেই ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে বিখ্যাত 'বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার' লাভ করেন। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কমিটির তিনি একজন সদস্য ছিলেন।

যাঁর তাফসীর ও ইসলামী সাহিত্য থেকে ইসলামী জীবনবিধানকে ব্যাপকভাবে জানার সুযোগ পেলাম, তাঁর বিরুদ্ধে যারা বিরূপ মন্তব্য করেন তাদের সম্পর্কে আমার মনে ভালো ধারণা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। আলেম সমাজ থেকে ইসলামের এমন সুস্পষ্ট জ্ঞান আমি পাইনি। যাঁর কাছ থেকে সে জ্ঞান পেলাম তাঁকে তারা কেন মন্দ বলেন, তা জানার চেষ্টা করেছি।

কাওমী মাদরাসার আলেমগণের ভূমিকা

আমাদের দেশের কাওমী মাদরাসাগুলোকে দারুল উলুম দেওবন্দের শাখা বলা চলে। ওলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে কয়েকজন বড় ব্যক্তিত্ব মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে কঠোর ভাষায় কতক বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তাঁদেরকে বড় আলেম হিসেবে আমিও শ্রদ্ধা করি। আর কাওমী আলেমদের নিকট তাঁরা অত্যন্ত উচ্চমর্যাদার অধিকারী। উস্তাদ ও বুযুর্গ হিসেবে তাঁদেরকে তাঁরা শ্রদ্ধার সাথে ভালোবাসেন। তাঁদের মুখে মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য জানার পর কাওমী আলেমগণ স্বাভাবিক কারণেই মাওলানা মওদূদীর বিরোধী। এ কারণেই কাওমী আলেমদের আমি দোষ দিতে পারি না।

তাঁদের প্রতি আমার দুটো আবেদন

১. আপনারা পাকিস্তানে গিয়ে ওলামায়ে দেওবন্দের নিকট জিজ্ঞেস করুন যে, তাঁরা জামায়াতে ইসলামীর সাথে আদর্শিক ঐক্য করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ইসলামী হুকুমত কেমন করে চালাচ্ছেন?

   বাংলাদেশের চেয়ে ওলামায়ে দেওবন্দের সংখ্যা পাকিস্তানে বেশি। সেখানে আমাদের দেশের মতো আলিয়া মাদরাসা নেই। তাঁরা ছয় দলীয় ইসলামী ঐক্যজোটের (MMA) সভাপতির পদ জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীরকে কেমন করে দিলেন? দেওবন্দের কয়েকজন বুযুর্গ ও আকাবের মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে এমন বিরূপ মন্তব্য করা সত্ত্বেও জামায়াতের আমীরকে তারা নেতা মেনে নিলেন কেন? এটা তো শুধু রাজনৈতিক ঐক্য নয়; একই সাথে দীনী ও আদর্শিক ঐক্য।

২. আপনারা যে বুযুর্গগণের মন্তব্যকে সঠিক মনে করে আছেন, তাঁরা নবীর মতো নির্ভুল নন। তাঁদের ইজতিহাদী গলত হতে পারে। অতএব তাঁরা ভুলের ঊর্ধ্বে নন। আপনারা মাওলানা মওদূদীর লেখা তাফসীর ও অন্যান্য সাহিত্য পড়ে দেখুন। হয়তো বুযুর্গগণ মাওলানা মওদূদীর কোনো লেখা বুঝতে ভুল করেও থাকতে পারেন। আর কোনো কোনো কথা আপত্তিকর মনে হলেও মাওলানার সব সাহিত্যকেই পরিত্যাজ্য মনে করা তো উচিত নয়।

একটা সত্য ঘটনা

প্রায় বিশ বছর আগের কথা। জামায়াতের একজন রুকন আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং পরিচয় দিলেন যে, তিনি কিশোরগঞ্জ জামেয়া এমদাদিয়া থেকে পাস করেছেন।

তিনি বললেন, "আমার একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ছাত্রদের সমাবেশে একটি বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর উন্নত ও সমৃদ্ধ আলোচনায় আমি এত মুগ্ধ হলাম যে, তিনি যেসব পয়েন্ট আলোচনা করেছেন তা আমি হুবহু নোট করে নিলাম।

মাদরাসা থেকে পাস করার পর আমি ঢাকায় এক মসজিদে ইমাম নিযুক্ত হলাম। মাদরাসায় পড়ার সময় তো মাওলানা মওদূদীর লেখা বই পড়া অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো বলে আমি তা পড়তে পারিনি। ঢাকায় আসার পর জামায়াতের এক লোক আমাকে

ঐসব বই পড়তে দিলেন। খুব মজা পেলাম। আরো বই চেয়ে নিলাম এবং পড়তে থাকলাম। একটা বই পড়ে আমি চমকে উঠলাম। মাদরাসার উস্তাদের যে বক্তৃতা আমি সযত্নে নোট করেছিলাম তা হুবহু এ বইটির ভাষার সাথে মিলে গেল।

আমি কিশোরগঞ্জ গিয়ে হুযূরের সাথে দেখা করে বললাম, 'হুযূর, এই বইটিতে যেভাবে পয়েন্ট সাজানো আছে আপনার বক্তৃতার নোটে ঠিক সেভাবেই সাজানো পেলাম। আপনি এ বই থেকে বক্তৃতা করেছেন বলে আমার ধারণা।' হুযূর মাথা নত করে চুপ করে রইলেন। তখন আমি বললাম, আমাদেরকে যাঁর বই পড়তে আপনারা নিষেধ করেন তাঁর বই পড়ে বক্তৃতা করলেন। আপনাদের সম্পর্কে আমার ধারণা এখন কী হতে পারে?"

২৩১.

বড় আলেমগণের রাজনৈতিক ভূমিকা কী ছিল?

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর আমার মনে এই বিরাট প্রশ্নের সৃষ্টি হলো যে, ১৯৪১ সালে যখন মাওলানা মওদূদী মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী কায়েম করেন তখন এ উপমহাদেশে অনেক বড় বড় আলেম ছিলেন। 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' নামে নিখিল ভারতীয় ওলামায়ে কেরামের একটি সংগঠনও ছিল। প্রখ্যাত ও নেতৃস্থানীয় আলেমগণ মাওলানা মওদূদীর চেয়ে বয়সে ও অভিজ্ঞতায় অনেক সিনিয়র ছিলেন। তাঁরা তো অনেক আগেই ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তুলতে পারতেন।

ঐ সময় রাজনৈতিক ময়দানে মি. গান্ধী ও মি. নেহরুর নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে বিপরীতমুখী দাবির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের পর ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে বলে বোঝা গেল। স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতার অধিকারী কারা হবে, সেটাই তখন সবচেয়ে বড় ইস্যু ছিল।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ভারতবর্ষের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস শাসন কায়েম হয়। এ কয়েকটি প্রদেশে মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘু। তিন বছরের প্রাদেশিক শাসনে কংগ্রেস মুসলিমদের প্রতি যে আচরণ করেছিল তাতে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইংরেজরা চলে গেলে কংগ্রেস যখন কেন্দ্রীয় ক্ষমতা হাতে নেবে তখন তারা গোটা ভারতে মুসলমানদের সাথে কেমন আচরণ করবে। মুসলিম জাতি উপলব্ধি করল যে, ইংরেজদের গোলামি থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও স্বাধীন ভারতবর্ষে মুসলমানরা অমুসলিমদের গোলাম হয়েই থাকবে। বর্তমান ভারতে মুসলমানদের অবস্থা ঐ আশঙ্কাকে সত্য বলে প্রমাণ করেছে। এ কারণেই ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহকে ভারত থেকে পৃথক করে মুসলিমদের নিজস্ব রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে।

মুসলিম লীগের এ সিদ্ধান্তের ফলে রাজনৈতিক ময়দান স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল। একদিকে কংগ্রেস তাদের ভারতমাতাকে দ্বিখণ্ডিত করতে কিছুতেই সম্মত ছিল না, অপরদিকে মুসলিম লীগ 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান', 'পাকিস্তান কা মতলব কেয়া– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্লোগানে মেতে উঠল।

কংগ্রেস দাবি করল, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-শিখ-উপজাতি সকলে একজাতি। আর মুসলিম লীগ দাবি করল, মুসলিমরা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। কংগ্রেসের একজাতি তত্ত্ব ও মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্ব চরম মতভেদের জন্ম দিল।

এ কঠিন পরিস্থিতিতে গোটা ভারতবর্ষের একমাত্র ওলামা সংগঠন 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' কংগ্রেসের মত সমর্থন করে বসল। সংগঠনের নেতা মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র)-এর লেখা, 'মুত্তাহিদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম' পুস্তিকা মুসলমানদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করল।

ফুরফুরার পীর সাহেবের উদ্যোগে ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম' নামের সর্বভারতীয় সংগঠন পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) মুসলিম লীগকে সমর্থন করে পাকিস্তান আন্দোলনে শক্তি জোগালেন। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের বিরোধিতা করে পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করায় দেওবন্দ মাদরাসার কয়েকজন শিক্ষক সেখান থেকে বহিষ্কৃত হন— যাঁদের মধ্যে মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী ও মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ঢাকা আরমানিটোলা ময়দানের একটি বিশাল সমাবেশে ভাষণ দেন। আমি তখন আইএ ক্লাসে পড়ি। ঐ সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম।

এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আলেমগণের রাজনৈতিক ভূমিকা শুধু সমর্থক পর্যায়ের ছিল। তাঁরা নেতৃত্বের পর্যায়ে ছিলেন না। তাঁরা কংগ্রেস বা মুসলিম লীগকে সমর্থন করেছেন মাত্র; নেতৃত্ব দিয়েছেন যারা, তারা অন্য লোক।

ওলামায়ে কেরাম ইকামাতে দীনের আন্দোলন করেননি কেন?

এ প্রশ্নের জবাব তালাশ করে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ওলামায়ে কেরাম আজীবন দীনের খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা দীনের খাঁটি মুসলিম খাদিম ছিলেন। দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তাঁদের ছিল না। এ বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকলে তাঁরা অবশ্যই ইকামাতে দীনের জন্য সংগ্রাম করতেন। ১৯৫৩ সালে মাওলানা আতহার আলী, মাওলানা সিদ্দীক আহমদ প্রমুখ নেতা যখন পাকিস্তানে ইসলামী নেজাম (সমাজব্যবস্থা) কায়েম করা জরুরি বলে উপলব্ধি করলেন তখন তাঁরা নেজামে ইসলাম পার্টি কায়েম করেন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টে শরীক হয়ে প্রাদেশিক আইনপরিষদে ২২টি আসনে জয়ী হন।

মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেযজী হুযূর ১৯৮১ সালে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা ফরয হিসেবে বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর আগে তিনি

রাজনীতি করা মোটেই পছন্দ করতেন না। শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হকও ঐ নির্বাচনের পরে হাফেযজী হুযূরের সাথে মিলে আল্লাহর খিলাফত কায়েমের উদ্দেশ্যে 'খেলাফত আন্দোলন' নামে সংগঠনভুক্ত হন। চরমোনাইর পীর সাহেব আশির দশকেই ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের উদ্দেশ্যে সংগঠন কায়েম করেন। মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী মাত্র কয়েক বছর আগে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি কায়েম করেছেন।

এতে বোঝা গেল যে, উপরিউক্ত ইসলামী নেতৃবৃন্দ যখন দীনকে বিজয়ী করার ফারযিয়াত সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন তখনই এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা শুরু করেছেন। গত ২০ বছর সময়কালে উপরিউক্ত ইসলামী সংগঠনগুলো কায়েম হয়েছে। ইসলাম তো এ দেশে দেড় হাজার বছর আগেই এসেছে। উপরিউক্ত আলেমগণও বহু বছর থেকেই দীনের খিদমত করছেন; কিন্তু ইকামাতে দীনের ফারযিয়াত সম্পর্কে পূর্বে তাঁদের কোনো চেতনা বা উপলব্ধি ছিল না। ওলামায়ে দেওবন্দের মাঝেও এ চেতনা জাগ্রত হলে নিশ্চয় তাঁরা ইকামাতে দীনের আন্দোলন করতেন।

ওলামায়ে কেরাম যদি মাদরাসা ও খানকাহর কর্মসূচিতেই দীন বিজয়ী হবে বলে মনে করতেন তাহলে শহীদাইনে বালাকোট শহীদ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী ও মাওলানা ইসমাইল শহীদ 'তাহরীকে মুজাহিদীন' তথা মুজাহিদ আন্দোলন করে ইসলামী হুকুমত কায়েমের চেষ্টা করতেন না।

ইকামাতে দীন ও খিদমতে দীন

দীন ইসলাম মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় নিয়ামত। এটাও তাঁরই মেহেরবানী যে, দীনের শিক্ষাকে জনগণের নিকট তুলে ধরার জন্য তিনি তাঁর হাজার হাজার বান্দাহকে অবিরাম চেষ্টায় লাগিয়ে রেখেছেন। এরই ফলে আমাদের দেশে এত মসজিদ, মাদরাসা, পীর, ওয়ায-নসীহত, তাফসীর মাহফিল ও তাবলীগ জামায়াত চালু আছে।

এ সবই দীনের বড় বড় খিদমত। এ দেশে প্রায় দু'শ বছর ইংরেজ-কাফিরদের শাসন থাকা সত্ত্বেও ওলামা-মাশায়েখের মেহনত ও কুরবানীর ফলে ঐসব দীনী খিদমত বন্ধ হয়ে যায়নি; বরং বেড়েই চলেছে। বর্তমানে যাদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা রয়েছে তারা যতই ষড়যন্ত্র করুক, দীনের এসব খিদমত বন্ধ করতে পারবে না। আল্লাহর রহমতে এসব খিদমত শত শত বছর থেকে চালু আছে। দীনের খাদিমগণের সংখ্যাও ইনশাআল্লাহ বাড়তেই থাকবে।

কিন্তু শুধু খিদমতে দীনের ফলে আল্লাহর দীন কায়েম হতে পারে না। অবশ্য এসব খিদমত দীন কায়েমের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক। মাদরাসায় আলেম বাহিনী তৈরি হচ্ছে বলেই এত বিরাট সংখ্যায় আলেমগণ ইকামাতে দীনের আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারছেন। মসজিদ, খানকাহ, ওয়ায ও তাফসীর চালু থাকার ফলেই জনগণ আল্লাহকে বিশ্বাস, রাসূল (স)-কে মহব্বত এবং কুরআনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। ইকামাতে দীনের জন্য জনসমর্থন জোগাড় করতে এসব খিদমত নিঃসন্দেহে বড় সহায়ক।

ইকামাতে দীন কী?

দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে পাঠিয়েছেন বলে কুরআন মাজীদে তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে (সূরা তাওবার ৩৩নং আয়াত, সূরা ফাত্হের ২৮নং আয়াত ও সূরা সাফ্ফের ৯নং আয়াত)। এ কাজটিই হলো ইকামাতে দীন। দীনকে বিজয়ী করা আর কায়েম করা একই কথা।

মানুষ যাতে দুনিয়ায় শান্তি এবং আখিরাতে মুক্তি পায় সেজন্য রাসূল (স)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের গোটা জীবন সঠিকভাবে পরিচালনার আইন-কানুন ও বিধি-বিধান পাঠিয়েছেন। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি সকল দিকের জন্যই নিয়ম-কানুন দিয়েছেন। এরই নাম দীন ইসলাম।

রাসূল (স)-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ নিজেদের মনগড়া আইন-কানুনের কারণে দুনিয়ায় যে অশান্তি ভোগ করছে, এ থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য ঐসব আইনের বদলে আল্লাহর আইন কায়েম করতে হবে। এ পৃথিবী আল্লাহর, এখানে তাঁরই আইন চলা উচিত। মানুষের কল্যাণের স্বার্থেই আল্লাহর আইন কায়েম হওয়া জরুরি।

রাসূল (স) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে এ মহান দায়িত্বই পালন করে গেছেন। এ কাজটিই হলো ইকামাতে দীন। যারা আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূলের উম্মত তাদের উপরও ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করা সব ফরযের বড় ফরয। সাহাবায়ে কেরাম এ মহান ফরয আদায়ে সবসময় রাসূল (স)-এর সাথী বা সহকর্মী ছিলেন। সাহাবী মানেই সাথী।

হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অনিবার্য কেন?

দুনিয়ায় যত নবী ও রাসূল এসেছেন তাঁদের সবাই হক কায়েম করার দায়িত্বই পালন করে গেছেন। যে দেশে দীনে হক কায়েম ছিল না সেখানে অবশ্যই বাতিল কায়েম ছিল। হক কায়েমের চেষ্টা করলে বাতিলের পক্ষ থেকে বাধা আসাই স্বাভাবিক। কারণ, হক ও বাতিল একই সাথে চালু থাকতে পারে না। আলো ও অন্ধকারের সহাবস্থান অসম্ভব। তাই যখনই কোনো নবী হকের দাওয়াত দিয়েছেন তখনই বাতিল তাতে বাধা দিয়েছে। একমাত্র আদম (আ) এবং সুলায়মান (আ) বাধার সম্মুখীন হননি। কারণ, আদম (আ)-এর সময় অন্য কোনো মানুষই ছিল না, বাধা দেবে কে? আর সুলায়মান (আ) তাঁর পিতা দাউদ (আ)-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক ছিলেন বলে তাঁকে বাধা দেওয়ার মতো কোনো বাতিল শক্তি ছিলই না।

হকের আওয়াজ যে কালেমায়ে তাইয়েবার মারফতে প্রথম ঘোষণা করা হয় তাতে আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে স্বীকার করার পূর্বে 'লা ইলাহা' বলে সমস্ত বাতিলকে অস্বীকার করা হয়। সমাজে ইলাহ বা মনিব কিংবা হুকুমকর্তার দাবিদার বাতিল শক্তি কায়েম আছে বলেই প্রথমে বাতিলকে অস্বীকার করার দরকার হয়। কারণ, বাতিলকে মন-মগজে কায়েম রেখে হককে স্বীকার করা অর্থহীন। তাই প্রথমেই 'লা ইলাহা' বলে সমস্ত বাতিল ইলাহকে অস্বীকার করার পর 'ইল্লাল্লাহ' বলে একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যে তাগূতকে অস্বীকার করে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, সে এমন মযবুত রশি ধরেছে, যা কখনো ছিঁড়বে না।' (সূরা বাকারা : ২৫৬)

তাগূত অর্থ হলো আল্লাহর বিদ্রোহী শক্তি। কাফির আল্লাহকে অস্বীকার করে মাত্র। কিন্তু তাগূত মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করতে বাধা দেয় এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার আনুগত্য করতে বাধ্য করে। ফিরাউন এমন ধরনের তাগূত ছিল বলেই মূসা (আ)-কে তার নিকট পাঠানোর সময় আল্লাহ বললেন, 'ফিরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয়ই সে বিদ্রোহ করেছে।' (সূরা নাযি'আত : ১৭)

ইসলামবিরোধী শক্তি এক কথায় তাগূত। দীনে বাতিল তাগূতী শক্তিরই নাম। কালেমায়ে তাইয়েবায় প্রথমেই তাগূত বা বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলা হয়, 'লা ইলাহা' বা কোনো হুকুমকর্তাকে মানি না। অন্য সকল কর্তা বা প্রভুকে অস্বীকার করার পরই 'ইল্লাল্লাহ' বলে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে স্বীকার করা হয়। সুতরাং ইসলামের প্রথম কথাই হলো বাতিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ কারণেই কালেমার দাওয়াত নিয়ে যে নবীই এসেছেন, তাগূত বা বাতিল তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই দুশমন মনে করেছে।

আল্লাহ তাআলা যাঁদেরকে নবী ও রাসূল হিসেবে বাছাই করেছেন তাঁরা সবাই নবুওয়াত লাভের পূর্বে নিজ নিজ দেশে সৎ, বিশ্বাসী, সত্যবাদী ও যাবতীয় মানবিক গুণের অধিকারী হওয়ার কারণে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। দীনে হকের দাওয়াত দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শেষ নবীও 'আল আমীন' ও 'আস সাদিক' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু 'আল্লাহর দাসত্ব কর ও তাগূতকে ত্যাগ কর' (নাহল : ৩৬)– এই দাওয়াত দেওয়ার পর নবীর সাথে তাগূতের সংঘর্ষ না বেধে পারে না।

নবীর দাওয়াত শুনেই নমরূদ, ফিরাউন ও আবূ জাহলরা বুঝতে পারল, তারা দেশকে যে আইনে শাসন করছে ও সমাজকে যে নীতিতে চালাচ্ছে, তা বদলিয়ে নবী নতুন কোনো ব্যবস্থা চালু করতে চান। ফিরাউন স্পষ্ট করে বলেই ফেলেছিল, 'আমি আশঙ্কা করি যে, সে (মূসা) তোমাদের দীনকে বদলিয়ে দেবে।' (সূরা মু'মিন : ২৬)

যারা দেশ শাসন করে তারা আইন-কানুন এমনভাবেই বানায়, যাতে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ বহাল থাকে। জনগণকে শোষণ করে শাসকগোষ্ঠীর প্রাধান্য বজায় রাখার উপযোগী আইন ও অর্থব্যবস্থা সমাজে চালু রাখা হয়। মানবরচিত আইনের বৈশিষ্ট্যই এটা। সুতরাং প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বহাল রাখার মধ্যেই শাসকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। এ জন্যই এদেরকে কায়েমী স্বার্থ বলা হয়। অর্থাৎ প্রচলিত ব্যবস্থা বহাল থাকলে যাদের স্বার্থ কায়েম থাকে তারাই কায়েমী স্বার্থ (Vested Interest)।

যখনই কোনো নবী আল্লাহর দাসত্বের দাওয়াত দিয়েছেন তখনই কায়েমী স্বার্থ এটাকে তাদের স্বার্থবিরোধী বলে বুঝতে পেরেছে। সে কারণেই তারা এটাকে বাধা দেওয়া জরুরি মনে করেছে। শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিই নয়, সামাজিক ও বাতিল ধর্মীয় স্বার্থও নবীদের সহ্য করতে পারেনি। ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযর একজন ধর্মীয় নেতা ছিলেন। নমরূদের দরবারে তার রাজ-পুরোহিতের মর্যাদা ছিল। ধর্মের

ব্যবসা নিয়ে নমরূদের অধীনে তিনি সুখেই ছিলেন। ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াতের ফলে আযরের ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগল। শেষ নবী আশা করেছিলেন, ইহুদী-নাসারাদের ওলামা ও পীরগণ (কুরআনের ভাষায় আহবার ও রুহবান) হয়তো তাঁর দাওয়াত সহজেই কবুল করবে। কারণ আল্লাহ, আখিরাত, নবী, ওহী ইত্যাদির সাথে তারা আগে থেকেই পরিচিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল, রাসূল (স)-এর সাথে যখন মক্কার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থের সংঘর্ষ বাধল তখন ঐ আহবার ও রুহবানদের ধর্মীয় স্বার্থই তাদেরকে আবূ জাহলদের সহযোগিতা করতে বাধ্য করল। এভাবেই হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অবশ্যই অনিবার্য এবং হকের বিরুদ্ধে সকল প্রকার কায়েমী স্বার্থ একজোট হয়েই সবসময় তার বিরোধিতা করে থাকে।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, মুসলিমপ্রধান দেশে মুসলিম শাসকদের সাথে ইসলামী আন্দোলনের এ ধরনের বিরোধ হওয়ার কারণ কী? মুসলিম নামধারী হলেই কেউ সত্যিকার ইসলামপন্থি হয়ে যায় না। ইয়াযীদ মুসলিম শাসকই ছিল। কিন্তু ইসলামী আদর্শের ধারক ইমাম হুসাইন (রা)-কে ইয়াযীদ সহ্য করতে পারেনি। এ দেশে মুসলিম নামধারী নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট বহু নেতা ও দল আছে, যারা ইসলামী আন্দোলনের চরম দুশমন।

আসল ব্যাপার হলো কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা। যারা কোনো দিক দিয়ে প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সুবিধা ভোগ করছে তারা যখন বুঝতে পারে যে, ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী হলে যে ধরনের আইন-কানুন ও সমাজব্যবস্থা চালু হবে তাতে তাদের বর্তমান প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। তাই তারা এ আন্দোলনের শত্রুতে পরিণত হয়।

যে বাতিল শক্তি দীনে হক কায়েমের পথে বাধার সৃষ্টি করে তা দুই ধরনের হয়ে থাকে। প্রধান বাতিল শক্তি হলো ক্ষমতাসীন সরকারি শক্তি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তারা ইকামাতে দীনের আন্দোলনকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। অনৈসলামী সমাজে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা দলের নেতৃত্বে ইসলামী সমাজব্যবস্থা যে চালু হতে পারে না, সে কথা সবাই ভালোভাবেই জানে। ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের নেতৃত্ব বহাল থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই তারা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করে থাকে।

সমাজে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী অপর শক্তি হচ্ছে তারা, যারা সরাসরি বাতিল শক্তির মধ্যে গণ্য না হলেও হক ও বাতিলের সংঘর্ষে হকের পক্ষে সক্রিয় হয় না। এতে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাতিলকেই সহযোগিতা করে। বাতিলের বিরুদ্ধে ময়দানে যারা সক্রিয় নয় তারা ঐ সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। এমনকি দীনের খাদিম হয়েও তারা এ জাতীয় দ্বিমুখী ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়। ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করার হিম্মত যাদের নেই তারা একপর্যায়ে বাতিলেরই সহায়ক প্রমাণিত হয়।

দীনী খিদমতের সাথে এ সংঘর্ষ হয় না কেন?

যে দেশে দীনে হক কায়েম নেই সেখানে ইকামাতে দীনের কাজ বা ইসলামী আন্দোলন চালালে তাতে কায়েমী স্বার্থ অবশ্যই বাধা দেবে। ইসলামী আন্দোলনকে বাতিল শক্তির

জন্য ক্ষতিকর ও আপত্তিকর মনে করাই স্বাভাবিক। যদি কায়েমী স্বার্থ কোনো ইসলামী খিদমতকে বিপজ্জনক মনে না করে তাহলে বুঝতে হবে যে, ঐ খিদমত যতই মূল্যবান হোক, তা ইকামাতে দীনের আন্দোলন নয়।

মাদরাসাসমূহ নিঃসন্দেহে দীনের বিরাট খিদমত করছে। কিন্তু মাদরাসায় যে দাওয়াতী কর্মসূচি রয়েছে তা বাতিল সরকার ও সমাজব্যবস্থাকে উৎখাত করবে বলে কায়েমী স্বার্থ মনে করে না। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মাদরাসা ভারতের দেওবন্দে অবস্থিত। কিন্তু ভারত সরকার ঐ মাদরাসাকে সে দেশের আইন, শাসন ও সরকারের জন্য মোটেই ক্ষতিকর মনে করে না। ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে দেওবন্দ মাদরাসার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক বিরাট আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঐ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। ইন্দিরা সরকার দেওবন্দ মাদরাসার দাওয়াত ও কর্মসূচিকে সে দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য মোটেই ক্ষতিকারক মনে করেনি।

দীনের বিরাট খিদমতের জন্য দেওবন্দ মাদরাসাসহ ছোট-বড় সব মাদরাসার নিকটই মুসলিম জাতি কৃতজ্ঞ। এ খিদমতের গুরুত্ব তারা কখনো অস্বীকার করতে পারে না। এসব মাদরাসা নিশ্চয়ই ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক। আন্দোলনের যোগ্য বহু আলেম এসব মাদরাসা থেকে এসেছেন। কিন্তু মাদরাসাগুলো প্রত্যক্ষভাবে ইকামাতে দীনের কোনো আন্দোলন চালাচ্ছে না।

তেমনিভাবে তাবলীগ জামায়াতও দীনের খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছে। এ জামায়াত সারা দুনিয়ায়ই বিপুলসংখ্যক লোককে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতমুখী বানাচ্ছে। এ জামায়াতের কেন্দ্র ভারতের দিল্লিতে অবস্থিত। এ বিশ্ব জামায়াতের আমীরও ভারতের নাগরিক। কিন্তু এ জামায়াতকে কোনো দেশের সরকারই তাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করে না। এমনকি চীন ও রাশিয়াতে পর্যন্ত এ জামায়াতকে যেতে বাধা দেওয়া হয় না। এ মহান জামায়াতের উসিলায় কমিউনিস্ট দেশেও কালেমা-নামাযের পয়গাম এবং আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের দাওয়াত পৌঁছতে পারছে। এটা খুবই আনন্দের কথা। এটাকে ছোট খিদমত মনে করা অন্যায়।

কিন্তু তাবলীগের দ্বারা যত বড় দীনী খিদমতই হোক, এ জামায়াতের দাওয়াত ও কর্মসূচিতে ইকামাতে দীনের কোনো পরিকল্পনা নেই। মুসলিম সংখ্যালঘু দেশ, এমনকি কমিউনিস্ট দেশেও এ জামায়াতকে কাজ করতে হচ্ছে। সুতরাং বাতিলের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে দীনের খিদমত করার যতটুকু সুযোগ নেওয়া সম্ভব ততটুকুই এ জামায়াত নিচ্ছে।

সাড়ে চার বছর মন-প্রাণ লাগিয়ে এ জামায়াতে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এমএ পরীক্ষা দিয়েই তিন চিল্লায় (চার মাস) একটানা এ জামায়াতের সাথে থাকাকালেই নিজের জীবনকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করার জযবা ও প্রেরণা বোধ করি। সুতরাং আমার জীবনে তাবলীগ জামায়াতের বিরাট অবদানকে আমি কখনোই ভুলব না। এ কারণেই তাবলীগ জামায়াতের সাথে আমার মহব্বত স্বাভাবিকভাবেই গভীর ও স্থায়ী।

বাংলাদেশের তাবলীগ জামায়াতের নেতৃস্থানীয় সবাইকে আমি অন্তর থেকে মহব্বত করি। কারণ, একসাথে কয়েক বছর এক জামায়াতে কাজ করার দরুন ব্যক্তিগতভাবে তাদের

ইখলাস ও একাগ্রতা সম্পর্কে আমার সঠিক ধারণা হওয়ার সুযোগ হয়েছে। তাঁদের কাউকে আমি অন্তরে উস্তাদ হিসেবে শ্রদ্ধা করি। যেমন– মরহুম মাওলানা আব্দুল আযীয, সাবেক আমীর, তাবলীগ জামায়াত বাংলাদেশ। তাদের কেউ কেউ আমার শ্রদ্ধাভাজন দীনী মুরব্বি, যাঁদের কাছ থেকে ইসলামের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করার প্রেরণা আমি পেয়েছি। যেমন– মরহুম ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মুকীত। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে বেশ কয়েকজন এমন আছেন, যাঁদেরকে আমি ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও মহব্বতের বন্ধু হিসেবে পেয়েছি।

আমার ঐসব উস্তাদ, মুরব্বি ও বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের খিদমতে অত্যন্ত দরদের সাথে আকুল আবেদন জানাই, তাঁরা যেন এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, যাতে তাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত এ মহান জামায়াত সম্পর্কে এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে কেউ কোনো ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে না পারে। কেউ কেউ তাবলীগ জামায়াতের কাজকে হুবহু রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন বলে প্রচার করে থাকেন। বর্তমানকালের মাদরাসাগুলোতে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা হচ্ছে। তাই বলে কেউ যদি মনে করেন যে, রাসূল (স) এ ধরনের মাদরাসাই কায়েম করেছিলেন, তাহলে এটা ভুল হবে। ঠিক তেমনি তাবলীগ জামায়াতের কাজ দ্বারা দীনের বড় খিদমত হওয়া সত্ত্বেও এ ধারণা সৃষ্টি হতে দেওয়া উচিত নয় যে, ঠিক এতটুকু কর্মসূচি নিয়েই রাসূল (স) ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

দীন ইসলামকে বিজয়ী করার যে কঠিন ও সংগ্রামমুখর আন্দোলন আল্লাহর রাসূল (স) পরিচালনা করেছিলেন এবং যে কর্মসূচি নিয়ে তিনি দীনকে বাস্তবে কায়েম করেছিলেন, ঠিক সে আন্দোলন এবং কর্মসূচিই যদি তাবলীগ জামায়াত গ্রহণ করত, তাহলে বিনা বাধায় এবং বাতিলের সাথে কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই তারা এভাবে সব দেশে তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেত না। দুনিয়াময় দীনের বুনিয়াদী শিক্ষাকে পৌঁছানোর প্রাথমিক কর্তব্য পালনের যে কর্মসূচি এ জামায়াত গ্রহণ করেছে তাতে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে হলে বর্তমান কর্মসূচিই সঠিক। কিন্তু আল্লাহর দীনকে দুনিয়ায় বিজয়ী ও কায়েম করার জন্য এটুকু কর্মসূচি যে কোনোক্রমেই যথেষ্ট নয়, সে কথা সবারই বুঝতে হবে। যদি এটুকু দাওয়াত ও কর্মসূচিকেই রাসূল (স)-এর আন্দোলন বলে মনে করা হয়, তাহলে এ জামায়াত দ্বারা দীনের যে পরিমাণ খিদমত হচ্ছে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ ক্ষতি হওয়ারই আশঙ্কা রয়েছে। যাদের মধ্যে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তাদের আচরণ থেকেই এ ক্ষতির ধরন ও পরিমাণ সম্পর্কে অনুমান করা যায়।

কয়েকটি ভুল ধারণা

যারা তাবলীগ জামায়াতের ছয় উসূলবিশিষ্ট কর্মপদ্ধতিকে (তরীকাকে) রাসূল (স)-এর মাক্কী জীবনের দীনী দাওয়াতের কর্মসূচির অনুরূপ বলে মনে করেন এবং এটুকু কাজের মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েম হয়ে যাবে বলে আশা করেন, তাদের মধ্যে কয়েকটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন–

১ তারা ইসলামকে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ মনে করবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য ইসলাম যে বিধান দিয়েছে তার কোনো প্রয়োজনীয়তাই তারা অনুধাবন করবে

না। ইসলামী অর্থনীতি, আইন ও রাজনীতি তাদের নিকট অপ্রয়োজনীয় বিষয় বলেই মনে হবে।

২. ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সরকার কায়েমের আন্দোলনকে তারা কেবল দুনিয়াদারী কাজ মনে করবে এবং যারা এ কাজ করে তাদেরকে ক্ষমতালোভী বলেই ধারণা করবে।

৩. বাতিলের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে দীন কায়েমের এই ধারণা তাদের মধ্যে এমন মনোভাব সৃষ্টি করবে যে, বাতিল শক্তি ইসলামের যতটুকুতে আপত্তি করে না ততটুকু ইসলাম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

৪. এ ধারণার ফলে দীনের অন্য যত প্রকার খিদমত আছে তারা সেগুলোকে তুচ্ছজ্ঞান করবে। শুধু তাবলীগই তাদের কাছে দীনের কাজ বলে মনে হবে এবং অন্যান্য দীনী খিদমতের মূল্য বোঝার যোগ্যতাই তাদের থাকবে না।

৫. নির্বাচনের সময় এ জাতীয় লোকেরা ইসলামবিরোধী লোককে ভোট দিতেও আপত্তি করবে না; বরং ইসলামী আইন চালু করার দাবিতে যারা রাজনীতি করে তাদেরকে তারা অপছন্দ করবে। ইসলামের নামে রাজনীতি করাকে তারা দূষণীয় মনে করার কারণে ভোটের বেলায় তারা ঐসব লোককেই ভোট দেবে, যারা ইসলামী আদর্শের কথা বলে না।

৬. তাদের এ ধারণাও হতে পারে যে, তাবলীগপন্থিরা এমন সুন্দর কৌশলে দীন ইসলামকে কায়েম করার চেষ্টা করছে যে, ইসলামের দুশমনরা তা টেরই পাচ্ছে না এবং এ জামায়াত এমন চমৎকার হিকমতের সাথে ধর্মীয় কাজ করছে যে, ইসলামবিরোধীরা তাতে বাধা দেওয়ার কোনো উপায়ই খুঁজে পাচ্ছে না।

এ রকম ধারণা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মারাত্মক। আল্লাহ তাআলা কি নবীদের এমন খিদমত শেখাতে পারলেন না, যাতে তারা তাবলীগের মতো বিনা বাধায় কাজ করতে পারতেন। নবীগণ কি তাহলে এত যুলুম-নির্যাতন অনর্থকই সহ্য করেছেন?

কেউ বলতে পারেন যে, নবীগণ কাফিরদের মধ্যে দাওয়াত দিচ্ছিলেন বলেই বাধা পেয়েছেন। আর তাবলীগ মুসলমানদের মধ্যেই কাজ করছে বলে কোনো বাধা পাচ্ছে না। আর মুসলমানদের ব্যক্তিগতভাবে ভালো মুসলমান বানানোর চেষ্টা করলে বাতিল থেকে বাধা আসবে কেন? কিন্তু দেশের আইন, শাসন ও সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের দাওয়াত ও কর্মসূচি নিয়ে কাজ করলে মুসলিম নামধারী শাসক শক্তিও অমুসলিমদের মতোই তাতে বাধা দেবে।

এসব আশঙ্কার কারণেই তাবলীগ জামায়াতের দায়িত্বশীলদের খিদমতে এত কথা আরয করতে বাধ্য হলাম। তাবলীগ জামায়াত ইকামাতে দীনের আন্দোলন নয়। এ জামায়াত দীনের মহামূল্যবান খিদমতের এক বিশ্বজোড়া আন্দোলন। তাবলীগ সম্পর্কে এ ধারণাই আমি সঠিক বলে মনে করি। তাবলীগের দাওয়াত ও কর্মসূচিকে রাসূল (স)-এর ইসলামী আন্দোলনের মতোই পূর্ণাঙ্গ বলে ধারণা করলে সে ধারণা হবে আল্লাহপ্রদত্ত ইসলামী জীবনবিধানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এর ফলে বিশ্বনবীকে মাত্র একজন তথাকথিত

ধর্মীয় নেতা হিসেবেই মনে করা হবে। আল্লাহ তাআলা এ জাতীয় ভুল ধারণা থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করুন।

প্রতি বছর তাবলীগের যে বিরাট বিশ্ব ইজতেমা টঙ্গীর বিস্তীর্ণ এক ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়, তাতে লাখ লাখ লোকের সমাগম হয়। এটা সত্যিই উৎসাহের ব্যাপার। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের প্রতি মহব্বতের এ দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

দীনে বাতিলকে উৎখাত করে দীনে হককে কায়েম করার দাওয়াত ও কর্মসূচি নিয়ে যদি এর শত ভাগের এক ভাগ লোকও একত্রিত হয় তাহলে দেশের সরকার ও কায়েমী স্বার্থ অস্থির হয়ে পড়ে। আর ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রী মহল তো পত্র-পত্রিকায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হৈ চৈ শুরু করে দেয়।

১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় একটি ইসলামী ছাত্রসংগঠনের মাত্র ১৫/২০ হাজার কর্মীর একটি সম্মেলন ও মিছিল সমস্ত ইসলামবিরোধী মহলে এক অদ্ভুত কম্পনের সৃষ্টি করেছিল। অথচ ঐ সংগঠনটি কোনো রাজনৈতিক দল নয়। তারা ইকামাতে দীনের কথা বলে এবং ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের জন্য ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করে বলেই কায়েমী স্বার্থ ও বাতিল শক্তিগুলো তাদের কর্মসূচিতে এত বিচলিত।

সকল বাতিল শক্তি ও ইসলামবিরোধী মহল ভালো করেই জানে যে, তাবলীগ নিছক ও নির্ভেজাল একটি ধর্মীয় জামায়াত; রাজনীতি, রাষ্ট্র ও সরকার নিয়ে তারা মোটেই মাথা ঘামায় না। সুতরাং তাদের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার কোনো কারণ নেই এবং ঘাবড়ানোরও কোনো হেতু নেই।

ঠিক একই কারণে পীর সাহেবানদের উরছ ও মাহফিলে লাখ লাখ মুসলমানের সমাবেশকে বাতিল শক্তি ভয় পায় না। এসব মাহফিলের ওয়ায, তালকীন ও যিকর দ্বারা ইসলামের খিদমত নিশ্চয়ই হচ্ছে। কিন্তু সেখানে ইকামাতে দীনের কোনো কর্মসূচি না থাকায় ইসলামবিরোধী মহল তাদের নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়।

এ কথা পরিষ্কার করার জন্যই উদাহরণস্বরূপ এখানে মাদরাসা, তাবলীগ ও খানকাহর কথা উল্লেখ করলাম। খিদমতে দীনের সাথে বাতিল শক্তির সংঘর্ষ হয় না। একমাত্র ইকামাতে দীনের দাওয়াত ও প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেই এ সংঘর্ষ বাধে। সব নবীর জীবনেই এ কথা সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

কুরআন মাজীদে যত নবী ও রাসূলের কথা আলোচনা করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, সমকালীন ক্ষমতাসীন শক্তি ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থ কোনো নবীকেই বরদাশত করতে পারেনি। শুধু হযরত আদম (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ) ছাড়া অন্য সব নবী (আ)-এর সাথেই বাতিল শক্তির সংঘর্ষ হয়েছে। ইকামাতে দীনের কর্মসূচি নিয়ে কাজ করায় যদি নবীগণকেই বাতিলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয় তাহলে নবীর উম্মতের পক্ষে এ সংঘর্ষ এড়িয়ে ইসলামকে কায়েম করা কী করে সম্ভব হতে পারে? আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে যারা কাজ করতে চান তাঁরা এ সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার কথা ভাবতেই পারেন না।

যারা বাতিলের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলাকে হিকমত মনে করেন তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণকে ঐ হিকমতটা কেন শেখালেন না? তাঁরা দীনের কোনো না কোনো দিকের খিদমত অবশ্যই করতে পারেন এবং তাঁদের সেই খিদমত ইকামাতে দীনের সহায়কও হতে পারে। কিন্তু তাঁদের ঐ কাজটুকু প্রত্যক্ষভাবে ইকামাতে দীনের কাজ হতে পারে না। তাঁদের ঐটুকু খিদমত দ্বারা দীন কায়েম হয়ে যাবে না। দীন কায়েমের জন্য আলাদা কর্মসূচি অবশ্যই প্রয়োজন।

জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্ব

ইকামাতে দীনের কাজ কারো পক্ষে একা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এমনকি পূর্ণ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোনো নবী পর্যন্ত দীনকে একাকী বিজয়ী করতে পারেননি। অবশ্য প্রথমে তাঁকে একাকীই এ কাজ শুরু করতে হয়েছে। যে নবীর ডাকে মানুষ সাড়া দেয়নি এবং জামায়াতবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ যে নবী পাননি, তিনি দীনকে বিজয়ী করতে পারেননি।

একটি সমাজব্যবস্থাকে বদলিয়ে নতুন করে তা গড়ে তোলার কাজটি এমন কঠিন ও জটিল, প্রয়োজনীয়সংখ্যক একদল লোকের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া এ বিরাট উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হতে পারে না। তাই প্রত্যেক নবী মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব কবুলের দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে তাঁর আনুগত্য করে ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালনে তাঁর সাথী হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।' (সূরা শুআরা : ১০৮)

প্রত্যেক নবীই দীনের এ দাওয়াত দিয়েছেন। কারণ, একদল লোকের আনুগত্য না পেলে দীনকে বিজয়ী করা সম্ভব নয়। এ কারণেই ইসলামে জামাআতের গুরুত্ব এত বেশি। জামাআতের সাথে রোজ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জামাআতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এমনকি জামাআতবদ্ধ যিন্দেগীকে ইসলামে আনুগত্যের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, 'মেষের পাল থেকে বিচ্ছিন্ন মেষকে যেমন নেকড়ে বাঘ ধরে নিয়ে যায়, তেমনি জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে শয়তান নিজের খপ্পরে নিয়ে যায়।'

এমনকি সফরের সময় দুজন একসাথে সফর করলেও একজনকে আমীর মেনে নিয়ে জামাআতের শৃঙ্খলা অনুযায়ী চলার জন্য রাসূল (স) নির্দেশ দিয়েছেন। জামাআত ছাড়া ইসলামী যিন্দেগী সম্ভব নয় এবং আমীর ছাড়া জামাআত গঠিত হতে পারে না। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, একজন মুসলিম হয় আমীর (হুকুমকর্তা) হবে, না হয় মামুর (হুকুম পালনকারী) হবে। যেমন– জামাআতে নামায আদায় করা অবস্থায় তাকে হয় ইমাম হতে হবে, না হয় মুক্তাদী। কেউ যদি ইমাম বা মুক্তাদীর কোনোটাই না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, সে নামাযের জামাআতে শামিল হয়নি। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোনো দীনী জামাআতে শামিল হয়নি, সে সঠিক ইসলামী জীবনযাপনের কর্মসূচিই গ্রহণ করেনি। এ অবস্থায় সে নাফ্স ও শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না।

নবী করীম (স)-এর সময়ে শুধু তাঁরাই মুসলিম বলে গণ্য হতেন, যাঁরা নবীর জামাআতে শরীক হয়ে নবীর নিকট বা তাঁর প্রতিনিধির নিকট বাইআত করতেন। ঐ জামাআতের বাইরে থাকলে কেউ মুসলিম বলে গণ্যই হতো না। ঐ জামাআতই দীনের একমাত্র জামাআত বা আল-জামাআত ছিল। বর্তমানে কোনো একটি জামাআতই আল-জামাআতের মর্যাদা পেতে পারে না। রাসূলের আদর্শের ভিত্তিতে যত জামাআত গঠিত, সেসব জামাআত মিলে আল-জামাআত হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো দীনী জামাআতে শামিলই হয়নি, সে ঈমানের দিক দিয়ে মোটেই নিরাপদ অবস্থানে নেই।

২৩২.

জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান

বাংলাদেশ অঞ্চলে জামায়াতে ইসলামী ১৯৫০ সাল থেকে সাংগঠনিকভাবে কাজের সূচনা করে এবং ১৯৫৬ সালে মাওলানা মওদূদীর প্রথম সফরের পর এখানে জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে ওঠে। ১৯৫৩ সালে নেজামে ইসলাম পার্টি গঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম পার্টিই এ দেশে সবচেয়ে পুরনো ইসলামী দল। আশির দশক থেকে আরো কতক ইসলামী দল ময়দানে সক্রিয় রয়েছে।

দেশের ইসলামবিরোধী শক্তি, ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থি– সবাই জামায়াতে ইসলামীকে তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক মনে করে। জামায়াতের অগ্রগতি ঠেকানোর উদ্দেশ্যে তারা পরিকল্পিতভাবে বিদেশে এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী চারদলীয় জোট সরকারে শরীক থাকায় তারা দেশে ও বিদেশে মৌলবাদী, জঙ্গিবাদী ও তালেবানী সরকার বলে এ সরকারকে উৎখাতের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর উপর এই বলে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, মৌলবাদী ও তালেবানী সরকারের দুর্নাম থেকে বাঁচতে হলে মন্ত্রিসভা থেকে জামায়াতকে বের করে দিতে হবে। জামায়াতের কারণে চারদলীয় জোট সরকার দুনিয়ায় নিন্দিত হচ্ছে বলে বিএনপিকে প্রভাবিত করার অপচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন থাকাকালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ঢাকা এসেছিলেন। তখন তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ইংরেজি ভাষায় রচিত একটি পুস্তিকায় বলা হয়, বাংলাদেশে মৌলবাদী সন্ত্রাসী শক্তি এতটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে যে, সে কারণে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন সাভার স্মৃতিসৌধে যাওয়ার কর্মসূচি পর্যন্ত বাতিল করে দেন।

ধর্মনিরপেক্ষ, ভারতপন্থি ও ইসলামবিরোধী সকল পত্রিকা একমাত্র জামায়াতে ইসলামীকেই সকল জঙ্গিবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষক বলে জোর প্রচারণা চালাচ্ছে। কাদিয়ানীদের আস্তানায় যত হামলা হয়েছে সেগুলোর জন্য জামায়াতকে দায়ী করা হয়। তারা জামায়াতের উপর এত খেপা কেন? আর অন্য কোনো ইসলামী দলের বিরুদ্ধে তারা এমন খড়্গহস্ত নয় কেন?

জামায়াতকে নিয়ে তাদের এত মাথাব্যথার কারণ কী? বাংলাদেশে জামায়াতের অবস্থান সম্পর্কে তো তারা সম্যক অবহিত। তারা দেখতেই পাচ্ছে যে—

১. বাংলাদেশে জামায়াতের গণভিত্তি আছে।

২. নির্বাচনে এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও ১৯৯১ সালে এ দলটি ১৮টি আসনে বিজয় লাভ করেছিল।

৩. সারা দেশে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়েও জামায়াতের সংগঠন সম্প্রসারিত।

৪. ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী ক্যাডারভিত্তিক লোক তৈরি করায় সর্বস্তরেই মযবুত সংগঠন রয়েছে।

৫. আধুনিক শিক্ষিত মহলে ইসলামকে নিছক একটি ধর্ম মনে করা হতো। গত ৫০ বছরে জামায়াতে ইসলামীর প্রচেষ্টায় ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান (Complete code of life)— এ ধারণা ক্রমেই প্রসার লাভ করছে।

৬. জামায়াতের প্রচেষ্টায় ইসলাম সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষিতদের উপযোগী আকর্ষণীয় ও যুক্তিপূর্ণ বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে; যার ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিকসহ ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছে।

৭. মাওলানা মওদূদী রচিত কুরআনের তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' শিক্ষিত মহলে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

৮. কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝেও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯. ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য পেশার লোকেরা তাদের পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজেদের মন-মগজ-চরিত্রকে গড়ে তোলার প্রেরণা পাচ্ছেন।

১০. কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাটসংখ্যক ছাত্র নিজেদের ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রে সমৃদ্ধ করছে। ধর্মনিরপেক্ষ ও সন্ত্রাসী ছাত্রসংগঠনগুলোর হাতে এদের শতাধিক নেতা-কর্মী নিহত হওয়া সত্ত্বেও তারা ময়দানে টিকে আছে।

নতুন প্রজন্মের আধুনিক শিক্ষিতদের এত বিরাট সংখ্যায় ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যে জান কুরবান করার জন্য প্রস্তুত হতে দেখে ইসলামের দুশমনদের মাথা ঠিক থাকার কথা নয়।ইসলামী শক্তির এ উত্থানে ইসলামবিরোধীদের আতঙ্কিত হওয়াই স্বাভাবিক। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির ছাড়া অন্য কোনো ইসলামী সংগঠনের বিরুদ্ধে তাদের সামান্যতম সক্রিয় হতেও দেখা যায় না। যদি তারা আর কোনো ইসলামী সংগঠনের মধ্যে ঐ জাতীয় আতঙ্কের সম্ভাবনা দেখতে পায় তাহলে অবশ্যই সেগুলোর বিরুদ্ধেও তেমনিভাবে সক্রিয় হয়ে উঠবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দুশমনরা বাংলাদেশে ইসলামী শক্তি হিসেবে জামায়াতে ইসলামীকেই তাদের জন্য হুমকির কারণ মনে করে।

জামায়াতের সাথে কোনো কোনো ইসলামী দলের আচরণ

একটি দলের নেতা বলে থাকেন, 'জামায়াতে ইসলামী কোনো ইসলামী দলই নয়'। তিনি কেন এমন আজব কথা বলেন তা তিনিই ভালো জানেন। ইসলামবিরোধী পত্রিকাগুলো তার এ কথা ফলাও করে প্রকাশ করে। তাঁর কথাকে ঐসব পত্রিকা এত মূল্যবান বলে মনে করে কেন? কারণ, তারা জামায়াতে ইসলামীকেই প্রধান ইসলামী দল বলে মনে করে এবং এ কারণেই তারা এর অগ্রগতিতে শঙ্কিত। তারা ঐ নেতার এসব বক্তব্যকে ইসলামবিরোধীদের পক্ষে সহায়ক হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। এ বক্তব্য দ্বারা তিনি ইসলামের খিদমত করলেন, নাকি ইসলামের দুশমনদের সাহায্য করলেন? তাঁর ঐ বক্তব্য সম্পর্কে আমরা আর কোনো মন্তব্য করতে চাই না। তিনি একতরফাই জামায়াতের বিরুদ্ধে বলে বেড়াচ্ছেন। জামায়াত তাঁর বা তাঁর দলের বিরুদ্ধে সামান্য মন্তব্যও করে না।

আরেকটি দলের নেতা জামায়াতের সাথে গায়েপড়ে ঝগড়া করতে চান। জামায়াত কিন্তু তাঁর সাথে ঝগড়া করতে চায় না। গত এপ্রিল মাসে (২০০৫) তিনি যা করলেন তা বিস্ময়কর। ঢাকা বিভাগীয় প্রতিনিধি সম্মেলন উপলক্ষে পল্টন ময়দান ব্যবহারের জন্য অনুমতি চেয়ে জামায়াতে ইসলামী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত দেয়। ২৯ এপ্রিল সম্মেলনের জন্য বিশাল প্যান্ডেল তৈরি করার প্রয়োজনে ২৮ এপ্রিলের জন্যও ময়দান ব্যবহারের অনুমতি চাওয়া হয়।

২৮ এপ্রিল তাঁর দলের নাকি সম্মেলন হওয়ার কথা। তিনি যদি কর্তৃপক্ষের নিকট আগে দরখাস্ত করতেন তাহলে আগেই অনুমতি পেতেন। কর্তৃপক্ষ পত্রিকায় ঘোষণা করল, জামায়াত আগে দরখাস্ত করেছে। ২৮ তারিখ জামায়াতের সম্মেলন ছিল না। তিনি জামায়াতের সাথে যোগাযোগ করলে অতি সহজেই এ সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তিনি তা না করে এর মধ্য থেকে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পেলেন। রীতিমতো হুমকি দিয়ে তিনি বললেন যে, ২৮ তারিখে অবশ্যই সম্মেলন করবেন। প্রয়োজনে রক্তগঙ্গা বইবে, কারবালার ঘটনাও ঘটতে পারে। জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হলো, জামায়াতের তৈরি প্যান্ডেলেই ২৮ তারিখে তিনি সমাবেশ করতে পারবেন। তিনি তা করতে অস্বীকার করলেন। জামায়াত সমস্যায় পড়ে গেল। পরদিন সম্মেলন করার প্রয়োজনেই আগের দিন প্যান্ডেল তৈরি করা জরুরি।

জামায়াত জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের মুহতারাম খতীব মাওলানা উবায়দুল হকের নিকট সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরোধ করল। জামায়াতের তরফ থেকে বলা হলো, যেহেতু জামায়াত প্যান্ডেল তৈরি করলে তারা তা ব্যবহার করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সেহেতু আপনার দায়িত্বেই প্যান্ডেল তৈরি হোক। খতীব সাহেব দায়িত্ব নিলেন। তিনি মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও মাওলানা যাইনুল আবেদীনকে প্যান্ডেল তৈরির দায়িত্ব দিলেন।

উভয় দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্যান্ডেলের খরচ জামায়াতকেই বহন করতে হলো।

উপরিউক্ত দলের প্রধানগণ জামায়াতের উপর সরাসরি হামলা করে বক্তব্য রাখেন। আর যারা জামায়াতের আকীদা খারাপ বলে দাবি করেন তাদের মূলধন হলো কতক ভিত্তিহীন ও মিথ্যা উদ্ধৃতি। মাওলানা মওদূদীর লেখাকে বিকৃত করে এমন কতক উদ্ধৃতি প্রচার করা হয়, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদার বিপরীত। এ সবের ভিত্তিতেই মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে। এসব উদ্ধৃতি যে মিথ্যা তা কুমিল্লা জেলার বরুড়ায় প্রমাণিত হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়ও মামলা দায়ের করা হলে তা প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ। যারা মিথ্যা উদ্ধৃতি তৈরি করছেন তাদের কি আল্লাহ ও আখিরাতের ভয় আছে? যাচাই না করেই যারা ঐসব মিথ্যা উদ্ধৃতি প্রচার করেন, আল্লাহর দরবারে তাদের বিচার একদিন অবশ্যই হবে।

মাওলানা মওদূদী (র)-বিরোধী ফতোয়া

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) কুরআন মাজীদের তাফসীর ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনীসহ ইসলাম সম্পর্কে ছোট-বড় শতাধিক বই লিখে গেছেন। তাঁর অগণিত পাঠক-পাঠিকা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছে। যেহেতু তিনি অনেক কিছু লিখেছেন, তাই তাঁর লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। যারা জ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত তারা যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে তার লেখার সমালোচনা করলে তাতে অবশ্যই দীনের উপকার ও খিদমত হবে। এ বিষয়ে উপমহাদেশের কয়েকজনের সমালোচনামূলক লেখা পড়ে আমিও অনেক উপকৃত হয়েছি।

কিন্তু কিছুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁর বিভিন্ন লেখা থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে সেগুলোর এমন বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন, কোনো নিরপেক্ষ পাঠক মূল বই ও সমালোচকদের লেখা একসাথে মিলিয়ে পড়লে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, লেখকের মূল বক্তব্যের সাথে ঐসব সমালোচনার কোনো মিল নেই। কতক সমালোচকের ভাষা তো অত্যন্ত বিদ্বেষমূলক এবং জঘন্য।

যারা অন্ধসমালোচক ও বিদ্বেষী তারা সংশোধনের উপযোগী ভাষা ব্যবহার না করে ফতোয়ার হাতিয়ার ব্যবহার করেন, এমনকি কারো কারো বক্তব্য হীন গালি-গালাজের পর্যায়েও পড়ে। যারা সত্য তালাশ করেন তারা যদি মূল বই পড়ার চেষ্টা করেন তাহলেই এ ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবেন। আর যদি মূল বই বাদ দিয়ে শুধু সমালোচকের লেখা পড়েই সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তারা অবশ্যই লেখকের প্রতি অবিচার করবেন। আসামির জবানবন্দী না নিয়ে শুধু ফরিয়াদীর নালিশ শুনেই যে বিচারক রায় দিয়ে বসেন, তাকে কখনো ন্যায়বিচারক বলা চলে না।

মাওলানা মওদূদী লিখেছেন বলেই কোনো কথা সঠিক বলে আমি গ্রহণ করি না। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল সহকারে যেসব কথা তিনি পেশ করেছেন, তা আমার বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা যাচাই করেই গ্রহণ করি। তাই যারা দলীল ও যুক্তির ভিত্তিতে তাঁর সমালোচনা করেন তাদের কথাও গ্রহণ করতে আমি দ্বিধা করি না। কারণ, মাওলানা মওদূদী (র)-কে আমি নির্ভুল মনে করি না। কিন্তু যারা ফতোয়ার ভাষায় কথা বলেন, তারা মাওলানার

ভুল সংশোধনের পরিবর্তে তাঁর সম্পর্কে মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের কথা বলেন বিধায় আমি তাদের কথা বিবেচনাযোগ্যই মনে করি না।

মাওলানা মওদূদী (র)-এর 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' নামক বই সম্পর্কে বাংলাদেশের কয়েকজন আলেম জোর আপত্তি তুলেছেন। এর মধ্যে হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)-এর লেখা 'ভুল সংশোধন' নামক পুস্তকটিকে আমি অবশ্যই পড়ার যোগ্য মনে করি। মাওলানা ফরিদপুরী (র) মাওলানা মওদূদী (র)-কে অত্যন্ত মহব্বত করতেন এবং আমাকেও খুব স্নেহ করতেন। তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার দরুন আমি জানতাম যে, 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট আপত্তি আছে। তিনি মাওলানা মওদূদী (র)-এর নিয়তের উপর হামলা করতেন না এবং তাঁকে সাহাবায়ে কেরামের বিরোধী বলেও মনে করতেন না। 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' লিখতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী (র) যেসব ঐতিহাসিকের হাওয়ালা দিয়েছেন তাদের কয়েকজনকে মাওলানা ফরিদপুরী (র) শিয়া বলে মনে করতেন এবং শিয়া ঐতিহাসিকের মতামত গ্রহণ করার ফলেই লেখক ভুল সিদ্ধান্তে পৌছেছেন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

মাওলানা ফরিদপুরী (র) 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইটির সমালোচনায় যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাতে বোঝা যায় যে, তাঁর অন্তরে বিদ্বেষ নেই এবং পূর্ণ ইখলাসের ভিত্তিতেই তিনি তা লিখেছেন। তাঁর বইয়ের 'ভুল সংশোধন' নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বইটি লেখেননি। মাওলানা মওদূদীর লেখাকে যেখানে তিনি ভুল মনে করেছেন, সেখানেই সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য বইটির কোথাও কোথাও এমন কিছু কথা আছে, যা মাওলানা ফরিদপুরী (র)-এর স্বভাবসুলভ শালীন ভাষার সাথে মিল খায় না। সেসব কথা অন্যের সংযোজন কি না তা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। বইটির প্রকাশক শুরুতেই কয়েকজন আলেমের অত্যন্ত অশালীন কিছু বক্তব্য যোগ করে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, বইটির সকল বক্তব্য মাওলানা ফরিদপুরীর নয়।

যারা সুবিবেচক ও সত্য তালাশ করতে ইচ্ছুক তাদের অনুরোধ করছি, তারা যেন 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইখানার সাথে ফরিদপুরী (র)-এর লেখা 'ভুল সংশোধন' পুস্তকটি মিলিয়ে পড়েন। যেসব আপত্তি 'ভুল সংশোধন'-এ তোলা হয়েছে এর জবাবও মূল বইয়ের শেষ ভাগে দেওয়া হয়েছে। বই দুটি পড়ে যেখানে যেখানে মাওলানা মওদূদী (র) ভুল করেছেন বলে পাঠকের ধারণা হয়, সেসব কথা গ্রহণ না করলেই হলো। কোনো লেখকের সব কথাই সঠিক হওয়া জরুরি নয়।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা) সম্পর্কে যেসব কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেটাকেই ভিত্তি করে কোনো কোনো সমালোচক মাওলানা মওদূদী (র)-কে সাহাবায়ে কেরামের নিন্দাকারী ও অপমানকারী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাদের লেখার বিদ্বেষপূর্ণ ভাষা দেখে মনে হয় যে, মাওলানা মওদূদী (র) যেন সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বইটি লিখেছেন। অথচ 'তাফহীমুল কুরআন' নামক মাওলানার তাফসীর ও অন্যান্য অনেক বইয়ে সাহাবায়ে

কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা মোতাবেক যেসব উচ্ছ্বসিত ও আবেগপূর্ণ প্রশংসা করা হয়েছে, সেসব কথা তারা পড়েছেন কি না জানি না। 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা) সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে তার সবটুকু আমিও সমর্থন করি না এবং গ্রহণও করি না। কিন্তু তাই বলে মাওলানা মওদূদী (র)-কে সাহাবীবিদ্বেষী বলে প্রচার করা মওদূদী-বিদ্বেষেরই পরিচায়ক।

'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইয়ে যে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা ইসলামের ইতিহাসের এমন কিছু দুঃখজনক ঘটনার সাথে জড়িত, যারাই এ বিষয়ে কলম ধরবেন তাদের পক্ষে একই সাথে হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা) সঠিক নীতির উপর কায়েম ছিলেন এমন কথা প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা অনুযায়ী হযরত আলী (রা) খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত। অথচ হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকে মেনে নেননি। এ অবস্থায় উভয়ই কী করে একই মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন?

মাওলানা ফরিদপুরী (র) হযরত মুয়াবিয়া (রা)-কে হযরত আলী (রা)-এর চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য খলীফা হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ রয়েছে সবই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন। এ সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ হযরত মুয়াবিয়া (রা)-কে কেন খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেন না, সে এক বিরাট প্রশ্ন।

হযরত মুয়াবিয়া (রা) সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না। তাঁকে খলীফা না বলে আমীর মুয়াবিয়া (রা) বলা হয়। এর নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে। হযরত মুয়াবিয়া (রা) ইসলামের বিরাট খিদমত করেছেন– এ কথা স্বীকার করে নিয়েও ইসলামী খিলাফতের নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে ঐতিহাসিকগণ তাঁর নীতিকে সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন। যারাই হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর পক্ষে যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তারা খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী (রা)-কে দোষী সাব্যস্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং এ ইতিহাস এমন সমস্যাপূর্ণ যে, তাঁদের উভয়কে একই মর্যাদার অধিকারী মনে করা একপ্রকার অসম্ভব।

এ বিষয়ে মাওলানা ফরিদপুরী (র)-এর যোগ্য শাগরেদ অধ্যাপক মাওলানা মনিরুজ্জামান ফরিদীর 'মাওলানা ফরিদপুরী সাহেব ও মাওলানা মওদূদী সাহেবের চিন্তার সমন্বয়' নামক পুস্তিকার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তাই ইতিহাসের অনিবার্য প্রয়োজনে যারা এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তাদের কথা নিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় চর্চা করা মোটেই উচিত নয়। কেননা, যারা ঐতিহাসিক নয়, তারা এ নিয়ে বিতর্ক করতে গেলে তাতে ফিতনা সৃষ্টির সম্ভাবনাই বেশি।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি আলোচনা করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী (র) কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'কে আইনের উৎস বলে উল্লেখ করেছেন। ইজমা' মানে সর্বসম্মত রায়। উম্মতে মুহাম্মাদীর ওলামায়ে কেরাম কোনো বিষয়ে একমত হলে সেটাকেই যিনি

শরীআতের হুজ্জাত বা দলীল বলে স্বীকার করেন তিনি যে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা'কে আরো উচ্চমানের হুজ্জাত মনে করেন তাতে সন্দেহ করার কোনো যুক্তি নেই।

১৯৫০ সালে আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী (র)-এর সভাপতিত্বে করাচিতে অনুষ্ঠিত সর্বশ্রেণীর ৩১ জন প্রখ্যাত আলেমের যে সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি ঘোষণা করা হয়, সেখানে মাওলানা মওদূদী (র) যোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তদানীন্তন পাকিস্তানের ৩১ জন শ্রেষ্ঠ আলেমের মধ্যে মাওলানা মওদূদী (র) বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এমন একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যারা ফতোয়া দেন তারা নিজেদের মর্যাদাই নষ্ট করেন। যুক্তির মাধ্যমে মাওলানা মওদূদী (র)-এর বক্তব্য খণ্ডন করা অবশ্যই দীনী দায়িত্ব। কিন্তু ফতোয়া প্রচারের মাধ্যমে দীনের কোনো উপকার হচ্ছে কি না, তা বিবেচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করছি।

আরো একটা কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে হয়। মাওলানা মওদূদী (র)-এর বিরুদ্ধে পাক-ভারত ও বাংলাদেশের কয়েকজন আলেম অবশ্যই বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু দুনিয়ার বড় বড় আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ মাওলানা মওদূদী (র)-কে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ও ইসলামের মহান বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকার করে থাকেন। তাঁর লেখা তাফসীর ও অন্যান্য বই দুনিয়ার ৪০টি ভাষায় তরজমা হয়ে লাখ লাখ লোকের নিকট ইসলামের আলো পৌঁছাচ্ছে। সুতরাং এ দেশের কিছুসংখ্যক লোক ফতোয়া দিয়ে এ আলোকে চাপা দিয়ে রাখতে পারবেন না। আমার বিশ্বাস, তারা যদি মাওলানা মওদূদী (র)-এর বইগুলো মন দিয়ে পড়তেন তাহলে সেগুলোকে অবশ্যই পছন্দ করতেন।

মাওলানা ফরিদপুরী (র)-এর বই সম্পর্কে মাওলানা ইউসুফ

মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)-এর নামে প্রকাশিত 'ভুল সংশোধন' নামক বই সম্পর্কে মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ তাঁর 'মাওলানা মওদূদীর বিরোধিতার অন্তরালে' বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মাওলানা ইউসুফের ভাষায় :

"হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব ছিলেন এ দেশের একজন খ্যাতনামা অনন্য চরিত্রের অধিকারী আলেমে দীন। তিনি ওলামায়ে দেওবন্দের হালকায় শামিল থাকা সত্ত্বেও সকল ধরনের আলেম ও ইসলামপন্থির মহব্বত ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এর মূলে ছিল তাঁর উদার মনোভাব। তিনি অত্যন্ত বিশাল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন এবং ছিলেন সকল প্রকার গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খুবই মহব্বত করতেন। আমি জাতীয় পরিষদ সদস্য থাকাকালীন (১৯৬২-১৯৬৫) ইসলামের পক্ষে জাতীয় পরিষদে আমার ভূমিকায় তিনি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং আমার জন্য দোআ করেছিলেন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ। ইলমী আলোচনার মাধ্যমে চিন্তার ঐক্য ও ভুল বোঝাবুঝির অবসানকল্পে তিনি একাধিকবার তাঁর উপস্থিতিতে জামায়াতের নেতৃস্থানীয় আলেমদের সাথে দেওবন্দী হালকার আলেমদের আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। তাঁর

ইনতিকালের কয়েক মাস আগে এ ধরনের একটা বৈঠকের ব্যবস্থা তাঁর গওহরডাঙ্গাস্থ বাড়িতে করা হয়েছিল।

হযরত মাওলানা শামসুল হক (র) তখন তাঁর গ্রামের বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর একজন ভক্ত মুরীদ ও খুলনা শহরের অধিবাসী মাওলানা হাজী আহমদ আলীর মাধ্যমে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য দুবার করে খবর পাঠালে আমি বর্তমান ইত্তেহাদুল উম্মাহর মজলিসে সাদারাতের সদস্য জনাব মাওলানা ফজলুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে মাওলানা ফরিদপুরীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে লঞ্চযোগে খুলনা হতে গওহরডাঙ্গা মাদরাসায় গিয়ে পৌছি।

গওহরডাঙ্গা মাদরাসার মুহতামিম হযরত মওলানা আবদুল আজিজ সাহেব চা-নাশতার পর আমাদের নিয়ে ফরিদপুরী সাহেবের বাড়িতে আসেন। আমরা যখন হযরত মাওলানা শামসুল হক (র) সাহেবের বাড়িতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি তখন ছিল ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাস, এরপর তিনি আর ঢাকায় ফিরে আসেননি। এভাবেই রোগাক্রান্ত অবস্থায় ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি (আমার সাথে সাক্ষাতের দশ মাস পর) তাঁর গ্রামের বাড়িতে তিনি ইনতিকাল করেন।

আমরা তাঁর বাড়িতে পৌছার পর তিনি মাদরাসা হতে কয়েকজন আলেমকে ডেকে পাঠান এবং কিতাবাদিসহ তাঁর কাছে আসতে বলেন। অতঃপর উপস্থিত আলেমগণ হযরত মাওলানার নির্দেশে মাওলানা মওদূদী (র) প্রণীত 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' পুস্তক হতে হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) সম্পর্কিত কয়েকটি উক্তি পাঠ করেন এবং তারীখে ইবনে কাছীরের হাওয়ালা (রেফারেন্স) দিয়ে মাওলানা মওদূদীর উক্তিকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। প্রকাশ থাকে যে, ঐ বৈঠকে যে দুটি বিষয় সম্পর্কে 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত'-এ লিখিত মাওলানা মওদূদীর উক্তিকে ভুল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল আমি তারীখে ইবনে কাছীরের মাধ্যমেই তার জবাব দিই। কেননা, তারীখে ইবনে কাছীরেই মাওলানা মওদূদীর বক্তব্যের পক্ষে মযবুত দলীল বিদ্যমান।

আলোচনার একপর্যায়ে আমি উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের সামনে হযরত মাওলানা শামসুল হক (র) সাহেবকে এ কথা বলেছিলাম যে, আমি কামিল ক্লাসে হাদীস অধ্যয়নকালে ইসলামের ইতিহাস সবটাই পড়ার মোটামুটি চেষ্টা করেছি। দিল্লির নদওয়াতুল মুছান্নেফীন কর্তৃক প্রকাশিত 'তারীখে মিল্লাত'-এর ছয়টি খণ্ডই আমার কাছে আছে। এর প্রথম দিকের কয়েকটি খণ্ড (বনূ উমাইয়াদের ইতিহাসসহ) লিখেছেন হযরত মাওলানা কাজী যয়নুল আবেদীন দেওবন্দী। আমি এ কথা বলার সাথে সাথেই হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব মাওলানা যয়নুল আবেদীন সাহেবের ভূয়সী প্রশংসা করলেন ও বললেন, আমরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয় জানার জন্য দেওবন্দে তাঁর কাছে যেতাম। তিনি খুব বড় আলেম ও মোহাক্কেক ছিলেন। হযরত ফরিদপুরীর কথা শেষ হতেই আমি বললাম, ইসলামের ইতিহাসে হযরত আলী (রা) ও আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ ও ঘটনাসমূহ পড়ার পর মহান ব্যক্তিদ্বয়ের ব্যাপারে আমার মনে একটা ধারণা জন্মেছে এবং উভয়ের জন্য মনের মণিকোঠায় আলাদা আলাদা মর্যাদাও

নিরূপিত হয়েছে। 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইখানা পাঠ করার পর আমার ঐ ধারণার কোনো পরিবর্তন হয়নি। কেননা, ইসলামের ইতিহাস যারা লিখেছেন (আরব ঐতিহাসিক হোক কিংবা অনারব ঐতিহাসিক হোক, কাজী যয়নুল আবেদীন দেওবন্দীসহ) তাঁদের থেকে ভিন্ন কোনো কথা মাওলানা মওদূদী তাঁর পুস্তকে লেখেননি। এ কথা বলেই আমি আমার ব্যাগ থেকে কাজী যয়নুল আবেদীন প্রণীত 'তারীখে মিল্লাত' বইখানা বের করে তা থেকে হযরত আমীর মুয়াবিয়া প্রসঙ্গে লিখিত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর (কাজী যয়নুল আবেদীনের) কয়েকটি উক্তি পাঠ করে শোনালাম, যার ভাষা ছিল মাওলানা মওদূদীর ভাষা থেকে কড়া এবং মন্তব্য ছিল 'খেলাফত ও মুলুকিয়াতে'র মন্তব্য হতে কঠোর।

এরপর আমি উপস্থিত ওলামায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললাম, হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর ব্যাপারে এত কড়া কথা লেখার পরও কেন মাওলানা কাজী যয়নুল আবেদীন দেওবন্দী ও তাঁর মতো অন্যান্য ইসলামী ইতিহাস লেখকের বিরুদ্ধে কোনো ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে না? অথচ তাঁদের চেয়ে নমনীয় ও মার্জিত কথা লিখেও মাওলানা মওদূদী (র) ফতোয়ার শিকারে পরিণত হয়েছেন। এর কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। আমার মতে, যেহেতু মাওলানা মওদূদী ইসলামী আন্দোলন করছেন, সেজন্যই তাঁর লেখা চালনি দিয়ে ছাঁকা হচ্ছে এবং তা থেকে ত্রুটি বের করার বা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। হযরত মাওলানা কাজী যয়নুল আবেদীনও যদি ইসলামী আন্দোলন করতেন তাহলে তাঁর লেখাও চালনি দিয়ে ছেঁকে তা থেকে ত্রুটি বের করার বা সৃষ্টি করার চেষ্টা চালানো হতো।

অতঃপর আলোচনা বৈঠকে সাহাবায়ে কেরামের 'মি'ইয়ারে হক' অর্থাৎ সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে আমি ব্যাগ থেকে আমার লেখা বই বের করে তা হতে সাহাবায়ে কেরামের 'মি'ইয়ারে হক' বা সত্যের মাপকাঠি হওয়া না হওয়া প্রসঙ্গে চার মাযহাবের ইমামসহ কতিপয় প্রসিদ্ধ ইমাম ও মুজাদ্দিদের উক্তি দলীলসহ পেশ করি। সে বৈঠকে যে আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব (র) ও শ্রদ্ধেয় মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেবকে চিনতাম। অন্য যারা ছিলেন নিঃসন্দেহে তাঁরা গওহরডাঙ্গা মাদরাসার মতো একটি বড় মাদরাসার উস্তাদ ছিলেন। এসব ওলামায়ে কেরাম আমার কথা সেদিন আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছিলেন কি না জানি না; তবে আমার কথার পক্ষে পেশকৃত যুক্তি-প্রমাণের কোনো প্রতিবাদ করেননি।

এরপর আমি বললাম, আমাদের আকীদা ও বিশ্বাস এই যে, পয়গম্বরগণ ছাড়া অন্য সকল মানুষেরই ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তিনি যত বড় আলেম বা পীরই হোন না কেন। সুতরাং মাওলানা মওদূদী সাহেবও ভুলের ঊর্ধ্বে নন। তাই আপনারা মাওলানা মওদূদী সাহেবের 'খেলাফত ও মুলুকিয়াত' বইখানা আরো ভালো করে পড়ুন এবং যদি আপনাদের দৃষ্টিতে কোথাও ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় তাহলে দলীলসহ সে সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী সাহেবকে লিখুন। আমি কয়েক দিনের মধ্যেই জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠকে যোগদানের জন্য লাহোর যাচ্ছি। সেখানে বেশ কয়েকদিন থাকব। আপনাদের লেখা চিঠি বা প্রশ্ন ওখানে খোঁজ করে বের করব এবং মাওলানা

মওদূদী সাহেবের নিকট থেকে জবাব লিখিয়ে নিয়ে আসব। এরপর আমি লাহোরে যাই এবং সেখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করি। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁদের কোনো চিঠিপত্র সেখানে পাইনি। এর ফলে আমি ধারণা করে নিয়েছিলাম, আমার সাথে আলোচনার পর তাঁরা এ সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের প্রয়োজন বোধ করেননি।

প্রকাশ থাকে যে, আমার সাথে ঐ ইলমী আলোচনার মাত্র ১০ মাস পর হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর গ্রামের বাড়িতে ইনতিকাল করেন। তাঁর ইনতিকালের ছয় বছর পর তাঁর নামে 'ভুল সংশোধন' নামক একখানা বই ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে প্রকাশ করা হয়।

মাওলানা শামসুল হক সাহেব (র) (আল্লাহ তাঁর কবরকে নূর দ্বারা আলোকিত করে দিন) শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা হেতু নিজে কিতাব পড়তে পারতেন না এবং কিছু লিখতেও পারতেন না। আমার ধারণা (সঠিক বিষয় আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন), কতিপয় জামায়াতবিদ্বেষী আলেম এই বইখানা লিখে তাঁর নামে প্রকাশের জন্য ইজাযত চেয়েছিলেন। হয়তো তখনই তিনি ঐসব আলেমের সাথে তাঁর সামনে আমার ঐ ইলমী আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। অতঃপর আমার সাথে ঐ ইলমী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বই প্রকাশের ইজাযত তিনি দেননি। এ ধরনের একটা কথা আমি কারো কারো মুখেও শুনেছি।

আমার প্রশ্ন, এ বইখানা প্রকাশ করা যদি হযরত মাওলানা শামসুল হক সাহেব খুব জরুরি মনে করতেন তাহলে তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই প্রকাশ করে যেতেন। আর যদি তিনি বইখানা প্রকাশ করার অসিয়ত করে গিয়ে থাকেন তাহলে তাঁর ভক্তরা এ ছোট্ট বইখানা প্রকাশ করতে ছয় বছর বিলম্ব করল কেন?

এই বইয়ের বেশ কিছু জায়গায় এমন অশালীন ও আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, যা হযরত মাওলানার তবিয়তের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কারো সমালোচনা করলেও কোনো অভদ্র ভাষা ব্যবহার করেছেন বলে প্রমাণ নেই। বইটির ঐ জাতীয় ভাষাই প্রমাণ করে যে, এটা তাঁর লেখা নয়।

দেওবন্দসহ উপমহাদেশে যত দারসে নেজামী মাদরাসা আছে তাতে ইসলামের ইতিহাস পড়ানো হয় না। কেননা, তাদের নেসাবে তারীখ (ইতিহাস) অন্তর্ভুক্ত নেই। তবে কোনো কোনো মাদরাসায় শুধু রাসূলের জীবনীটুকুই পড়ানো হয়। এমতাবস্থায় তারীখে ইসলাম (খোলাফায়ে রাশেদীন, বনূ উমাইয়া ও বনূ আব্বাস) সম্পর্কে অনবহিত ঐসব আলেমের কাছে যখন তাদের বুজুর্গদের অভিযোগসহ হযরত আলী, হযরত হাসান (রা) ও হযরত আমীর মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদ সম্পর্কীয় মাওলানা মওদূদীর লেখনী পেশ করা হয়, তখন তারা কোনোরূপ তাহকীক ছাড়াই তাদের বড়দের মত সমর্থন করে থাকেন। অথচ মাওলানা মওদূদী (র) ইসলামের বিজ্ঞ পুরনো ঐতিহাসিকগণ ছাড়া আলাদাভাবে অন্য কারো তথ্য বা মন্তব্য তাঁর পুস্তকে পেশ করেননি।"

আমি নিজেও মাওলানা ফরিদপুরী (র)-এর ভাষার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাই যে অংশটি অশালীন ভাষায় লেখা, তা তাঁর রচিত নয় বলে আমি নিশ্চিত।

কাওমী মাদরাসার উস্তাদগণের প্রতি আবেদন

আপনারা আল্লাহর রহমতে আলেম হওয়ার কারণে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যেকোনো বই পড়ে তা যাচাই করার যোগ্যতা রাখেন। বইটিতে কোন্ কথাটি সহীহ ও কোন্ কথাটি গলদ, তা বিচার করার তাওফীক আল্লাহ তাআলা আপনাদের দিয়েছেন। মাওলানা মওদূদী লিখিত বই পড়লেই আপনাদের গোমরাহ হয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। আপনাদের কয়েকজন আকাবেরের কিছু বিরূপ মন্তব্যের দরুন আপনারা মাওলানা মওদূদী রচিত কিতাবাদি পড়েন না।

আপনারা লক্ষ করে দেখুন, আলিয়া নেসাবের মাদরাসায় শিক্ষিত আলেমগণ মাওলানা মওদূদীর লিখিত বই পড়ে আধুনিক উচ্চশিক্ষিত লোকদের নিকটও অত্যন্ত চমৎকারভাবে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার যোগ্যতা হাসিল করেছেন।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মাওলানা কামালুদ্দীন জাফরী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ইকামাতে দীনের আন্দোলনে যে যোগ্য ভূমিকা পালন করছেন তা আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করছেন। মাওলানা মওদূদীর লেখা তাফসীর এবং ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য দিক সম্পর্কে তাঁর রচিত কিতাবাদিই তাঁদেরকে এ যোগ্যতা দান করেছে।

আলিয়া নেসাবে পাসকরা আলেমগণের এক বিরাট সংখ্যা জামায়াতে ইসলামীতে বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছেন। আপনারা কি তাঁদেরকে আলেম হিসেবে গণ্য করেন না? তাঁরা কি যোগ্যতার সাথে ছাত্রদেরকে কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হ পড়াচ্ছেন না?

আপনারা যদি মাওলানা মওদূদী রচিত সাহিত্য অধ্যয়ন করেন তাহলে এ যোগ্যতা আপনারাও অর্জন করতে পারবেন। আধুনিক যুগে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মোকাবিলায় ইসলামী অর্থনীতি কীভাবে মানবসমাজকে উন্নত করতে পারে, সে বিষয়ে মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য ছাড়া সঠিক জ্ঞান আর কোথায় পাবেন? আধুনিক শিক্ষিত লোকদের নিকট ইসলামকে যোগ্যতার সাথে পরিবেশন করতে হলে মাওলানা মওদূদীর লেখা বইপত্র পড়া জরুরি।

আমাদের মতো লাখ লাখ আধুনিক শিক্ষিত লোক ইসলামের সঠিক ও ব্যাপক জ্ঞান অর্জনের যে মহাসুযোগ লাভ করেছেন, মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য অধ্যয়নের সুযোগ না পেলে তাঁরা এ সৌভাগ্য লাভ করতে পারতেন না।

আপনারা লক্ষ করছেন যে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাটসংখ্যক ছাত্র ইসলামী জ্ঞানচর্চা করছে এবং এ দেশে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে নিজেদের গড়ে তুলছে। ইসলামবিরোধীদের হাতে তারা শহীদও হচ্ছে। মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যই তাদের মাঝে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার এ জযবা জুগিয়েছে।

২৩৩.

আমার প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে হামলা

১৯৮৬ সালের ৫ ডিসেম্বর জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়। এর আগের দিন সন্ধ্যার পর আমি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করছিলাম। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে কেন্দ্রীয় অফিস সেক্রেটারি অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম এসে বললেন, এই মাত্র আপনার বাড়ি থেকে ফোনে খবর এল, সেখানে বোমা হামলা হয়েছে।

পরে জানা গেল, মাগরিবের পরপর আমি অফিসে রওয়ানা হওয়ার ২ মিনিটের মধ্যেই মোটরসাইকেলে কয়েকজন এসে আমার চেম্বারে ঢুকে পড়ে। মহল্লার রাস্তা সংলগ্ন দেয়ালের উপর টিনের ছাদবিশিষ্ট আধাপাকা একটা বড় ঘরের চেম্বারটিতে পার্টিশন দিয়ে পেছনের অংশে আমি বসি, আর রাস্তার পাশের অংশে পার্টিশন দিয়ে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের এক কামরা ও আমার ব্যক্তিগত সেক্রেটারির এক কামরা রয়েছে।

হামলাকারীদের একজন পিস্তল দেখিয়েই ঘরে ঢুকে বলে উঠল, 'গোলাম আযম কোথায়?' সেক্রেটারি ফযলুর রহমান (বর্তমানে অধ্যাপক) হতভম্ব। সেক্রেটারির কামরা ডিঙ্গিয়ে পিস্তলধারী আমার কামরায় ঢুকে পড়ল। আমার আসনে তখন আমার বড় ছেলে মামূন বসা ছিল। সে ইংল্যান্ড থেকে কিছু দিনের জন্য ছুটি কাটাতে দেশে এসেছিল। হামলাকারীরা আমাকে না পেয়ে মন্দ-সন্দ বলতে বলতে চলে গেল। যাওয়ার সময় ঘরের দিকে কয়েকটা বোমা মেরে গেল। আল্লাহর রহমতে কেউ আহত না হলেও ঘরের দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাড়িতে এসে জানলাম, আমার গাড়ি আমাদের মহল্লার গলি অতিক্রম করার আগেই ওরা মহল্লায় ঢুকে পড়েছিল। মাত্র দেড়-দু'মিনিট আগে এলেই আমাকে গাড়িতে ওঠার সময় নাগাল পেত। আল্লাহ তাআলা হেফাযত করলেন।

আমার চেম্বারের স্থান পরিবর্তন

জামায়াত সিদ্ধান্ত দিল, আমার চেম্বার অবিলম্বে রাস্তার পাশ থেকে সরিয়ে নিতে হবে। আমার বাড়ির পাশে আমার সবচেয়ে ছোট ভাই মাহদীর জায়গায় রাস্তা থেকে দূরে ভেতরের দিকে সেমিপাকা টিনের ছাদবিশিষ্ট দুটো কামরায় জামায়াতের বর্তমান সিনিয়র নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ ও জামায়াতনেতা মরহুম মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী ভাড়ায় থাকতেন। আমার প্রয়োজনে তাঁরা দুজন মেহেরবানী করে ঐ দুটো কামরা খালি করে দিলে সেখানেই আমার চেম্বার স্থানান্তর করা হয়।

মাওলানা ইউসুফ ১৯৮২ সালে যখন ঐ বাসা ভাড়া নেন তখন তিনি জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। তাঁর এ পরিচিতি নিয়েই তিনি তাঁর নামে সেখানে টেলিফোন নেন। তিনি চলে যাওয়ার পর ঐ ফোনই আমি চেম্বারের ফোন হিসেবে ব্যবহার করি। সরকার আমার নাগরিকত্ব স্বীকার করেনি বলে আমার নিজ বাড়িতেও আমার নামে টেলিফোন নেওয়া যায়নি।

পাকিস্তান আমলে আমার বাড়িতে যে ফোন ছিল সেটা আব্বার কামরায় থাকত। আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্‌যামের নামে ঐ ফোন ১৯৫৩ সালে আনা হয়। আমার ভাই আব্বার দেয় জমিতে দালান তৈরি করে সেখানে থাকলেও তার ফোনটা আব্বার কাছে রেখে যায়। '৭১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত আমি ঐ ফোনই ব্যবহার করেছি।

১৯৭৮ সালে যখন সস্ত্রীক দেশে ফিরে এলাম তখন আমার বাড়িতে কোনো ফোন ছিল না। '৭৯ সালে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে মুসলিম লীগের বর্তমান (২০০৫) সেক্রেটারি জেনারেল এডভোকেট নূরুল হক মজুমদার ও প্রেসিডেন্ট জিয়ার টেলিফোনমন্ত্রী জনাব সাঈদুল ইসলাম এক টেবিলে বসা ছিলেন।

এডভোকেট সাহেব আমাদের মহল্লায় আমার চাচা মুসলিম লীগ নেতা এডভোকেট শফীকুল ইসলামের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। টেলিফোনমন্ত্রীর সাথে আমার পরিচয় ছিল না। তাঁরা দুজন আগে থেকেই একসাথে বসা ছিলেন। আমাকে দেখে এডভোকেট সাহেব এগিয়ে এসে আমাকে নিয়ে ঐ টেবিলে বসালেন। তিনি মন্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে জানতে পারলাম, তিনি মুসলীম লীগ নেতা জনাব আবুল কাসেমের ছেলে– যাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

আমার বাড়িতে ফোন নেই– সে কথা নূরুল হক সাহেব জানতেন। তিনিই টেলিফোনমন্ত্রীকে বললেন, অধ্যাপক সাহেবের বাড়িতে ফোনের ব্যবস্থা করে দিন। মন্ত্রী সাহেব বললেন, দরখাস্ত করলেই অবিলম্বে ব্যবস্থা করব। তিনি আমার নামে দরখাস্ত না করার পরমার্শও দিলেন। তাই আমার স্ত্রীর নামে দরখাস্ত করা হলে কয়েক দিনের মধ্যেই ফোন লেগে গেল। আমার বেডরুমে এ ফোনই রয়েছে।

আর আমার চেম্বারে মাওলানা ইউসুফের নামে নেওয়া ফোনই এ পর্যন্ত ব্যবহার করে এসেছি। আমার নিজের নামে কোনো টেলিফোন নেই।

এরশাদ মযবুতভাবে গদিতে আসীন হলেন

১৯৮৬ সালের মে মাসে সংসদ নির্বাচন এবং অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর জেনারেল এরশাদ বৈধ নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশ শাসন করতে লাগলেন। তাঁর দলীয় মন্ত্রীদের নেতৃত্বে জাতীয় সংসদের অধিবেশন নিরুপদ্রবে চলছে; কিন্তু আসলে তো স্বৈরশাসনই কায়েম আছে। গণতন্ত্র তো বহাল হলো না। আইয়ুব খানের শাসনামলেও জাতীয় সংসদ ছিল, কিন্তু গণতন্ত্র ছিল না।

এরশাদ গদিতে পাকাপোক্ত হওয়া সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক আন্দোলন আবার চালু হওয়া প্রয়োজন বলে জামায়াত গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করছিল। বিএনপি সংসদে নেই বলে তাদের আন্দোলনে আগ্রহ থাকলেও আওয়ামী লীগ আন্দোলনে শরীক না হলে একা কিংবা জামায়াতের সাথে মিলে আন্দোলন করতে দ্বিধাবোধ করছিল। আগেই উল্লেখ করেছি, তথাকথিত পাঁচদলীয় বামজোট জামায়াতের বিরুদ্ধে বড় দুই দলকে দুই ভাবে কুমন্ত্রণা দিয়ে আন্দোলনে জামায়াতকে সাথে না রাখার গুরুত্ব বোঝানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটি বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেত্রীদ্বয় এবং অন্য নেতৃবৃন্দকে আন্দোলনের পক্ষে এগিয়ে আসতে সম্মত করা সত্ত্বেও বামজোট তাদেরকে আবার পিছিয়ে দেয়। এভাবে ১৯৮৭ সালের মে মাস পার হয়ে যায়।

পুনরায় যুগপৎ আন্দোলন

১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশনে আন্দোলনের যে পলিসি নির্ধারিত হয় সে অনুযায়ীই লিয়াজোঁ কমিটি তিন জোটের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখল।

মজলিসে শূরায় এ বিষয়ে দীর্ঘ ও ব্যাপক আলোচনা হয় যে, এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আওয়ামী লীগের আটদলীয় জোটের কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। জামায়াত জাতীয় সংসদ বাতিলের দাবি করছে– তা তারা সমর্থন করে না। সংসদে বিএনপি নেই বলে তারা এর পক্ষে থাকলেও আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে বিএনপির সাথে আন্দোলন করা সঠিক কি না? আরো আলোচনা হয় যে, জামায়াতের জন্য কারো সাথে জোটবদ্ধ হওয়া উচিত হবে কি না? অথবা জামায়াতের পক্ষে একা আন্দোলন করা ঠিক হবে কি না?

মজলিসে শূরা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, স্বৈরশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করে দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েমের উদ্দেশ্যে আন্দোলন করা অপরিহার্য। জামায়াতের একার পক্ষে এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া মোটেই সমীচীন নয়। আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে একই সাথে আন্দোলনে সম্মত করতে পারলে জামায়াত যুগপৎ পদ্ধতিতেই আন্দোলনে শরীক থাকবে।

এ পলিসি অনুযায়ী বারবার যোগাযোগের ফলে ১৯৮৭ সালের জুন মাসে আট, সাত ও পাঁচ দলীয় জোট এবং জামায়াত যুগপৎ কর্মসূচি গ্রহণ করে।

তিন জোটের লিয়াজোঁ কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠকে বসত। জামায়াতের সাথে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের পৃথকভাবে বৈঠক হতো। আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়নে জামায়াতের সমান অংশীদারিত্ব ছিল। অনেক ক্ষেত্রে জামায়াতের উদ্যোগী ভূমিকা ছিল। পাঁচদলীয় বামজোটের হঠকারী প্রস্তাব নাকচ করার জন্য আওয়ামী লীগ অনেকবার জামায়াতের সহযোগিতা চেয়েছে।

২২ থেকে ২৮ জুন 'দাবি সপ্তাহ' পালন করা হয় এবং ২৮ জুন ঢাকায় সমাবেশ ও বিক্ষোভের কর্মসূচি সফলভাবে পালিত হয়। ফলে কর্মীদের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টি হয়। ২০ থেকে ২২ জুলাই দুপুর ১২টা পর্যন্ত ৫৪ ঘণ্টার হরতাল পালনের মাধ্যমে আন্দোলনে গতি সঞ্চার হয়।

আগস্ট মাসে (১৯৮৭) ফারাক্কা বাঁধ ছেড়ে দেওয়ার ফলে অসময়ে ভয়াবহ বন্যা হলো। তিন জোট ও জামায়াত ১৭ থেকে ৩১ আগস্ট বন্যাদুর্গত এলাকা সফর করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। ফারাক্কা ইস্যুকে জাতিসংঘে উত্থাপনের দাবি জানানো হলো। কিন্তু সরকার

ভারতকে নাখোশ করতে সাহস পেল না। জামায়াত বিক্ষুব্ধ জনগণকে সাথে নিয়ে ফারাক্কা ইস্যুতে সরকারবিরোধী আন্দোলন করার প্রস্তাব দেয়। বড় দুই দলের আগ্রহের অভাবে তা করা গেল না। জামায়াত পরিকল্পিতভাবে বন্যাদুর্গতদের মাঝে সাধ্যমতো ত্রাণ তৎপরতা চালিয়ে গেল।

বন্যা-পরবর্তী আন্দোলন

বিএনপি ও পাঁচদলীয় জোট লাগাতার হরতালের পক্ষে ছিল। আওয়ামী লীগকে দোদুল্যমান দেখা গেল। অবশেষে ১৯ ও ২০ অক্টোবর লাগাতার ৪৮ ঘণ্টা হরতাল করা হলো। জামায়াত হরতাল না করার জন্য তিন জোটকেই বিশেষভাবে চাপ দিল। হরতালে জনগণেরই দুর্ভোগ হয়। সরকারের চেয়ে খেটে খাওয়া মানুষেরই ক্ষতি হয় বেশি। আওয়ামী লীগ হরতাল না করার পক্ষে সম্মত হয়। বিএনপিও নমনীয় হয়। কিন্তু পাঁচদলীয় জোট আন্দোলন বলতে হরতাল ও ভাঙচুরই বুঝে।

হরতাল শেষে ২০ জুন আওয়ামী লীগের জনাব আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে তিন জোটের বৈঠক বসল, আর জামায়াত নিজ অফিসে পৃথকভাবে বৈঠকে বসল। হরতাল ছাড়া আর কী কর্মসূচি দেওয়া যায় সেটাই ছিল আলোচ্য বিষয়। তাঁদের নিকট জামায়াত অবরোধ করার প্রস্তাব পেশ করে। তারা তা লুফে নিল। রেডিও-টিভি ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসকের অফিস অবরোধ শেষে ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ এবং ঢাকায় মহাসমাবেশের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ ও মহাসমাবেশকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে এক সপ্তাহ আগেই সরকার ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করল। সারা দেশে হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করা হলো, যাতে ঢাকার মহাসমাবেশে বাইরে থেকে জনগণকে ঢাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা না যায়। ঢাকায় অধিকাংশ নেতাই গ্রেফতার এড়িয়ে চললেন। যারা গ্রেফতার হলেন তাদেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক করা হলো। আটককৃতরা হলেন জামায়াতে ইসলামীর জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, আওয়ামী লীগের জনাব আবদুল মান্নান, বিএনপির কর্নেল (অব.) অলি আহমদ ও কর্নেল (অব.) আকবর হোসেন। সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে দিল। এত কিছুর পরও পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস মোকাবিলা করে কোনো রকমে সমাবেশ হলো; মহাসমাবেশ হতে দিল না।

গ্রেফতারের তালিকায় আরো যোগ হলেন ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ, এডভোকেট শামসুল হক চৌধুরী, এডভোকেট আলীমুজ্জামান চৌধুরী, সাম্যবাদী দলের বাবু নির্মল সেন, পাঁচদলীয় জোটের জনাব মাইনুদ্দীন খান বাদল ও সাতদলীয় জোটের জনাব শামসুল আরেফীন। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব জিল্লুর রহমানও গ্রেফতার হন।

গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দের মধ্যে জেলখানায় সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয় রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে। জেলের পরিবেশে পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় এবং হৃদ্যতা জন্মে। বাইরে এলে দলীয় বিভেদ যথাযথভাবে বহাল থাকলেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে জেলের বন্ধু হিসেবে সম্পর্ক বহাল থাকে।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, জামায়াতের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করে এরশাদকে ক্ষমতা ত্যাগের জন্য চাপ দেওয়ার প্রস্তাব শেখ হাসিনার নিকট পেশ করা হলে তিনি সম্মত হননি। জেলে মুজাহিদ সাহেব ঐ প্রস্তাবের পক্ষে লবি করতে থাকেন।

জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ

৩০ নভেম্বর (১৯৮৭) আওয়ামী লীগের জনাব আবদুল মান্নান মুক্তি পান। মুক্তির পূর্বে তিনি মুজাহিদ সাহেবকে কথা দেন যে, তাঁর দল যাতে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয় সে চেষ্টা তিনি করবেন। ১ ডিসেম্বর মুজাহিদ সাহেব মুক্তি পান। জেল অফিসে জনাব জিল্লুর রহমানও মুক্তির জন্য উপস্থিত ছিলেন। জেল ফর্মালিটিতে বেশ সময় পাওয়া গেল। মুজাহিদ সাহেব তাঁর সাথে আলোচনা করলে তিনি জোর দিয়েই বললেন, এ মুহূর্তে সংসদ থেকে পদত্যাগ করাই জরুরি। আমরা পদত্যাগের সিদ্ধান্তই নেব।

আওয়ামী লীগনেত্রী তখন গৃহবন্দী ছিলেন। মুজাহিদ সাহেব ২ ডিসেম্বর দিন ও রাতে দুবার জনাব জিল্লুর রহমানের সাথে কথা বলেছেন। তিনি স্পষ্ট বললেন, আমরা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। শুধু নেত্রীর সম্মতির প্রয়োজন। আপনারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিন।

জামায়াতই ১৯৮৭ সালের শুরুতে পদত্যাগের প্রস্তাব পেশ করে। আওয়ামী লীগ সম্মত হতে বিলম্ব করে। যখন তারাও সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানাল তখন নিশ্চিন্তে জামায়াত চূড়ান্ত ফায়সালা করল।

মুজাহিদ সাহেবের 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন' শিরোনামের লেখা থেকে পদত্যাগের ঘটনাটি উদ্ধৃত করছি :

"৩ ডিসেম্বর, আমরা সংসদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। সিদ্ধান্ত হলো, প্রেসক্লাবে গিয়ে প্রেস ব্রিফিং-এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। তার পূর্বে আওয়ামী লীগকে অফিসিয়ালি জানানো হবে। সেমতে জনাব জিল্লুর রহমান সাহেবের বাসায় টেলিফোন করলাম। তিনি বাসায় ছিলেন না। টেলিফোন ধরলেন তাঁর স্ত্রী আওয়ামী লীগ নেত্রী বেগম আইভি রহমান। তাকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানালাম এবং অনুরোধ করলাম, জনাব জিল্লুর রহমানকে জানাতে। এরপর টেলিফোনে কথা বললাম জনাব আবদুল মান্নান সাহেবের সাথে। তাঁকে অফিসিয়াল ভাষায় আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের সদস্য হিসেবে আমাদের সিদ্ধান্ত অবহিত করলাম। তিনি সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বললেন, ভালো হয়েছে। আমাদের জন্য সুবিধা হলো। আপনারা এগিয়ে যান। আমি এও জানিয়ে দিলাম যে, একটু পরে (দুপুরে) প্রেসক্লাবে গিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি। ৩ ডিসেম্বর (১৯৮৭) ছিল বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য দিন। ঐ দিন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ তার দশজন সংসদ সদস্যের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এক নজির স্থাপন করে। গণতন্ত্রের স্বার্থে জনমতকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে পূর্বপ্রতিশ্রুতি মোতাবেক এভাবে সংসদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত বিরল দৃষ্টান্ত। ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে তদানীন্তন জামায়াত সংসদীয় গ্রুপের নেতা জনাব অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ ১০ জন সংসদ

সদস্যের উপস্থিতিতে প্রেসক্লাবে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। মুজিব ভাই ছাড়া অন্য সংসদ সদস্যগণ হলেন– জনাব মাওলানা মোজাম্মেল হক, জনাব লতিফুর রহমান, জনাব কাজী শামসুর রহমান, জনাব জবানউদ্দীন আহমদ, জনাব এডভোকেট নূর হোসাইন, জনাব মকবুল হোসাইন, জনাব মাওলানা আব্দুর রহমান ফকির, জনাব মীম ওবায়দুল্লাহ এবং জনাব আবদুল ওয়াহেদ।

কিন্তু আওয়ামী লীগ পদত্যাগ করল না। আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ ছাড়া ঐ ঠুটো সংসদে থাকার প্রয়োজনীয়তা আজো বুঝতে পারিনি। আওয়ামী লীগকে অবশ্য জোরের সাথেই বলেছিলাম, পদত্যাগ না করলে 'আমও যাবে ছালাও যাবে'। অর্থাৎ বদনাম কামাবেন; সংসদও রাখতে পারবেন না। বাস্তবে তা-ই হয়েছিল। ৬ ডিসেম্বর রাতে এরশাদ সাহেব আকস্মিকভাবে সংসদ ভেঙে দিলেন। সংসদ ভেঙে দিলেন বটে, কিন্তু কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হলেন না।"

গত এপ্রিল মাসে (২০০৫) দৈনিক ইনকিলাবে দেয় সাক্ষাৎকারে এরশাদ সাহেব বলেছেন, সংসদ ভেঙে দেওয়া আমার সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ভুল ছিল। তিনি সংসদ ভেঙে দিলেন বটে, কিন্তু আন্দোলনের প্রধান দাবি 'পদত্যাগ' করলেন না।

আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি

এরশাদ ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রয়োজনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করলেন। তিন জোট ও জামায়াতের রাজনৈতিক ময়দানে কর্তব্য ছিল ঐ নির্বাচন ঠেকানো। সংসদ থেকে পদত্যাগ করার উদ্দেশ্য তো আরেকটা সংসদ নির্বাচন হতে পারে না। তাই '৮৮ সালের জানুয়ারি থেকে সরকারবিরোধী ব্যাপক কর্মসূচি পালন করা হয়। বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিল, হরতাল ইত্যাদি চলতে থাকে। নির্বাচন বানচাল করার মতো জোরদার আন্দোলন করা সম্ভব না হলেও তিন জোট ও জামায়াত আন্তরিকতার সাথেই নির্বাচন বর্জন করে। শুধু ফ্রিডম পার্টি নির্বাচনে অংশ নেয় এবং আগস্ট বিপ্লবের অন্যতম নায়ক কর্নেল রশীদ নির্বাচিত হন।

নির্বাচনের দিন হরতালের মাধ্যমে নির্বাচন প্রতিরোধের ডাক দেওয়া হয়। জনগণ ব্যাপক সাড়া দেয়। অতি নগণ্যসংখ্যক ভোটার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়। সরকার নির্লজ্জের মতো দাবি করে, শতকরা ৭০ জন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে।

নির্বাচনপরবর্তী পরিস্থিতি

মুজাহিদ সাহেবের 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন' শিরোনামের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে পূর্বের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটেনি। এরশাদের পতন হলে আমার কী লাভ– এ চিন্তা তাদেরকে এ যাত্রায়ও সংশয়ে ফেলে দিয়েছে। মোটকথা, আন্দোলনরত দলগুলোর বলিষ্ঠ ভূমিকার অভাবেই এরশাদ সাহেব নির্লজ্জ মিথ্যাচার চালিয়ে পার পাওয়ার সুযোগ করে নিলেন। যেখানে নির্বাচন প্রতিরোধের মধ্যদিয়ে

সরকারকে বেকায়দায় ফেলানো সম্ভব ছিল, সেখানে আন্দোলনরত শক্তিই দুর্বল হয়ে পড়ল। তবুও আমাদের পীড়াপীড়িতে কর্মসূচি দেওয়া হলো। ২ মার্চ সকাল ৬টা থেকে ৩ মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত ৪৮ ঘণ্টার হরতাল পালিত হয়। হরতালের ব্যাপারে ঘোর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তা পরিহার করা সম্ভব হয়নি। হরতালে জনগণের দুর্ভোগ এবং জাতির বৃহত্তর ক্ষতি সাধিত হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য এটা খুবই সহজ কর্মসূচি। ৬ মার্চ সারা দেশে সরকারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস পালিত হলো; কিন্তু আন্দোলন জমানো গেল না।

১৯৮৮ সালের এ পর্যায়ে এসে আমাদেরকে দুঃখজনক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ মোকাবিলা করতে হলো। এরশাদ সাহেবের নিকট জামায়াতে ইসলামীর ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল–

১. আন্দোলনের ব্যাপারে জামায়াত সবচেয়ে সিরিয়াস ও আন্তরিক।

২. জামায়াতই সর্বপ্রথম সরকারকে অবৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে।

৩. কেয়ারটেকার সরকারের যৌক্তিক ফর্মুলা সর্বপ্রথম জামায়াতই দিয়েছে।

৪. জামায়াতের কাউকে কেনা যায় না বা ম্যানেজ করা যায় না।

এ জন্য এরশাদ সাহেব জোরেশোরে জামায়াতবিরোধী অভিযানে নেমে পড়লেন। কার সাথে কী গোপন আলাপ বা আঁতাত করলেন জানি না। তবে এ সময় আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ এবং পাঁচদলীয় জোটের ছাত্রসংগঠনগুলো এরশাদের ছাত্রসমাজের সাথে মিলে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সন্ত্রাসের তাণ্ডব বৃদ্ধি পেল। পাঁচদলীয় জোট সরকারবিরোধী আন্দোলন বাদ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে নেমে পড়ল এবং আওয়ামী লীগও আমাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো। বিএনপি রহস্যজনক নীরবতা পালন করল। মোটকথা, ১৯৮৮ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এরশাদবিরোধী বা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন আর হলো না।"

২৩৪.

বিদেশ সফর

নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে প্রায় সাত বছর বাধ্য হয়ে বিদেশে থাকাকালে বহু দেশ সফর করতে হয়েছে। ১৯৯৪ সালে নাগরিকত্ব বহাল হওয়ার পর বেশ কয়েকবার সৌদি আরব, কুয়েত, আমেরিকা ও ইংল্যান্ড সফর করেছি। এসব সফর ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনেই করতে হয়েছে।

২০০১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে জামায়াতের ইমারতের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার পরও জামায়াতের সিদ্ধান্তে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা সফর করেছি। ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে 'তরজমায়ে কুরআন মজীদের' সহজ বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনে নিরিবিলি সময় পাওয়ার উদ্দেশ্যে সাড়ে তিন মাস সৌদি আরবের জেদ্দায় আমার বড় ছেলের বাসায় কাটালাম। ঐ বছরই ডিসেম্বরে ২০ দিনের সফরে পাকিস্তান গেলাম।

এ বছর (২০০৫) ১৫ এপ্রিল থেকে ডান পায়ে সায়েটিকা রোগের দরুন চলাফেরা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর কোথাও সফরে যাওয়া সম্ভব হবে না বলেই ধারণা হয়েছিল। শুধু জুমুআর দিন ক্র্যাচে ভর দিয়ে নামাযে যেতাম। বসে বসে লেখা-পড়ার কাজ চালু রইল। সায়েটিকায় সামান্য ব্যথা থাকলেও ডাক্তার শুয়ে থাকতে বাধ্য করেন। তাই শুয়ে থাকার বেকারত্ব অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়ার আশায় চলাফেরা একেবারেই বন্ধ রাখলাম। শোবার ঘর থেকে পড়ার ঘর পর্যন্ত চলাফেরা সীমাবদ্ধ।

আমার মগবাজারের বাড়ি থেকে অতি কাছে কাকরাইলে ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে ফিজিওথেরাপি নিতে যেতাম। আল্লাহর রহমতে এ চিকিৎসার উসিলায় রোগের এ পরিমাণ উপশম হলো যে, ক্র্যাচের সাহায্যে ধীরে ধীরে হাঁটা সম্ভব হয়। স্বাস্থ্যের অবস্থা অন্য দিক দিয়ে ভালো থাকায় চলাফেরা ছাড়া লেখাপড়ার কাজ চলতে লাগল।

আরেকটা কাজ আমি উৎসাহের সাথে করি। আমার পড়ার ঘরে নিয়মিত কয়েকটি স্টাডি সার্কেল চলে। ২০/২৫ জনের বসার ব্যবস্থা আছে। গত জুন মাসের শেষ পর্যন্ত চারটি স্টাডি সার্কেল চালু ছিল। প্রথমটিতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ, দ্বিতীয়টিতে ঢাকা মহানগর জামাআতের থানা সেক্রেটারিগণ। থানা আমীরদের কোর্স এর আগে সমাপ্ত হয়েছে। তৃতীয়টিতে মহিলা বিভাগের থানা সেক্রেটারিগণ। চতুর্থটিতে মহানগর আমীর কর্তৃক বাছাইকৃত উচ্চশিক্ষিত ও নেতৃত্বের সম্ভাবনাময় একটা টিম।

ইংল্যান্ড সফরের দাবি

আমার পাঁচ ছেলের মধ্যে পাঁচ জনই বিদেশে। চতুর্থ ছেলে আমান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বলে দেশেই আছে। বড় ছেলে জেদ্দায় কর্মরত থাকলেও তার ছেলেমেয়েরা ইংল্যান্ডেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। চার ছেলেই সপরিবারে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ম্যানচেস্টারে থাকে।

আমার বাধ্যতামূলক নির্বাসনকালে ওরা ছয় ভাই ১৯৭৭ সালে ম্যানচেস্টারে সর্বশেষবার একসাথে কিছুদিন ছিল। এবার (২০০৫) ২৮ বছর পর আবার সেখানেই তারা একসাথে কিছু দিন কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল। তাই যে দেশে আছে, তাকেই বিদেশে যেতে হলো। সে মাত্র এক মাসের ছুটি পেল।

এ উপলক্ষে ওরা আমাকে এবং ওদের মাকে ম্যানচেস্টারে যাওয়ার জন্য দাবি জানাল। আরো দুটো বড় উপলক্ষ শামিল হওয়ায় দাবি জোরদার হয়ে গেল। বড় ছেলে মামূনের প্রথম পুত্র নাবীলের বিয়ে এবং দ্বিতীয় ছেলে আমীনের বড় মেয়ে হবু ডাক্তার আতিয়ার বিয়ে। ইতঃপূর্বে এক আলোচনায় এসেছে, ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে এ মেয়ের বিয়ে ঢাকা থেকেই ফোনে আমি পড়িয়েছি। মেয়েকে উঠিয়ে দেওয়ার তারিখ ঠিক হলো এ বছর ২৪ জুলাই। এতগুলো উপলক্ষ একসাথ হওয়ায় এ দাবি মানতেই হলো।

আমার দাদা ৮০ বছর বয়সে এবং আমার আব্বা ৭৮ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তাঁরা দুজনই কোনো নাতির বিয়ে দেখে যাননি। আল্লাহ তাআলা আমাকে এ সুযোগ দিলেন বলে নাতি-নাতনীদের এবং তাদের পিতামাতার আনন্দে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য

হলো। আমি সস্ত্রীক ১৬ জুলাই রওয়ানা হয়ে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু চতুর্থ ছেলে আর্মি অফিসার আমানের সাথে ৪ জুলাই আসতে বাধ্য হলাম। তার ছুটির সময়ের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে আগেই আসতে হলো।

২ আগস্ট আমানকে সিঙ্গাপুরে ১০ দিনব্যাপী এক প্রোগ্রামে যোগদান করার প্রয়োজনে ৩১ জুলাই তাকে ঢাকা রওয়ানা হতে হয়। ঐ তারিখেই লন্ডনে নাতনী আতিয়ার ওয়ালীমাতেও সে শরীক হতে পারল না। ১৭ সেপ্টেম্বরে বড় নাতির বিয়েতেও থাকতে পারেনি। এমনকি আমানের বড় মেয়ে নাবীহা বেচারিও ওর বড় ভাইয়ার বিয়েতে শরীক হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। সে ১৪ আগস্ট ঢাকা ফিরে যেতে বাধ্য হলো। কারণ, তাকে পরীক্ষা দিতে হবে। সে ভিকারুন্নিসা ন্যূন কলেজের ছাত্রী।

দেশে ও বিদেশে বিচ্ছিন্ন পরিবারের সমস্যা

যাদের পরিবারের কিছু লোক বিদেশে দীর্ঘদিন অবস্থান করে তাদের সমস্যা প্রধানত দুটো :

১. আপদ-বিপদে, অসুখ-বিসুখে, শোক-দুঃখে পরিবারের সবাই একসাথে শরীক হতে পারে না। পিতামাতা অসুস্থ হলে বিদেশ থেকে সপরিবারে ছেলে-মেয়েরা এসে দেখতে পারে না। তাদের কেউ মারা গেলে সবাই জানাযায়ও শামিল হতে পারে না। যারা জানাযায় আসতে পারে তাদের অপেক্ষায় লাশ দাফন বিলম্বিত হয়।

২. বিয়ে-শাদির আনন্দেও পরিবারের সবাই একসাথে শরীক হতে পারে না। এতে আনন্দের স্বাদ পূর্ণরূপে উপভোগ করা যায় না।

আমার ছয় ছেলের সন্তানদের সংখ্যা বর্তমানে (২০০৫) ২০ জন। এর মধ্যে মাত্র তিনজন দেশে থাকে। পাঁচ ছেলের সন্তানরা সবাই বিদেশে। এ ২০ জনের মধ্যে এক ডজন নাতনী ও দুই হালি নাতি। আল্লাহ আমাকে কোনো মেয়ে দেননি বটে, কিন্তু নাতনীর সংখ্যা বেশি দিয়ে তা পুষিয়ে দিয়েছেন।

আমার আব্বা পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সবার বড় ছিলেন। পরবর্তী প্রজন্মে আব্বা ও চাচাদের সন্তানদের মধ্যে আমি সবার বড়। আমরা ১৭ জন চাচাত ভাইয়ের সন্তানদের মধ্যে আমার বড় ছেলে মামূন গোটা বংশে সবার বড়। এর পরবর্তী প্রজন্মে বৃহত্তর বংশেও মামূনের বড় ছেলে নাবীল সবার বড়।

আমার ভাই-বোনেরা বর্তমানে দেশেই আছে। চাচাতো বোনেরাও দেশে। চাচাতো ভাইদের সাতজনই আমেরিকা ও কানাডায়।

বংশের বড় ছেলের বিয়েতে যারা ইংল্যান্ডে আছে শুধু তারাই শরীক হচ্ছে। দেশ থেকে বংশের আর কেউ আসতে পারছে না। আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যামের বড় ছেলে সোহায়ল ইংল্যান্ডে থাকে বলে শুধু তাকেই পাওয়া যাচ্ছে। আমেরিকা ও কানাডা থেকে কারো আসা সম্ভবপর নয়। বংশের বাইরের আত্মীয়-স্বজনদের এ আনন্দে শরীক করার কোনো উপায়ই নেই।

আমার এক ডজন নাতনীর মধ্যে দ্বিতীয় ছেলে আমীনের প্রথম মেয়েটিই এ প্রজন্মের সবার বড়। তার বিয়েও এ দেশেই হয়ে গেল। পাত্রের পিতা মৌলভীবাজার থাকেন।

একসময় ম্যানচেস্টারেই ছিলেন। পাত্র তাঁর একমাত্র ছেলে। তিনি এ বছর (২০০৫) ডিসেম্বরে মৌলভীবাজারে ছেলে এবং তাঁর বৌমার বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান করতে চান। আমার ছেলেও তার কন্যা ও জামাতার বিয়ে উপলক্ষে ঐ সময়ই ঢাকায় অনুষ্ঠান করে সকল আত্মীয়-স্বজনকে আনন্দে শরীক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমার বড় নাতি

আমার আটজন নাতির মধ্যে নাবীল সবার বড়। সে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৩ সালে বিএ অনার্স পাস করে। তার বিষয় ছিল 'ম্যাথমেটিকস উইথ বিজনেস এন্ড ম্যানেজম্যান্ট।' ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে এমএ ভর্তি হওয়ার কথা ছিল। ২০০৩-০৪ সেশনে তার মায়ের অসুখের কারণে তাকে জেদ্দা ও ম্যানচেস্টারে দৌড়াদৌড়ি করার কারণে পড়া বন্ধ রাখতে হয়। তার ছোট দুভাই এ-লেভেল পাস করার পর আরবী ভাষা শেখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এক বছর বিলম্বিত করল। নাবীল আরবী শেখার উদ্দেশ্যে এমএ পড়া এক বছর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ওর মায়ের চরম অসুস্থতার কারণে কায়রোতে মাত্র পাঁচ মাস আরবী শেখার সময় পেল।

এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, ২০০৫-২০০৬ সেশনে তার এমএ পড়া সমাপ্ত করতে হবে। সেপ্টেম্বর মাসেই ভর্তি হওয়ার অনুমতি পেয়েছে। তার বিষয় হলো HRM (Human Resource Management)। ইসলামী আন্দোলনের জন্যও এ বিষয়টা অত্যন্ত উপযোগী বলে সে মনে করে। এমএ ফাইনাল পরীক্ষার পর আরবী শেখার কোর্স সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ছয় মাসের জন্য আবার তাকে কায়রো যেতে হবে।

নাবীল ম্যানচেস্টারে ইয়াং মুসলিম অর্গানাইজেশনের প্রধান ছিল। অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বে তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সংগঠনের একজন সিনিয়র মেম্বার হিসেবে সে এখন দায়িত্ব পালন করছে। এ দেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের প্রধান সংগঠন হলো ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ। গোটা ইউরোপেই এর শাখা বিস্তৃত। ফোরামের ছাত্র-যুব সংগঠনের নামই হলো YMO (Young Muslim Organization)।

নাবীলের বিয়ের কথা

নাবীলের পিতা মামূনকে এমএ পাস করার আগেই বিয়ে করিয়েছিলাম। নাবীলের মায়ের ক্যান্সার হওয়ার পর তার ইচ্ছা ছিল যে, দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার আগে বড় ছেলেকে বিয়ে করিয়ে বউ দেখে যাবে। অলংকারাদিও কিনে রেখেছিল। ম্যানচেস্টারে চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ার পর হোমিও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালের আগস্টেই নাবীলের মাকে ঢাকায় নেওয়া হয়। চার মাস পর তার মৃত্যু হয়; এ সম্পর্কে পঞ্চম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ঢাকায় কন্যা তালাশ করা হচ্ছিল। কিন্তু পছন্দসই মেয়ে দুই মাসের মধ্যেও জোগাড় হয়নি। অক্টোবরে তার অবস্থার অবনতি হয় এবং ৩০ নভেম্বর তার ইনতিকাল হয়। নাবীলের বয়স তখন ২৫ বছর পূর্ণ হয়নি। নাবীল আমাকে বলল, 'আম্মার দেখার জন্যই

আমার বিয়ের কথা চিন্তা করা হয়েছিল। এখন আর তাড়াহুড়া করার দরকার নেই। মামূনের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো. নাবীল এমএ পাস করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পরই বিয়ে করুক।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি লন্ডনপ্রবাসী ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ ফোনে আমার নিকট নাবীলের সাথে একটি মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিল। সে বলল, 'নাবীলকে অনেক দিন থেকেই আমি চিনি। ইসলামী আন্দোলনে তাকে যেমন অগ্রসর দেখেছি, মেয়েটি ছাত্রীমহলে তেমনি অগ্রসর। সবদিক দিয়ে এদের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। একটা আদর্শ দম্পতির সম্ভাবনা এদের মধ্যে রয়েছে বলে আমি মনে করি।' আমি বললাম, পরামর্শের পর জানাব। এপ্রিলের শুরুতে সে ঢাকায় আমার বাড়িতে সাক্ষাৎ করতে গেলে তার প্রস্তাব সম্পর্কে আমি বললাম, এ মেয়ে সম্পর্কে আমি জানি। এ পরিবার ইসলামী আন্দোলনেরই পরিবার। মেয়ের পিতা আমার বহু পুরনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও মহব্বতের দীনী ভাই। মা মুন্নীর ইনতিকালের পর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, নাবীলের বিয়ে এখন হবে না। এমন একটা ভালো প্রস্তাব পাওয়া সত্ত্বেও আমরা তা বিবেচনা করতে পারছি না বলে দুঃখিত।

কিছু দিন পর আমার ছোট ছেলে সালমান ম্যানচেস্টার থেকে ঢাকায় ফিরে এসে এ প্রস্তাবের পক্ষে জোর তদবির শুরু করল। সে বলল, এমন চমৎকার প্রস্তাবটি বিবেচনা করার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। নাবীলের বোন লুবাবা ইসলামী আন্দোলনের ছাত্রী শাখায় ঐ মেয়ের সাথে কাজ করে। লুবাবাও এ প্রস্তাব জোরেশোরে সমর্থন করে।

বললাম, 'তাহলে জেদ্দায় মামূনের সাথে যোগাযোগ কর এবং কায়রোতে নাবীলের সাথেও কথা বল।'

বেশকিছু দিন যোগাযোগ ও মতবিনিময় চলার পর এপ্রিল মাসের শেষের দিকে মামূন ঢাকা এল। লুবাবাও ম্যানচেস্টার থেকে ঢাকা পৌঁছল। আমরা সবাই একসাথে পরামর্শ করলাম। লুবাবার মায়ের ইচ্ছা ছিল এমন একটি মেয়ে, যে ঢাকায় ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষিতা; যাতে বাংলাদেশি মুসলিম কালচারে অভ্যস্ত হয়। লুবাবা ওর খালার সাথে কয়েকটি মেয়ে দেখল। আরো যারা ঢাকায় শিক্ষিতা মেয়ের পক্ষে ছিল তারা লন্ডনি মেয়ে সম্পর্কে এ বিষয়ে জানতে চাইল। লুবাবা এ বিষয়ে ঐ মেয়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিল যে, এ মেয়ে সবদিক দিয়েই বাংলাদেশি; এমনকি বাংলাদেশে থাকতেও আপত্তি করবে না। লুবাবার এ মযবুত সাক্ষ্য তার পিতা মামূনের মনেও প্রভাব বিস্তার করল। এ প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সালমানকে এ খবর জানালে সে পরম উৎসাহ নিয়ে হামিদ হোসাইন আজাদকে সুখবর দিল। সালমান কয়েকদিন পর ফোনে আমাকে জানাল, হামিদ হোসাইন নাকি বলেছে, এখন মুরব্বি পর্যায়ে যোগাযোগ হওয়া প্রয়োজন। মেয়ের পিতা বর্তমানে ঢাকায় আছেন। ১৯৭০ সাল থেকে তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক ইসলামী আন্দোলনের সহকর্মী হিসেবে।

তাঁকে ফোন করে বললাম, আপনার সাথে দীনের ভিত্তিতে বহুদিন থেকে মহব্বতের সম্পর্ক। আপনার জামাতা, আমার ছোট ছেলে ও মামূনের বড় মেয়ে আপনার সাথে আমার পারিবারিক সম্পর্ক করার ষড়যন্ত্র (!) করছে। 'ষড়যন্ত্র' শব্দ শুনে তিনি খুব হাসলেন। এখন সাক্ষাৎ প্রয়োজন বলে জানালাম। বললাম, নিয়ম অনুযায়ী পাত্রপক্ষই পাত্রীপক্ষের নিকট গিয়ে কথা বলে। আমি সায়েটিকা রোগের কারণে আপনার কাছে যেতে অক্ষম। তিনি সাথে সাথেই বললেন, 'আমিই আপনার বাড়িতে আসব।' আমি শুকরিয়া জানালাম।

মুরব্বি পর্যায়ে প্রথম বৈঠক

দুই দিন পরই পাত্রীর পিতা ও চাচা আমার বাড়িতে এলেন। সাথে পাত্রীর বড় ভগ্নিপতি ইঞ্জিনিয়ার মুমতাজুল করীমও ছিলেন। কন্যার পিতা মাওলানা প্রফেসর আবদুল আউয়ালের বাড়ি নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায়। তিনি কুমিল্লা ভিকটোরিয়া কলেজে আরবীর অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জামায়াতের নমিনি হিসেবে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কলেজ থেকে পদত্যাগ করেই নির্বাচন করতে হয়েছে। পরে তিনি লন্ডন গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সেখানকার সংগঠনে তিনি সবসময়ই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

কন্যার আপন চাচা আবু নাসের মোহাম্মাদ আবদুজ্জাহের বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রথম দিকের সভাপতি। জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ, কর্মপরিষদ ও মজলিসে শূরার বহু পুরনো সদস্য। দীর্ঘকাল জামায়াতের বিদেশ বিভাগীয় সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছে। আমি জামায়াতের দায়িত্বে থাকাকালে ১৯৯৫ থেকে '৯৯ সাল পর্যন্ত সকল বিদেশ সফরে আমার সাথী ছিল। বিশেষ করে সৌদি আরব, ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় ঐ পাঁচ বছরে বেশ কয়েকবার সফরে গিয়েছি।

মাওলানা আবদুল আউয়াল সাহেবের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দীনী ভাই হিসেবে। আর আবু নাসেরের সাথে সম্পর্ক অনেকটা বাপ-বেটার মতো। আমার সাথে তার আচরণ এ রকমই। এ সম্পর্কটা তারই সৃষ্টি। ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি হিসেবে ১৯৭৪ সালে আবু নাসের হজ্জ করতে গেলে আমার সাথে দেখা হয়। এর আগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকায় আমি 'আপনি' সম্বোধন করায় সে তীব্র আপত্তি তুলে আমাকে 'তুমি' বলতে বাধ্য করল। তখন থেকে আবু নাসের আমার পরম স্নেহভাজন।

আমরা তিনজন একসাথে আলোচনায় বসলাম। ফরমালিটির কোনো বালাই নেই। বিয়ে-শাদির ফরমাল বৈঠকে উভয়পক্ষের আত্মীয়-স্বজন হাজির হয় এবং প্রথা অনুযায়ী আলাপ শুরু হয়। সেজাতীয় বৈঠক এটা ছিল না। ঘটনাক্রমে সালমান তখন ঢাকায় থাকায় বৈঠকে উপস্থিত ছিল।

দুপক্ষের মধ্যেই এ বিয়ের ব্যাপারে এক পর্যায়ে বেশকিছু দিন থেকে কথাবার্তা চলায় উভয়পক্ষের সম্মতি জানা থাকার কারণে আমাকে ফরমালি কোনো প্রস্তাব দেওয়ার দরকার হয়নি। তাই ইনফরমালি কথা শুরু করলাম। মাওলানাকে বললাম, এ বিষয়ের মাধ্যমে আপনার সাথে যে আত্মীয়তার নতুন সম্পর্ক হতে যাচ্ছে তাতে দীর্ঘকাল থেকে ভাই-ভাই সম্পর্কটা বিপন্ন হওয়ার কথা; কিন্তু আমি তা হতে দেব না। আমার প্রমোশন

আর আপনার ডিমোশন হতে দেওয়া যায় না। আমরা ভাই-ভাইই থাকব, ইনশাআল্লাহ। উদাহরণ হিসেবে বললাম, আমার আপন শালা আমার এক মামাতো ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করেছে। সে আমাকে দুলাভাই-ই ডাকে। ওর স্ত্রী এখনো চাচাই ডাকে। অবশ্য ওদের সন্তানরা আমাকে ফুপাই ডাকে। আমার আপন চাচাতো ভাই আরেক আপন মামাতো ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করা সত্ত্বেও আমি তার ভাই সাহেবই আছি। ওর সন্তানদের আমি চাচা, ওর স্ত্রীও চাচাই ডাকে। সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো হযরত ফাতেমা (রা)-এর বিয়ে তাঁর চাচাতো চাচা হযরত আলী (রা)-এর সাথে হয়েছে। সুতরাং এ সমস্যা নতুন নয়।

নাসেরের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই বলে বললাম। নাসের বলে উঠল, আর কারো বড় সমস্যা না হলে সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়বে মামূন। মামূন বহু বছর থেকে ভাই সাহেবকে চাচা ডেকে আসছে। মামূন-মুন্নী লন্ডনে কয়েকবার ভাই সাহেবের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে ও মেয়েদের 'মুন্নী আপা' হিসেবে ওরা বড়ই ঘনিষ্ঠ। তাই বড় সমস্যা শুধু মামূনের। বাকিদের সমস্যা সহজেই কেটে যাবে।

সিদ্ধান্ত হলো যে, আমরা ইংল্যান্ডে যাওয়ার পর মামূন জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে জেদ্দা থেকে ম্যানচেস্টার পৌঁছবে। তখন পানচিনির (এ্যাঙ্গেজমেন্ট) তারিখ ঠিক করা যাবে।

আমাদের এই বৈঠক চলাকালে সালমান ইন্টারনেটে কায়রোতে নাবীলের সাথে যোগাযোগ করল। নাবীল নাকি ই-মেইলে পাত্রীর সাথে মতবিনিময়ের অনুমতি চেয়েছে। তাঁরা দুজনই অনুমতি দিলেন। আমি অবশ্য বললাম, ফোনে যোগাযোগ যেন না হয়; শুধু ই-মেইলে।

ম্যানচেস্টারের আবহাওয়া

৪ জুলাই (২০০৫) সন্ধ্যারাতে ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরে অবরতণ করে যখন আমীনের গাড়িতে উঠে বসলাম, তখন দেখা গেল ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাপমাত্রা নেমে এল। আমাকে তাড়াতাড়ি একটা ওভারকোট পরিয়ে দেওয়া হলো। গরম দেশ থেকে এসে রাতে লেপ গায়ে দিয়ে আরামেই ঘুমালাম। এ শহরটি লন্ডন থেকে প্রায় ২০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। লন্ডনের তুলনায় শীত এখানে বেশি। বৃষ্টিও এখানে বেশি হয়। বৃষ্টির সাথে বাতাস থাকলে শীত বেড়ে যায়। কয়েকদিন পর শীত কমে গিয়ে গরমবোধ হলো। মাত্র তিন-চার দিন ছোট একটা টেবিল ফ্যান ব্যবহার করতে হয়। এরপর আর এ পরিমাণ গরম পড়েনি। ঘরে তাপ-পরিমাপ যন্ত্র আছে। তাপ ২৪ ডিগ্রিতে পৌঁছলেই জানালা খুলে দিলে গরম কমে যায়।

আষাঢ় মাসের ২০ তারিখে এখানে পৌঁছলাম। ২৮ সেপ্টেম্বর (১৩ আশ্বিন) ঢাকা ফেরত রওয়ানা। তাহলে ঢাকার গ্রীষ্মকালীন প্রায় তিন মাস সময় শীতের দেশে এসে লেপের মজা বেশ ভোগ করলাম।

১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আমার বাধ্যতামূলক নির্বাসিত জীবনে লন্ডনে কোথাও সিলিংফ্যান দেখেছি বলে মনে পড়ে না। গরমবোধ হলে জানালা খুলে দিলেই চলত।

এবার লন্ডনে গিয়ে বহু জায়গায় সিলিংফ্যান দেখলাম; সবার বাড়িতেই কমপক্ষে টেবিলফ্যান আছে। অফিসে কমপক্ষে প্যাডেস্টেল ফ্যান রাখতেই হয়। দুনিয়ার সব দেশেই আবহাওয়ায় পরিবর্তন এসেছে।

এখানে সবচেয়ে বড় দিন পৌনে ১৯ ঘণ্টা দীর্ঘ এবং সবচেয়ে ছোট দিন মাত্র সোয়া পাঁচ ঘণ্টা। রোযা বড় দিনে পৌনে ১৯ ঘণ্টা ও ছোট দিনে সোয়া পাঁচ ঘণ্টা মাত্র। ২১ জুন সবচেয়ে বড় দিন ও ২৫ ডিসেম্বর সবচেয়ে ছোট দিন। সবচেয়ে বড় দিনে ফজরের সময় শুরু হয় ৩টায় এবং ইশার সময় শুরু হয় ১১টায়। সবচেয়ে ছোট দিনে ফজরের সময় শুরু হয় ৬.৪৫-এ এবং ইশা শুরু হয় ৪টায়। ছোট দিনে আসর, মাগরিব ও ইশার সময় অত্যন্ত ঘন ঘন হয়। এমন দেশও আছে, যেখানে সবচেয়ে ছোট দিন মাত্র এক ঘণ্টা। সেখানে সকালের আভা দেখা দেয় কিন্তু সূর্য উদয়ের সময় হয় না; আবার ডোবার সময় এসে যায়। সকাল-সন্ধ্যা টের পাওয়া গেলেও সূর্য দেখা যায় না।

সফরে লেখার কাজ

'জীবনে যা দেখলাম' প্রতি সপ্তাহে একটা কিস্তি লেখার দায়িত্বটাই এখন প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক পাঠক-পাঠিকা ধারাবাহিক এ লেখার অপেক্ষায় থাকেন। তাই কোনো সপ্তাহ যাতে বাদ না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে বাধ্য হই। এ লেখার জন্য তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন বই থেকে সংগ্রহ করতে হয় ও বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ফোন করে জেনে নিতে হয়। তাই সফরে এ লেখা সম্ভব নয় বলে এ কয়েক মাসের লেখা সফরের আগেই দিয়ে এসেছি। এ সফর সম্পর্কে লেখা বিদেশে সম্ভব বলেই লিখছি।

এমন কয়েকটি লেখার কাজ সফরে সম্ভব হবে বলে ধারণা ছিল, যার জন্য তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন নেই। এর মধ্যে দুটো লেখার কাজ সমাধা হয়েছে।

১. অল্প-শিক্ষিত বিশাল জনসংখ্যার জন্য অতি সহজ বাংলায় এমন একটি বই লেখার স্বপ্ন দীর্ঘদিন থেকে লালন করে এসেছি, যার মধ্যে 'পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের সহজ পরিচয়' পাওয়া যায়। সফরের দুই মাস আগেই লেখা শুরু করেছি, যা 'মাসিক পৃথিবী'তে গত জুন (২০০৫) থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। আগস্ট মাসের লেখাও দিয়ে এসেছি। এখানে এসে সে লেখাটা আল্লাহর রহমতে সমাপ্ত করতে পেরেছি। সম্ভবত মাসিক পৃথিবীতে আগামী ফেব্রুয়ারি (২০০৬) মাসে মুদ্রণ সমাপ্ত হবে। আশা করি বই হিসেবেও শিগ্‌গিরই প্রকাশ হবে।

বইটিতে ইসলামের ভিত্তিতে ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, ধর্মীয় জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সাধারণ মানুষের জন্য শেষের কয়েকটি বিষয় বোধগম্য করা যে কত কঠিন, তা লিখতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়েছে। ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক নীতি জনসাধারণকে বোঝানোর এ দুঃসাহস কতটা সার্থক হয়েছে তা অবশ্য প্রমাণসাপেক্ষ। আমার এ বিরাট আশা কতটুকু পূরণ হলো তার বাস্তব প্রমাণ পাব কি না তা দেখার অপেক্ষায় রইলাম।

২. A Guide To Islamic Movement নামে আমার একটা বই ১৯৬৮ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। বইটিতে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজকে সংক্ষেপে সঠিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ইসলামকে একটি বিপ্লবী জীবনাদর্শ হিসেবে বিজয়ী করার যে মহান দায়িত্ব বিশ্বনবী (স) পালন করে গেছেন, ঐ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই 'জামায়াতে ইসলামী' কায়েম করা হয়েছে বলে বইটিতে দাবি করা হয়েছে। বইটিতে জামায়াতের তিন দফা দাওয়াত ও চার দফা কর্মসূচির ব্যাখ্যা, জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতার সংক্ষিপ্ত জীবনী, ১৯৪১ সালে জামায়াতের প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত জামায়াতের ইতিহাস, জামায়াতের লোক তৈরির কর্মসূচি, নেতৃত্ব গড়ার নিয়ম, জামায়াতে যোগদানের পদ্ধতি ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে।

যারা বাংলার চেয়ে ইংরেজি ভাষা পড়তে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তাদের জন্যই বইটি লিখেছিলাম। বইটি পাকিস্তান আমলে লেখা বলে বাংলাদেশ আমলের উপযোগী করে সংশোধন করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইতঃপূর্বে এ কাজে হাত দিতে পারিনি। সফরে এ কাজ করা সম্ভব হতে পারে মনে করে এখানে বইটি নিয়ে এসেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! এ কাজও সমাধা হয়ে গেল। এতে প্রচুর সময় ব্যয় হয়েছে। সংশোধিত এ সংস্করণের আকারও বেশ বর্ধিত হয়ে গেল।

আরেকটি কাজেও অনেক সময় লেগে গেছে। সে কাজটি আমার নিজস্ব লেখা নয়। সে লেখাটি মরহুম মাস্টার মুহাম্মদ শফীকুল্লাহর। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ইতিহাস লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলাম মরহুম জনাব আব্বাস আলী খানকে। তিনি কাজটি করে যেতে পারেননি। ১৯৭২ সালে যে কয়েকজনের উদ্যোগে 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' পুনর্গঠিত হয়, তাঁদের একজন ছিলেন মাস্টার শফীকুল্লাহ। অনেক দিন থেকে তাঁকে শুরু থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সময়কালীন ইতিহাস লেখার জন্য তাকিদ দিয়ে এসেছিলাম। বিলম্বে হলেও তিনি গত জুন মাসে (২০০৫) তাঁর রচিত খসড়া আমাকে দিলেন। আমাকে লেখাটির ভাষাগত সংশোধনের জন্য অনুরোধ করলেন। সময়াভাবে ঢাকায় লেখা দেখতে না পারায় সফরে সাথে নিয়ে এসে সর্বপ্রথম তাঁর লেখাটাই ধরলাম। গত ১ আগস্ট তাঁর এ লেখা তাঁর হাতে পৌঁছল এবং তিন সপ্তাহ পরই তিনি হঠাৎ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন।

২৩৫.

আমার স্বাস্থ্যগত অবস্থা

'জীবনে যা দেখলাম'-এর পাঠক-পাঠিকাগণকে আমার স্বাস্থ্যগত অবস্থা জানিয়েই সফরে এসেছি। ৪ জুলাই (২০০৫) কাতার এয়ারলাইন্সে আসার সময় কাতারের রাজধানী দোহায় ২ ঘণ্টা বিরতি দিয়ে এখানকার সময় সন্ধ্যা ৭টায় ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। মোট ১৪ ঘণ্টা লাগল। তখন ঢাকায় রাত ১২টা।

বিমানবন্দরে আমাকে হুইল চেয়ার ব্যবহার করতে হয়েছে। ক্র্যাচে ভর দিয়েও এতটা রাস্তা হাঁটা সম্ভব ছিল না। এখানে আসার পর এক পাকিস্তানি হোমিও হারবাল বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসার উসিলায় আল্লাহ্ তাআলা সায়েটিকা রোগের আরো কিছু উপশম করলেন। এখন ক্র্যাচ ব্যবহার করি না বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে হাঁটতে হয়। দ্রুত হাঁটতে পারছি না।

এ দেশে লাখ লাখ বাংলাদেশি বসবাস করেন। তাদের শতকরা ৮০ জনেরই জন্ম বাংলাদেশে। বাকিরা এ দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাদের পিতামাতা বাংলাদেশি বলে তারাও মনের দিক থেকে বাংলাদেশি। এখানকার পরিবেশে সত্যিকার মুসলিম হিসেবে টিকে থাকার জন্য এবং পরবর্তী প্রজন্মকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলামী সংগঠন রয়েছে। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করে বাস্তব জীবন গড়ে তোলার যে আন্দোলন উপমহাদেশে 'জামায়াতে ইসলামী' নামে পরিচিত সে আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় এ দেশে বেশ কয়েকটি সংগঠন রয়েছে। এর মধ্যে দুটো সংগঠনের কাজ বাংলাদেশিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর একটি শুধু ইংল্যান্ডে কর্মরত। অপরটির সংগঠন গোটা ইউরোপে বিস্তৃত। প্রথমটির নাম 'দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে'। অপরটির নাম 'ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ'। এর কেন্দ্রীয় অফিস লন্ডনে।

আমি এ দেশে এলে উভয় সংগঠনই বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমাকে শরীক হতে আহ্বান জানায়। এ সফরেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তবে স্বাস্থ্যগত কারণেই আগের মতো এত বেশি প্রোগ্রামে আমি যোগদান করতে সক্ষম হইনি। এ উদ্দেশ্যে আমাকে তিনবার লন্ডন যেতে হয়েছে। ম্যানচেস্টার থেকে প্রায় দুই শ' মাইল দূরে লন্ডন। দু'বার বিমানে গিয়েছি, একবার ট্রেনে গেলাম। বিমানে ৪৫ মিনিট আর ট্রেনে আড়াই ঘণ্টা লাগে।

লন্ডনে আমার কর্মসূচি

'দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে'-এর দায়িত্বশীল ভাই-বোনদের সাথে আমার এক দিনে তিন দফায় পাঁচ ঘণ্টা বৈঠক হয়। আমি জামায়াতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর দায়িত্বশীলদের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে যেসব নতুন বই লিখেছি সেসব বইয়ের বিষয়সমূহ নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করেছি। বক্তৃতার বদলে স্টাডি সার্কেল পদ্ধতিতে আলোচনায় প্রতিটি বিষয় সবার নিকট স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তাদেরকে আমি আলোচনার বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তাঁদের মতামত শুনি। এরপর আমি বিষয়টির ব্যাখ্যা দিই। তাঁদেরকেও প্রশ্ন করার সুযোগ এবং তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি। এভাবে ৪ ঘণ্টায় এমন কতক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চর্চা করা হয়, যা তাঁরা অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে উপলব্ধি করেন। তাঁরা আরো সময় দাবি করেছিলেন, যা পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

একটি বর্ধিত বৈঠকে ১ ঘণ্টা বাংলাদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিই। পর্দার আড়াল থেকে প্রজেক্টরের মাধ্যমে বক্তাকে দেখার ব্যবস্থা থাকায় মহিলাদের শুনতে ও বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

আরেকদিন ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্যগণের সাথে দুই দফায় ৪ ঘণ্টা আলোচনা হয়। ঐ একই পদ্ধতিতে এ স্টাডি সার্কেল পরিচালিত হয়।

ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর সাথে আরো তিনটি প্রোগ্রাম হয়। ফোরামের সাথে জড়িত জনশক্তিকে গড়ে তোলার প্রয়োজনে তাদেরকে বাংলা ও ইংরেজি শাখায় পৃথকভাবে প্রোগ্রাম দেওয়া হয়। যারা ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেছে বা বাল্যকালেই এ দেশে এসেছে তারা ইংরেজি ভাষা না হলে বুঝতে পারে না। তাই আমাকে দুই শাখায় দুই দিন দুই ভাষায় বক্তব্য রাখতে হয়। ফোরামের নেতৃবৃন্দ বাংলা-ইংরেজি মিলিয়েই বক্তৃতা করেন। আমি এ শিল্পে অভিজ্ঞ নই। তাই ইঙ্গ-বঙ্গ বক্তৃতার বদলে হয় বাংলা, না হয় ইংরেজিতে বলি।

ফোরামের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ

৪ আগস্ট (২০০৫) ফোরামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম ছিল। সেদিন ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আগামী বছরের জন্য কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোটাররা লন্ডনে সমবেত হন। ভোটগ্রহণের ফাঁকে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পূর্বে আমাকে ভাষণ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ইংরেজিতেই বক্তব্য রাখলাম। পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলিম জাতি বর্তমানে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযানের শিকার। এ বিষয়ই তাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি মনে করলাম। আমার বক্তব্যের সারকথা নিম্নরূপ :

"পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্তমান বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর প্রধান মোড়ল। আর ব্রিটেন তার প্রধান সহযোগী। এ সভ্যতার পতাকাবাহীরা ইসলামী সভ্যতার উত্থানের আশঙ্কায় অস্থির। ইরান, সুদান ও আফগানিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের ফলেই এ শঙ্কা প্রবল হয়েছে।

ইরাকের স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেনকে দিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে নয় বছর যুদ্ধ চালিয়েও মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ঘাঁটি গড়তে ব্যর্থ হয়ে আমেরিকা সাদ্দামকে কুয়েত দখলে প্ররোচিত করে। এবার কুয়েত উদ্ধার ও সৌদি আরবকে সাদ্দামের আক্রমণ থেকে রক্ষার বাহানায় তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা সামরিক আধিপত্য স্থাপনের সুযোগ পেয়ে গেল।

গত দুই দশক থেকে আমেরিকার বিখ্যাত হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর স্যামুয়েল হান্টিংটন সে দেশের সরকারের ফিলোসফার ও গাইডের ভূমিকা পালন করছেন। প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের শাসনকালে তিনি দেশের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান ছিলেন। একসময় তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি বই এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃবৃন্দের পথপ্রদর্শক। আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ বইয়ের নাম The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order।

সাড়ে তিন শ' পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বইটিতে দুটো চ্যাপ্টারে লেখক 'ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন' সম্পর্কে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় আক্রমণাত্মক বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য ইসলামকে 'পার্মানেন্ট ডেনজার' বলে ঘোষণা করেছেন। মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের বিবরণ দিয়ে তিনি বিস্ময়ের সাথে শঙ্কা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'আধুনিক শিক্ষিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও প্রফেসরদের বাহিনী ইসলামী সভ্যতার বিজয়ের জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার নিরাপত্তার স্বার্থে দুনিয়ার কোথাও ইসলামী শক্তিকে মাথা তুলতে দেওয়া যাবে না।'

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বিমান হামলায় আমেরিকার ১১০ তলা সুউচ্চ টুইন টাওয়ারের প্রায় অলৌকিকভাবে ভূগর্ভে নিমজ্জিত হওয়া এবং আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি পেন্টাগনে একই সময়ে বিমান হামলার মাধ্যমে একমাত্র সুপার পাওয়ারের পদবিধারীদের গৌরব ও অহঙ্কার ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আমেরিকা আত্মরক্ষায় ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়। দেশবাসীকে এ ব্যর্থতার কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায় থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বিনা তদন্তে এর জন্য উসামা বিন লাদেনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

ঐ সময় আমি আমেরিকার ডেট্রয়েট শহরে ছিলাম। টেলিভিশনে টুইন টাওয়ারকে নিচের দিকে বিস্ময়করভাবে দেবে যেতে দেখলাম। আমার মনে প্রশ্ন জাগল, হঠাৎ করে বিমান আক্রমণের এ অপ্রত্যাশিত দৃশ্যটি যারা ধারণ করল তারা কেমন করে জানল, এমনটি ঘটবে। না জানলে তারা কিছুতেই এ দৃশ্য দেখাতে পারত না। আমার মুখ থেকে তাৎক্ষণিক মন্তব্য বের হলো, 'আমেরিকা ও ইসরাইল ছাড়া এত বিরাট ঘটনা ঘটানোর সাধ্য অন্য কারো নেই।'

প্রেসিডেন্ট বুশ পরের দিনই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 'ক্রুসেড' ঘোষণা করলেন। 'ক্রুসেড' শব্দটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এতে ইসলামী সভ্যতার বিরুদ্ধে তাদের শত বর্ষব্যাপী ব্যর্থ ধর্মযুদ্ধের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। 'ক্রুসেড' মানেই ধর্মযুদ্ধ। তারা আবার ঐ ধর্মযুদ্ধ শুরু করা জরুরি মনে করলেন।

জাতিসংঘকে চাপ দিয়ে সম্মত করে আফগানিস্তান দখল করে সতর্ক করা হয় যে, অন্য কোথাও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হতে দেওয়া হবে না। জাতিসংঘের সম্মতি ছাড়াই ইরাক দখল করে ইরান ও সিরিয়াকে সতর্ক করা হলো যে, ইসরাইলের উপর হামলার চিন্তাও যেন না করে।

ইসলাম শুধু ধর্ম হিসেবে টিকে থাকতে চাইলে তাদের কোনো আপত্তি থাকত না। কারণ, দুনিয়ায় বহু ধর্ম একই দেশে আছে। ধর্মে ধর্মে কোনো সংঘাত নেই। কিন্তু ইসলাম যদি সভ্যতা হিসেবে পুনরুজ্জীবিত হতে চায় তাহলে তারা তা সহ্য করতে কিছুতেই প্রস্তুত নয়– এ কথাই তারা জানিয়ে দিলেন।

পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রধান ভিত্তি হলো সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এর মর্মকথা হলো, ডিভাইন গাইডেন্স বা স্রষ্টার পথনির্দেশের কোনো প্রয়োজন নেই। ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়া মানবজীবনের সকল দিকের জন্য জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা ও ইতিহাসের অভিজ্ঞতাই

যথেষ্ট। এর দ্বিতীয় ভিত্তি হলো মেটারিয়েলিজম তথা জড়বাদ বা বস্তুবাদ। অর্থাৎ বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানের নাগালের বাইরের কোনো বিষয়ে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ, রাসূল, ওহী, পরকাল, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদি যার ইচ্ছা সে বিশ্বাস করুক। মানবজাতির উন্নতি ও প্রগতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

এর তৃতীয় ভিত্তি হলো জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজম। অর্থাৎ ভৌগোলিক এলাকা হিসেবে এক-একটি দেশের ভিত্তিতে মানুষের পরিচয়। দেশভিত্তিক জাতীয়তা ছাড়া মানুষের অন্য কোনো রকম পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। কোনো রকম বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা উচিত নয়।

এ তিনটি ভিত্তিতে মানুষের ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন যেভাবে গড়ে ওঠা স্বাভাবিক সেভাবেই পাশ্চাত্য-সভ্যতার ধারক দেশগুলো চলছে। সেসব দেশে ইসলাম শুধু ধর্ম হিসেবে বেঁচে আছে। আর যারা ইসলামী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী তারা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে, বড় জোর কমিউনিটি পর্যায়ে ইসলামী কালচারকে কোনো রকমে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর দেওয়া বিধান ও রাসূল (স)-এর বাস্তব জীবনাদর্শ অনুযায়ী পরকালের সাফল্যের লক্ষ্যে পার্থিব জীবনের বিন্যাস সাধন। এ তিনটি ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সভ্যতায় মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হওয়াই স্বাভাবিক। তাই এক ধরনের সভ্যতার অধীনে অন্য ধরনের কোনো সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না। ফলে সভ্যতার দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য। রাসূল (স)-এর সময়ে আরবে ইসলামী সভ্যতার উত্থানের ফলেই তখনকার প্রতিষ্ঠিত রোমান ও পারসিক সভ্যতা ইসলামী সভ্যতাকে সহ্য করতে পারেনি। অবশ্য তারা হামলা করেও ইসলামী সভ্যতার নিকট পরাজিত হয়।

ইসলামী সভ্যতার উত্থানকে ঠেকানোর জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা যে 'ক্রুসেড' শুরু করেছে, এ যুদ্ধের আসল ময়দান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহ। মুসলিম দেশগুলোর ইসলামী আন্দোলনকে প্রতিহত করা ও যে কটি দেশে ইসলামী সরকার রয়েছে সেগুলোকে তাদের অনুগত থাকতে বাধ্য করাই আসল টার্গেট।

অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে বসবাসরত মুসলিমদের মাঝে যাতে ইসলামী সভ্যতার চেতনা জাগ্রত হতে না পারে সেদিকে তারা সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। তাই সেসব দেশে অত্যন্ত হিকমতের সাথে ইসলামী আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখতে হবে। মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী সভ্যতার বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত অমুসলিম দেশে সংঘাত এড়িয়ে চলা ছাড়া উপায় নেই। এ সংঘাত মুসলিম দেশে অনিবার্য। মুসলিম দেশের মুসলিম নামধারী সরকার ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলসমূহ পাশ্চাত্য-সভ্যতার এজেন্টের ভূমিকা পালন করছে। মুসলিম জনগণ ইসলামের পক্ষে না থাকলে তারা ইসলামী আন্দোলনকে কবেই নিশ্চিহ্ন করে দিত! মুসলিম দেশসমূহে এ লড়াই আরো তীব্র হতে থাকবে বলে মনে হয়।"

উপরিউক্ত বক্তব্যের একপর্যায়ে প্রফেসর হান্টিংটনের বইটির পর্যালোচনা স্বরূপ লেখা আমার চটি বইটির কথাও উল্লেখ করি। বইটির নাম 'ইসলামী সভ্যতা বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা'। এ কথাও জানাই যে, বইটি শিগ্‌গিরই ইংরেজিতে অনুবাদ করা হবে বলে আশা করা যায়।

আরো দুবার লন্ডন গমন

সাংগঠনিক প্রোগ্রাম ছাড়া আরো দুবার লন্ডন যেতে হয়। ২৭ জুলাই (২০০৫) নাবীলের বিয়ের এ্যাঙ্গেজমেন্ট বা পানচিনির অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে এবং ৩১ জুলাই বড় নাতনীর বিয়ের ওয়ালীমায় শরীক হওয়ার জন্য যেতে হলো। ওয়ালীমার অনুষ্ঠানটি প্রখ্যাত ইস্ট লন্ডন মসজিদ সংলগ্ন বিখ্যাত লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ইসলামী আন্দোলনের অনেক পুরনো পরিচিত ভাইদের সাথে সাক্ষাতের আনন্দ উপভোগ করি।

পানচিনির অনুষ্ঠানটি ২৭ জুলাই কনের পিতা মাওলানা আবদুল আউয়ালের লন্ডনস্থ নিজস্ব বাড়িতে (ভাড়া বাসা নয়) অনুষ্ঠিত হয়। বরের পিতা আমার বড় ছেলে মামূন জেদ্দা থেকে ছোট মেয়ে নুসাইবা ও দ্বিতীয়া স্ত্রীকে নিয়ে আতিয়ার ওয়ালীমা ও নাবীলের বিয়ের পানচিনির অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এল। বরপক্ষের ঘনিষ্ঠ যারা এ দেশে বসবাস করেন তারা উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাবীলের নানী মুহতারামা হাফিযা আসমা খাতুন, তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি হিসেবে অনেক দিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর ৩০ জন মহিলা এমপির মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। নাবীলের ছোট মামা ও বর্তমান আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বড় জামাতা সাইফুল্লাহ মানসুর সপরিবারে উপস্থিত ছিল। নিজামী সাহেবের ছেলে মোমেন এ দেশেই লেখাপড়া করার সুবাদে উপস্থিত ছিল। মামূনের মামাতো ভাই ব্যারিস্টার মীর আবদুল ওয়ারেছ সাদী লন্ডনেই বসবাস করায় উপস্থিত হতে সক্ষম হয়েছে। মামূনের দ্বিতীয়া স্ত্রীর ছোট ভাই ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান (সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া)-এর বড় জামাতা বোরহানুদ্দীন আহমদ (ব্যাংকার– সে এ দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে এবং চাকরি করছে) উপস্থিত ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, আমার বড় বৌমা মুন্নীর ইনতিকালের পর তার ছোট মেয়ে নুসাইবাকে লালন-পালনের প্রয়োজনে এ বছর (২০০৫) মার্চ মাসে ঢাকায় বসবাসরত মা মুন্নীর বয়সেরই এক গ্র্যাজুয়েট মহিলার সাথে মামূনের বিয়ে হয়। আমার এ বৌমা ১৬ বছর থেকে জামায়াতের কর্মী ও মামূনের শালীর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ।

কনেপক্ষের যারা এ দেশে থাকেন তারা তো ছিলেনই। মাওলানা আবদুল আউয়ালের পাঁচ মেয়ে ও চার ছেলে। ছেলেরা সবাই এ দেশেই প্রতিষ্ঠিত। বড় মেয়ে ও জামাতা ঢাকায় আছে। দুজনই জামায়াতের পুরনো রুকন। জামাতা ইঞ্জিনিয়ার মুমতাজুল করীম। এদের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে। তাদের বাড়িটি এ শহরে জামায়াতে ইসলামীর প্রথম ঘাঁটি। সত্তরের দশকের কঠিন সময়ে তার মরহুমা আম্মা ছিলেন জামায়াতের খুঁটি। বাড়িটি 'মাসুমা মঞ্জিল' নামে পরিচিত।

মাওলানা আবদুল আউয়ালের তিন জামাতা-ই বর্তমানে লন্ডনে আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জামাতা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ডা. আমিনুল ইসলাম মুকুল এমআরসিপি ও ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ। চতুর্থ জামাতা আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছও ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক নেতা। সে উচ্চশিক্ষার জন্য এসেছে।

আমাদের নাতি-নাতনী প্রজন্মে বংশের মধ্যে সবার বড় হলো নাবীল; তার বিয়ে হলো মাওলানা আবদুল আউয়ালের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান নাসরীনের সাথে। আমার আব্বা ছিলেন তাঁর ভাই-বোনদের মধ্যে সবার বড় আর আম্মা ছিলেন তাঁর ভাই-বোনদের মধ্যে সবার ছোট। নাবীল-নাসরীনের বিয়ের মাধ্যমে কাকতালীয়ভাবে সে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল।

নাসরীন ইসলামী আন্দোলনের ছাত্রীসংগঠন 'মুসলিমাত'-এর নেত্রী। লন্ডনস্থ মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বর্ষ পাস করে সবেমাত্র চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করল।

অনুষ্ঠানে আশাতীতভাবে আমার অত্যন্ত মহব্বতের দীনী ভাই মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলাম। পরের দিনই তিনি ঢাকা ফিরে যাওয়ার কথা। এ সত্ত্বেও তিনি উপস্থিত হলেন। কথাবার্তা অল্প সময়েই সমাপ্ত হয়ে গেলে সাঈদী সাহেবকেই দোআ করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি আবেগময় দোআ করলেন। দোআয় তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন মুন্নীর কথা স্মরণ করে বললেন, এ বিয়েতে যার সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হওয়ার কথা সে-ই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল। তিনি মা মুন্নীর জন্য দোআ করলেন। তাঁর এ দোআয় আমি ও মামূন বিশেষভাবে অভিভূত হই এবং কেঁদে তৃপ্তিবোধ করি।

দোআর আগে বিয়ের তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ধার্য হয়। আমি কনের পিতাকে মোহরানার অংক ধার্য করার অনুরোধ জানাই। তিনি কিছুতেই এ দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন না। আমাকে ধার্য করার জন্য বাধ্য করলেন। আমি একটা অংক বললাম। তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলে সম্মতি দিয়ে মন্তব্য করলেন, এর চেয়ে কম বললেও আপত্তি করতাম না। বিয়ের তারিখ ও মোহর ধার্য করা ছাড়া অন্য কিছুই আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন কোনো পক্ষই অনুভব করেনি।

দোআর পর পারস্পরিক কোলাকুলি হলো। আমি হামিদ হোসাইন আজাদকে মুবারকবাদ জানিয়ে বললাম, তোমার প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল। মাওলানা সাঈদী বললেন, তোমার মিশন সফল হলো।

প্রায় তিন মাস বিদেশে কাটালাম

এবারের বিদেশ সফর বেশ দীর্ঘ হলো। এসব দেশে সফরে এসে একটানা এতদিন আর থাকিনি। দেশ থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও এবার দেশের খবরাখবর জানার এত সুযোগ পেলাম যে, মনে হলো দেশেই আছি। দুটো টিভি চ্যানেল দেখার সুযোগ পাচ্ছি– এটিএন বাংলা ও এনটিভি। এটিএন বাংলা বিটিভির খবরও প্রচার করছে। তা ছাড়া ইন্টারনেটে দৈনিক সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের খবরের সাথে সাথে ইসলামী আন্দোলনের তৎপরতার সংবাদও জানতে পারছি।

চ্যানেল এস নামে বাংলাদেশিদের পরিচালনায় এ দেশে যে চ্যানেলটিতে বাংলায় অনুষ্ঠান দেখানো হয় তাতে বাংলাদেশের খবর পরিবেশন করা হয়। সিলেটি ভাষায় এতে কতক অনুষ্ঠান হয়। এ দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের শতকরা ৯০ জনই সিলেট থেকে আগত। বাড়িতে সিলেটি ভাষা চালু থাকায় এ দেশে যারা জন্ম লাভ করে তারাও সে ভাষা বলতে পারে। সে তুলনায় বাংলাভাষীদের নতুন প্রজন্ম বাংলা খুব কমই বলতে পারে। কারণ, তারা বাড়িতে পিতা-মাতার মুখে বাংলার চেয়ে ইংরেজিই বেশি শুনে।

এ দেশে 'ইসলাম চ্যানেল' নামে চমৎকার একটা টিভি চ্যানেল ২৪ ঘণ্টা চালু রয়েছে। প্রথমে একজন বাংলাদেশি যুবকের উদ্যোগে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এখন অনেকেই শরীক হয়েছে এবং অনুষ্ঠানের মান ক্রমেই উন্নত হচ্ছে। ৭ জুলাই লন্ডনে বোমা হামলার পর একশ্রেণীর সাদা চামড়ার উগ্র জাতীয়তাবাদীরা মুসলমানদেরকে উত্ত্যক্ত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতন করার যে অপচেষ্টা করেছে, তা বন্ধ করার ক্ষেত্রে এ চ্যানেলের অবদান রয়েছে। ইসলামের সঠিক জ্ঞান পরিবেশনের উদ্দেশ্যে এতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। টেলিফোনে প্রাপ্ত প্রশ্নাবলির জবাব এবং বিভিন্ন ধরনের আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক ধারণা দেওয়া হয়।

এ দেশে কয়েকটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা চালু রয়েছে। প্রধান পত্রিকাগুলো বাংলাদেশের ইসলামবিরোধী পত্রিকাগুলোর ভূমিকাই পালন করে। ইসলামের পক্ষে 'ইউরো-বাংলা' নামের পত্রিকাটি এখন পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ৫২ পৃষ্ঠার এ পত্রিকায় বাংলাদেশের প্রচুর খবর থাকে। শেষের কয়েক পৃষ্ঠায় ইংরেজি ভাষায় খবর ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'দি মুসলিম উইকলি' নামে ৩২ পৃষ্ঠার একটা ইংরেজি পত্রিকা ইসলামের পক্ষে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশিদের উদ্যোগেই এর জন্ম। এ দেশে মুসলিমদের জন্য এটাই একমাত্র পত্রিকা। ইসলাম চ্যানেলে এর বিজ্ঞাপন দেখা যায়।

তিনটি মৃত্যুসংবাদ

সফরে আসার কিছুদিন পরই ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলীর ইনতিকালের খবর পেলাম। আমি আসার সময় তিনি হাসপাতালে ছিলেন। বিগত ছয় বছর তিনি শয্যায় কাটিয়েছিলেন। অনেক দিন অচেতন থাকার পর শেষপর্যায়ে হাসপাতালে নেওয়া হয়। জুন মাসের ৬ তারিখে জামায়াতের কেন্দ্রীয় ইউনিটের বৈঠকে আমীরে জামায়াত আমাকে তাঁর জন্য দোআ করতে বললে আমি সবাইকে নিয়ে দোআ করেছিলাম।

মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুসংবাদে একজন ঘনিষ্ঠ দীনী ভাইকে হারানোর বেদনাবোধ করেছি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি ছিলেন। তখন থেকে তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ব্যারিস্টারি পড়তে লন্ডনে এসে 'ইউকে ইসলামিক মিশন' নামে বিখ্যাত সংগঠনটি তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনিই এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তাঁর বেগমের নিকট ফ্যাক্সের মাধ্যমে আমার অনুভূতি জানাই। তিনি আজীবন ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। সাংগঠনিকভাবে জামায়াতে ইসলামীর বাইরে থাকাকালেও আমার সাথে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে চরমোনাইর পীর সাহেবের পরেই তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পীর সাহেব জামায়াতে ইসলামীর বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করায় তিনি সে দল ত্যাগ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল দীনী খিদমত কবুল করে জান্নাতে উচ্চমর্যাদা দান করুন এবং তাঁর সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন।

আগস্ট মাসের ২৩ তারিখে বজ্রপাতের মতো মাস্টার শফীকুল্লাহ সাহেবের হঠাৎ মৃত্যুর খবর আমার অন্তরকে কাঁপিয়ে দিল। অপ্রত্যাশিত এ খবরে চরম বেদনাবোধ করলাম। তাঁর সাথে ৫০ বছরের দীর্ঘ মহব্বতের সম্পর্ক। তাঁর মৃত্যুসংবাদে জামায়াতের যে কজন কেন্দ্রীয় নেতা আমার সবচেয়ে গভীর মহব্বতের ভাই তাঁদের একজনকে হারানোর তীব্র বেদনাবোধ করেছি। তাঁর সুযোগ্য পুত্র মাওলানা তারেক মুনাওয়ারকে ফ্যাক্সে শোকবার্তা পাঠিয়ে আমার হৃদয়ের অনুভূতি জানালাম।

১৯৭২ সালের জুন মাসে যে কজনের প্রচেষ্টায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নতুন করে সংগঠিত হয়, তিনি তাঁদের অন্যতম। তাই তাঁকে বহুদিন ধরে তাকিদ দিয়েছিলাম, ১৯৭৯ সালের মে মাসে জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্য তৎপরতা শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস আপনিই লিখুন; তা না হলে এ ইতিহাস হারিয়ে যাবে। বহুপূর্বে আমি জনাব আব্বাস আলী খানের উপর জামায়াতের ইতিহাস লেখার দায়িত্ব দিই। বারবার তাকিদ দেওয়া সত্ত্বেও যেকোনো কারণেই হোক, এ কাজটি তিনি করে যেতে পারেননি। এরপর থেকে আমি মাস্টার সাহেবের পেছনে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত গত জুন মাসে (২০০৫) তিনি টাইপ করে খসড়াটি আমার কাছে পাঠান এবং ভাষাগত সংশোধন করতে অনুরোধ করেন। বিদেশে চলে আসব বলে 'জীবনে যা দেখলাম'-এর প্রয়োজনীয়সংখ্যক কিস্তি লেখায় মহাব্যস্ত থাকায় তাঁর খসড়াটি দেখার সময় পেলাম না। তাঁকে জানালাম, তাঁর লেখাটি সফরে সাথে নিয়ে যাচ্ছি। প্রথমেই তাঁর কাজে হাত দেব। যথেষ্ট সময় ব্যয় করে তাঁর লেখাটিকে উন্নত করার চেষ্টা করলাম। বেশকিছু পরামর্শ দিয়ে চিঠি লিখলাম। সেনাবাহিনীতে কর্মরত আমার ছেলেটির হাতে তাঁর খসড়াটি ফেরত পাঠালাম। আমার সেক্রেটারি নাজমুল হকের নিকট থেকে জানলাম, ১ আগস্ট তারিখেই তাঁর হাতে তা পৌঁছে গেছে।

মাত্র তিন সপ্তাহ পরই তিনি দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিলেন। আমার পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর যা করণীয় ছিল তা করতে সময় পেয়েছিলেন কি না জানি না। আমি তাঁর ছেলে তারেক মুনাওয়ারকে এ মূল্যবান লেখাটি সংগ্রহ করে প্রকাশ করার পরামর্শ দিয়েছি।

দৈনিক সংগ্রামে অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের লেখায় মাস্টার সাহেবের যে গুণাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার সাথে আমিও একমত। কেন্দ্রীয় ইউনিটের দারসে কুরআনের

পর্যালোচনায় তিনি সবসময় অংশগ্রহণ করতেন। তাতে বোঝা যায়, তিনি কুরআনে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। তাঁর ইখলাসে আমি মুগ্ধ। আন্দোলনের প্রতি তিনি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আপন সান্নিধ্যে গ্রহণ করুন।

১২ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী এমপির ইনতিকালে গভীর বেদনাবোধ করেছি। দুই বছর ধরে তিনি লিভার ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তাই এ সংবাদ মাস্টার সাহেবের মৃত্যুর মতো অপ্রত্যাশিত ছিল না। ইনতিকালের দুই দিন আগে দৈনিক সংগ্রামে দেখলাম, হাসপাতালে আমীরে জামায়াত তাঁর জন্য দোআ করছেন; কিন্তু কাফী সাহেবের হাত দোআয় শরীক নেই। তখনই আমার মনে হয়েছে, তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ।

মাদরাসা থেকে কামিল পাস করার পর তিনি পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী ম্যাট্রিক ও আইএ পাস করে অর্থনীতিতে অনার্স ও এমএ পাস করেন। তিনি নিজ এলাকায় একটা ডিগ্রি কলেজে বহু বছর অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। উভয়দিকের উচ্চ ডিগ্রি তাঁর জন্য ইসলামী আন্দোলনে যোগ্য ভূমিকা পালনে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার আমীর হিসেবে ঐ অঞ্চলে জামায়াতে ইসলামীর সম্প্রসারণে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। বহু বছর তিনি কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য থাকায় তাঁকে দীর্ঘ সময় ইসলামী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সাথী হিসেবে পেয়েছি।

আদর্শিক ও সাংগঠনিক সম্পর্ক ছাড়াও তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। প্রতিবছর তিনি কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশনে আসার সময় আমার একটা ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। দিনাজপুরের বিখ্যাত কাটারীভোগ চাল ও ভর্তার মজাদার আলু বেশি পরিমাণে আনার জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ করতাম। আমার পক্ষে এসব মূল্যবান খাবার জিনিস আনার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। ক্রয়মূল্য ও মালের জন্য বাসের ভাড়াটুকু দিয়েই আমার সারা বছরের পোলাও-এর চালের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যেত। আমি জামায়াতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেও তিনি বেশ কয়েকবার নিজের জমির চাল ও আলু নিজে এসে দিয়ে গেছেন। গত বছরও তিনি শেষবারের মতো দিয়ে গেলেন। এ কারণে আমার স্ত্রী কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁর কথা স্মরণ করেন। আমি তাঁর তিরোধানে একজন উপকারী বন্ধু হারালাম।

২০০১ সালে জামায়াতের নমিনি হিসেবে তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় দিনাজপুর জেলায় জামায়াতের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাঁর তিরোধানে সংসদে জামায়াত একটি আসন হারাল। দিনাজপুরের ইসলামী আন্দোলন তাঁর খিদমত থেকে বঞ্চিত হলো। আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল নেক আমল কবুল করুন এবং তাঁকে সালেহ বান্দাহর মর্যাদা দান করুন।

২৩৬.

নাবীল-নাসরীনের বিয়ে

১৭ সেপ্টেম্বর (২০০৫) আমার বড় নাতি নাবীলের সাথে মাওলানা আবদুল আউয়ালের কনিষ্ঠ সন্তান নাসরীনের বিয়ের অনুষ্ঠান হলো। ইস্ট লন্ডন মসজিদ সংলগ্ন বিখ্যাত লন্ডন মুসলিম সেন্টারে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেন্টারের নিচতলার বিশাল হলে পুরুষ ও দোতলার অনুরূপ হলে মহিলাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

ম্যানচেস্টার থেকে সকাল ৯টায় কয়েকটা মাইক্রোবাস রিজার্ভ করে লন্ডনের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। যানজট না থাকলে ৪ ঘণ্টায় পৌছা যায়। সে হিসেবে আমরা দুপুর একটায় পৌছার কথা। এ দীর্ঘ সময় সোজা হয়ে বসে থাকা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। তাই আমার তৃতীয় ছেলে মোমেনের গাড়ির সামনের আসনটিকে আমার জন্য ইজি চেয়ারের মতো হেলান দিয়ে বসার ব্যবস্থা করায় দীর্ঘ ভ্রমণের কষ্ট কিছুটা হলেও উপশম হলো। পেছনের আসনে বর ও বরের পিতা মামূন বসল। মামূন মন্তব্য করল, তিন জেনারেশন একসাথে বসলাম।

গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি গিয়ে বরকে একটি সাজানো গাড়িতে দেওয়া হলো। এটি আমার বড় ও প্রথম নাত-জামাই মতিউর রহমান চৌধুরী সুমনের গাড়ি। একসাথে বেশ কয়েকটি মাইক্রোবাসে বরযাত্রীর মিছিল বরকে নিয়ে যথাস্থানে পৌছল।

আমি বরযাত্রী থেকে আলাদা হয়ে মামূনকে নিয়ে মুসলিম সেন্টারের মেহমানখানায় গিয়ে ওযূ-নামায সেরে অনুষ্ঠানের উপযোগী পোশাক (শেরওয়ানি) পরে হলে গেলাম। যানজটের কারণে বরযাত্রী ১টার স্থলে আড়াইটায় পৌছে সামাজিক প্রথা অনুযায়ী গেটে আটকা পড়ল। আমি হলে গিয়ে দেখলাম, বর তখনো আটকাবস্থা থেকে মুক্তি পায়নি। পৌনে তিনটায় বরকে মঞ্চে হাজির করলে আমি, কনের পিতা ও বরের পিতা মঞ্চে আসন গ্রহণ করলাম। বরের ছোট দুই ভাই তার দুই পাশে বসল।

মাইক হাতে নিয়ে মুসলিম সেন্টারস্থ স্কুলের এক যুবক শিক্ষক হুসাইন শেফার মঞ্চ পরিচালনা করল। সে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে ইংরেজিতে অনুষ্ঠানোপযোগী বক্তব্য রাখতে থাকল। সে প্রথমে কনের পিতাকে মাইক দিল। তিনি তাঁর দাওয়াতে আগত মেহমানদের দাওয়াত কবুল করার জন্য শুকরিয়া জানালেন। ইস্ট লন্ডন মসজিদের অন্যতম ইমাম হাফেয মাওলানা আবুল হোসাইন খান মুসলিম ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার হিসেবে রেজিস্টার নিয়ে মঞ্চে উঠলেন।

এ সময় বরের ছোট ভাই নাযীল সূরা রূমের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করে এর ইংরেজি অনুবাদও শুনিয়ে দিল। এর মধ্যে ২১নং আয়াতটি বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। আয়াতটির অনুবাদ হলো 'তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটা এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ কর। আর তিনি তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব-ভালোবাসা ও দয়া-মায়া দান করেছেন।'

মাওলানা আবদুল আউয়াল নিজ কন্যার উকিল হিসেবে বরের সামনে বসলেন। আমাকে মাইক দেওয়া হলে আমি বিয়ের খুতবা দিলাম। কনের উকিল আরবী ভাষায় তাঁর কন্যাকে নাবীলের নিকট বিয়ে দেওয়ার কথা জানালেন, নাবীলও আরবী ভাষায় 'আলহামদুলিল্লাহ! কাবিলতু' বলে সম্মতি জানাল। এক মিনিটের মধ্যেই 'ইজাব-কবুল' সম্পন্ন হয়ে গেল। ইমাম ও কাজী সাহেব মুনাজাত করলেন। তখন ৩টা বেজে গেছে।

আমি মাইক হাতে নিয়ে কনেপক্ষকে অনুরোধ করলাম, মেহমানদের খাবার পরিবেশন করা হোক। এ ফাঁকে কিছু কথা বলার সুযোগ নিলাম। মেহমানদের মধ্যে কিছুসংখ্যক অবাঙালি থাকায় এবং সকলের সুবিধার জন্য গোটা অনুষ্ঠানে ইংরেজি ভাষাই ব্যবহার করা হয়।

আমি প্রথমে মেহমানদের নিকট বিলম্বে পৌঁছার কৈফিয়ৎ দিয়ে ক্ষমা চাইলাম। নবদম্পতির জন্য দোআ করার অনুরোধ জানাতে গিয়ে বললাম, সাধারণত নবদম্পতির শুভাকাঙ্ক্ষীরা দোআ করে থাকে, বিয়েটা যেন স্থায়ী হয়। স্থায়ী হওয়া বলতে আজীবন স্থায়ী হওয়াই বোঝানো হয়। দুনিয়ার জীবনে যেন তারা মিলে-মিশে থাকে, সে কামনাই করা হয়। আমি বললাম, এ দোআই করবেন যেন তারা খাঁটি মুসলিম দম্পতি হিসেবে এমন উন্নত জীবনযাপন করতে সক্ষম হয় এবং এর ফলে তারা বেহেশতেও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে চিরসুখে থাকে। আমি আরো বললাম, বেহেশতের মধ্যে আটটি শ্রেণী আছে। একজন যদি উপরের শ্রেণীতে যায় তাহলে অপরজনকে নিম্নশ্রেণী থেকে প্রমোশন দিয়ে তাদেরকে মিলিত করবেন বলে আল্লাহ তাআলা সূরা তূরের ২১ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন। তাই এ বিয়ে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে স্থায়ী হওয়াই শুধু কাম্য নয়; আখিরাতের জীবনেও যেন এ বন্ধন কায়েম থাকে, সেজন্যও দোআ করা প্রয়োজন।

খাবার পরিবেশন করার ফাঁকে মঞ্চ পরিচালক একে একে তিনজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে কিছু বলার জন্য আহ্বান জানায়। প্রথমে আসেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর জেনারেল ড. মানাযির আহসান। তিনি পাত্র ও পাত্রীপক্ষকে বহু বছর থেকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন বিধায় দুটো দীনী পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন বলে উল্লেখ করলেন এবং উভয়পক্ষকে মুবারকবাদ জানালেন।

এরপর ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর প্রেসিডেন্ট মাওলানা মুসলিহুদ্দীন ফারাদি বক্তব্য রাখলেন। নাবীল ও নাসরীন ফোরামেরই সহযোগী সংগঠন YMO (Young Muslim Organization) ও 'মুসলিমাত' (ছাত্রীদের সংগঠন)-এর দায়িত্বশীল পজিশনে থাকায় তাদেরকে সরাসরি তিনি চেনেন। তাই তিনি তাদের মধ্যে বিয়ে হওয়ায় আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানালেন। তিনি আশা প্রকাশ করলেন, এ দম্পতি আদর্শ মুসলিম দম্পতি হিসেবে সফল হবে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর অন্যতম সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক অপ্রত্যাশিতভাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে মঞ্চে আহ্বান জানানো হলে তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে বক্তব্য রাখলেন। তিনি আমাকে ও মাওলানা আবদুল আউয়ালকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় মুবারকবাদ জানালেন এবং নবদম্পতির সার্বিক কল্যাণ কামনা করলেন।

তাঁকে এ বিয়েতে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। আমি ঢাকা থাকাকালেই তাঁর কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম, এ সময় লন্ডন যাবেন কি না। বিয়ের তারিখ তখনো ঠিক হয়নি বলে তাঁকে জানাতে পারিনি। তিনি ঘটনাক্রমে সাংগঠনিক সফরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছেন। তাঁকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি। তাঁর মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিত্ব হয়ে গেল বলে তৃপ্তিবোধ করলাম।

বিয়ের পর একসময়ে তিনি আমাকে বললেন, আপনাকে দেখলে ঈর্ষা হয়। আপনি ছেলেকে ২৫ বছর বয়সে বিয়ে করালেন, নাতিকেও ২৫ বছর বয়সেই বিয়ে করাতে পারলেন। বললাম, 'আলহামদুলিল্লাহ!' তাঁর ঈর্ষার কারণ হলো, তিনি নিজের ছেলেদের বেলায় এমনটি করতে সক্ষম হননি।

পারস্পরিক সম্বোধনে সমস্যা

মামূন ও আমার অন্য ছেলেরা মাওলানা আবদুল আউয়াল সাহেবের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিল। ওরা বহু বছর থেকে তাঁকে চাচা এবং তাঁর ছেলে ও জামাতাদের ভাই সম্বোধন করে এসেছে। এ বিয়ে সম্বোধনের ক্ষেত্রে রীতিমতো সমস্যা সৃষ্টি করে দিল। মামূনের সমস্যাই বড়। আমি মাওলানা আবদুল আউয়াল সাহেবকে ভাইয়ের মর্যাদায় রাখলেও মামূনকে তো বেহাই ডাকতেই হবে। তাঁকে আমার ছেলেরা চাচা ডাকলেও তিনি তাদেরকে তুমি বলে সম্বোধন করতেন না। তাই তাদেরকে বেহাই ডাকার সমস্যাটা কঠিন রইল না। তাঁর ছেলেদের সাথে আমার ছেলেদের ভাই সম্পর্ক ছিল। এখন আমার ছেলেদের চাচার পজিশনে প্রমোশন হয়ে গেল। এ নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা নেই। উভয়পক্ষ একে অপরকে চাচা ডাকলেই চলবে। অর্থাৎ, কারো ভাতিজা হওয়ার প্রয়োজন নেই। সবাই চাচা। কতকের প্রমোশন হলেও অন্যদের ডিমোশন হওয়া জরুরি নয়।

মাওলানা আবদুল আউয়ালের দুই জামাতা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি থাকাকালে তাদের আমলে আমার দুই ছেলে কর্মী ছিল। তারা আমার ছেলেদের 'মুকুল ভাই' ও 'হামিদ ভাই'। আমিনুল ইসলাম মুকুল খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে বিবাহের মঞ্চে উপস্থিত হয়ে মাইকে ঘোষণা করল যে, তারা তিন ভায়রা এখন তাদের শালী নাসরীনের দাদাশ্বশুর হিসেবে আমাকে দাদা হিসেবে বরণ করতে চাচ্ছে। তারা আমাকে কোলে করে মঞ্চে হাজির করে দাদা সম্বোধন করল। আমিও কয়েকজন সেয়ানা নাতি পেয়ে আনন্দিত হয়ে কোলাকুলি করলাম।

আমাকে দাদা হিসেবে বরণ করে নেওয়ার পর আমার ছেলেরা তাদের চাচার মর্যাদা পাওয়ার কথা; কিন্তু মুকুল চাচার মর্যাদা না দিয়ে চমকপ্রদ থিওরি ঘোষণা করল। সে বলল, "চাচার ছেলেরা যদি চাচাতো ভাই হয় এবং মামার ছেলেরা যদি মামাতো ভাই হয়, তাহলে দাদার ছেলেরা কেন 'দাদাতো ভাই' হবে না।" তাই আজ থেকে আমার ছেলেরা নাকি তাদের দাদাতো ভাই। সবাই এ রসিকতা উপভোগ করল। এভাবে তারা তাদের ডিমোশন ঠেকানোর সুব্যবস্থা করল।

নাত-বউ নিয়ে ম্যানচেস্টার ফিরে এলাম

বিকেল ৬টার পর ম্যানচেস্টারের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। এবার গাড়িতে বরের সাথে কনে এবং বরের বোন লুবাবা পেছনের আসনে বসল। সামনের আসনে আমি। লুবাবা তার সাংগঠনিক বান্ধবীকেই ভাবী হিসেবে বাছাই করে ওর আব্বাকে সম্মত করেছিল; কিন্তু বিয়ের পর বান্ধবীকে ভাবী সম্বোধন করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। মাঝেমধ্যে ভাবী ডাকে। অভ্যাস হতে কিছু সময় হয়তো লাগবে। এ সমস্যা থাকবে না।

আমার আগেই পরিকল্পনা ছিল যে, পথে ৪/৫ ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে। এ সময়ে নাত-বউয়ের সাথে আলাপ সেরে নেব। তার দাদিশাশুড়ি, নানীশাশুড়ি, দুই খালাশাশুড়ি, আধা ডজন ননদের ভিড়ে পড়ে এত সময় আমার ভাগে পড়বে না। একসাথে এত দীর্ঘ সময়ও পাব না।

আমার আশঙ্কা ছিল যে, যাদের এ দেশে জন্ম এবং এ দেশেই যারা লেখাপড়া করে তাদের মতো নাসরীনও হয়তো বাংলাভাষা ঠিকমতো বুঝবে না। তাই প্রথমেই জানতে চাইলাম, বাড়িতে বাপ-মায়ের সাথে ও ভাই-বোনদের সাথে বাংলায় কথাবার্তা বলে কি না। শুনে খুশি হলাম যে, তারা ঘরে বাংলায় কথা বলে। আমি বাংলায়ই কথা বলব বলে ঘোষণা করলাম। কোনো শব্দ না বুঝলে যেন জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়, সে তাকিদও তাকে দিলাম।

প্রথমে ঐ পরিবারের বিস্তারিত খবরাখবর জেনে নিলাম। তাদের আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কেও যা দরকার জিজ্ঞেস করলাম। লেখাপড়া ও ওর সাংগঠনিক তৎপরতার খবর নিলাম। আমার সব কথা সে বুঝতে পেরেছে জেনে আমি সন্তোষ প্রকাশ করলাম। আমিও কোনো কঠিন শব্দ ব্যবহার করিনি, যেন বুঝতে সমস্যা না হয়।

নাবীল ও নাসরীনকে আমি হুকুম দিলাম, তারা যেন নিজেদের মধ্যে সবসময় বাংলাভাষায় কথা বলে, যাতে এ ভাষার চর্চা জারি থাকে। সন্তানরা যাতে মাতৃভাষা হিসেবে বাংলায় কথা বলা শেখে। এ দেশে বাচ্চাদের ইংরেজি ভাষা শেখানোর চেষ্টা করার প্রয়োজন হয় না। ওটা এমনিতেই শেখা হয়ে যায়। তিন বছর বয়সে নার্সারিতে ভর্তি হলে ইংরেজি সহজেই শিখে নেয়।

বাংলা পড়তে পারে কি না জানতে চাইলাম। সে বলল, পড়তে পারি; অনেক শব্দের অর্থ বুঝতে পারি না। আমি বললাম, পড়তে থাকলে বুঝতেও পারবে। নাবীলের সাহায্য নেবে।

রাত সাড়ে দশটায় নাবীলদের বাড়িতে গাড়ি পৌঁছল। নাবীলের দাদি-নানী-খালা-চাচীরা গাড়ি থেকে নেমে এসে নববধূকে বৈঠকখানায় নিয়ে বসাল। আমিও সেখানে বসলাম। পথে নাসরীনের সাথে এত আলোচনা হলেও তাকে দেখার সুযোগ ছিল না। এবার নাত-বউকে দেখলাম। বোরকা পরা অবস্থায় নাসরীনের শাশুড়িবাহিনীও সেখানেই তাকে দেখল, নাবীল-নাসরীন এক সোফাতেই পাশাপাশি বসল। সবাই তাদেরকে ঘরে তৈরি মিষ্টি চামচ দিয়ে মুখে তুলে দিল। নাসরীনের শ্বশুর, মামূন ও শাশুড়ি মাহমূদাসহ সবাই সেখানে উপস্থিত ছিল।

আমি বললাম, 'আজ যার সবচেয়ে বেশি খুশি হওয়ার কথা সে-ই অনুপস্থিত। বউকে ঘরে তুলে নেওয়ার দায়িত্ব তো সে-ই পালন করত। এ বিয়ে ঠিক হওয়ার পর থেকে

বারবার মা মুন্নীর কথা মনে পড়েছে। বউয়ের জন্য অলঙ্কারও কিনে রেখেছিল সে; কিন্তু বউ দেখে যেতে পারল না।'

আনন্দের মুহূর্তে আমার বিষাদময় কথাগুলো সবাইকে আমার মতোই অশ্রুসিক্ত করে দিল। তখন নবদম্পতির জন্য সবাইকে নিয়ে আল্লাহর তাআলার দরবারে দোআ করলাম এবং মা মুন্নীর বিদেহী আত্মার প্রতি যেন এ খুশি পৌঁছে দেন সে দাবিও জানালাম। দুনিয়ায় যে খুশি থেকে সে বঞ্চিত রয়ে গেল, এর বদলায় আল্লাহ্ তাআলা তাকে যেন পুরস্কৃত করেন।

দোআর পরে আমি দ্বিতীয় ছেলে আমীনের বাড়িতে ফিরে এলাম; যাতে সব মহিলা নেকাব খুলে নববধূর সাথে পরিচিত হতে পারেন।

নাবীলের ওয়ালীমা অনুষ্ঠান

এ দেশে শনি-রবি দুই দিন সাপ্তাহিক ছুটি। বিয়ে-ওয়ালীমা জাতীয় অনুষ্ঠান এ দুই দিনেই হয়ে থাকে। রাত ছোট বলে গ্রীষ্মকালে এসব অনুষ্ঠান দুপুরেই হয়ে থাকে। বরের পিতা ওয়ালীমার মেযবান। বেচারা বিনা বেতনে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে জেদ্দা থেকে এসেছে। তার পক্ষে পরবর্তী সপ্তাহ পর্যন্ত থাকা অসম্ভব। তাই বাধ্য হয়ে বিয়ের পরের দিনই ওয়ালীমার আয়োজন করতে হলো। ১৭ সেপ্টেম্বর লন্ডনে বিয়ে হলো, ১৮ সেপ্টেম্বর ম্যানচেস্টারে ওয়ালীমার অনুষ্ঠান হয়ে গেল।

কনেপক্ষ বিশাল এক দ্বিতল বাস রিজার্ভ করে দুপুর দেড়টার সময় পৌঁছে গেল। স্থানীয় মেহমানসহ ওয়ালীমায় নারী-পুরুষ মিলে ৫০০ লোক ছিলেন। এক পাকিস্তানি হোটেলে অনুষ্ঠান হলো। অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের প্রবেশপথ ভিন্ন থাকায় এ হোটেলকে পছন্দ করা হয়েছে।

উভয়পক্ষের মুরব্বিরা মঞ্চে বসার পর নাবীলের ছোট ভাই নাযীল কুরআন তিলাওয়াত করল। মামূন মেহমানদের স্বাগত জানাল। আমি সবাইকে নিয়ে দোআ করলাম। এরপরই খাবার পরিবেশন করা হয়। এ সময় মাইকে আরবী গান, বাংলা হামদ ইত্যাদি চলতে থাকে। নাযীল একটি চমৎকার হামদ শোনাল।

খাবারগ্রহণ শেষে নাবীলের তিন ভায়রা, নাযীল ও মামূনের ছোট ছেলে উসামা মঞ্চে মাইকের সামনে সমবেত হলো। হামিদ হোসাইন আজাদ ঘোষণা করল, তাদের এক ভায়রা ইউনুছ নাবীল ও নাসরীনকে নিয়ে বাংলায় একটা গান রচনা করেছে। শুরুতে দুজনের নামের অর্থ ও গানে ব্যবহৃত কতক বাংলা শব্দের অর্থ ইংরেজিতে জানিয়ে দিয়ে হামিদ হোসাইনের নেতৃত্বে তারা কোরাস গাইল। সবাই মোটামুটি গানটি উপভোগ করল। পরে জানা গেল, সুরকার হামিদই।

নাসরীনের চতুর্থ বর্ষের ক্লাস পরদিন থেকেই শুরু। বিয়ের জন্য সে এক সপ্তাহ ছুটি নিয়েছে। ওয়ালীমার পর সাধারণত বর ও কনেকে সাথে নিয়ে কনেপক্ষ বাড়িতে ফিরে যায়। এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম হলো। কনের পিতাই সিদ্ধান্ত নিলেন, কনেকে সাথে নিয়ে যাবেন না, যাতে সে আমাদের সাথে ছুটির দিনগুলো এখানে কাটাতে পারে। কয়েক দিন

পরই আমাদের ঢাকা ফেরত যেতে হবে বলে তিনি তাঁর মেয়েকে রেখে গেলেন। তিনিও কয়েক মাসের জন্য পরের দিন ঢাকা চলে গেলেন।

আবার লন্ডন যেতে হলো

বড় নাতনী আতিয়ার বিয়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। সে ম্যানচেস্টারেই মেডিকেলের পঞ্চম বর্ষের ছাত্রী। তার স্বামী চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট। একটা বড় কোম্পানির ম্যানেজার। লন্ডনে নিজের বাড়িতেই থাকে। আতিয়া সাপ্তাহিক ছুটিতে দুই দিনের জন্য যায়। কোনো সপ্তাহে ওর স্বামী ম্যানচেস্টারে উইকেন্ড কাটায় শ্বশুরবাড়িতে।

দুজনেরই দাবি, লন্ডনে তাদের বাড়িতে আমাদের যেতেই হবে। এ দাবি তো পূরণ করতেই হয়। তা ছাড়া নাত-জামাইকে ভালো করে জানতে হলে বাড়িতে যাওয়া প্রয়োজন। একটা উপলক্ষও যোগ হলো। ২৪ সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় এ দেশের আইন অনুযায়ী সিভিল ম্যারেজ হিসেবে রেজিস্ট্রি করার তারিখ ধার্য হয়েছে। এ অনুষ্ঠানটা দেখার প্রয়োজনবোধ করলাম।

আগের দিন বিকেলে আমীন (আতিয়ার পিতা) আমাদেরকে নিজের গাড়িতে করেই নিয়ে গেল। আমি পাশের আসনে হেলান দিয়ে বসলাম। পেছনের আসনে আমীনের মা, স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে রাইয়ান বসল। রাত সাড়ে দশটায় পৌঁছলাম। আতিয়া ওর ছোট বোন মরিয়মকে নিয়ে বাসযোগে আগেই পৌঁছে গেল। আতিয়াদের বেডরুমে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। ওরা দুজন ড্রইং রুমে ফ্লোরেই রাত কাটাল।

নাত-জামাইয়ের ডাক নাম সুমন। ওর মা, দুবোন এবং নানা এ বাড়িতেই থাকেন। ওর নানা মাঝেমধ্যে তাঁর আরেক মেয়ের বাড়িতেও থাকেন। নানার বয়স ৮০। এখন তার শ্বশুর-শাশুড়ি ও শালা-শালী বেড়াতে আসায় চার বেডরুমই দখল হয়ে গেল।

আমি কারো বাড়িতে গেলে তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরির বই দেখে তার মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তির মান যাচাই করি। সুমনের বেডরুম, ড্রইংরুম, এমনকি ডাইনিংরুমেও শেলফে সাজানো বই দেখে খুবই ভালো লাগল। সকালে ফজরের নামায একসাথে ড্রইংরুমে পড়ার সময়টা রাতেই ঠিক করা ছিল। ঘণ্টাখানিক পূর্বে উঠলাম। কিছু পড়ার উদ্দেশ্যে বেডরুমের শেলফে গেলাম। পিকথলের লেখা কুরআনের অনুবাদ ও মদীনায় প্রকাশিত দি নোবল কুরআন দেখলাম। বেশ কয়েক খণ্ড মুফতী মুহাম্মদ শফীর তাফসীর 'মাআরিফুল কুরআন'-এর ইংরেজি অনুবাদ পেলাম। এটা ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে বলে আমি আগে জানতাম না। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর 'বেহেশতি যেওর'-এর ইংরেজি অনুবাদ এখানেই প্রথম দেখলাম। ড্রইংরুমে আরো অনেক ইসলামী বই দেখলাম। মাওলানা মওদূদীর তাফহীমুল কুরআনের ইংরেজি অনুবাদও কয়েক খণ্ড সেখানে আছে। বাংলা ভাষায় কোনো বই দেখলাম না। সুমন বাংলা বুঝে মোটামুটি; বলতে পারে না। সিলেটি ভাষা স্বাচ্ছন্দ্যেই বলতে পারে। বাড়িতে এ ভাষায়ই ওরা কথাবার্তা বলে।

আতিয়া ও সুমনকে বললাম, তোমরা দুজন ইংরেজিতে কথা না বলে যার যার মাতৃভাষায় বলার অভ্যাস চালু রাখ। আতিয়াকে বললাম, সুমনের আম্মা ও বোনদের নিকট থেকে

এ পরিমাণ সিলেটি ভাষা শিখে নাও, যাতে আগামী ডিসেম্বরে মৌলভীবাজারে আত্মীয়দের সাথে কথা বলতে পার। আরো বললাম, সুমনের সাথে বাংলা বলতে থাকলে বাংলা বুঝতে তার সুবিধা হবে।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রির অনুষ্ঠান

সকাল ১০টায় ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে পৌঁছলে আমাদের Rose Hall নামক প্রশস্ত কামরায় বসার সুযোগ করে দেওয়া হলো। আতিয়া ও সুমনকে ভেতরে এক কামরায় নিয়ে গেল। লেখালেখির কাজ শেষ হলে ওরা ফিরে এল।

সাড়ে দশটায় বিয়ের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে পাশের সুসজ্জিত এক কামরায় আমাদের সবাইকে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। কামরাটি কৃত্রিম ফুলে চমৎকারভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পাত্র ও পাত্রীপক্ষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন মিলে জনপঁচিশ নারী-পুরুষ চেয়ারে বসলাম। মাঝে যাতায়াতের পথ রেখে চেয়ারগুলো দুপাশে সাজিয়ে রাখা ছিল। একদিকে পুরুষ অপরদিকে মহিলারা আসন গ্রহণ করল।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার একজন বেশ বয়স্কা মহিলা। তার সহকারী মাঝবয়সী এক মহিলা। তারা দুজন সামনে রাখা দুই টেবিলে বসলেন। সহকারী মহিলা সুইচ টিপে উৎসবের আমেজ সৃষ্টিকারী মৃদু সুমিষ্ট বাদ্য চালু করে দিলেন।

সহকারীর টেবিলের সাথে দুটো চেয়ারে পাত্র ও পাত্রীকে বসানো হলো। তাদের সাথে সামান্য কথা বলে সহকারী মহিলা দাঁড়ালেন, পাত্র-পাত্রীকেও দাঁড় করালেন। আমাদের সবাইকে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করলেন। তিনি একটি ফাইল খুলে হাতে নিয়ে কী যেন পড়তে থাকলেন। বোঝা গেল, তিনি বিয়ের খুতবা দিচ্ছেন। মহিলার আওয়াজ এত ক্ষীণ ছিল যে, সব শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না। তা ছাড়া তাদের উচ্চারণ শুনে অভ্যস্ত নই বলে বুঝতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু এটুকু বুঝলাম যে, স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে যথেষ্ট মূল্যবান উপদেশ তাতে ছিল। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মহিলা খুতবা শেষ করে পাত্র-পাত্রীকে শপথবাক্য পাঠ করালেন। সবাইকে বসতে অনুরোধ করে তিনি সরে গিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের জন্য আসন ছেড়ে দিলেন। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার মূল রেজিস্ট্রি বইতে পাত্র-পাত্রীর দস্তখত নিলেন এবং পাত্রীর পিতা ও পাত্রের দস্তখত সমাপ্ত হওয়ার পর বাদ্য বন্ধ করা হলো এবং সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হলো।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার পাত্রীর হাতে একটা খাম তুলে দিলেন। খামের উপর লেখা ম্যারেজ সার্টিফিকেট। পাত্রকে কোনো সার্টিফিকেট দিলেন না। আমাদের দেশে কাজী অফিস থেকে দুপক্ষকেই রেজিস্ট্রির কপি দেওয়া হয়। সে দেশে নাকি পাত্রীর জন্যই সার্টিফিকেট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তার অধিকার দাবি করার জন্য আইনগত হাতিয়ার হিসেবে তা কাজে লাগে। পাত্রের অবহেলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটা রক্ষাকবচ।

আমি পাত্র ও পাত্রীকে ঠাট্টা করে বললাম, শরীআতমতো তোমাদের বিয়ে আগে হলেও এ দেশের আইনে আজ থেকে তোমরা বৈধ স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদা পেলে। এতদিন তোমাদের সম্পর্ক আইনগতভাবে অবৈধ ছিল। এ ঠাট্টা তারা উপভোগ করল।

ঐ দিনই সুমন থেকে জানতে পারলাম, সিভিল ম্যারেজের নিয়ম অনুযায়ী পাত্র-পাত্রীকে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত করে জানাতে হয় যে, তারা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহী। তখন অফিস থেকে নোটিশ বোর্ডে জানানো হয়, এ বিয়েতে কারো কোনো আপত্তি আছে কি না। নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষার পর তাদেরকে বিয়ের অনুমতি দেওয়া হয় এবং বিয়ের তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়। এ নিয়ম অনুযায়ীই আজ তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান হলো। অথচ শরীআত মোতাবেক ২০০৪ সালের ডিসেম্বরেই তাদের বিয়ে হয়েছে এবং এ বছর (২০০৫) ২৪ জুলাই অনুষ্ঠান করে মেয়েকে সামাজিকভাবে পাত্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

নাবীল-নাসরীনের বিয়ে কবে বৈধ হবে?

নাবীলকে আতিয়ার বিয়ে রেজিস্ট্রি করার কাহিনী শুনিয়ে বললাম, তোমরা এ দেশের আইনে বৈধ হতে দেরি করো না। যেসব নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়, তাতে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে বিয়ের দরখাস্ত করার পরও বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করতে হয়।

লন্ডনে মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রার যে রেজিস্ট্রি করেছেন, তা যথেষ্ট বলে মনে হয় না। কারণ, সিভিল ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে দরখাস্ত করা ও তাদের পক্ষ থেকে পাবলিক নোটিশ দেওয়ার ফরমালিটি ছাড়া তো আইনগত বৈধতা পাওয়ার কথা নয়।

মামূনের বড় মেয়ে লুবাবা

মা মুন্নীর মৃত্যুতে সবচেয়ে বড় সমস্যায় পড়েছে লুবাবা। ২০০৪ সালের জুনে জেদ্দাস্থ মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এ্যান্ড কলেজ থেকে এ-লেভেল (ইন্টারমিডিয়েট) পরীক্ষা দিয়ে সেপ্টেম্বরে ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার কথা ছিল। ওর মায়ের অসুস্থতার কারণে এ-লেভেল পরীক্ষাই দিতে পারল না। মায়ের সেবা করার জন্য ইংল্যান্ড চলে যেতে হলো। মায়ের মৃত্যুর পর সেখানে আবার এ-লেভেলে ভর্তি হওয়ায় ওর দুই বছর নষ্ট হয়ে গেল। আগামী জুনে (২০০৬) এ-লেভেল পরীক্ষা দিতে হবে। আগামী বছর সেপ্টেম্বরে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে বলে আশা করা যায়। ওর প্রিয় বিষয় হলো ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য। এ বিষয়েই সে অনার্স ও মাস্টার্স করতে চায়।

সে তিন ভাইয়ের ছোট। বড় ভাই নাবীলের জন্য সে-ই পাত্রী বাছাই করেছে। ম্যানচেস্টারে যে বাড়িতে তারা থাকে সে বাড়িটি বিয়ের পূর্বে নবায়নের জন্য সে তা-ই করেছে, যা ওর মা থাকলে করত। ওর ভূমিকায় মনে হয়, সে-ই ভাইদের বড় বোন। ভাইয়েরাও ওকে মূল্যায়ন করে। সে ভাইদের সাথেই থাকে। ওদের নিয়ে পাক-শাক করে। মামূন তো সস্ত্রীক জেদ্দায় আছে। ছোট মেয়েটা সাথে থাকে। ম্যানচেস্টারে যদি নাসরীন থাকতে পারত তাহলে সমস্যা ছিল না। সে লন্ডনে পড়ে। তাই আমরা সবাই আগামী গ্রীষ্মের ছুটিতে ওকে বিয়ে দেওয়া জরুরি মনে করেছি। এক ছেলে ছাড়া আমার সবাই তো ওখানে। ওরা তো সবাই একসাথে আমাকে দেখতে আসতে পারবে না। স্বাস্থ্য অনুমতি দিলে প্রতি গ্রীষ্মে আমাকেই সস্ত্রীক সেখানে যেতে হবে বলে মনে হয়।

২৩৭.

লন্ডনে মুসলিম কমিউনিটি

ইংল্যান্ডে বহু মুসলিম দেশ থেকে আগত প্রায় ২০ লাখ মুসলিম অধিবাসী রয়েছে। এর মধ্যে শতকরা ছয়জনই সে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে বলে তারা ব্রিটিশ নাগরিক। বাকিদের মধ্যেও বেশির ভাগই ব্রিটিশ নাগরিক। শুধু লন্ডন মহানগরীতেই ৭ লাখ মুসলিম রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় লাখখানেক বাংলাদেশি। লন্ডনে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ জন মুসলিম। আর গোটা যুক্তরাজ্যে মুসলিমদের সংখ্যা শতকরা দুইজন।

লন্ডনে অনেক মসজিদ রয়েছে– যেখানে নিয়মিত জুমুআ ও ঈদের নামায হয়। এর মধ্যে মসজিদের উদ্দেশ্যে ও মসজিদের আকৃতিতে তৈরি বাড়ি খুবই কম। কোনো বাড়ি কিনে তা মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বেশকিছু মসজিদ এমন, যা একসময়ে গির্জা ছিল পরে কর্তৃপক্ষ তা বিক্রয় করে দিয়েছে। ধর্মের প্রতি আকর্ষণ না থাকায় যেসব গির্জায় লোক আসে না, সেসব বিক্রয় করে দেওয়া হয়।

মুসলিম জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনা ও স্বাতন্ত্র্য বহাল রাখার উদ্দেশ্যে শত শত সংগঠন রয়েছে। মসজিদই এ জাতীয় সংগঠনগুলোর কেন্দ্র। বিভিন্ন দেশ থেকে আগতদের দেশভিত্তিক সংগঠনও আছে। বাংলাদেশের প্রধান দুটো রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক সংগঠনও সেখানে সক্রিয়। কোনো কোনো ইসলামী দলের শাখাও সেখানে আছে। 'জামায়াতে ইসলামী' নামে বিদেশে কোথাও সংগঠন নেই। জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত যারা বিদেশে বসবাস করেন তারা কোনো না কোনো নামে দাওয়াতে দীনের উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা চালান। ইখওয়ানুল মুসলিমুনও এ উদ্দেশ্যে সংগঠন কায়েম করে। সে দেশের মুসলিম সংগঠনগুলোর মধ্যে অল্পকতক দেশব্যাপী বিস্তৃত, সারা দেশেই এগুলোর শাখা রয়েছে। অন্যান্য সংগঠন অঞ্চলভিত্তিক। ইসলামী সংগঠনসমূহ বিশেষ ইস্যুতে সম্মিলিত কর্মসূচিও পালন করে থাকে।

মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন

চার শ'-এর বেশি মুসলিম সংগঠনের ফেডারেশনের নাম হলো Muslim Council of Britain (MCB)। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মুসলিম ইস্যুতে MCB অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্রিটিশ সরকার একে সে দেশে বসবাসরত গোটা মুসলিম কমিউনিটির সত্যিকার প্রতিনিধি মনে করে। প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার কয়েক বছর আগে MCB কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। ব্রিটিশ কেবিনেটের অনেক মন্ত্রীর সাথে এ ফেডারেশনের যোগাযোগ রয়েছে। ২০০৫ সালের ৭ জুলাই লন্ডনে ভয়াবহ বোমা হামলার পর মুসলিম কমিউনিটির প্রতিনিধি হিসেবে MCB বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। সরকারি উদ্যোগে এ হামলার তীব্র নিন্দাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সকল মহলের নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে MCB-এর নেতৃবৃন্দও আমন্ত্রিত হয়ে বক্তব্য রেখেছেন। এটাই সরকারিভাবে স্বীকৃত মুসলিম কমিউনিটির প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান।

MCB-এর সেক্রেটারি জেনারেল স্যার ইকবাল সাকরানী। মুসলিম কমিউনিটির নেতা হিসেবে তাঁকে ব্রিটিশ সরকার সম্প্রতি সম্মানজনক 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেছে। তিনি সাউথ আফ্রিকা থেকে এ দেশে স্থায়ী বসতি গড়েছেন। তাঁর পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষ থেকে সাউথ আফ্রিকায় ব্যবসায়ী হিসেবে বসবাস করতেন। তিনি নিজেও একজন ব্যবসায়ী।

১৯৯৯ সালে MCB কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশে আমি অতিথিবক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হই। তখন থেকেই তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর সম্ভবত ২০০১ সালে তিনি এক উপলক্ষে ঢাকা এসেছিলেন। আমার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমার বাড়িতেও এলেন। এবার (২০০৫) আমার সফরের সময় লন্ডনে অনুষ্ঠিত MCB-এর সদস্য সংগঠন IFE (Islamic Forum Europe)-এর সদস্য সম্মেলনে তিনি ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণের পরপরই আমার বক্তব্য রাখার কথা। তাঁর ভাষণরত অবস্থায়ই আমাকে সেখানে হাজির করা হলে তিনি মাইক থেকে সরে এসে আমার সাথে কোলাকুলি করার পর ভাষণ সমাপ্ত করলেন। গোটা অনুষ্ঠানই ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত হয়।

আমার আলোচ্য বিষয় ছিল 'ফেইথ' (বিশ্বাস) আর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'বিশ্বাস বা ঈমান মানে অন্ধ ও অযৌক্তিক স্বীকৃতি নয়'। আমি বেশকিছু উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করলাম, বিশ্বাসের পেছনে মযবুত যুক্তি রয়েছে। বিশ্বাসকে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আর বিশ্বাসকে বর্জন করে একদিনও মানুষ চলতে পারে না। কারণ, সরাসরি প্রত্যক্ষ জ্ঞান শুধু পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই অর্জন করা যায় এবং এর পরিধি অত্যন্ত সীমিত। পরোক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। যেসব বিষয়ে সরাসরি জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়, সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমেই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে মানুষ বাধ্য। আমার লেখা 'মযবুত ঈমান' বইটিতে এ আলোচনা রয়েছে।

স্যার ইকবাল অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আমার বক্তব্য শুনছিলেন এবং মাঝেমধ্যে কাগজে নোট করছিলেন। বক্তব্য শেষ হলে তিনি হাত বাড়িয়ে মুবারকবাদ জানালেন এবং আমার উপলক্ষে MCB-এর একটা প্রোগ্রামের প্রস্তাব দিলেন। বোমা হামলার পর যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে আমাকে নিয়ে কোনো প্রোগ্রাম না করাই সমীচীন। তা ছাড়া আমি প্রেসকে এড়াতে চাই। আমার কোনো প্রোগ্রামই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেওয়া হয়নি। তিনি বিষয়টা অনুধাবন করলেন।

MCB-এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে ড. আবদুল বারীও সর্বমহলে পরিচিত। তিনি বহুদিন ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশি ব্রিটিশ নাগরিক।

ইস্ট লন্ডন মসজিদ

মসজিদের আকৃতিতে নির্মিত ও সুউচ্চ মিনার দ্বারা চিহ্নিত বৃহদাকারের দুটো মসজিদ লন্ডনে সর্বমহলে পরিচিত। একটি মসজিদ রিজেন্ট পার্কে অবস্থিত। মসজিদের মূল হলটি লন্ডনে সর্ববৃহৎ। এ মসজিদটির সাথে মুসলিম দেশের রাষ্ট্রদূতগণ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অপর মসজিদটি হোয়াইট চ্যাপেল রোডে অবস্থিত; এটি 'ইস্ট লন্ডন মসজিদ'

নামে খ্যাত। এর মূল হলটি রিজেন্ট পার্ক মসজিদের চেয়ে ছোট হলেও এর নিচে (বেইজমেন্টে) বিরাট হল থাকায় এখানে রিজেন্ট পার্ক মসজিদের তুলনায় বেশিসংখ্যক মুসল্লী সমবেত হতে পারেন।

ইস্ট লন্ডন এলাকাটিতেই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বাংলাদেশি মুসলমান বসবাস করেন– যাদের শতকরা ৮০ জনই বৃহত্তর সিলেট থেকে আগত। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ব্রিটিশ শাসনামলে সামুদ্রিক জাহাজে কর্মরত সিলেটি লোকেরাই পূর্বলন্ডনে বসতি স্থাপন করা শুরু করেন। ত্রিশের দশক থেকেই এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের সূচনা হয় এক শ' বছর আগে। ১৯০৫ সালে সর্বপ্রথম লন্ডনের সর্ববৃহৎ 'হাইড পার্ক'-এ ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়। যারা এর আয়োজন করেন তারাই মসজিদ স্থাপনের উদ্যোগ নেন। উদ্যোক্তাদের তালিকায় জাস্টিস সাইয়েদ আমীর আলী, মেজর সাইয়েদ হাসান বিলগ্রামী, লে. কর্নেল স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী, আল্লামা আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী এবং ব্রিটিশ নওমুসলিম ও কুরআনের প্রখ্যাত অনুবাদক মুহাম্মদ মার্মাডিউক পিকথলের নাম পাওয়া যায়।

১৯৩৮ সালে একটি কেনা বাড়িকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। বাড়ির একাংশ মুসলিম জাহাজীদের হোস্টেল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ১৯৪০ সালে মসজিদের জন্য তিনটি বাড়ি খরিদ করা হয়। ১৯৪১ সালের ১ আগস্ট সৌদি আরবের মন্ত্রী শায়খ হাফিয ওহবার ইমামতিতে প্রথম জুমুআর নামায আদায় করা হয়। বাড়ি তিনটি কমার্শিয়াল রোডে অবস্থিত ছিল। ১৯৭৩ সালে আমি লন্ডন পৌঁছে ইস্ট লন্ডনেই আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থান করি। তখন ঐ মসজিদেই আমি জুমুআর নামায পড়তাম।

১৯৭৫ সালে সরকার তাদের প্রয়োজনে ঐ তিনটি বাড়ি দখল করে নেয় এবং এর বদলে হোয়াইট চ্যাপেল রোডে জমি বরাদ্দ করে নামাযের ঘর নির্মাণ করে দেয়। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সে দেশে থাকাকালে এখানেই জুমুআ আদায় করেছি।

বর্তমান ইস্ট লন্ডন মসজিদটি ১৯৮৫ সালের ১২ জুলাই কাবা শরীফের ইমাম শায়খ আবদুল্লাহ বিন সুবাইলের ইমামতিতে জুমুআর নামায আদায়ের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়। আমার নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ১৭ বছর বাংলাদেশেই অন্তরীণ অবস্থায় থাকায় লন্ডনের গৌরব এ মসজিদটি দেখা থেকে বঞ্চিত ছিলাম। ১৯৯৪ সালের জুন মাসে সুপ্রিম কোর্ট আমার নাগরিকত্ব বহাল করার পর ১৯৯৫ সালের আগস্টে ঐ মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিই।

এ মসজিদ সম্পর্কে এত বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার কারণ আছে। ১৯৩৮ সালে 'ইস্ট লন্ডন মসজিদ ট্রাস্ট' কায়েম হয়। গত কয়েক দশক থেকে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা বাংলাদেশি। বর্তমানে এর চেয়ারম্যান ড. আবদুল বারী ও সেক্রেটারি জনাব হাবীবুর রহমান বাংলাদেশি ব্রিটিশ সিটিজেন। গত এক দশক থেকে এ মসজিদের খতীব মাওলানা আবদুল কাইউম ও ইমাম হাফেয মাওলানা আবুল হোসাইনও বাংলাদেশি। খতীব সাহেব আরবী, ইংরেজি ও বাংলায় খুতবা দেন। তিনি জামায়াতনেতা মরহুম মাস্টার মুহাম্মদ শফীকুল্লাহর জামাতা।

এ মসজিদের বেইজমেন্টের হল সারা বছর মহাব্যস্ত থাকে। লন্ডনে বসবাসরত সকল দেশের মুসলমানদের সংগঠন এখানে তাদের সম্মেলন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম করে থাকে। আমি ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর যত প্রোগ্রামে শরীক হয়েছি তা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদটি ইস্ট লন্ডনের বিশাল এলাকার মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায় ঘনবসতিপূর্ণ এ এলাকার মানুষের সামাজিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। জুমুআ, ঈদ ও রমযানে স্থান সংকুলান হয় না। তিন হাজার লোক একসাথে নামায আদায় করার ব্যবস্থা রয়েছে। মসজিদটি এলাকার বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের কেন্দ্র হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

মসজিদে নামাযের প্রধান হল ছাড়া বিল্ডিংয়ের বেইজমেন্ট ও অন্যান্য কামরায় বহু রকমের কর্মসূচি পালনের সুযোগ রয়েছে। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সে সুযোগ গ্রহণ করায় ইস্ট লন্ডন মসজিদ সবার আকর্ষণীয় কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়। সুউচ্চ দর্শনীয় মিনার ও গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি দেখার জন্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আগমন করেন। ব্রিটিশ ক্রাউনের উত্তরাধিকারী বর্তমান রানী এলিজাবেথের বড় ছেলে প্রিন্স চার্লস দুই বার মসজিদটি দেখতে আসেন। তিনি ইসলাম সম্পর্কে অত্যন্ত সুধারণা পোষণ করেন বলে তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। তিনি লিস্টারে অবস্থিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনে গিয়ে ইসলাম সম্পর্কে মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন।

'ইস্ট লন্ডন মসজিদ ট্রাস্ট' গোটা ইস্ট লন্ডনের জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে মসজিদসংলগ্ন একটি খালি জায়গা কেনার জন্য চেষ্টা করে আসছিল। জায়গাটি কারপার্ক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দীর্ঘ প্রায় বিশ বছর চেষ্টার পর ২০০০ সালে ট্রাস্ট ঐ কাম্য জায়গাটি খরিদ করতে সমর্থ হয়।

লন্ডন মুসলিম সেন্টার

২০০৪ সালের ১১ জুন লন্ডন মুসলিম সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষে Vision Becomes Reality (স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত) নামে প্রকাশিত পুস্তক থেকে এ সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশন করছি।

মসজিদসংলগ্ন জায়গাটি খরিদ করার পর তিন বছরের মধ্যেই ৬ তলাবিশিষ্ট মনোরম বিল্ডিংয়ের নির্মাণকাজ সমাধা হয়। 'লন্ডন মুসলিম সেন্টার' নামক প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কা'বা শরীফের ইমাম (তারাবীহ নামাযে যাঁর তিলাওয়াত সবচেয়ে জনপ্রিয়) ডক্টর আবদুর রহমান আস্‌সুদাইস। ইংল্যান্ডের উল্লেখযোগ্য সকল ইসলামী ব্যক্তিত্ব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ক্রাউন প্রিন্স চার্লসেরও উপস্থিত থাকার কথা ছিল; কিন্তু ঐ সময় আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের মৃত্যুতে রানীর পক্ষ থেকে তাঁকেই যেতে হয়। ২০০৫ সালের নভেম্বরে তিনি এ সেন্টারটি দেখে মুগ্ধ হন। লন্ডনের মেয়র ও পুলিশ কমিশনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

লন্ডন মুসলিম সেন্টারের অনারারি সেক্রেটারি জনাব মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (যিনি ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট) উপরিউক্ত পুস্তকে লেখেন :

'লন্ডন মুসলিম সেন্টারটি পশ্চিম ইউরোপে বৃহত্তম মুসলিম প্রতিষ্ঠান এবং লন্ডনে মুসলিমদের সর্ববৃহৎ প্রকল্প। এতে এক কোটি পাউন্ডেরও বেশি ব্যয় হয়। সর্বস্তরের মুসলিম জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ তহবিলে সাধ্যমতো দান করেন।'

এ সেন্টারের ডাইরেক্টর (যিনি ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর সেক্রেটারি জেনারেল) জনাব দিলাওয়ার হোসাইন খান ঐ পুস্তকে লেখেন :

'ব্রিটেনে মুসলিম কমিউনিটির ব্যাপক কর্মতৎপরতার নেতৃস্থানীয় কেন্দ্র হিসেবে ইস্ট লন্ডন মসজিদের ভূমিকা স্থানীয়ভাবে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত; এমনকি ইউরোপের দেশগুলোতেও পরিচিত। এখন লন্ডন মুসলিম সেন্টার যুক্ত হওয়ায় ঐসব তৎপরতা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে মসজিদ ও সেন্টার মুসলিম কমিউনিটির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।'

পুরনো ও নতুন মিলে ৩২টি প্রকল্প পাঁচটি গ্রুপ-সার্ভিসের পরিচালনায় চালু করা হবে; যার মধ্যে বেশ কয়েকটি পূর্ব থেকেই চালু আছে। গ্রুপ-সার্ভিসগুলো হলো– ধর্মীয়, শিক্ষামূলক, সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত, সাংস্কৃতিক অঙ্গন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। পুস্তকটিতে সকল প্রকল্প সম্পর্কেই সংক্ষেপে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

লন্ডন মুসলিম সেন্টারের বিবরণ

৮০০০ বর্গমিটার ব্যবহারযোগ্য স্থান এতে রয়েছে। ৬ তলাবিশিষ্ট মনোরম বিল্ডিংটির প্রথম তলাটি মাটির নিচে। এর শতকরা ৮০ ভাগ মুসলিম কমিউনিটির কর্মতৎপরতার জন্য বরাদ্দ। বাকি অংশ সেন্টারের ব্যয়নির্বাহের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট। মাটির উপর প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় বিশাল দুটো মিলনায়তন রয়েছে। সম্মেলন, বিবাহ-ওয়ালীমাতে পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক ব্যবস্থায় হল দুটো ব্যবহৃত হয়।

হল দুটোর এত চাহিদা যে, সাপ্তাহিক ছুটির দুই দিন শনি ও রবিবার কখনো খালি থাকে না। ২৭ জুলাই যখন আমার নাতির বিয়ের তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ধার্য হয় তখন জানা গেল, ঐ তারিখে হল দুটো খালি নেই। অনেক চেষ্টা করে ঐ দিন যাদের প্রোগ্রাম ছিল তাদেরকে মসজিদের বেইজমেন্ট হলে যেতে রাজি করানো হয়, যাতে আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান সেন্টারের হলে করা সম্ভব হয়।

এতে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুল পরিচালিত হয়। একটি ফ্লোর বিরাট লাইব্রেরির জন্য বরাদ্দ রয়েছে। সেন্টারের ডাইরেক্টর জনাব দিলাওয়ার হোসাইন খান একদিন মাস্টার-কী (যে চাবি দিয়ে সব দরজা খোলা যায়) নিয়ে আমাকে সব তলা ঘুরিয়ে দেখালেন। মাটির নিচের তলায় জিমনেশিয়াম। কতক লোককে বিভিন্ন রকম যন্ত্রের সাহায্যে ব্যায়াম করতে দেখা গেল। সেখানে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বিশিষ্ট একটি কামরায় এক মোটা

লোককে খালি গায়ে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত হলাম। সারা গা থেকে ঘামের ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। জানা গেল, এভাবে নাকি বেশ হালকাবোধ করা যায়। জিমনেশিয়ামের পাশে ঐ তলায়ই নার্সারি রয়েছে। যেখানে শিশুরা খেলার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে। প্রতিটি ফ্লোরে বিভিন্ন কামরায় যেসব তৎপরতা চলে তা জেনে আমি অত্যন্ত উৎসাহবোধ করলাম।

ইস্ট লন্ডন মসজিদটি এতদিন শুধু লন্ডনের গৌরব ছিল। এখন লন্ডন মুসলিম সেন্টার যুক্ত হওয়ায় তা গোটা ইউরোপের গৌরবে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয় তলায় তিন কামরাবিশিষ্ট মেহমানখানা রয়েছে। এবারের সফরে যতবার লন্ডন গিয়েছি ঐ মেহমানখানায়ই রয়েছি। এমনকি নাতনীর ওয়ালীমা ও নাতির বিয়েতে দিনে গিয়ে দিনেই ফিরে আসার ফাঁকেও সেখানেই বিশ্রাম নিয়েছি।

দুজন বিশিষ্ট লোকের সাথে বিশেষ সাক্ষাৎ

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, যাঁদের প্রায় সকলেই পূর্বপরিচিত; কিন্তু দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে সময় নিয়ে আমি তাঁদের নিকট গেলাম। একজন হলেন প্রফেসর ড. খুরশিদ আহমদ, যিনি বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ হিসেবে খ্যাত। তিনি জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান-এর নায়েবে আমীর, পাকিস্তান সিনেটের সদস্য ও মাওলানা মওদূদী (র) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাসিক 'তরজুমানুল কুরআন'-এর সম্পাদক। তিনি বেশি সময় পাকিস্তানে অবস্থান করলেও বছরে বারবার বিদেশ সফর করতে হয়। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রয়োজনে তাঁকে প্রতি বছরই একাধিকবার ইংল্যান্ডে আসতে হয়। তিনি এর চেয়ারম্যান। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা ও গত কয়েক বছরে ফাউন্ডেশনের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমের উন্নতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য লিস্টার গেলাম।

অপর বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক রিডার ড. মোহর আলী। তিনি লন্ডনেই নিজ বাড়িতে অবস্থান করছেন।

প্রফেসর খুরশিদ আহমদ

তাঁর নিকট থেকে আমি পাকিস্তানের বিস্তারিত অবস্থা জানলাম। আর তিনি আমার নিকট থেকে বাংলাদেশের খবরাখবর নিলেন। তাঁর সম্পাদিত মাসিক 'তরজুমানুল কুরআন' প্রতি মাসেই ঢাকায় আমার নিকট আসে। মাসের মাঝামাঝি সময়ে পাই। আগস্টের ২৪ তারিখে তাঁর সাথে দেখা হলো। জুলাই ও আগস্টে এর কপি ঢাকায় পৌঁছলেও আমি দেখতে পাইনি। তাঁর কাছ থেকে তা পেয়ে গেলাম। তাঁর লেখা সম্পাদকীয় থেকে পাকিস্তানের অবস্থা জানা যায়।

তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, পাকিস্তানে ইসলামী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ এবং সীমান্ত প্রদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করলেও জেনারেল পারভেজ মোশাররফ পাকিস্তানে ইসলামের অগ্রগতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধকের ভূমিকা পালন করছেন। পাকিস্তানে যেটুকু ইসলামী শিক্ষা আছে তিনি তাও সংকুচিত করতে চাচ্ছেন। সীমান্তের ইসলামী হুকুমতকে পদে পদে বাধা দিচ্ছেন।

'আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান্ নাহী আনিল মুনকার' বিলটি আইনসভায় সর্বসম্মতভাবে পাস হওয়ার পরও তিনি তা বাস্তবায়িত হতে দিচ্ছেন না। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের ভেটো পাওয়ার প্রয়োগ করেই চলেছেন।

ড. মানাযির আহসান ঐ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর জেনারেল। তিনি পাকিস্তান আমলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রসংগঠনের নেতা ছিলেন। পিএইচডি করতে ইংল্যান্ড গেলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি আর ফিরে আসেননি। তাঁর পিতা বিহার থেকে হিজরত করে সিরাজগঞ্জ এসে বসতি স্থাপন করেন এবং সিরাজগঞ্জ কামিল মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তখন জনাব মানাযির শিশু ছিলেন। বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া করায় তিনি ভাষাগতভাবে আমাদের মতোই বাংলাভাষী; কিন্তু বাড়িতে পারিবারিকভাবে উর্দুভাষী। বাংলা ও উর্দু ভাষায় সমান দক্ষতা থাকায় ব্রিটেনে তিনি ইসলামী আন্দোলনের পাকিস্তানি ও বাংলাদেশিদের নিকট সমান জনপ্রিয়।

তাঁরই পরিচালনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাশ্চাত্যে অত্যন্ত সুপরিচিত। ইসলামের বহুমুখী খিদমত এখানে হচ্ছে। এখানেই ব্রিটিশ নওমুসলিম মহিলাদের শিক্ষাকেন্দ্র অবস্থিত। লাফবোরো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চুক্তিতে এখানে এমএ ও পিএইচডি ডিগ্রি প্রত্যাশী ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করে।

যতবারই আমি সে দেশে যাই, প্রতিবারই সেখানেও যাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল্ডিং নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে– তা দেখানোর জন্য ড. মানাযির বারবার ফোন করলেন। প্রফেসর খুরশিদের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি আমাকে ঐ বিল্ডিং দেখান।

আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার আলো যে এত চমৎকারভাবে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা আমার ধারণায় ছিল না। তিনি আমাকে একটা ক্লাসরুম দেখালেন। কয়েকটি দেশের সাথে তাদের যোগাযোগ রয়েছে। এখানকার প্রফেসরের লেকচার সেসব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শুনতে পায়। ঐ ছাত্ররাও এ প্রফেসরকে প্রশ্ন করে এবং তিনি জবাব দেন। এ উদ্দেশ্যে যে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তাও তিনি দেখালেন। দুনিয়ার যেকোনো দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের লেকচারও এখানে শোনানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব। বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষের সার্বিক কল্যাণে ব্যবহার করা যেতে পারে; কিন্তু অকল্যাণেই বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ড. মোহর আলী

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনসহ যে কজন অধ্যাপক নির্যাতিত হন ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন তাদের মধ্যে ড. মোহর আলী অন্যতম। দুই বছর কারাযন্ত্রণা ভোগের পর তিনি সৌদি আরব পৌঁছেন। তাঁর সাথে পূর্বে আমার পরিচয় ছিল না। হজ্জের মৌসুমে লন্ডন থেকে মক্কা শরীফে এলে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি সৌদি আরবের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালি মুসলমানদের ইতিহাস লেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। যেভাবে ভারতের সাহায্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে তাতে তিনি এ আশঙ্কা করেন যে,

ভারতের আধিপত্য প্রবল থাকলে বাঙালি মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে পারে। তাই এ ইতিহাস সৌদি আরবে প্রকাশিত হলে তা সংরক্ষণ করা সহজ হবে।

আমি তাঁকে নিয়ে রিয়াদে ইমাম সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. আবদুল্লাহ আবদুল মুহসিন আল-তুর্কীর নিকট গেলাম। ড. আবদুল্লাহ বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে তাঁকে এ সুযোগ দিলেন। তিনি ইংরেজিতে কয়েক খণ্ডে The History of the Muslims of Bengal রচনা করলেন; যা ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় এবং বাংলাদেশের সৌদি দূতাবাসের মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিলি হয়। আমিও তা সংগ্রহ করি। এ মূল্যবান গ্রন্থটির তেমন কোনো মূল্যায়ন এখনো কোনো মহল থেকে হলো না।

দশ বছর পর্যন্ত তিনি ব্লাডক্যান্সারে ভুগছেন। বহু বছর থেকে দেখা নেই। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকাকালে আমি মদীনায় গেলে মসজিদে নববীতে তাঁর সাথে আমার দেখা হলো। আগে দাড়ি ছিল না, লম্বা দাড়ি দেখে চিনতে সামান্য দেরি হয়। এবার লন্ডনে ফোন নম্বর জোগাড় করে দেখা করতে গেলাম। দেখে খুব দুর্বল মনে না হলেও তিনি বেশ দুর্বলতা বোধ করেন। দীর্ঘ কোলাকুলি হলো। কয়েক বছর আগে তাঁর মৃত্যুর গুজব শুনেছিলাম বলে জানালাম।

তিনি গত দশ বছরে অসুস্থ অবস্থায়ও এক বিরাট অবদান রেখেছেন। তিনি ইংরেজি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন। তিনটি বড় বড় খণ্ডে তা প্রকাশিত হয়েছে।

আমাকে তিনি তাঁর অনূদিত তিন খণ্ডে বিস্তৃত গ্রন্থখানা দিলেন। কুরআনের অনুবাদ ইংরেজিতে অনেকেই করেছেন। তাঁর অনুবাদের বৈশিষ্ট্য অভিনব। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব রচনাশৈলী আছে। তাই ভাষাভিত্তিক অনুবাদ হয় না; ভাবের অনুবাদই হয়ে থাকে। এক ভাষায় যে ভাবটি প্রকাশিত হয়, অন্য ভাষার রচনাশৈলী অনুসরণ করে ঐ ভাবটি প্রকাশ করেই অনুবাদ করা হয়। ড. মোহর আলীর অনুবাদ এ দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। আমি কিছু অংশ পড়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলাম। তিনি প্রত্যেকটি আয়াতের শব্দগুলো যেক্রমে সাজানো রয়েছে সেক্রমেই ইংরেজি ভাষায় রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছেন। এতে ভাব যথাযথই প্রকাশ পেয়েছে। এ অসাধ্য সাধনের জন্য তিনি সত্যিই কৃতিত্বের অধিকারী। মসজিদে নববীতে বসেই তিনি এ অনুবাদ শুরু করেছেন বলে জানালেন।

কোন্ আরবী শব্দের অনুবাদে ইংরেজি কোন্ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা বুঝতে পাঠকের সামান্যও বেগ পেতে হবে না। যারা আরবী ভাষা বুঝে না তাদের জন্য এ অনুবাদ আরবী ভাষা শেখার জন্যও অত্যন্ত সহায়ক।

ফুটনোটেও তিনি আরেকটি অবদান রেখেছেন। গুরুত্বপূর্ণ আরবী শব্দগুলোর মূল আরবী শব্দ, মূল শব্দের বিভিন্ন অর্থ এবং কুরআনে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাকরণভিত্তিক বিশ্লেষণ করে আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন।

তিনি বর্তমানে সীরাতুন্নবী সম্পর্কে লেখায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এ মহান সাধক ও গবেষককে এ কাজ সমাধা করার তাওফীক দান করুন।

২৩৮.

লন্ডনে বোমা হামলা

২০০৫ সালের জুলাই মাসের ৪ তারিখে আমি ম্যানচেস্টার পৌঁছলাম। ৭ জুলাই লন্ডনে ভয়ঙ্কর বোমা হামলায় বিশাল মহানগরীর গোটা যানবাহন অচল হয়ে পড়ল। আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন ও বাসই প্রধান যানবাহন। এ দুটোর উপরই বোমা হামলা হয়। আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনেই বেশি লোক নিহত হয়। সর্বমোট ৫৩ জন নিহত ও প্রায় ৭০০ লোক আহত হয়। লন্ডনের জনসংখ্যার শতকরা ১০ জন মুসলিম। ঘটনাক্রমে নিহতদের মধ্যে ছয়জন মুসলিম হওয়ায় প্রায় ঐ হারেই মুসলিম নিহত হয়। তাদের মধ্যে তিনজনই বাংলাদেশি– একজন তরুণী ও দুজন স্বামী-স্ত্রী।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন-টাওয়ার বিমান হামলায় ধ্বংস হওয়ার পর বিনা প্রমাণে এমনকি বিনা তদন্তেই উসামা বিন লাদেনকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে আশ্রয় দেওয়ার অজুহাতে আফগানিস্তানের জনসমর্থিত সরকারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ঘোষণার মাধ্যমে হামলা চালিয়ে উৎখাত করে সেখানে পুতুল সরকার কায়েম করা হয়। এরপর থেকে বিশ্বের যেখানেই বোমা হামলা হয়, তা মুসলিম সন্ত্রাসীদের দ্বারাই হয়ে থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। আফগানিস্তান ও ইরাক দখলের পর তাদের অপরাধী মন এ ধারণাই করে যে, মুসলিম সন্ত্রাসীরা প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের আদলে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালাচ্ছে।

তাই দেখা গেল, লন্ডনে বোমা হামলার পর এ সন্দেহের ভিত্তিতেই উগ্র জাতীয়তাবাদী জঙ্গিরা মুসলিমদের উপর বিভিন্ন ধরনের হামলা, নির্যাতন ও জ্বালাতন করতে লাগল, হিজাব পরিহিতা মহিলাদের উত্ত্যক্ত করল। এমনকি মসজিদেও হামলা চালাল।

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সকল ধর্মের নেতৃবৃন্দ সমবেত হয়ে বোমা হামলার তীব্র নিন্দা জানানোর পর জঙ্গিদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়নি বটে, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। ঐ সমাবেশে মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসেবে মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন (MCB)-এর সেক্রেটারি জেনারেল স্যার ইকবাল সাকরানি, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ড. আবদুল বারী ও ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর প্রেসিডেন্ট মাওলানা মুসলিহুদ্দীন ফারাদীও ছিলেন।

হিজাব পরিহিতাদের উত্ত্যক্ত করার অজুহাতে লন্ডনে বসবাসকারী ড. জামাল বাদাবী নামক এক মিসরি উদারপন্থি মুসলিমনেতা হওয়ার দাবিদার ব্যক্তি সাময়িকভাবে হলেও হিজাব পরা মুলতবি রাখার আহ্বান জানান। এরপর থেকে এ নেতা প্রশাসনের নৈকট্য লাভ করেন। কিন্তু মুসলিম মহিলারা তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে প্রতিবাদ করেন।

ম্যানচেস্টারে এ বোমা হামলার প্রতিক্রিয়ায় জাতীয়তাবাদী জঙ্গিদের তেমন তৎপরতা লক্ষ করা যায়নি। তবুও বিবিসি থেকে দুজন মহিলা আমার মেঝ ছেলে আমীনের বাসায় তার স্ত্রী ও কন্যা আলিয়ার কাছ থেকে হিজাব সম্পর্কে ইন্টারভিউ নিয়ে গেল। আমি ঐ বাড়িতেই ছিলাম। তারা বিবিসিকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, মুসলিম হিসেবে তারা আল্লাহর পক্ষ হতে আরোপিত হিজাব পরার নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য। এর জন্য

নির্যাতনের শিকার হলেও তা তারা সহ্য করতে প্রস্তুত। তথাকথিত উদারপন্থিদের মতামত তারা মেনে নিতে পারবে না।

'ইসলাম চ্যানেল' নামক টিভি চ্যানেল এ ব্যাপারে মূল্যবান অবদান রেখেছে। ব্রিটিশ মুসলিম মহিলারা টিভিতে হিজাবের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। যারা কোনোভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, এ চ্যানেল তাদের তথ্য সংগ্রহ করে প্রশাসনকে প্রতিকার করার আহ্বান জানিয়েছে।

লন্ডনে বোমা হামলার জন্য আসল দোষীদের কেউ গ্রেফতার ও তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে কি না তা জানার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে মাওলানা আবদুল আউয়ালকে অনুরোধ করলাম। তিনি বর্তমানে ঢাকায় আছেন। তিনি ড. আবদুল বারীর সাথে যোগাযোগ করলেন। ড. আবদুল বারীর পূর্বে মাওলানা আবদুল আওয়াল ইস্ট লন্ডন মসজিদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ঐ বিষয়ে ৯ পৃষ্ঠাব্যাপী সরকারি তথ্যের ফ্যাক্স পেলেন। ঐ ফ্যাক্সের ভিত্তিতেই লিখছি :

১. চারজন আত্মঘাতী বোমারুর মধ্যে তিনজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের দুজন মুসলিম। তারা নিহত হয়ে গেছে বলে দোষী সাব্যস্ত করার উপায় নেই। ৭ জুলাইয়ের হামলাকারী সন্দেহে গ্রেফতারকৃতদের কোনো তালিকা এতে পেলাম না।

২. ২১ জুলাইয়ের দ্বিতীয় বোমা হামলায় বোমা না ফাটায় হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে এর সাথে জড়িত চারজনকে শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। তাদের সাথে জড়িত সন্দেহে আরো ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মোট ১৫ জন গ্রেফতারকৃতদের তালিকা পাওয়া গেল। তাদের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছর। তাদের কেউ দেশের বাইরে থেকে আসেনি। ইংল্যান্ডে তাদের একজন ছাড়া সবার ঠিকানাও দেওয়া হয়েছে। চারজন মূল আসামি। অন্যরা হয় সহযোগী আর না হয় আসামিকে পালাতে সহায়ক অথবা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হিসেবে দোষী মনে করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরে তাদেরকে কোর্টে হাজির করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ৭ জুলাইয়ের আসামি হিসেবে কারো নাম নেই। উক্ত ১৫ জনের মধ্যে ১১ জনের নাম থেকে মুসলিম মনে হয়। মূল আসামির তিনজনই মুসলিম।

ইংল্যান্ডে আমার ভিডিও ইন্টারভিউ

'ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব দাওয়াহ্ এ্যান্ড রিসার্চ' নামক একটি সংস্থার কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম হলো মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ইন্টারভিউ ভিডিও করে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বিশ্বময় তাদেরকে পরিচিত করা।

এ কর্মসূচি অনুযায়ী তারা ১১ সেপ্টেম্বর (২০০৫) ম্যানচেস্টার শহরের এক স্টুডিওতে তিনজনের ইন্টারভিউ নেয়। দুজন লন্ডন থেকে এলেন। আমি তাদের চেয়ে অনেক বেশি বয়স্ক হওয়ায় আমাকে লন্ডনে যাওয়ার কষ্ট থেকে রেহাই দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রোগ্রামটা ম্যানচেস্টারেই করা হয়।

যে স্টুডিউতে ইন্টারভিউ গ্রহণ করা হয় তার নাম 'মুসলিম ইউথ ফাউন্ডেশন'। এর প্রতিষ্ঠাতা একজন ইরাকি ইঞ্জিনিয়ার। ৩০ বছর থেকে তিনি সে দেশে আছেন। তাঁর নাম প্রফেসর সলীম আল হাহ্সানী। ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে ১৯৭৫ সাল থেকেই তিনি আমার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তিনি ইসলামের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মতৎপরতা চালান।

ঐ দুজনের একজন মিসরের অধিবাসী হলেও বহু বছর থেকে লন্ডনে আছেন। তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের একজন বিশিষ্ট নেতা। তাঁর নাম ড. কামাল আল হালওয়াবী এবং অপরজন তিউনিসিয়ার নাদহাত আন্দোলনের প্রধান শায়খ রাশেদ আল-গানুশী। তিনি লন্ডনে এক যুগেরও বেশি সময় নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে ল্যাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের যে বিবরণ 'জীবনে যা দেখলাম'-এর চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে শায়খ গানুশীর পরিচিতি রয়েছে। তাঁদের দুজনের সাথেই লন্ডনে বহুবার আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছে।

ম্যানচেস্টারের স্টুডিওতে দুপুর থেকে আমার ইন্টারভিউ প্রায় আড়াই ঘণ্টা চলে। ইন্টারভিউ চলাকালেই শ্রোতাদের মাঝে শায়খ গানুশী এসে বসলেন। আমার পর তাঁর ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। সবশেষে ড. কামাল আল হালওয়াবীর পালা আসে সন্ধ্যায়। আমি আগেই চলে আসায় সেখানে তাঁর সাথে দেখা হয়নি। ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় ২৫/৩০ জন নারী-পুরুষ দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যারা বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের সাথে জড়িত। আমার নাতি-নাতনীও পাঁচ-ছয়জন ছিল। যে সংস্থাটি ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করেছে এর প্রধান হাসানুল বান্না নামের এক প্রতিভাবান যুবক। তাঁর পিতা সিলেটের মাওলানা শরীফ আবদুল কাদের। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কয়েক বছর তিনি কুমিল্লা ও নোয়াখালী এলাকায় ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী সংগঠন সম্প্রসারণে বিরাট অবদান রাখেন। এরপর তিনি লন্ডনে স্থায়ী অধিবাসী হিসেবে আছেন। তিনি একসময় 'দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে' নামক সংগঠনের আমীর ছিলেন। বর্তমানে 'ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ'-এর সাথে জড়িত আছেন।

শরীফ মুহাম্মদ হাসানুল বান্না তাঁরই যোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি পিতার নিকট থেকে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করার সাথে সাথে এ-লেভেল পাস করেন; ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ ও মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষা আয়ত্ত করেন; লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ও ল' পাস করার পর বার অফশনাল কোর্স সমাপ্ত করে ব্যারিস্টার হয়েছেন; ইংরেজিতে ইসলাম সম্পর্কে কয়েকটি বই লিখেছেন; কয়েকটি আরবী বই ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন; বর্তমানে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রি কোর্সে নিয়োজিত আছেন।

ইন্টারভিউতে হাসানুল বান্নাই প্রশ্ন করেছেন এবং আমি উত্তর দিয়েছি। আড়াই ঘণ্টাব্যাপী প্রশ্নোত্তরে আমার জীবনের কোনো দিক বাদ পড়েনি। বংশ পরিচয়, শৈশব, ছাত্রজীবন, বিয়ে, সন্তানাদিকে গড়ে তোলা ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্নের জবাব দিই। আমি বললাম, আমার আব্বার অভিভাবকত্ব ও ইসলামী ছাত্রসংগঠনের সাহায্য পাওয়ায় সন্তানদের ইসলাম মোতাবেক গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

আমার ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা, অভ্যাস, পেশা ইত্যাদি সম্পর্কেও অনেক কথা জানতে চাওয়া হলো। কোন্ কোন্ ব্যক্তি ও কোন্ কোন্ বই আমাকে প্রভাবিত করেছে– এ প্রশ্নের জবাবে বললাম, মাওলানা মওদূদী (র)-এর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর রচিত সাহিত্য বিশেষ করে তাঁর লেখা তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে। নিজের ব্যক্তিগত অধ্যয়ন, সাংগঠনিক দায়িত্ব ও পারিবারিক দায়িত্বপালনে ভারসাম্য রক্ষা সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে বলেছি, কোনো দায়িত্বকেই অবহেলা করা চলে না। সকল দায়িত্ব মিলেই জীবন। নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকলে ভারসাম্য রক্ষা করা অসম্ভব নয়।

ইসলামী আন্দোলন

কীভাবে ইসলামী কর্মতৎপরতায় জড়িত হলেন এবং কেমন করে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হলেন– এ প্রশ্নের জবাবে আমার তাবলীগ জামায়াতে যোগদান ও পরে জামায়াতে ইসলামীতে শরীক হওয়ার কাহিনী সংক্ষেপে বললাম। ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে আমার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাইলে বললাম, মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ্, ওয়ায ও তাবলীগের মাধ্যমে দীনের যে বিরাট খিদমত হচ্ছে এসবকে বাতিল শক্তি তাদের জন্য মোটেই ক্ষতিকর মনে করে না বলে এসবের বিরুদ্ধে কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করে না। কিন্তু দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে কর্মতৎপর হওয়ার কারণে সকল কায়েমী স্বার্থ– রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থও জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা করা জরুরি মনে করে।

রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা

রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলে বললাম, আমাদের দেশে যারা রাজনীতি করেন তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতায় গিয়ে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা। দেশকে উন্নত করা ও দেশকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য তাদের আছে বলে মনে হয় না। থাকলে চরিত্রবান লোক তৈরি করা ও সৎ লোকদের সংগঠনভুক্ত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হতো।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করলাম, সুস্থ ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি চালু থাকলে আমার জন্মগত নাগরিকত্ব বাতিল করা হতো না। দেশের আইনে দোষী সাব্যস্ত হলে নাগরিককে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু নাগরিকত্ব বাতিল করা যেতে পারে না। তাই শেষ পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে আইনের লড়াইয়ের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আমার নাগরিকত্ব বহাল হলো। ২৩ বছর পর ১৯৯৪ সালে জন্মগত নাগরিকত্ব ফিরে পেলাম।

আমার লেখা বই

আমার লিখিত বই-পুস্তক সম্পর্কে জানতে চাইলে বললাম, ছোট-বড় ৭০টিরও বেশি বই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ছোট বইয়ের সংখ্যাই বেশি। সাধারণ ও স্বল্প শিক্ষিত লোকের উদ্দেশ্যেই আমি লিখি, যারা বড় বই ধরতেই ভয় পায়। তাছাড়া সহজ ভাষায় লিখি, যাতে তারা সহজে বুঝতে পারে। ইংরেজিতে কোনো বই লিখেছি কি না– জানতে চাইলে বললাম, ইংরেজিতে মাত্র দুটো বই লিখেছি– A Guide To Islamic Movement

ও Political Thoughts of Abul A'la Maudoodi. এছাড়া Establishment of Deen Islam নামে আমার একটা বই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। ইংরেজিতে লেখার সময় পাচ্ছি না।

স্মরণীয় ঘটনা

আমার জীবনের স্মরণীয় কতক ঘটনা উল্লেখ করতে বললে জানালাম, অনেক ঘটনা থেকে কয়েকটি পেশ করছি :

১. ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের চমকপ্রদ ঘটনা।

২. ১৯৫৫ সালের জুনে লাহোরে মাওলানা মওদূদী (র)-এর সাথে প্রথম সাক্ষাতের আবেগময় দিনের ঘটনা।

৩. ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে করাচিতে মাওলানা মওদূদীর সাথে একান্ত সাক্ষাতে জানতে পারলাম, ইসলামকে বিজয়ী করার আন্দোলন করার বিপ্লবী ধারণা তিনি কেমন করে লাভ করলেন।

৪. ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাস লাহোর জেলে মাওলানা মওদূদীর সান্নিধ্য লাভের মহাসুযোগ।

৫. ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে জেদ্দায় শহীদ বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আযীযের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকার।

আমার কারাজীবন

কারাজীবন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বললাম, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা আদায়ের আন্দোলন করার অপরাধে ১৯৫২ সালে এক মাস ও ১৯৫৫ সালে দুই মাস জেলে কাটাই। ইসলামী আন্দোলন করার অপরাধে ১৯৬৪ সালে সাত মাস ও ১৯৯২-এর মার্চ থেকে ১৬ মাস কারাগারে আটক থাকি। শেষের তিনবারই হাইকোর্টের রায়ে মুক্তি পাই।

বিদেশ সফর

কোন্ কোন্ দেশ সফর করেছি তা জানতে চাইলে বললাম– সৌদি আরব, কুয়েত, আরব আমিরাত, বাহরাইন, লেবানন, লিবিয়া, তুরস্ক, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, ডেনমার্ক, জাপান ও সিঙ্গাপুর। সৌদি আরব, কুয়েত ও ইংল্যান্ডে বহুবার যেতে হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ

যেসব উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁদের নাম জানতে চাইলে বললাম, ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সাবেক মুরশিদুল আম ড. হাসান আল-হুদাইবী ও সুদানের সে সময়ের ইখওয়াননেতা ড. হাসান তুরাবী, তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. নাজমুদ্দীন আরবাকান, সৌদি আরবের শায়খ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আযীয বিন বায, বাদশাহ ফয়সাল, বাদশাহ খালেদ, ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী (ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট), রাবেতা আলমে ইসলামীর সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল ড.

আবদুল্লাহ ওমর নাসীফ, রাবেতার বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী ড. আবদুল্লাহ আবদুল মুহসিন আত্তুর্কী, মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী (ভারত), ড. প্রফেসর খুরশিদ আহমদ (পাকিস্তান), ড. আহমদ তুতুনজী (আমেরিকা), ড. আবদুল হামীদ আবু সুলায়মান (সৌদি আরব)-সহ বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের অনেক নেতা।

ইসলামী পুনর্জাগরণের পদ্ধতি

ইসলামী পুনর্জাগরণের পদ্ধতি সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চাইলে বললাম, আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণকে দীন কায়েমের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁরা আল্লাহর শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই আমাদেরকে এ উদ্দেশ্যে কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে না– শুধু নবীদের পদ্ধতি বুঝে প্রয়োগ করতে হবে। সে পদ্ধতি হলো :

১. মানুষকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মেনে চলার দাওয়াত দিতে হবে।

২. যারা এ দাওয়াতে সাড়া দেয়, তাদের সংগঠিত করে দীনকে বিজয়ী করার উপযোগী যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

৩. এমন একদল যোগ্য লোক তৈরি হলে এবং জনগণ দীনের সক্রিয় বিরোধী না হলে আল্লাহ তাআলা সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াতে তাদেরকে দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগ দেওয়ার ওয়াদা করেছেন।

লোক তৈরির দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেননি। লোক তৈরি হলে ক্ষমতাসীন করার দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। তাই আমাদেরকে লোক তৈরির উপরই গুরুত্ব দিতে হবে। ক্ষমতা দখলের জন্য কোনো কৃত্রিম প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। শক্তি প্রয়োগ, সশস্ত্র বিপ্লব, গেরিলা যুদ্ধ ইত্যাদি স্বাধীনতা আন্দোলনের উপায় হতে পারে; এগুলো ইসলামী বিপ্লবের পথ নয়।

শিক্ষা সম্পর্কে অভিমত

শিক্ষা সম্পর্কে আমার অভিমত জানতে চাইলে বললাম, মানুষ নৈতিক জীব। তাই গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে নৈতিক ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা সৃষ্টির সাথে নৈতিকতার শিক্ষা না থাকলে মানুষ পশুর চেয়েও অধম হয়। সততা ও যোগ্যতার সমন্বয় না হলে মানুষ 'মানুষ' হতে পারে না। ইসলামী শিক্ষা মানে শুধু কুরআন-হাদীস-ফিক্‌হের শিক্ষা নয়; পার্থিব যাবতীয় শিক্ষাকে কুরআন-হাদীসের আলোকে শিক্ষাদান করাই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা। প্রচলিত পৃথক সাধারণ শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা দুই প্রকারের মানুষ গড়ছে। এতে সমাজে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে।

আধ্যাত্মিকতা

আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে আমার অভিমত কী– এ প্রশ্নের জবাবে বললাম, শরীআত অনুযায়ী বাস্তবজীবন পরিচালনা করা থেকে আধ্যাত্মিকতা পৃথক কোনো বিষয় নয়। একজন নিষ্ঠাবান মুসলিমকে জীবনের সকল কাজ (পার্থিব ও ধর্মীয়) অবশ্যই কুরআন-হাদীস

মোতাবেক করতে হবে। এ ধরনের জীবন যদি শুধু আল্লাহর ভয়ে পরিচালিত হয় তাহলে যথেষ্ট নয়; আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসার সমন্বয় হলেই আধ্যাত্মিকতা হাসিল হয়। ইসলামী পরিভাষায় একে ইহসান বলে। শুধু ভয় থাকলে মুত্তাকী হয়, আর ভালোবাসা যুক্ত হলে মু'মিন হওয়া যায়। তাই তাকওয়া ও ইহসান দুটোই প্রয়োজন।

রাজনীতি সম্পর্কে অভিমত

রাজনীতি সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চাইলে বললাম, রাসূল (স) যে রাজনীতি করেছেন তা-ই ইসলামী রাজনীতি। তিনি আল্লাহর আইনকে মানবসমাজে চালু করার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা-ই ইসলামী রাজনীতি। এ রাজনীতি করাই সব ফরযের বড় ফরয এবং এ কাজকেই ইকামাতে দীনের কাজ বলা হয়। ক্ষমতা দখল করে দেশ শাসনের প্রচেষ্টা অবশ্যই রাজনীতি। আর জনগণের সমর্থনে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টাকে গণতান্ত্রিক রাজনীতি বলা হয়। আমি আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে জনসমর্থন হাসিলের প্রচেষ্টাকেই ইসলামী রাজনীতি বলে মনে করি।

যুবকদের ভূমিকা

যুবকদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত– এ প্রশ্নের জবাবে বললাম, প্রবীণদের প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্ব যুবশক্তি ব্যতীত কাজে লাগতে পারে না। যেকোনো আদর্শ বাস্তবায়নে যুবকদের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। রাসূল (স)-এর যুগেও যুবকদের অগ্রণী ভূমিকা দেখা গিয়েছিল। যুবশক্তিকে আকৃষ্ট করতে পারলে মন্দ কাজও সফল হতে পারে। আর যুবশক্তির অভাব হলে ইসলামের মতো সুমহান আদর্শও সফল হতে পারে না।

মহিলাদের ভূমিকা

মহিলাদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত– এ প্রশ্নের জবাবে বললাম, আল্লাহ্ তাআলা 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ' বলে যখন সম্বোধন করেন তখন নারী-পুরুষ সবাইকে বোঝায়। নামায-রোযার হুকুমের বেলায় মহিলাদের পৃথকভাবে সম্বোধন করা না হলেও তা তাদের উপরও ফরয বলে সবাই স্বীকার করতে বাধ্য। তেমনিভাবে দীন কায়েমের আদেশও উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। রাসূল (স)-এর যুগে প্রথম শহীদ হন হযরত সুমাইয়া নামক মহিলা সাহাবী। মহিলাঙ্গনে দীনের দাওয়াত শুধু পুরুষের দ্বারা পৌছানো কিছুতেই সম্ভব নয়। মহিলা কর্মীদের গড়ে তুলতে মহিলা নেতৃত্ব অপরিহার্য।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে আমার অভিমত জানতে চাইলে বললাম, ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার অদ্ভুতভাবে বিধ্বস্ত হওয়ায় আমেরিকার অহঙ্কার ও গৌরব ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ার পর কোনো তদন্ত ও প্রমাণ ছাড়াই উসামা বিন লাদেন ও

তাঁর নামে প্রচারিত আল কায়েদা নেটওয়ার্ককে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং এ অজুহাতে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমনের দোহাই দিয়ে আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করে নেওয়া হয়। বিশ্বে ইসলামের পুনরুত্থানকে প্রতিহত করার পরিকল্পনা নিয়েই এ অভিযান চলছে। এমনকি প্যালেস্টাইন ও কাশ্মীরের আযাদি আন্দোলনকেও সন্ত্রাস আখ্যা দিয়ে ইসরাইল ও ভারতের আগ্রাসনকে সমর্থন করা হচ্ছে।

বহু বছর থেকে বিশ্বের বহু মুসলিম দেশে ইসলামী আন্দোলন পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সবসময় সকল প্রকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে ইসলামবিরোধী বলে তীব্র নিন্দা জানিয়ে আসছেন। অথচ তাদের আন্দোলনকে সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক বলে প্রচারণা চালানোর উদ্দেশ্যে ইসলামের নামে কতক ভুয়া সংগঠনকে দিয়ে বোমাবাজি করানো হচ্ছে।

পাশ্চাত্য-সভ্যতা ধর্মনিরপেক্ষতা, জড়বাদ ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গঠিত। তারা এসব মতবাদ সারা বিশ্বে কায়েম করছে। আর ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। অর্থাৎ আল্লাহর বিধান, রাসূলের নেতৃত্ব ও আখিরাতে সাফল্যের উদ্দেশ্যে জীবনযাপনই ইসলামী সভ্যতার মূল। তাই স্বাভাবিক কারণেই পাশ্চাত্য-সভ্যতার ধ্বজাধারীরা ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থানকে তাদের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ মনে করে।

ইরাক, সুদান ও আফগানিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের পর পাশ্চাত্য-সভ্যতার অভিভাবকগণ মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনকে ঠেকানোর জন্য আগ্রাসী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমি তাদের এ ঘৃণ্য কর্মসূচির প্রতি তীব্র নিন্দা জানাই। কিন্তু তাদেরকে এর জন্য প্রধান দোষী মনে করি না। তারা তো এটা তাদের স্বার্থে করবেই। আমি মুসলিম দেশের শাসকদেরই আসল অপরাধী মনে করি। অল্প কয়েকটি দেশ ছাড়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর মুসলিম নামধারী শাসকরাই পাশ্চাত্য-সভ্যতার এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। তাই ওআইসি নামে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সংস্থাটি বিশ্বের মুসলিমদের মুক্তি ও ইসলামী সভ্যতার পক্ষে কোনো পদক্ষেপই নিচ্ছে না।

মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ

মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে– এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে বললাম, আমেরিকার নেতৃত্বে পাশ্চাত্য-সভ্যতার ধ্বজাধারীদের সন্ত্রাস দমনের নামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসই মুসলিম উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরীণ তিনটি চ্যালেঞ্জের কারণেই এর মোকাবিলা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১. মুসলিম জনগণের মধ্যে এখনো এ ধারণা ব্যাপক হয়নি যে, মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও সত্যিকার মুসলিম হতে হলে ইসলামকে জানতে হবে এবং মেনে চলতে হবে। জ্ঞান ও চরিত্রের কতক গুণাবলির নামই মুসলিম। জন্মগত মুসলিম হওয়া যথেষ্ট নয়।

২. আলেম সমাজ বিভিন্নভাবে দীনের অনেক মূল্যবান খিদমত করছেন বটে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করা যে সবচেয়ে বড় ফরয, সে বিষয়ে যথাযথ সচেতন নন। জনগণ দীনের যতটুকু আলো পেয়েছে, আলেমগণ থেকেই তা পেয়েছে। তারা যদি ঐ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন হতেন তাহলে মুসলিম জনগণ রাজনৈতিক ময়দানে ধর্মহীন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের খপ্পর থেকে দূরে থাকতে সমর্থ হতো।

৩. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ৪৫টি দেশের সরকার যে মুসলিম নামধারীদের হাতে রয়েছে তারা যদি সত্যিকার মুসলিম হতেন তাহলে মুসলিম উম্মাহ সহজেই বর্তমান চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারত। বলতে গেলে তারাই মুসলিম উম্মাহর আসল মুসীবত। তাদের কারণেই দেড় শ' কোটি মুসলিম পঙ্গু হয়ে আছে। পাশ্চাত্য-সভ্যতার ধ্বজাধারীরা তাদের মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

সুদান ও ইরানের মতো সকল মুসলিম দেশে ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত এ চ্যালেঞ্জের সার্থক মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না।

পাশ্চাত্যের যুবকদের প্রতি উপদেশ

সর্বশেষে পাশ্চাত্যে অবস্থানরত মুসলিম যুবকদের প্রতি দশটি উপদেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে আমি বললাম, আমি শুধু সচেতন মুসলিম যুবকদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি। সকল মুসলিম যুবকের নিকট আমার পরামর্শ সচেতন যুবকদের মাধ্যমেই পৌঁছতে পারে।

১. তাদেরকে সুসংগঠিত হয়ে দীনের দাওয়াতী কাজে সক্রিয় হতে হবে, যাতে তারা সকল মন্দ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন।

২. যারা পাশ্চাত্য দেশে জন্মগ্রহণ করেননি তারা নিজ নিজ দেশ থেকে আগত মুসলিমদের সংগঠিত করার চেষ্টা করবেন, যাতে তাদেরকে ইসলামের অনুসারী ও ইসলামী কালচারের সংরক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

৩. যারা পাশ্চাত্যে জন্মগ্রহণ করে সেখানেই শিক্ষালাভ করেছেন, তাদের স্থানীয় অমুসলিমদের নিকটও দাওয়াতী কাজ সম্প্রসারণ করতে হবে। প্রথমেই ইসলামের দিকে দাওয়াত না দিয়ে মানবিক নৈতিক গুণাবলির দিকে দাওয়াত দিতে হবে। মানুষ নৈতিক জীব। ভালো ও মন্দের বিশ্বজনীন একটা ধারণা রয়েছে। তাই অপরাধী মন্দ কাজ করলেও তা যে মন্দ, সেটা সে জানে। মিথ্যাবাদীও সত্যবাদীর প্রশংসা করে। যে মন্দ কাজ করে, সে তার নিজের বিবেকের নিকটই অপরাধী। সমাজ ও দেশের কল্যাণের প্রয়োজনেই নৈতিক গুণাবলি অর্জন করার গুরুত্ব অপরিসীম। বিবেকের বিরুদ্ধে চলা থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে দুটো বিশ্বাস জরুরি :

ক. আমার সৃষ্টিকর্তা আমাকে সবসময় দেখছেন। কোনো মন্দ কাজই তাঁর নিকট

গোপন থাকে না। পুলিশ ও আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায়; সৃষ্টিকর্তাকে ফাঁকি দেওয়ার কোনো উপায় নেই।

খ. মৃত্যুর পর আরো একটি জীবন আছে। সেখানে সৃষ্টিকর্তা আমার সকল কাজের বদলা দেবেন। তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে আমাকে সকল অনৈতিকতা থেকে দূরে থাকতে হবে।

এ দুটো বিশ্বাস যারা পোষণ করে তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দেওয়া সহজ হয়।

৪. আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে কুরআনের সর্বশেষ সূরায় (সূরা নাস) তিনি নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি মানুষের প্রতিপালক, বাদশাহ ও হুকুমকর্তা প্রভু। প্রত্যেক মুসলিমকে আল্লাহর সাথে এ সম্পর্কের ব্যাপারে গৌরববোধ করা উচিত। যদি যুবকরা সবসময় এ সম্পর্কের বিষয়ে সচেতন থাকেন তাহলে তারা সহজেই শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবেন।

৫. রাসূল (স) যা শিক্ষা দিয়েছেন তা শৈশব থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেরই সবসময় প্রয়োজন। তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করা হলে আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র হওয়া যায় বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই রাসূল (স)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে এবং এ ভালোবাসার অনুভূতি গভীর হতে হবে। তাহলে কবরে তাকে চিনতে পারা যাবে, হাউজে কাওসারের পানি ও আদালতে আখিরাতে তাঁর শাফাআত লাভে ধন্য হওয়া যাবে।

৬. সে দেশের স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট মুসলিম যুবকদেরকে উন্নত ইসলামী চরিত্রের বাস্তব পরিচয় দিতে হবে; যাতে কর্মক্ষেত্রে যারা সহকর্মী এবং যারা প্রতিবেশী তারা তাদের সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও সহমর্মিতা দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

৭. তাদের সহকর্মী ও প্রতিবেশীদের আপদ-বিপদে সহায়তা করার মাধ্যমে তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে হবে। এ জাতীয় আচরণ শত্রুকেও ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত করে। এ বন্ধুত্ব দাওয়াতের পরিবেশ সৃষ্টি করতে অত্যন্ত সহায়ক।

৮. তারা যেন তাদের পিতা-মাতার প্রতি ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী আচরণ করেন। বিশেষ করে তাঁদের বার্ধক্যাবস্থায় সেবা-যত্ন দ্বারা তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জন করে তাঁদের মূল্যবান দোআর ভাগী হতে হবে। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের উদাহরণ অবশ্যই ঘৃণার সাথে বর্জন করতে হবে।

৯. পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ বয়সে পৃথক বাড়িতে থাকতে না দিয়ে নিজেদের সাথে এক বাড়িতেই রাখতে হবে, যাতে তাঁরা নাতি-নাতনীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত না হন এবং সন্তানরাও দাদা-দাদির স্নেহ থেকে বঞ্চিত না হয়।

১০. সে দেশের মানুষের মধ্যে যেসব ভালো গুণ রয়েছে তা উপলব্ধি করে আয়ত্ত করতে হবে।

২৩৯.

লন্ডন থেকে এক ডজন যুবকের আগমন

ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর ইংল্যান্ড শাখার সভাপতি জনাব আতিকুর রহমান জিলুর নেতৃত্বে ডজনখানেক বাংলাদেশি যুবক আমার সাথে একবেলা কাটানোর কর্মসূচি আমাকে জানালে সম্মতি দিই। আমি ম্যানচেস্টারে থাকি। তারা লন্ডন থেকে সড়কপথে ম্যানচেস্টার এল। যানজটের কারণে বিলম্বে পৌঁছায় কম সময়ের জন্যই তাদের সাথে মিলিত হতে পারলাম। ফোরামের ম্যানচেস্টার অফিসেই আমরা বসলাম।

প্রথমে পরিচয়পর্ব চলল। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার অধিবাসী। সবাই ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে জড়িত ছিল। কয়েকজন সাবেক সদস্য, কয়েকজন সাথী, দুজন কর্মী এবং একজন সমর্থক ছিল বলে জানলাম। তারা উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যেই এসেছে। বেশ কয়েকজনকে ব্যারিস্টার হওয়ার প্রতি আগ্রহী দেখলাম।

তারা বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন করলে জবাব দিলাম।

আমি তাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য ইসলামিক ফোরামে সক্রিয় হওয়ার জোর তাকিদ দিলাম এবং বললাম, সংগঠনভুক্ত না থাকলে নিজেকে গড়ে তোলা যায় না। তারা এ বিষয়ে আমাকে আশ্বস্ত করল। আমি তাদেরকে উৎসাহ দিলাম যে, যাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করে দেশ, জাতি ও দীনের যোগ্য খাদিম হতে পারে। দেশ থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে সেখানকার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয় বলে তাদেরকে আয়-রোজগার করেই শিক্ষার অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। এটা বেশ কষ্টসাধ্য হলেও প্রায় সবাইকে তা সহ্য করতে প্রস্তুত থাকতে হয়।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাগত যত যোগ্যতাই অর্জন করা হোক, নৈতিক শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। ইসলামী ছাত্রশিবির কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষার এ অভাব পূরণে বিরাট অবদান রাখছে। ঐ যুবকদের মধ্যে শিবিরের শিক্ষার প্রভাব দেখে তাদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ করলাম। তারা উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েও ইসলামী চেতনা হারায়নি।

ইংল্যান্ডে সন্তানাদিকে গড়ে তোলা

১৯৭২ সাল থেকে আমার বড় ছেলে মামূন ও মেজ ছেলে আমীন ম্যানচেস্টারে আছে। মামূন অবশ্য ১৯৯৬ সাল থেকে জেদ্দায় আছে; কিন্তু তার ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রয়োজনে সে ম্যানচেস্টারে বাড়ি কিনতে বাধ্য হয়। ওর ছেলেমেয়ে সবাই জন্মগতভাবেই ব্রিটিশ নাগরিক। তৃতীয় ছেলে মোমেন ১০ বছর এবং পঞ্চম ছেলে নোমান ১৫ বছর পর্যন্ত ম্যানচেস্টারেই আছে। চতুর্থ ছেলে আমান সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকায় দেশেই আছে। ষষ্ঠ ছেলে সালমানও দেশে কোনো সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য ইংল্যান্ড চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

একসময় আমি খুব চিন্তিত ছিলাম যে, সে দেশে নাতি-নাতনীদের সত্যিকার মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা আদৌ সম্ভব হবে কি না। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম যে, সে দেশে ইসলামের সৈনিক হিসেবে গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়। ইসলামী সংগঠনের বরকতে ওরা সে দেশের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও ইসলামী চরিত্রে ভূষিত হচ্ছে দেখে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানাই।

আরেকদিক দিয়ে ওরা আরবী ভাষা শেখার যে পরিবেশ ও সুযোগ পেয়েছে তা বাংলাদেশে সম্ভব হতো না। মামূনের মেজ ছেলে নাযীল ও ছোট ছেলে উসামা এ-লেভেল পাস করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগেই এক বছর আরবী শেখার উদ্দেশ্যে 'ইউরোপিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ'-এ পড়ার জন্য ফ্রান্স গেল। এ দুজনই গ্রীষ্মের ছুটিতে ইংল্যান্ডে আরবী শিখতে আগ্রহীদের আরবী শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে। বিভিন্ন দেশের মুসলিম যুবকরা আরবী শেখার জন্য বেতন দিয়ে তাদের কাছে পড়ে। এ বছর (২০০৫) গ্রীষ্মে লন্ডনে আরবী শিক্ষক হিসেবে উসামা এক হাজার পাউন্ড আয় করেছে। নাযীলও ম্যানচেস্টারে শিক্ষকতা করে আয়ের সুযোগ পায়। যুবকদের মধ্যে আরবী শেখার আগ্রহও বাড়ছে।

নাযীল ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্সে অনার্স পড়ছে। উসামা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েও আরবী শিখতে গিয়ে ওরিয়েন্টালিস্টদের ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণা শুনে তা মোকাবিলা করার জন্য ইসলামিক স্টাডিজ পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। গত বছর সে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলো। তারা বলল, তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, আরবী কিছুটা না জানলে ভর্তি হওয়া যাবে না। সে বলল, আরবীর টেস্ট নিন। টেস্টে ওর আরবীর মান দেখে ইসলামিক স্টাডিজে ভর্তি করে নিল এবং বলল, তোমার এখানে আরবী শেখার দরকার নেই; ফার্সি নাও। যারা ইসলামিক স্টাডিজ পড়ে তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন কোনো আরব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর লেখাপড়া করে। সে এবার সিরিয়া পড়তে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ই খরচ বহন করে।

মেজ ছেলে আমীনের দ্বিতীয় মেয়ে আলীয়া অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ইসলামিক স্টাডিজ পড়ছে। এক বছর পড়ার পর এবার সে এক বছরের জন্য কায়রো গেল। তার ছোট বোন মরিয়ম এবার এ-লেভেল পাস করল। সে ডেন্টিস্ট হতে চায়। আরবী শেখার জন্য সেও বোনের কাছে কায়রো যাচ্ছে।

ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে ওদের পড়ার খরচ বিশ্ববিদ্যালয়ই বহন করে। পূর্বে তো ফ্রি-ই ছিল। গত কয়েক বছর আগে নিয়ম করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার খরচটা ধার হিসেবে দেবে। পড়া-লেখা শেষে আয় করে ফেরত দিতে হবে। এ সুযোগটুকুও তো এ দেশে নেই। আমি তৃপ্তির সাথে লক্ষ করলাম, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক একাধিক ইসলামী সংগঠন রয়েছে। ট্রেনিং ক্যাম্পে গ্রীষ্মের ছুটিতে সন্তোষজনক প্রশিক্ষণও তারা পাচ্ছে।

গত আগস্টে একটি ক্যাম্পে যোগদান করে নাবীহা আমার নিকট এর বিবরণ দিতে গিয়ে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে তাতে খুশি হলাম। সে ভিকারুন্নিসা ন্যুন কলেজের ছাত্রী। সে আমার চতুর্থ ছেলে ব্রিগেডিয়ার আমানের বড় মেয়ে। দেশে এসে সর্বত্রই সে ঐ ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছে।

ইংরেজি ভাষায় প্রচুর কুরআনের তাফসীর, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য রয়েছে। ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে ওঠার চমৎকার সুযোগ সেখানে রয়েছে। নাতনীদের হিজাব পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মেডিক্যাল কলেজে আত্মপ্রত্যয়ের সাথে পড়াশোনা করতে দেখে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানাই।

বড় নাতি নাবীলও কায়রো থেকে আরবী শিখে এল। এরা তিন ভাই আরবীতে অনর্গল কথাবার্তা বলতে পারে জেনে ঈর্ষা হয়। আমি তো এ রকম পারি না। স্পোকেন আরবী এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী শিক্ষকদের অনেকেই পারেন না। এটা শেখা আলাদা একটা শিল্প। এর জন্য পৃথক পরিবেশও জরুরি।

আমার নাতি-নাতনীরা আল্লাহর রহমতে বিদেশে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রে গড়ে উঠছে দেখে আমি আনন্দিত। তদুপরি আরবী ভাষা আয়ত্ত করায় আরো তৃপ্তিবোধ করি; কিন্তু আরেকদিকে অতৃপ্তি কিছুটা হলেও পীড়া দেয়। ওরা বাংলায় আমার লেখা ইসলামী বই পড়তে পারে না। আমি ইসলামকে যেভাবে বুঝেছি আমার নাতি-নাতনীদের সেভাবে বোঝাতে পারলে অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করতাম। ২০০৩ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে নাবীল, আলীয়া ও লুবাবা ঢাকায় এসেছিল। ওদের সাথে ১০/১২টা বৈঠকে ইসলাম সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় ধারাবাহিক আলোচনা করেছিলাম। সিনপসিস আকারে নোটও দিয়েছিলাম। ঐ নোটের ভিত্তিতে যে আলোচনা করেছিলাম তা নাবীল লিখে নিয়েছিল। এবার আমি সেখানে গেলে সে ঐ আলোচনার বিষয়গুলো লিখিত আকারে তৈরি করেছে বলে জানাল। আমি নমুনা দেখতে চাইলে এক পৃষ্ঠা দেখাল। খুশি হলাম যে, সে ঠিকমতোই নোট করতে পেরেছে। আমি বলেছিলাম, ওর সহকর্মীদের যেন এগুলো শেখায়। সে সংগঠনের ছেলেদের মধ্যে তা কাজে লাগিয়েছে জেনে খুব ভালো লাগল। সে এটাকে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করবে বলেও জানাল।

নাবীল দুই বছর নিচের ক্লাসে ঢাকাস্থ মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে লেখাপড়া করায় বাংলা পড়ে মোটামুটি বুঝতে পারে। তাই সে আমার কোনো কোনো বই ইংরেজিতে অনুবাদ করার হিম্মত রাখে বলে জানাল। আমার লেখা বই পড়ার জন্য নাতি-নাতনীদের মধ্যে বাংলা ভাষা শেখার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। বেশ কয়েকজন পড়তে পারে, কিন্তু সব কথা বুঝতে পারে না। ওরা চেষ্টা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দিয়েছে।

ড. মুস্তাফিজের মেয়ের বাসায় বেড়াতে গেলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. মুস্তাফিজুর রহমান দীনী ভাই হিসেবে বহু বছর থেকেই আমার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমার বড় ছেলে মামূনের দ্বিতীয় স্ত্রীর ছোট

ভাই ড. মুস্তাফিজের বড় জামাতা হওয়ায় তাঁর সাথে সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ হয়ে গেল। এখন তিনি আমার বেহাই। এতে আমরা দুজনই খুশি।

তাঁর জামাতা বোরহানুদ্দীন সেলিম সপরিবারে লন্ডন থাকে। তাঁর মেয়ের ডাক নাম মুন্নী হওয়ায় আমি আরো ঘনিষ্ঠতা বোধ করলাম। মামূনের বিয়ের সময় বোরহান ঢাকায় আসতে পারেনি; তবে মুন্নী দুই সন্তান নিয়ে এসেছিল। নাতি নাবীলের বিয়ের কথাবার্তার সময় লন্ডনে বোরহান উপস্থিত ছিল বলে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানেই বোরহান তার বাসায় বেড়াতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। আমি লন্ডনে আবার যখন যাব তখন তার বাসায় যাওয়ার ওয়াদা দিলাম এবং তারিখও ঠিক করলাম।

নির্দিষ্ট দিনে সকাল ১১টায় লন্ডন মুসলিম সেন্টারের মেহমানখানা থেকে বোরহান এসে আমাকে নিয়ে গেল। ট্যাক্সিতে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ। আগে থেকেই কথা ছিল, দুপুরে সেখানে খেয়ে মেহমানখানায় ফিরে আসব। সেখানে পৌঁছে মুন্নীকে বললাম, 'মা, তোমার বাসায় না এলে তোমার আব্বাকে কী জবাব দেব– তাই আসতে হলো।' কন্যা পিতার সাথে যেমন আচরণ করে, মুন্নী আমার সাথে তেমন আচরণই করল। সে মাছ, মুরগি, লেম্ব (ভেড়া), সবজি মিলে বেশ কয়েক রকম খাবার তৈরি করল। খাবার মজাদার হওয়ায় তৃপ্তির সাথেই খেলাম। আমি পরিমাণে এত কম খাই যে, মুন্নী মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারল না। 'এটা আরেকটু নিন, ওটা তো নিলেনই না' ইত্যাদি ওরা দুজনই বলাবলি করতে থাকল। মুন্নী বলল, আমার আব্বাও আপনার মতোই কম খান।

ওদের দুই সন্তান। বড়টা মেয়ে। মেয়ে বারীরাহ'র বয়স সাত বছর ও ছেলে বাস্‌সামের বয়স পাঁচ বছর। ছোটদের প্রিয় কিছু খাবার জিনিস নিয়ে গেলাম, যাতে নানার স্বীকৃতি পাই। নাতি ওর স্কুলের বই-খাতা নিয়েই ব্যস্ত, আমার সাথে কথা বলার তার অবসর নেই। বারীরাহকে কাছে ডেকে বললাম, আমি তোমার নানার বন্ধু– বল দেখি, আমি তোমার কে? একটু চিন্তা করে সে বলল 'নানা'। স্বীকৃতি পেয়ে খুশি হয়ে গেলাম। বোরহান ও মুন্নী তো সারাক্ষণই খালু ডাকতে থাকল। মুন্নীর ভাই নিশাত বিলম্বে আসায় বেশি আলাপের সময় পাওয়া গেল না। তবে আমার সাথে অল্প সময় কথা বলার মাধ্যমেই বোঝা গেল, সে আমাকে ভালোবাসে এবং ইসলামী আন্দোলনে আগ্রহী। তার প্রতিও গভীর স্নেহবোধ করলাম। সে বেশ গুছিয়ে সুন্দরভাবে কথা বলে।

STV চ্যানেলে সালমানের প্রোগ্রাম

লন্ডনে বাংলাদেশিদের একমাত্র বাংলা টেলিভিশন চ্যানেল 'S'-এর কথা আগেই লিখেছি। এখন অন্য প্রসঙ্গে আবার লিখছি। বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম শ্রীলঙ্কায় টেস্ট ম্যাচ খেলতে গেল। এ খেলা সম্পর্কে STV-তে পর্যালোচনা বৈঠক পরিচালনার জন্য আমার ছোট ছেলে সালমানকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। সপ্তাহব্যাপী খেলা চলল। ঐ টিভি চ্যানেলেই সরাসরি খেলা সম্প্রচার করল।

সালমানের মা শখ করেই ক্রিকেট খেলা দেখেন। আমি খেলা দেখে সময় নষ্ট করা মোটেই পছন্দ করি না। তবে খেলার ফলাফল জানতে আগ্রহী। বিশেষ করে নিজের

দেশের টিম জিতুক– এ কামনা তো স্বাভাবিকই। খেলার বিরতি হলেই পর্যালোচনা বৈঠক বসে। সে বৈঠকটা দেখার শখ আমারও হলো। আমি লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকার পরও মাঝে মাঝে টিভি খুলে বৈঠকের অপেক্ষায় থাকি। মোট ছয়-সাতটি বৈঠকের মধ্যে তিনটি বৈঠক আমিও দেখলাম।

পরিচালক হিসেবে সালমান মাঝে বসা। তার দুই পাশে দুজন ক্রীড়া-বিশ্লেষক। তারা সাবেক খ্যাতিমান ক্রিকেট খেলোয়াড় অথবা অভিজ্ঞ বিশ্লেষক। পরিচালক যাকে বলার আহ্বান জানায় তিনি খেলা সম্পর্কে মন্তব্য করতে থাকেন। হঠাৎ পরিচালক অস্ট্রেলিয়ায় এ খেলার দর্শক বাংলাদেশ টিমের সাবেক অধিনায়ক বুলবুলের সাথে কথা বলে তার মন্তব্য তারই কণ্ঠে শোনার ব্যবস্থা করল; কোনো সময় ঢাকায় খেলার দর্শক বাংলাদেশ টিমের কোনো খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদের বক্তব্য তারই কণ্ঠে শুনতে দিল। ইংল্যান্ডে অবস্থানরত বাংলাদেশি দর্শকরাও ফোনে প্রশ্ন করে এবং তাদের মন্তব্য প্রকাশ করে। পরিচালক হিসেবে সালমান মঞ্চের বিশ্লেষক, বিদেশের বিশ্লেষক ও ঐ দেশের প্রশ্নকর্তাদের চমৎকারভাবে ড্রিল করতে দেখে খুশিই হলাম।

শেষের দুই বৈঠকে সালমান ওর চাচাতো ভাই সোহায়লকে বিশ্লেষক হিসেবে শরীক করল। সোহায়ল আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্‌যামের বড় ছেলে। MCC নামক প্রখ্যাত ব্রিটিশ ক্রিকেট সমিতির সদস্য হিসেবে তার পরিচয় দেওয়া হলো। সোহায়ল পর্যালোচনা বৈঠককে আরো প্রাণবন্ত করে তুলল।

ইতঃপূর্বে সালমানের লেখা ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছি। তাতে সে দাবি করেছে, ক্রিকেট খেলা মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার যোগ্যতা রাখে। সে একসময় ঢাকায় দৈনিক বাংলাদেশ অবজারভারের স্পোর্টস রিপোর্টার ছিল। বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশ কয়েকজন নাকি ওর বন্ধু। পর্যালোচনা বৈঠকের মাধ্যমে সে কথার প্রমাণ পাওয়া গেল।

পরে আরো জানতে পেরেছি, ঐ পর্যালোচনা বৈঠক অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। অনেক ক্রীড়ামোদী মন্তব্য করেছে, শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশ টিম অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক খেলার কারণে মনে যে দুঃখবোধ হয়েছে তা পর্যালোচনা বৈঠকের প্রাণবন্ত আলোচনায় অনেকখানি লাঘব হয়েছে। আমার নিকটও খেলার চেয়ে ঐ পর্যালোচনা বৈঠক অধিক উপাদেয় মনে হয়েছে।

চৌধুরী মুঈনুদ্দীনের ছেলের ওয়ালীমা

আমি ইংল্যান্ড গেলে ঘনিষ্ঠজন হিসেবে যে কয়েকজনের সাথে প্রথমেই ফোনে যোগাযোগ করি এর মধ্যে চৌধুরী মুঈনুদ্দীন অন্যতম। আমি তাঁকে পাকিস্তান আমলে ছাত্রসংগঠনে সক্রিয় হিসেবে চিনতাম। সাংবাদিকতা পেশায় যোগদানের পরও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই ছিল। বাংলাদেশ আমলে ১৯৭৩ সালেই তিনি লন্ডনে পৌঁছেন। সেখানে একই সাথে ইসলামের জন্য কাজ করেছি। একবার তাঁর বাসায় বেশ কিছুদিন ছিলাম। তখন তাঁর বড় ছেলে সাকিবের বয়স এক বছর। এ বয়সের বাচ্চারা তো বড়দের জন্য

খেলনাই। তাই আমি ওকে নিয়ে খেলতাম। এ বয়সের বাচ্চাদেরকে আমি হাতের তালুতে খাড়া করিয়ে রাখি। এতে বাচ্চারা বেশ আনন্দ পায়।

এবার ম্যানচেস্টারে পৌছার পরপরই চৌধুরী মুঈনুদ্দীনের সাথে ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি খুব খুশি হয়ে জানতে চাইলেন যে, কতদিন সে দেশে থাকব। 'তিন মাস' বলার সাথে সাথে জোরে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে তিনি জানালেন যে, আগস্টের শেষদিকে তাঁর বড় ছেলে সাকিবের বিয়ে। তাতে আমাকে যেতেই হবে। তাঁর সাথে আমার যে সম্পর্ক তাতে সম্মত হতেই হলো।

বিয়ের সপ্তাহ দুয়েক পূর্বে ম্যানচেস্টারে ডাক মারফত অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ কার্ড পৌছল। তাতে বিয়ে ও ওয়ালীমার জন্য পৃথক কার্ড পেলাম। ফোনে জানালাম, আমি বিয়েতে যাব না। বিয়ের অনুষ্ঠান তো পাত্রীপক্ষ করে থাকে; তাই আমি পাত্রপক্ষের লোক হিসেবে ওয়ালীমাতে উপস্থিত থাকতে চাই। তিনি বললেন যে, দুটোতেই তিনি আমাকে চান। শেষ পর্যন্ত তিনি মেনে নিলেন; আর পীড়াপীড়ি করলেন না।

ওয়ালীমার অনুষ্ঠান বিখ্যাত রিজেন্টপার্ক মসজিদের কমিউনিটি সেন্টারে হওয়ার কথা থাকায় যুহরের নামায সেখানে গিয়েই পড়লাম। আমাকে লন্ডন মুসলিম সেন্টারের মেহমানখানা থেকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সেন্টারের ডাইরেক্টর জনাব দিলাওয়ার হোসাইনের উপর ছিল। ওয়ালীমা থেকে তিনিই আমাকে বিকেল ৫টায় বিমানবন্দরে পৌছানোর দায়িত্ব নিলেন, যাতে সেদিন সন্ধ্যায়ই ম্যানচেস্টার পৌছে যেতে পারি।

১৯৭৩ থেকে '৭৮ সাল পর্যন্ত আমার বাধ্যতামূলক নির্বাসন জীবনে লন্ডনে বাংলাদেশি ও বিদেশি যত লোকের সাথে ইসলামী আন্দোলনের কারণে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাঁদের অনেকের সাথেই ওয়ালীমার অনুষ্ঠানে দেখা হয়ে গেল। দীনী ভাইদের সাথে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র মহব্বতের কারণে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ হলে এমন অনাবিল আনন্দবোধ হয়, যার কোনো তুলনা হয় না। এ সুযোগ পেয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম। সবার সাথে কোলাকুলি ও কুশল বিনিময় হতে থাকল। চৌধুরী মুঈনুদ্দীন তাঁর ছেলে সাকিবকে এনে দেখা করালেন। বড় হওয়ার পর ওর সাথে আর দেখা না হওয়ায় প্রথমে চিনতে পারিনি। সে বাপের চেয়েও লম্বা, দেখতে অত্যন্ত সুপুরুষ, মাশাআল্লাহ!

আমাকে চৌধুরী সাহেব আগেই বলে রেখেছিলেন, ওয়ালীমাতে আমাকে নবদম্পতির জন্য দোআ করতে হবে। বরের একপাশে বরের পিতা ও শ্বশুরকে বসানো হলো। আরেক পাশে আমাকে ও পাকিস্তানের প্রফেসর খুরশিদ আহমদকে বসানো হলো। চৌধুরী সাহেব আমাকে তাঁর বেহাই সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি ভারতীয় জেনে তাঁর সাথে উর্দুতেই কথা বললাম।

অনুষ্ঠান বিলম্বে শুরু হওয়ায় আমি বিব্রতবোধ করলাম। কারণ, বিমানবন্দরে পৌছতেই আমার ১ ঘণ্টা লেগে যাবে। আমাকে কিছু বলার জন্য মাইক সামনে ধরলে আমি ১ মিনিট কিছু বলে আরেক মিনিটে দোআ শেষ করলাম। আমার তাড়াহুড়া করার কারণ সবাইকে জানালাম।

আমাকে সবার আগে খাবার দেওয়া হলো। আমি একাই খাওয়া শুরু করলাম। ওদিকে প্রফেসর খুরশিদ বক্তব্য রাখলেন। তিনি আমার বক্তব্য থেকে 'বিবাহ মানবজাতির প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান' কথাটিকে উল্লেখ করে বললেন, আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে যত নির্দেশ দিয়েছেন এর মধ্যে বিবাহের নির্দেশই সর্বপ্রথম দিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশেই আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর মাঝে প্রথম বিয়ে হয়।

আমি যখন খাচ্ছি তখন চৌধুরী সাহেব তাঁর বেহাইকে বললেন, আপনার জামাতার বয়স যখন এক বছর তখন প্রফেসর সাহেব সাকিবকে হাতের তালুতে খাড়া করাতেন, এতে সে খুব মজা পেত। শুনে সাকিব ও তার শ্বশুর হাসতে থাকলেন।

আমি ১ মিনিটে কুরআন-হাদীসের যে কটি দোআ পেশ করলাম, সাকিবের শ্বশুর খুবই পছন্দ করলেন বলে আমাকে জানালেন। তিনিও নাকি এ কয়েকটি দোআ বেশি বেশি করে থাকেন। তিনি বহু বছর থেকে সে দেশে আছেন এবং তাঁর কন্যা সে দেশেই জন্মেছে। তিনি দীনী জযবা রাখেন দেখে আনন্দিত হলাম।

আমাদের বিদায়বেদনা

প্রায় তিন মাস পাঁচ ছেলে, পাঁচ বৌমা, ১৭ জন নাতি-নাতনীর সাথে আনন্দে কাটানোর পর আমি ও আমার স্ত্রী তাদের ছেড়ে চলে আসার কয়েক দিন আগে থেকেই উভয়দিক থেকে বিদায়ের বেদনাবোধ হতে লাগল।

ওদের দাবি খুবই ন্যায্য। 'আমরা সবাই এখানে। আপনি এখানেই থেকে যান। লেখার কাজ তো এখানেই করতে পারছেন।' জবাবে বললাম, আমি সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেও ইসলামী আন্দোলন থেকে তো রিটায়ার করিনি; আর ইসলামী আন্দোলন থেকে তো রিটায়ার্ড হওয়া যায় না। লেখার জন্য আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরির বই থেকে সাহায্য নেওয়ার দরকার হয়। বিশেষ করে 'জীবনে যা দেখলাম' লেখার জন্য বই ছাড়াও অনেকের কাছ থেকেই ফোনে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। তা ছাড়া আমি চারটি স্টাডি সার্কেল পরিচালনা করি; আরো একটি টিম বাড়বে। প্রতি মাসে পাঁচটি টিমের সাথে পাঁচ বার বৈঠক করতে হয়।

আল্লাহর রহমতে ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তি এখন বিশাল। পুরুষ-মহিলা ও ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্বশীলদের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে এসব স্টাডি সার্কেলকে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। তা ছাড়া ডজনখানেক চটি বই 'কস্ট প্রাইসে' আমি ব্যাপকসংখ্যায় বিলি ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করি।

আজীবন পাঁচ ওয়াক্ত আযান শুনে অভ্যস্ত। এখানে এক ওয়াক্তও শুনতে পাই না। ছোট সময় থেকে মসজিদে জামায়াতে নামায আদায় করে এসেছি। এখানে সে সুযোগ নেই। এ দেশের পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠি। এখানে বেড়াতে আসি; স্থায়ীভাবে থাকার জন্য নয়। স্বাস্থ্য অনুমতি দিলে প্রতি বছরই জুলাই ও আগস্ট দুই মাসের জন্য বেড়াতে আসার ইচ্ছে আছে। তোমাদের তো ঢাকায় একসাথে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা দুজনই তোমাদের দেখতে আসতে বাধ্য হচ্ছি।

তাদের দাবি ন্যায্য বলে স্বীকার করে নিলাম। আমার এতগুলো যুক্তি তারাও খণ্ডন করতে পারল না। তাই তাদের সম্মতি নিয়েই চলে এলাম। কিন্তু স্নেহ, মমতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আবেগের বিষয়। আবেগের নিকট যুক্তি পরাজিত হলেও বাস্তবতার কঠিন পরিস্থিতির নিকট আবেগকেও পরাজয় মেনে নিতে হয়।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দয়া-মায়া-মমতা ও স্নেহ-ভালোবাসার যে বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন তা বড়ই মধুর ও তৃপ্তিদায়ক। তাই পরস্পর কাছে থাকতে চায়; বিচ্ছিন্ন হওয়া সাময়িক হলেও বেদনাবোধ হয়। বিশেষ করে মায়ের ছোট ছেলে বড় হয়ে গেলেও 'কোলের পোলা'র মর্যাদা হারায় না। এ দুজনের পারস্পরিক আচরণ একটু ভিন্নই হয়। আমার স্ত্রী সব ছেলের নিকট থেকে বিদায় নেওয়ার সময় উভয়পক্ষকেই অশ্রুসজল হতে দেখলাম। তবে ছোট ছেলে সালমান ও তার মাকে দীর্ঘক্ষণ জড়িয়ে ধরে আকুলভাবে কাঁদতে দেখে আমিও আবেগাপ্লুত হলাম।

আমরা চেয়েছিলাম, অন্তত এ ছেলেটি আমাদের জীবিত থাকাকালে আমাদের সাথে এক বাড়িতেই থাকুক। ঢাকার মগবাজারে একই ফ্লোরে দুটো ফ্ল্যাটে থেকে এক পাকেই খাচ্ছিলাম। বৃদ্ধ বয়সে সে-ই ছিল আমাদের একমাত্র হাতের লাঠি। সে ছিল ওর মায়ের জন্য অপরিহার্য। স্থিতিশীল স্বাস্থ্যের অধিকারিণী নয় বলে তার মাকে সে-ই ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে নিয়ে যেত; আমাকে পেরেশান হতে হতো না। একমাত্র ওর মেয়ে দুটোই দাদা-দাদির স্নেহের পরশ সবসময় পেয়েছে। আমার স্ত্রীর জন্য ওদের সঙ্গটা খুবই আনন্দদায়ক ছিল। গত জুলাই মাসে ওরাও সালমানের সাথে চলে গেল।

সালমান মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি বিভাগের দায়িত্বে ছিল। সে আলীগড় থেকে বিএ, এমএ ও পিএইচডি করেছে; কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার সনদ না হলে এ দেশেও নাকি তেমন মর্যাদা পাওয়া যায় না। তাই সে ইংল্যান্ডের নামকরা এক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পোস্ট ডক্টরেল' কোর্সের সুযোগ পেয়ে তা কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইল না; কিন্তু মানারাত ইউনিভার্সিটি ওর ছুটি মঞ্জুর না করায় রিজাইন দিয়ে চলে যেতে বাধ্য হলো। এ বছর (২০০৫) এপ্রিলে দেশে ফিরে এসে কোনো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ না পেয়ে সপরিবারে ইংল্যান্ডে চলে গেল।

সালমানের বড় মেয়ে নাবার বয়স আট বছর। সে দাদা-দাদুর চলে আসায় ব্যথিত হলেও এটুকু বুঝে যে, কেন আমরা ওদের থেকে পৃথক হতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু তিন বছরের সাফা আমরা চলে আসার পর নাকি বারবার বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করছে, দাদা-দাদু কেন চলে গেল? সে সবসময় দাদা-দাদুকে কাছে পেয়েছে। এখন কেন পাচ্ছে না– এ কারণেই ওর জিজ্ঞাসা।

সেখানে ওকে মাঝেমধ্যে বলতাম, আর এত দিন পর আমরা ঢাকা চলে যাব। সে বলত, আমিও তোমাদের সাথে চলে যাব। আমি বলতাম, তোমার আব্বু-আম্মু তো যাবে না। সে বলত, আমি আবার চলে আসব। 'কেমন করে আসবা' জিজ্ঞেস করলে সে বলত, গাড়িতে করে চলে আসব।

আসার দিন ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরে সাফা একবার আমার কোলে, আরেকবার ওর দাদুর কোলে বিমর্ষ হয়ে বসে রইল এবং সারাক্ষণ ওর দাদুর চোখ থেকে অশ্রু বইতে থাকল।

এসব কথা লিখতে গিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির কথা মনে পড়ল। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থটি বিএ-তে আমার পাঠ্য ছিল। আজো ঐ গ্রন্থের কবিতাটির আবেদন অন্তরে বহাল ও তাজা রয়েছে। 'যেতে নাহি দেব'র চার বছরের কন্যার 'স্নেহ-অধিকার' আমার তিন বছরের নাতনী সাফার চেহারায় ফুটে উঠতে দেখলাম। কবি এখানেই সার্থক। দার্শনিক কবি কী চমৎকার ভাষায় মানবমনের শাশ্বত আবেগকে তুলে ধরেছেন!

কবিতাটির উপজীব্য ছোট্ট একটা ঘটনা। চার বছরের কন্যার পিতা ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার দিন কন্যার মা সারাদিন ব্যস্ত। কন্যা অসহায়ের মতো পিতার বিদায়ের মহাআয়োজন লক্ষ করছে। বিকেলে পিতা বিদায় হওয়ার সময় দরজার পাশে বসে থাকা মেয়েটিকে বলল–

'মা গো আসি' সে কহিল বিষণ্ন নয়ন
ম্লানমুখে, 'যেতে আমি দেব না তোমায়'
যেখানে আছিল বসে রহিল সেথায় ;
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার ;
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ অধিকার
প্রচারিল, 'যেতে আমি দেব না তোমায়।'
তবুও সময় হল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল।

এটুকু ঘটনার বিবরণ দেওয়ার পর দার্শনিক কবি দীর্ঘ কবিতায় বিশ্ব-চরাচরে প্রকৃতির জগতে জলে-স্থলে সর্বত্র 'যেতে নাহি দেব', 'তবু যেতে দিতে হয়' মর্মে চিরবিরহের দীর্ঘ নিঃশ্বাস বিরাজমান বলে সুনিপুণ শৈল্পিক দক্ষতার সাথে প্রমাণ করেছেন। পড়ে যারা তৃপ্ত হতে চান পড়ে দেখতে পারেন।

২৪০.

ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা সফল হচ্ছে না কেন?

২০০৫ সালের ৪ আগস্ট দৈনিক সংগ্রামে জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও বায়তুল মুকাররমের মুহতারাম খতীব মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। আমি তখন ম্যানচেস্টারে। ইন্টারনেট থেকে কম্পিউটারে দৈনিক সংগ্রাম প্রায় নিয়মিতই পড়তাম। ঐ সাক্ষাৎকারে তিনি ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা সফল না হওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে যে জবাব দিয়েছিলেন তা থেকে পাঁচটি কারণ নোট করে নিলাম। ২৯ সেপ্টেম্বর দেশে ফিরে আসার পর খতীব সাহেবের সাথে ফোনে আলাপকালে প্রসঙ্গক্রমে আমি ঐ পাঁচটি কারণ নোট থেকে পড়ে শোনালাম।

তিনি বললেন, আরো একটি কারণ উল্লেখ করা হয়নি। সে কারণটি তিনি ফোনে জানালে তাও নোট করে নিলাম। ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা সফল না হওয়ার মোট ছয়টি কারণ তিনি উক্ত সাক্ষাৎকারে বলেছেন বলে আমি নিশ্চিতভাবে জানলাম। নিম্নে আমি ঐ ক্রমানুসারেই কারণগুলো উল্লেখ করছি :

১. একদল অপর দলকে বিদ্রূপ করা।
২. নিজের দোষ না দেখে অন্যের দোষ তালাশ করা।
৩. প্রতিপক্ষকে গালি দেওয়া ও মন্দ উপাধিতে তিরস্কার করা।
৪. নিজস্ব ধারণাবশত বিনা প্রমাণে অভিযোগ করা।
৫. আত্মগর্ব ও অহঙ্কারবশত ধারণা করা যে, শুধু আমরাই ঠিক; অন্য সবাই ভ্রান্ত ও ইসলামের দুশমন।
৬. কারো সাথে পরামর্শ ছাড়াই যা ইচ্ছা করে ফেলা।

মুহতারাম খতীব সাহেব জাতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি তাঁরই হয়েছে। তাই তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ঐ প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন তা সঠিক হওয়ারই কথা।

ইসলামী দল ও নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর নীতি

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদীর সময় থেকেই সকল ইসলামী দল ও নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে জামায়াত নিষ্ঠার সাথে এ নীতি মেনে চলছে যে–

১. জামায়াত কোনো ইসলামী দল ও নেতা সম্পর্কে কখনো কোনো রকম বিরূপ মন্তব্য করে না।
২. ইসলামের নামে কর্মরত কোনো দলের বা নেতার পক্ষ থেকে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করা হলেও জামায়াতের পক্ষ থেকে পাল্টা আক্রমণ করা হয় না। অবশ্য মন্তব্যে কোনো ভুল তথ্য থাকলে অত্যন্ত শালীন ভাষায় তা প্রকাশ করা হয়।
৩. যারা জামায়াতের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রচার করেন, তাদের ব্যাপারে জামায়াত চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করে। কারণ, ঐ ফতোয়ার উদ্দেশ্য ভুল ধরিয়ে দিয়ে সংশোধন করা নয়; বরং জনগণকে বিভ্রান্ত করে জামায়াত থেকে দূরে রাখা।
৪. জামায়াত কোনো ইসলামী দল ও নেতার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় না। কেউ বিতর্ক করতে চাইলে জামায়াত তাতে সাড়াও দেয় না। কারণ, বিতর্ক (বাহাস) দ্বারা কোনো বিরোধেরই মীমাংসা হয় না; তাতে ঝগড়া বাড়ে মাত্র।
৫. কেউ যদি যুক্তিসহকারে জামায়াতের কোনো ভুল ধরিয়ে দেন তাহলে জামায়াত সেজন্য তার শুকরিয়া জানায়। অতঃপর হয় ভুলটা সংশোধন করে নেয়, নয়তো যুক্তি দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করে যে, ওটা ভুল নয়।

এ নীতিমালা মেনে চলার উদ্দেশ্য হলো :

১. জামায়াতে ইসলামী কোনো ইসলামী দলকেই প্রকৃত দুশমন মনে করে না; বরং দীনের পক্ষে সহযোগী হিসেবে সকলকেই পেতে চায়।

২. যারা জামায়াতের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বা ফতোয়ার ভাষায় কথা বলেন তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলে তারা আরো উৎসাহের সাথে আক্রমণ করতে থাকবেন। তারা শুধু ঝগড়াই করতে চান। অতএব, জামায়াত চুপ করে থাকলে তাদের ঐ একতরফা ঝগড়া বেশি দিন চলতে পারে না।

৩. ইসলামের নামে প্রকাশ্য বিতর্ক ও ঝগড়া হলে তাতে ইসলামের দুশমন মহলই খুশি হয় এবং তাতে ইসলামের মর্যাদাহানিও ঘটে।

৪. জামায়াতে ইসলামী সকল ইসলামী শক্তির মধ্যে মযবুত ঐক্য চায়। তাই কোনো ইসলামী দলের সাথেই জামায়াত সম্পর্ক নষ্ট করতে চায় না।

৫. কোনো ইসলামী দলের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা বা কারো মন্তব্যের প্রতিবাদে বিতর্কে লিপ্ত হওয়াকে জামায়াত সময় ও শ্রমের অপচয় বলে মনে করে। জামায়াত ইসলামের পক্ষে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে এবং কোনো ইসলামী দলের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ভূমিকায় লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকাই সমীচীন মনে করে।

এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর দৃঢ়তা

মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব দেওয়ার জন্য জামায়াতের সাথে সম্পর্কিত কয়েকজন আলেম পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করলে মাওলানা কঠোরভাবে তাঁদেরকে তা থেকে বিরত রাখেন। তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ দেন, আপনারা জনগণের নিকট দীনের দাওয়াত ইতিবাচকভাবে দিতে থাকুন। অপপ্রচারকদের প্রতিবাদ করে সময়ের অপচয় করবেন না। যারা আমাকে গালি দিচ্ছে তাদেরকে এভাবে নিবৃত করতে পারবেন না; বরং তারা আরো বেশি গালি দিতে থাকবে। এ জাতীয় লোকদের বিরত রাখার জন্যই চুপ থাকুন। এদের কোনো জবাব না দেওয়াই তাদের জন্য সহীহ জবাব।

১৯৬৭ সালের কথা। মাওলানা মওদূদী জামায়াত অফিসের সামনের লনে বৈকালিক আসরে বসা। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আরো অনেকে ছিলেন। আলেমানা পোশাকপরা এক যুবক মাওলানার সামনে এসে বসল। মাওলানা তার দিকে তাকালে যুবকটি বলল, দীন সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে আমি নামকরা ব্যক্তিদের কাছে যাই। গতকাল আমি মাওলানা গোলাম গাউস হাযরাভীর খিদমতে হাজির হয়েছিলাম। তিনি এক লোকের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে বললেন, 'মওদূদীর বিরুদ্ধে আমি এত কিছু বললাম, সে কোনো জবাবই দিল না।' মাওলানা মুচকি হেসে কুরআনের একটি আয়াতাংশ উচ্চারণ করলেন, 'মূতূ বিগাইযিকুম' অর্থাৎ, 'তোমাদের ক্রোধেই তোমরা মর।' মাওলানার প্রশান্ত চেহারার দিকে যুবকটি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকল। মাওলানা আর একটি কথাও এ ব্যাপারে বললেন না। আমি তখন তৃপ্তির সাথে মাওলানার দিকে চেয়ে রইলাম।

জামায়াতে ইসলামীকে কি দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব?

যে ছয়টি কারণকে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টা সফল না হওয়ার জন্য দায়ী বলে মুহতারাম খতীব সাহেব চিহ্নিত করলেন, এর কোনো একটি কারণের সাথেও জামায়াতে ইসলামীকে জড়িত বলে প্রমাণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। যিনি তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এসব কারণ আবিষ্কার করলেন তাঁকে যে কেউ জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন, তিনি জামায়াতকে এর কোনো একটি কারণের জন্যও দায়ী মনে করেন কি না।

বর্তমানে (২০০৫ সাল) পত্র-পত্রিকায় সবচেয়ে বেশি অপপ্রচার চলছে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে। ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও ইসলামবিরোধী পত্রিকাগুলো তো আদর্শিক কারণেই এ অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। নিজেদের কোনো ইসলামী দল বা সংস্থার লোক পরিচয় দিয়ে যেকোনো ভুঁইফোড় সংগঠনের পক্ষ থেকেও যদি জামায়াতবিরোধী কোনো বক্তব্য প্রদান করা হয় তাহলে এসব পত্রিকায় তা ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। যেসব দল বা নেতার বক্তব্য পত্রিকায় কোনো পাত্তা পাওয়ারই কথা নয়, তারাও জামায়াতের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য দিলে তা গুরুত্বসহকারে উক্ত পত্রিকাসমূহে প্রকাশ করা হয়। মনে হয়, পত্রিকায় উল্লেখযোগ্য স্থান পাওয়ার উদ্দেশ্যেই কতক লোক কৌশল হিসেবে জামায়াতের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়ার মহাসুযোগ গ্রহণ করছে। এসব পত্রিকার এ ভূমিকা স্বাভাবিকই। এ দেশে ইসলামী শক্তির উত্থানকে প্রতিহত করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগতি রোধ করার জন্য তাদের এ অপপ্রচারে জামায়াত বিস্মিত নয়। এ জাতীয় পত্রিকার জামায়াতবিরোধী ভূমিকা ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সক্ষম নয়। ইসলামপন্থি কোনো মহলই এর দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ইসলামের পক্ষের পত্রিকা হিসেবে পরিচিত একটি পত্রিকা জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে যে প্রচারাভিযান চালাচ্ছে তাতে ইসলামী মহলের কেউ কেউ বিভ্রান্ত হতে পারেন মনে করেই এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

সকল ইসলামী শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়া সবচেয়ে বেশি জরুরি। পত্রিকাটির বর্তমান ভূমিকা ঐক্যপ্রচেষ্টাকে দারুণভাবে বিঘ্নিত করছে। তাই যারা ঐক্যের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাদের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট থাকা অপরিহার্য। এ আলোচনার উদ্দেশ্যও এটাই।

ফাযিল ও কামিলের স্বীকৃতির পদ্ধতি নিয়েই বিতর্ক

মাদরাসার ফাযিল ও কামিল ডিগ্রিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি কীভাবে দেওয়া হবে, সেটা নিয়েই বিতর্কের সূচনা। বিষয়টা সাধারণ পাঠক-পাঠিকা যেন সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে, সেজন্য এর পটভূমি সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন।

আলিয়া নেসাবের মাদরাসার ছাত্ররা গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শুরু থেকেই তাদের ডিগ্রির স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল ডিগ্রিগুলোর সরকারি স্বীকৃতি না থাকায় সরকারি চাকরির সকল সুযোগ থেকে মাদরাসার ছাত্ররা বঞ্চিত। দশ বছরে দাখিল, আরো দু-দু বছরে আলিম, ফাযিল ও কামিল পাস করতে মোট ১৬ বছর লেগে যায়। এমএ পাস করতেও একই সময় লাগে। অথচ কামিল

পাস করে সরকারি চাকরি পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ম্যাট্রিক, আইএ, বিএ ও এমএ ডিগ্রি নিতে হয়। তাই ছাত্ররা তাদের ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলে; কিন্তু পাকিস্তান আমলের সে আন্দোলন সফল হয়নি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার করে আরবী ভাষা এবং কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হের সাথে হাই স্কুল ও কলেজের সমমানের বাংলা, ইংরেজি, গণিত ইত্যাদি বিষয় শামিল করা হয়। তাই ১৯৮৫ সালে সরকার দাখিলকে এসএসসি এবং ১৯৮৭ সালে আলিমকে এইচএসসির সমমান প্রদান করে। ফলে দাখিল পাস করে ছাত্ররা কলেজে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে এবং আলিম পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছে।

১৯৮৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ কোর্সের সিলেবাস ফাযিল ক্লাসে শামিল করা হয়। তাই ফাযিলকে বিএ ডিগ্রি হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। ১৯৮৯ সালেই এ স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল। তাহলে গত ১৬ বছরে মাদরাসাপাস ছাত্রদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতার সুযোগ পেত।

সরকারি সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজে এমএ কোর্স রয়েছে। মাদরাসায়ও কামিল ক্লাসের জন্য অনুরূপ কোর্স রয়েছে। তারা কেউ আরবী, কেউ কুরআন, কেউ হাদীস এবং কেউ ফিক্‌হ বিষয়ে কামিল ডিগ্রি হাসিল করে। তাই এ ডিগ্রিকে এমএ-এর সমমান না দেওয়ার কোনো অজুহাত থাকতে পারে না।

চারদলীয় জোট সরকার আলিয়া মাদরাসার ফাযিল ডিগ্রিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ এবং কামিল ডিগ্রিকে মাস্টার্সের সমমান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে ২০০২ সালেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঐ বছর ৫ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতি নিম্নরূপ চিঠি পাঠানো হয় :

'বিষয় : ফাযিল ও কামিল ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা স্থাপন প্রসঙ্গে।

সূত্র : মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির সুপারিশমালা।

উপরিউক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাইতেছে যে, সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, ফাযিল ও কামিল ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে দেশে একটি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং যতদিন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না হইবে ততদিনের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর-এর নেতৃত্বে ঢাকায় ইহার একটি শাখা অফিস খুলিয়া এই সংক্রান্ত একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হইবে। আপাতত গাজীপুরস্থ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এ ইহার কার্যক্রম শুরু করা যাইতে পারে।

২. এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত বিষয়ে অবিলম্বে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।'

তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করার পরামর্শ দেন। ফলে ঐ নির্দেশের বাস্তবায়ন মুলতবি হয়ে যায়। ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব আইনগত প্রশ্ন না তুললেও পারতেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ পালন করে ফেললে ২০০২ সাল থেকেই মাদরাসার ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও মাস্টার্সের মর্যাদা ভোগ করতে পারত। আইনগত জটিলতা দেখা দিলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ই এর সমাধান বের করতে বাধ্য হতো। তখন থেকেই বিষয়টা মুলতবি হয়ে পড়ে আছে।

ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার মারাত্মক পরিণতি

জোট সরকার ফাযিল ও কামিলকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের খবরে মাদরাসার ছাত্ররা বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়ার আশায় অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিল এবং ফাযিল ও কামিল ক্লাসে ছাত্ররা বেশি সংখ্যায় ভর্তি হচ্ছিল। কিন্তু সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত না হওয়ায় ফাযিল ও কামিলপাস ছাত্ররা চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়েছে। কয়েকটি বড় মাদরাসা ছাড়া বহু মাদরাসায় ফাযিল ও কামিল ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা এত কমে যাচ্ছে যে, মাদরাসার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ছাত্ররা আলিম পাস করার পরই বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছে। মাদরাসার মেধাবী ছাত্ররা একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসায় পড়তে বাধ্য হচ্ছে, যা তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় নেই সেখানকার মেধাবী ছাত্ররা মাদরাসায় পড়া বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে বহু ফাযিল ও কামিল মাদরাসা শুধু আলিম মাদরাসায় পরিণত হতে বাধ্য হবে। আধুনিক ও কুরআন-হাদীসের সমন্বিত শিক্ষা ফাযিল ক্লাস পর্যন্ত চালু থাকায় অনেক ছাত্রই আলিম পাস করার পর ফাযিল পড়তে অত্যন্ত আগ্রহী। কিন্তু এখন পর্যন্ত স্বীকৃতির ব্যবস্থা না হওয়ায় তারা হতাশ হয়ে ফাযিল পড়া থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

মাদরাসাপাস ছাত্ররা যদি পেশার ময়দানে বিশ্ববিদ্যালয়পাস ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে তাহলে তাদেরকে প্রতিযোগিতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা অত্যন্ত অমানবিক ও মেধার জঘন্য অপচয়। তারা তো চাকরির ময়দানে কোটা দাবি করছে না, প্রতিযোগিতার সুযোগ চাচ্ছে মাত্র।

২০০২ সালে গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্ত এখনো কেন বাস্তবায়িত হচ্ছে না– এটা রীতিমতো বিস্ময়কর ও রহস্যময়। আমার দুজন ঘনিষ্ঠ দীনী ভাই মন্ত্রিসভায় থাকলেও তাঁরা বিশ্বস্ততার সাথে গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন বলে সরকারের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তাবলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

মন্ত্রিসভা কমিটিতে বিষয়টি আটকা পড়ে আছে

শুধু এটুকু তথ্য সংগ্রহ করা গেল যে, ২০০২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে দেওয়া নির্দেশের পর ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের যে পরামর্শ দিয়েছেন, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য

বিষয়টি ২০০২ সালের শেষার্ধে মন্ত্রিসভায় পেশ করা হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েটিং অথরিটি না থাকায়ই ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব ঐ পরামর্শ দিয়েছেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তো এফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সুতরাং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেমন কলেজগুলোর জন্য দায়িত্ব পালন করে, তেমনি মাদরাসার জন্যও দায়িত্ব পালন করতে পারে। তাহলে আইন পাস করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই এ বিষয় বিবেচনা করে সুপারিশ করার জন্য সিনিয়র মন্ত্রী ও বিএনপির মহাসচিব জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিতে শিক্ষামন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, পানিসম্পদমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী সদস্য হিসেবে রয়েছেন। কেবিনেট সচিব ও শিক্ষাসচিব পদাধিকারবলে কমিটিতে আছেন।

কমিটি গঠনের পর তিন বছর চলে গেল, কমিটির সুপারিশমালা এত দীর্ঘ সময়েও কেন প্রণয়ন করা গেল না? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০০২ সালের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফাযিল ও কামিলের স্বীকৃতির উদ্দেশ্যে এফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি কেন কায়েম করা হচ্ছে না? তবে কি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঐ সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার অনুমোদন ছাড়াই নেওয়া হয়েছিল? এসব প্রশ্নের ব্যাপারে সরকারি কোনো বক্তব্যই আমার জানা নেই।

যখন মনে প্রশ্ন জাগে এবং যথাস্থান থেকে জবাব সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় তখন অবস্থাগত প্রমাণ (Circumstantial Evidence) থেকে এর জবাব তালাশ করা ছাড়া উপায় থাকে না। তাই আমিও অবস্থাগত প্রমাণ হিসেবে লিখতে বাধ্য হচ্ছি।

২০০২ ও ২০০৩ সালে জোটবিরোধী অপপ্রচার

২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতাসীন হয়। ২০০২ সাল থেকে আওয়ামী লীগ ও হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দুনিয়াব্যাপী অপপ্রচার চালায় যে, বাংলাদেশে মৌলবাদী, তালেবান ও সাম্প্রদায়িক সরকার সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। বিশেষ করে এ অপপ্রচার আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতে ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। প্রচারকরা আশা করেছিল, আমেরিকা ও ব্রিটেন আফগানিস্তানের মতো বাংলাদেশেও হামলা চালিয়ে জোট সরকার থেকে বাংলাদেশকে উদ্ধার করবে। বাংলাদেশে ঐসব দেশের রাষ্ট্রদূতগণ বাস্তব অবস্থা অবগত থাকায় কোনো দেশের সরকারই বিভ্রান্ত হয়নি।

তবে এ অপপ্রচারের এটুকু প্রভাব জোট সরকারের উপর পড়ে থাকতে পারে যে, সরকার কিছুটা চাপের মুখে পড়েছে। জনগণের চাপ সত্ত্বেও জোট সরকার সতর্কতার সাথে এমন সব দাবি মানা থেকে বিরত আছে, যা মানলে সরকারকে মৌলবাদী আখ্যা দেওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। কাদিয়ানীদের নিরাপত্তার স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করা যেত; কিন্তু দেশের সকল মতের আলেমসমাজ ও ইসলামী দলের দাবি সত্ত্বেও সরকার সম্ভবত ঐ কারণেই তা করা সমীচীন মনে করছে না।

মাদরাসাছাত্রদের ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি পৃথক এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কায়েমের পূর্বসিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করার কারণও হয়তো এটাই।

বিশাল মন্ত্রিসভায় জামায়াতে ইসলামীর মাত্র দুজন মন্ত্রী। মন্ত্রিসভার সকল সদস্য না হোক, অধিকাংশ সদস্যও যদি কোনো বিষয়ে একমত না হন তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় কায়েমের পক্ষে ঐ দুজন মন্ত্রী নিশ্চয়ই বলিষ্ঠ মতামত দিয়ে থাকবেন। বিশেষ করে পাকিস্তান আমলে মাদরাসাছাত্রদের ঐ দাবির পক্ষে আন্দোলনে মাওলানা নিজামী ছাত্রনেতা হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন বলে আমার ভালোভাবেই স্মরণ আছে। ফাযিল ও কামিলের স্বীকৃতির পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের মতামত পত্রিকায় বারবার দেখেছি। তিনি ছাড়া অন্য মন্ত্রীগণের মতামত আমার জানা নেই।

মাদরাসাছাত্রদের এ ন্যায্য দাবি কি এভাবে ঝুলেই থাকবে?

২০০২ সালেই মন্ত্রিসভা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল ও কামিলকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মন্ত্রিসভা কমিটিকে এ বিষয়ে সুপারিশ করার যে দায়িত্ব দিয়েছে, মন্ত্রিসভা কমিটি সে দায়িত্ব তিন বছরেও পালন না করায় সংশ্লিষ্ট সকল মহলই হতাশায় ভুগছে। একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যদি উদ্যোগী হয়ে মাদরাসাছাত্রদের এ ন্যায্য দাবি পূরণের জন্য সম্মত হন তবেই ঐ কমিটির নিকট আটকেপড়া বিষয়টির মুক্তি সম্ভব।

জামায়াতের মন্ত্রীদ্বয় এটাই চান যে, পৃথক এফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি যদি সম্ভব না-ই হয়, তাহলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হলেও অবিলম্বে স্বীকৃতির দাবি পূরণ হোক। যে দাবি ১৯৮৯ সালেই পূরণ হওয়া উচিত ছিল তা ২০০২ সালে জোট সরকার সম্মত হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে অযৌক্তিকভাবে বিলম্বিত হচ্ছে।

জমিয়তুল মুদাররেসীনের পক্ষ থেকে ২০০৪ সালে দাবি তোলা হয় যে, ফাযিল ও কামিলের স্বীকৃতিপ্রদান একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই হতে হবে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নয়। এ দাবি নিয়ে জমিয়তুল মুদাররেসীনের নেতৃবৃন্দ ২০০৫ সালের মার্চ মাসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাদের দাবি সমর্থন করে বললেন, এ দাবি পূরণ হোক তা আমি চাই। এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্বীকৃতিটাও হয়ে যাক। জমিয়তনেতৃবৃন্দ শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাহেবের সাথে ২০০৫ সালের ১ এপ্রিল সাক্ষাৎ করলে তিনি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন; কিন্তু এ দাবি পূরণের অপেক্ষায় ফাযিল ও কামিলের স্বীকৃতি বিলম্বিত হওয়া উচিত নয় বলে তিনি মন্তব্য করলেন।

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কায়েমের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব কার?

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম করতে সরকারকে বাধ্য করার সামান্য ইখতিয়ারও জামায়াতের দুজন মন্ত্রীর নেই। অথচ তাদের বিরুদ্ধে এমন জঘন্য ভঙ্গিতে প্রচারণা চলছে, যার ফলে পাঠক-পাঠিকাদের মাঝে এ ভ্রান্ত ধারণা জন্মাতে পারে যে, সরকার আন্দোলনকারীদের দাবি মানতে প্রস্তুত; আমীরে জামায়াতের বিরোধিতার দরুন সরকার দাবিটি পূরণ করতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ প্রচারণায় সরকারের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ না করে জামায়াতকেই শুধু শুধু দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামী এ দাবির বিরোধিতা করতে পারে, এমন উদ্ভট ধারণা ইসলামবিরোধী পত্রিকাও প্রকাশ করতে পারে না। অথচ ইসলামপন্থি হিসেবে জনসমাজে পরিচিত পত্রিকাই এমন আজব ধারণা দিতে চেষ্টা করছে। বিএনপিকে এ পত্রিকার উপসম্পাদকীয়তে জোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে জামায়াতে ইসলামীকে জোট থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর দ্বারা এমন অদ্ভুত ধারণাও হতে পারে যে, জামায়াতকে বের করে দিলে জনগণের নিকট বিএনপির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কায়েমের দাবি পূরণ না হওয়ার জন্য মাওলানা নিজামীকে দায়ী করা অত্যন্ত বিস্ময়কর ও রহস্যজনক।

২৪১.

জামায়াতের সাথে দৈনিক ইনকিলাবের বৈরী সম্পর্ক অস্বাভাবিক

জামায়াতে ইসলামী এ দেশে ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুল মান্নান জমিয়তুল মুদাররেসীনের সভাপতি হিসেবে মাদরাসাশিক্ষকগণের নিকট ইসলামের মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটি প্রকাশ করার জন্য আর্থিক সহযোগিতা দাবি করেন। তাঁরা বিপুলভাবে সাড়া দেন। সুতরাং ইসলামের মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটির সাথে জামায়াতে ইসলামীর বিরোধ হওয়া মোটেই স্বাভাবিক নয়।

ইসলামের মুখপত্র হিসেবেই দৈনিক ইনকিলাবের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ পত্রিকায় আমার অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ২০০১ সালে আমি জামায়াতের আমীরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর ইসলামবিরোধী পত্রিকাগুলো আমার বিরুদ্ধে জঘন্য রকম অপপ্রচার চালায়। ঐ পরিবেশে দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক সাহেবের নির্দেশে দুজন সিনিয়র সাংবাদিক আমার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকারটি কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। এটা আমার জন্য এক বিরাট খিদমত হিসেবে আমি কৃতজ্ঞতাবোধ করছি।

শেখ হাসিনার শাসনামলে দৈনিক ইনকিলাবের উপর সরকারি হামলার আশঙ্কা দেখা দিলে পত্রিকাটিকে ইসলামের মুখপত্র মনে করেই জামায়াতের তদানীন্তন সংসদীয় গ্রুপের নেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সারা দেশে তাঁর তাফসীর মাহফিলে লাখ লাখ ইসলামী জনতার মধ্যে দৈনিক ইনকিলাবের পক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন এবং সরকারকে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করে দেন, যেন ইনকিলাবের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে। চট্টগ্রামে দৈনিক ইনকিলাব পুড়িয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে তিনি হুঙ্কার দেন, ইনকিলাবের সাথে কোথাও যদি আবার এ আচরণ করা হয় এবং আর একটি সংখ্যাও যদি পুড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে এ দেশে কোনো পত্রিকা বাঁচতে পারবে না।

জামায়াতের নেতৃবৃন্দ দৈনিক ইনকিলাবের সাথে সুসম্পর্ক কায়েম ও বহাল রাখার উদ্দেশ্যে আন্তরিক চেষ্টা করে এসেছেন। আমীরে জামায়াত মন্ত্রী হিসেবেও বেশ

কয়েকবার পত্রিকাটির সম্পাদক সাহেবের অফিসে গিয়েছেন। এ বছর (২০০৫) জুন মাসেও তিনি গিয়েছিলেন।

বিরোধের আসল ইস্যু কি ইসলাম?

জামায়াতের সাথে ইনকিলাব সম্পাদকের বিরোধের আসল ইস্যু এটা নয় যে, ইনকিলাব সহীহ ইসলামের পতাকাবাহী আর জামায়াতে ইসলামী মনগড়া ইসলামের ধারক বিধায় দেশকে বিকৃত ইসলাম থেকে রক্ষা করার জন্য ইনকিলাবের এ প্রচারাভিযান। ইনকিলাবের বর্তমান ভূমিকা থেকে আলেমসমাজের এমন ধারণা হওয়ার কথা নয়। কারণ, যারা মাজার, মিলাদ ও কিয়ামকেই আসল ইসলাম মনে করে তারা জামায়াতকে গালি দিলেই ইনকিলাবে গুরুত্ব পায়। অথচ হাক্কানী আলেমসমাজ এসবকে সহীহ ইসলাম মনে করেন বলে আমার ধারণা নয়। ইনকিলাব কর্তৃপক্ষ এসবকে আসল ইসলাম মনে করে কি না, তা আমার জানা নেই।

জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর কুরআন, রাসূল (স)-এর সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশকে একটি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। এ উদ্দেশ্যে ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য জামায়াত বাংলা ভাষায় বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। আমার মতো লাখ লাখ আধুনিক শিক্ষিত লোক এসব সাহিত্য থেকে ইসলামের আসল পরিচয় লাভ করে নিজেদের জীবনকে সত্যিকার মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

এ দেশের হাজার হাজার আলেম– যাঁরা পূর্বে ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবেই জানতেন, তাঁরা এসব সাহিত্য পড়ে এ দেশে আল্লাহর দীনকে কায়েম করার জন্য ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। তাঁরা জুমুআর খুতবায়, তাফসীর মাহফিলে, সীরাত সম্মেলনে, টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলে ইসলামের এ পূর্ণাঙ্গ রূপ সকল স্তরের জনগণের মধ্যে এমনভাবে তুলে ধরছেন, যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

তাই জামায়াতের বিরুদ্ধে ইনকিলাবের এ প্রচারাভিযান আশা করি ইসলামপন্থি জনগণকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে না। তাই জামায়াতের সাথে ইনকিলাবের বিরোধের আসল কারণের মধ্যেই বিরোধিতা সীমাবদ্ধ রাখলে ইনকিলাবের জন্য সঠিক ভূমিকা হতো বলে হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আমার ধারণা।

জমিয়তুল মুদাররেসীন

দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুল মান্নান কয়েক মাস ধরে অচেতন অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন। তিনি এখনো (নভেম্বর ২০০৫) জমিয়তুল মুদাররেসীনের সভাপতি। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি এ দায়িত্ব পালন করছেন। আলিয়া মাদরাসার উন্নয়ন, মাদরাসার শিক্ষকদের উন্নত বেতনস্কেল ও মাদরাসা শিক্ষার অগ্রগতিসাধনে তাঁর বিরাট অবদান সবাই স্বীকার করতে বাধ্য। এ বিষয়ে তাঁর নীতি ছিল সরকারকে সমর্থন দিয়ে সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। তিনি নিজেই আমাকে বলেছেন, আন্দোলন করে সরকার থেকে দাবি আদায় করার চেয়ে সরকারের সমর্থক হয়ে দাবি আদায় করা সহজ। কেউ

এ বিষয়ে তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারে; কিন্তু তিনি এ নীতিকে অবলম্বন করেই মাদরাসা শিক্ষার জন্য যথেষ্ট অর্জন করেছেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে এবং জেনারেল এরশাদের আমলে তিনি সরকারের সাথে থেকেই এসব করতে পেরেছেন। একপর্যায়ে তিনি এরশাদ সরকারের ধর্মমন্ত্রী হন। যেকোনো কারণেই হোক, এরশাদ সাহেব তাঁকে মন্ত্রিত্বের পদ থেকে অপসারণ করার পর জমিয়তের সভাপতি পদ থেকেও তাঁকে অপসারণের উদ্দেশ্যে জমিয়তুল মুদাররেসীনে বিকল্প নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা হয়। তখন অধ্যক্ষ মাওলানা মুফতী আবদুস সাত্তার জমিয়তের সহসভাপতি ছিলেন। তিনি বর্তমানে জামায়াতের এমপি। ১৯৯১ সালেও তিনি এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকেই আমি বিষয়টি জানতে পারি। জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত আরো বেশ কয়েকজন জমিয়তের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন। মাওলানা আবদুল মান্নানকে সভাপতি পদ থেকে অপসারণের উদ্দেশ্যে মুফতী আবদুস সাত্তার সাহেবের সহযোগিতা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমি এ কথা জানতে পেরে মুফতী সাহেবকে দৃঢ়তার সাথে এ প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার নির্দেশ দিই। জমিয়তের নেতৃস্থানীয় পজিশনে জামায়াতে ইসলামীর যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রচেষ্টায়ই সরকারের ঐ অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। স্বৈরসরকারের খপ্পর থেকে জমিয়তকে রক্ষা করার কারণে মাওলানা আবদুল মান্নান সভাপতি পদে বহাল থাকেন। এ কথা মাওলানা আবদুল মান্নান জানেন বলেই তিনি জামায়াতবিরোধী ভূমিকা ত্যাগ করে আমার সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

মাওলানা আবদুল মান্নানের সাথে আমার মহব্বতের সম্পর্ক

মাওলানা আবদুল মান্নান আইয়ূব খান ও মোনায়েম খানের আমল থেকে এরশাদের আমলের প্রথমদিক পর্যন্ত জামায়াতের চরম বিরোধী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জমিয়তুল মুদাররেসীনের সম্মেলনে এরশাদ জামায়াতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। সেখানে এরশাদ বলেছেন, আমরা মদীনার ইসলাম চাই, মওদূদীর ইসলাম চাই না। তাঁরই চেষ্টায় গভর্নর মোনায়েম খান শর্ষিনা মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে গিয়ে জামায়াতের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছেন।

কিন্তু ঐ ঘটনার পর থেকে তিনি আমার আন্তরিকতার এতটা মূল্যায়ন করলেন, আমি অন্তর থেকে অনুভব করলাম যে, তিনি আমাকে ও জামায়াতকে সত্যিই ভালোবাসেন। আমি তাঁর সাথে প্রথমে যোগাযোগ করিনি। তিনিই আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন। কথায় ও কাজে তাঁর মহব্বতের প্রমাণ পেয়ে আমিও তাঁকে মহব্বত করতে বাধ্য হলাম। বেশ কয়েকবার তাঁর বাড়িতে ও দৈনিক ইনকিলাব অফিসে যেতে বাধ্য হয়েছি। 'বাধ্য হয়েছি' বললাম এ জন্য যে, তিনি এমন ভাষায় ও এমনভাবে যেতে বলতেন, বাধ্যই হতে হয়েছে। যতবার গিয়েছি কোনোবারই ভূরিভোজন ছাড়া রেহাই পাইনি। অবশ্য আমার বাড়িতে তাঁকে একবারই মাত্র ডাল-ভাত খাওয়ানোর জন্য আনতে পেরেছি।

কয়েক বছর আগের কথা। তাঁর বাড়িতে আলাপ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'আমার বিবি আবিষ্কার করেছেন যে, আপনি আমাদের বেহাই।' অত্যন্ত উৎসুক হয়ে হিসাবটা বুঝতে

চাইলাম। সম্পর্কের ব্যাখ্যা শোনার পর উপলব্ধি করলাম যে, দূরসম্পর্ক হলেও হিসাব একেবারেই সঠিক। আরমানিটোলার বিখ্যাত শরফুদ্দীন মনজিল ও সুবহান মনজিলের মাধ্যমে আমাদের আত্মীয়তা। এর পর থেকে একে অপরকে বেহাই সম্বোধন করে এসেছি। তাঁর অসুস্থতার সময় ফোনে বেহান সাহেবা থেকেও তাঁর খবর নিয়েছি।

তাঁর বড় ছেলে বাহাউদ্দীনের সাথে আমার পুত্রা সম্পর্ক। তাঁর ডাকেও একাধিকবার ইনকিলাব অফিসে গিয়েছি। তাঁর পিতার মতোই খানা না খাইয়ে তিনি ছাড়েননি। তিনি আমার বাড়িতে নিজের উদ্যোগেই কয়েকবার এসেছেন। ছেলে পিতার সাথে যেমন আচরণ করে তিনি তেমনিভাবে আমার সাথে কথা বলেন। এমনও বলেছেন, 'আপনার ছেলে মনে করেই আমার সাথে কথা বলুন'। এটা গত জুন (২০০৫) মাসের প্রথমদিকের কথা। গত বছর সায়েটিকায় আক্রান্ত হয়ে আমি যখন শয্যাগত অবস্থায় ছিলাম তখন তিনি এসে আমাকে দেখে গেছেন। তাঁর আন্তরিক ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।

দৈনিক ইনকিলাবের ভূমিকায় আমি বিব্রত

গত ২০ বছর ধরে দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবদুল মান্নানের সাথে আমার সম্পর্ক শুধু ঘনিষ্ঠই নয়, অত্যন্ত গভীর ও মহব্বতের। পত্রিকার সম্পাদক জনাব এএমএম বাহাউদ্দীন গত জুন (২০০৫) মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন ফোন করে আমার বাড়িতে এলেন। সেদিন সদ্য প্রকাশিত আমার একটি পুস্তিকা তাঁকে দিলাম। পুস্তিকাটির নাম 'জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি'। কয়েক দিন পর দেখলাম, ইনকিলাবের পূর্ণ এক পৃষ্ঠায় বইয়ের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণত কোনো পত্রিকা মুদ্রিত পুস্তকের লেখা ছাপাতে চায় না। তাই এটা প্রকাশিত হতে দেখে বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হলাম। এতে আমার সাথে তাঁর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ মেলে। প্রায়ই ফোনে তাঁর কাছ থেকে তাঁর আব্বার অবস্থা জেনে নিতাম। ৪ জুলাই ২০০৫ তারিখে ইংল্যান্ড যাওয়ার আগে তাঁর সাথে ফোনে কথা বলে গিয়েছিলাম।

বেশ কিছু দিন ধরেই ইনকিলাবের উপসম্পাদকীয়তে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে লেখা প্রকাশিত হচ্ছিল। বিএনপিকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছিল যে, জোট থেকে জামায়াতকে বের করে দিয়ে অন্য সকল ইসলামী দলকে জোটে শরীক করা প্রয়োজন। জুন (২০০৫) মাসেই জামায়াতে ইসলামী ছাড়া সকল ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দকে এক সম্মেলনে সমবেত করা হয়। দৈনিক ইনকিলাব এতে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে। এ সত্ত্বেও ইনকিলাব সম্পাদকের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক যথাযথই বহাল থাকে।

জুলাই (২০০৫) মাসের প্রথমদিকে পল্টন ময়দানে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপির নেতৃত্বে মাদরাসা-শিক্ষকগণের বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে মাওলানা সাঈদীকে আহ্বায়ক ও তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা যাইনুল আবেদীনকে সদস্যসচিবের দায়িত্ব দিয়ে 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক পরিষদ' গঠন করা হয়।

জমিয়তুল মুদাররেসীনের সভাপতি মাওলানা আবদুল মান্নান অসুস্থ থাকায় ইনকিলাব সম্পাদকই জমিয়তের সিনিয়র সহসভাপতি হিসেবে বাস্তবে প্রধান নেতার দায়িত্ব পালন

করছেন। সে কারণে 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক পরিষদ' গঠন করায় তাঁর ক্ষুব্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় দৈনিক ইনকিলাব জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে চরম দুশমনি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী ও এর নেতৃবৃন্দ এবং আমার সাথে দৈনিক ইনকিলাবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার পরও পত্রিকাটির বর্তমান ভূমিকায় আমি এতটা বিব্রতবোধ করছি যে, তিন মাস বিদেশে থাকার পর সেপ্টেম্বরের (২০০৫) শেষদিকে দেশে ফিরে এসে সম্পাদক সাহেবকে ফোন করে কুশল বিনিময় করতে পারিনি। এতে আমি অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করছি। মাওলানা আবদুল মান্নান সুস্থ থাকলে পরিস্থিতি এ পর্যায়ে হয়তো পৌঁছত না।

ইনকিলাব সম্পাদক যে কারণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন এর মধ্যেই জামায়াতের বিরোধিতা সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে শোভনীয় হতো। ইনকিলাবের পাঠকদের নিকট জামায়াতকে যে জঘন্যভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে, তা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে আমিসহ জামায়াতের কোনো নেতার সাথেই কখনো কোনো সম্পর্ক রাখা ইনকিলাব সম্পাদকের জন্য উচিত ছিল না। তাই বোঝা গেল, বিরোধের আসল কারণ যা, তা নিয়ে বিতর্ক করা যথেষ্ট মনে হয়নি। এ কারণেই বিরোধের আসল ব্যাপারটা আলোচনা করতে চাই।

ফাযিল-কামিলের স্বীকৃতির পদ্ধতিই বিরোধের মূল

দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক জমিয়তুল মুদাররেসীনের প্রধান নেতা হিসেবে ফাযিল ও কামিলের স্বীকৃতি অবশ্যই চান; তবে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম করে এর মাধ্যমে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন চলছে। এটা বাস্তবে সম্ভব হচ্ছে না বলে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে হলেও অবিলম্বে স্বীকৃতির দাবিটি যেন পূরণ হয়ে যায় সে চেষ্টাই করছেন।

ইনকিলাব সম্পাদক ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি পূরণ না হওয়ার জন্য নিজামী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামীকে দায়ী মনে করেই জামায়াতবিরোধী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ এর জন্য তাঁকে দায়ী করা সম্পূর্ণ ভুল, অযৌক্তিক ও অন্যায়।

জমিয়তুল মুদাররেসীনের বৈঠক ও সমাবেশে অব্যাহতভাবে জামায়াতের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করার কারণে মাদরাসা-শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা জামায়াতে ইসলামীকে ভালোবাসেন তাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। তাঁদের অনেকেই আমীরে জামায়াতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমীরে জামায়াত সারা দেশ থেকে মাদরাসা-শিক্ষকগণের প্রতিনিধিদের সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে জমিয়তুল মুদাররেসীনের নামে জামায়াতবিরোধী তৎপরতা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক পরিষদ' নামে পৃথক সংগঠন কায়েম করে ফাযিল-কামিলের স্বীকৃতির দাবি আদায়ের জন্য পৃথকভাবে আন্দোলন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই ২০০৫ সালের ২ জুলাই পল্টন ময়দানে মাদরাসা-শিক্ষকদের বিরাট সম্মেলনে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে আহ্বায়ক করে 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক পরিষদ' গঠন করা হয়।

এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দৈনিক ইনকিলাব জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। যারাই জামায়াতকে গালি দিচ্ছে তাদের বক্তব্য গুরুত্বসহকারে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী, মাওলানা নিজামী ও মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে চরম অশালীন ও আক্রমণাত্মক ভাষা পত্রিকাটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ও হচ্ছে; কিন্তু তাঁরা জামায়াতের ঐতিহ্য অনুযায়ী সবর করে যাচ্ছেন। জমিয়তুল মুদাররেসীন ও দৈনিক ইনকিলাবের বিরুদ্ধে তাঁরা সামান্য বিরূপ মন্তব্যও করছেন না। মাদরাসা শিক্ষক পরিষদও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

মাদরাসা শিক্ষক পরিষদ দৈনিক ইনকিলাবের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হলে ইসলামী ঐক্যের পরিবেশ আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেই পরিষদ নীরব থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এ অবস্থায় দৈনিক ইনকিলাব এ প্রচারাভিযান বন্ধ করলে ইসলামের জন্য কল্যাণকর হবে বলে আমার ধারণা। তাহলে ইনকিলাব সম্পাদকের সাথে আমার সম্পর্ক বহাল করার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে এবং আমি বর্তমান বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পেতে পারি।

কাওমী মাদরাসার স্বীকৃতি

ইংরেজ শাসনামলে কুরআন ও হাদীসের ইলমকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদী জযবা সৃষ্টির লক্ষ্যে উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে দেওবন্দে 'দারুল উলুম' নামে যে মাদরাসা কায়েম হয়, এরই অনুকরণে গোটা উপমহাদেশে অগণিত মাদরাসা গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে এসব মাদরাসাই কাওমী মাদরাসা হিসেবে পরিচিত।

দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (র) ইংরেজ সরকারের এমন বিরোধী ছিলেন, সরকারের সাথে দূরতম সম্পর্ক রাখাও তিনি পছন্দ করেননি। ইংরেজ সরকার মাদরাসাকে সাহায্য করার জন্য বারবার আগ্রহ প্রকাশ করলেও মাদরাসা থেকে কোনো সাড়া দেওয়া হয়নি। ধুরন্ধর সরকার সাহায্য দিয়ে মাদরাসাকে অনুগত রাখা প্রয়োজন মনে করেছিল। মাদরাসা দেখার জন্য স্বয়ং গভর্নর জেনারেল চিঠি দিয়েও অনুমতি না পেয়ে বিনা খবরেই হাজির হয়ে গেলেন। তখন মাওলানা নানুতুবী (র) ক্লাসে ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন। গভর্নর জেনারেলের আগমনসংবাদ শুনে তিনি কোনো রকম বিব্রতবোধ না করে তাকে সাক্ষাৎ দিতেই অস্বীকৃতি জানান।

এ ঐতিহ্য অনুযায়ী দেওবন্দ মাদরাসা এবং এ জাতীয় সকল মাদরাসাই কোনো সময় সরকারি অনুদান চায়নি। মুসলিম জনগণের আর্থিক সহযোগিতায়ই কাওমী মাদরাসাগুলো গড়ে উঠেছে। মাদরাসাগুলোর কর্তৃপক্ষ কোনো সময় সরকারি স্বীকৃতি দাবি করেননি। ২০০৫ সালেই প্রথমে এ দাবি উঠেছে। তাঁরা সরকারি স্বীকৃতি চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। সে স্বীকৃতি কী ধরনের হতে পারে, এ বিষয়ে তাঁরাই সঠিক বলতে পারেন। তবে তাঁদের কেস তো সম্পূর্ণ আলাদা। আলিয়া মাদরাসার ফাযিল-কামিলের স্বীকৃতির সাথে কাওমী মাদরাসার স্বীকৃতির কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়।

একই মঞ্চ থেকে দুই ধরনের মাদরাসার স্বীকৃতি দাবি

ইবতেদায়ী স্তর থেকে ক্রমান্বয়ে দাখিল ও আলিম কোর্সের সিলেবাস সরকারিভাবে সংস্কার করার পর '৮৫ সালে দাখিল ও '৮৭ সালে আলিম স্বীকৃতি পেয়েছে। ফাযিলের স্বীকৃতি '৮৯ সালে এবং কামিলের স্বীকৃতি '৯১ সালেই হওয়া স্বাভাবিক ছিল। বিলম্বে হলেও ২০০২ সালে সরকার স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যে কারণেই হোক, ঐ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে। জমিয়তুল মুদাররেসীন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম করে এর মাধ্যমে ঐ স্বীকৃতি দাবি করছে। ২০০৪ সাল থেকে এ দাবিতে আন্দোলন হচ্ছে।

২০০৫ সালে জমিয়তুল মুদাররেসীনের মঞ্চ থেকেই কাওমী মাদরাসার স্বীকৃতিও দাবি করা হচ্ছে। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় কায়েমের দাবির সাথে কাওমী মাদসারার স্বীকৃতির দাবি একীভূত হওয়ায় সরকার এ দাবিকে কীভাবে দেখছে, সে বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই।

এতে আমার আশঙ্কা হয় যে, সরকারি দলের যারা ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধী, তারা এ যৌথ দাবিকে অজুহাত বানিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাযিল-কামিলের স্বীকৃতি দিতেও কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেন কি না, আলিয়া মাদরাসার দাবি মেনে নিলে কাওমী মাদরাসার দাবি মানার আন্দোলন আরো জোরদার হওয়ার আশঙ্কাবোধ করেন কি না এবং এ কারণে আলিয়া মাদরাসার দাবিও বাধাগ্রস্ত হয় কি না, কে জানে?

এ দেশে বহু কাওমী মাদরাসা আছে। এসব মাদরাসা থেকে হাজার হাজার আলেম তৈরি হচ্ছেন। ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষাব্যবস্থা সরকারিভাবে স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। এতদিন তাঁরা প্রয়োজন মনে না করলেও এখন তাঁরা দাবি করছেন। এ দাবি অবশ্যই ন্যায্য। তবে আলিয়া মাদরাসার ব্যাপারটা কাওমী মাদরাসা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

২৪২.

যুগপৎ আন্দোলনের নবায়ন-প্রচেষ্টা

ইতঃপূর্বে লিখেছি যে, ১৯৮৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত কিছুতেই স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন নতুন করে শুরু করার প্রচেষ্টা সফল হলো না। জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজোঁ কমিটি সকল জোটের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা সত্ত্বেও বামপন্থি পাঁচ দলের ষড়যন্ত্রে অন্য দুই জোট বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পাঁচদলীয় জোট স্বৈরশাসককে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালায়।

জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজোঁ কমিটি যুগপৎ আন্দোলন নতুন করে শুরু করার উদ্দেশ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। ১৯৮৮ সালের ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধের ঐতিহাসিক দিনটি পালনের মাধ্যমে যুগপৎ আন্দোলন আবার শুরু হয়। ১০ নভেম্বর ঢাকায় সমাবেশের কর্মসূচি দেওয়া হয়। ঐ সমাবেশ থেকে ১৫ নভেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর

পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে আন্দোলনকে চালু রাখা সম্ভব হয়। অবশ্য আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করতে পারেনি।

তবে ১৯৮৮ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে আন্দোলনে যেটুকু গতি সঞ্চার হয়েছিল তার কারণে ১৯৮৯ সালের ১৬ জানুয়ারি কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা কায়েমের দাবিতে সারা দেশে অর্ধদিবস হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়, কিন্তু আন্দোলন বেগবান হলো না। মুজাহিদ সাহেবের লেখায় এর কারণ নিম্নরূপ– 'বড় দুটো দলের পারস্পরিক অনাস্থা অত্যন্ত বেশি ছিল। উভয় দলের সাথে পাঁচ দলের খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তারা ১৯৮৬ সালে জামায়াতের নির্বাচনে অংশগ্রহণের নজির থেকে বিএনপিকে বোঝাতে লাগল যে, জামায়াত ফাইনাল খেলায় আওয়ামী লীগের সাথেই থাকবে। আর আওয়ামী লীগকে বোঝাচ্ছিল, আদর্শিক কারণে জামায়াত বিএনপির সাথেই থাকবে। .....ফলে তাদেরকে আন্দোলনের দিকে নিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ছিল। তবু আমরা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলাম। ....আমাদের সাথে কথাবার্তায় পাঁচ দলের নেতৃবৃন্দ আন্দোলন না হওয়ার জন্য ঐ দুটি দলকে দায়ী করেই কথা বলতেন।'

জাতীয় সংসদে আমার নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন

১৯৮০ সালে ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্নেল (অব.) মুস্তাফিজুর রহমানকে আমার নাগরিকত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। 'জীবনে যা দেখলাম'-এর পঞ্চম খণ্ডে সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৮৮ সালের ২৮ মে জাসদনেতা আ স ম আবদুর রব প্রশ্ন করলেন, '১৯৭৮ সালে বিদেশি নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম দেশে এসেছেন। তিনি এত দিন কীভাবে দেশে আছেন?'

জামায়াতে ইসলামীর ১০ জন এমপি সংসদ থেকে পদত্যাগ করার তিন দিন পর ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ তৃতীয় জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে ১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ সংসদের প্রহসনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। এরশাদের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার কায়েমের দাবিতে যুগপৎ আন্দোলনরত জামায়াতে ইসলামী, ৭, ৮ ও ৫ দলীয় জোট ঐ নির্বাচন বর্জন করে। একমাত্র জাসদনেতা আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে তথাকথিত সম্মিলিত বিরোধীদলীয় জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ১৮টি আসন লাভ করে। সরকার তাকে বিরোধীদলীয় নেতার মর্যাদা দেয়। পত্র-পত্রিকায় বিদ্রূপ করে তাকে সরকারের 'গৃহপালিত বিরোধীদলীয় নেতা' বলে অভিহিত করা হতো। ঐ প্রহসনমূলক নির্বাচনে এরশাদের জাতীয় পার্টি ৩০০ আসনের মধ্যে ২৫০টি দখল করে নেয়। বাকি ৫০টির মধ্যে ২৫টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী, ১৮টি আসনে সম্মিলিত বিরোধীদলীয় জোট ও সাতটি আসনে ক্ষুদ্র কয়েকটি দলের প্রার্থীগণ নির্বাচিত হন।

তখন এরশাদ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। তিনি সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেন যে, গোলাম আযমের বাংলাদেশে অবস্থান সম্পর্কে পেশকৃত প্রশ্নের জবাবে ৩১ মে তারিখে সংসদে তিনি বিবৃতি দেবেন।

আমার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন

১৯৮৮ সালের ৩০ মে আমার বাড়ির টিনের ঘরের বৈঠকখানায় আমি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করি ও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিই। ৮৫ জন সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ছোট ঘরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ঘরের বারান্দা ও বাইরে বসার স্থান দিতে হয়।

বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা ও রয়টারসহ সকল জাতীয় দৈনিকের রিপোর্টারগণ সম্মেলনে হাজির হন। সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত আমার বিবৃতি জাতীয় দৈনিকসমূহে ২ কলাম থেকে ৪ কলাম হেডিংসহ প্রথম পৃষ্ঠায় গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশ আমলে এটাই আমার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন। তাই এতে প্রদত্ত আমার বক্তব্যের কতক গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করতে চাই, যাতে আমার আত্মজীবনীতে রেকর্ড হয়ে থাকে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত আমার বক্তব্য

নাগরিকত্ব বহালের চেষ্টা

১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করে, পূর্ববর্তী সরকার যাদেরকে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করেছিল তারা সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের বরাবরে দরখাস্ত করতে পারেন। আমি এ সুযোগে ১৯৭৬ সালের মে মাসে লন্ডন থেকে যথারীতি দরখাস্ত পাঠাই। ১৯৭৭ সালের জানুয়ারিতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের নিকটও আবেদন জানাই। ১৯৭৮ সালে দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের নিকট আবার দরখাস্ত করি। অবশেষে আমার অসুস্থ বৃদ্ধা আম্মার আবেদনে সরকার আমাকে দেশে আসার অনুমতি দেয়।

১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে দেশে আসার পর আমার নাগরিকত্ব বহালের জন্য যথারীতি দরখাস্ত করি। নভেম্বর মাসে সরকার ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে আমাকে দেশ থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। আমি লিখিতভাবে প্রেসিডেন্টকে জানাই যে, আমার পক্ষে দেশ ত্যাগ করা সম্ভব নয়।

এরপর সরকার আমাকে আর কিছুই জানায়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে আমি জানতাম যে, ১৯৮০ সালের মে মাসেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমার নাগরিকত্ব বহাল করার পক্ষে সুপারিশ করে প্রেসিডেন্টের বরাবরে দস্তখতের জন্য পাঠিয়েছেন। ঐ মাসেই জাতীয় সংসদের জনৈক সদস্যের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, সরকার আমার নাগরিকত্ব বহালের প্রশ্নটি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে এবং তা বহাল হওয়ার অপেক্ষায় আমি দেশে থাকতে পারি।

বিষয়টি ঝুলে আছে কেন?

১৯৭৮ সালের ১১ জুলাই দেশে আসার পর প্রায় দশ বছর আমি দেশে অবস্থান করছি। আট বছর পর্যন্ত চুপ থাকার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে লিখিতভাবে

আমার কাছ থেকে জানতে চাইল, আমি এতদিন কীভাবে দেশে আছি। জবাবে আমি জানিয়ে দিলাম, জন্মগত অধিকারের দাবিতেই আমি নিজ দেশের নিজ বাড়িতে বাস করছি। এরপর আজ পর্যন্ত সরকার আর কিছুই বলছে না।

১৯৭৩ সালে যে ৮৪ জনকে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে যারাই নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার ইচ্ছায় দেশে এসেছেন তাদের সবারই নাগরিকত্ব বহাল হয়েছে। শুধু আমার বেলায় এ বিষয়টি কেন অমীমাংসিত রাখা হয়েছে, তার কোনো কারণ সরকার আজ পর্যন্ত আমাকে জানায়নি। সরকার আমার জন্মগত নাগরিকত্বের অধিকার বহাল না করে দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নিয়ে আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর সুযোগ করে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; বরং সরকারের একটি মহল অন্যায়ভাবে উসকানিমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। একটি সরকারি সাপ্তাহিকসহ কতক পত্রিকা আমার বিরুদ্ধে জনগণকে উসকে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার বাড়িতে সশস্ত্র হামলা পর্যন্ত চালানো হয়েছে।

ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারণা

আমার বিরুদ্ধে যেসব অলীক কল্পকাহিনী পত্র-পত্রিকায় লিখে আমার সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে তা খুবই ন্যক্কারজনক। আমি শৈশবকাল থেকেই এ দেশের মাটি, আলো, বাতাস ও জনগণের সঙ্গে একাকার হয়ে আছি। ছাত্রজীবন, কর্মজীবন ও রাজনৈতিক জীবনে যাদের সাথে আমার মেলামেশার সুযোগ হয়েছে তারা আমাকে ঘনিষ্ঠভাবেই জানেন। আমার আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছাত্রজীবন থেকে একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। যারা ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী অর্থাৎ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো তন্ত্রমন্ত্রে মুক্তির সন্ধান করেন, তাদের সাথে আমার মত ও পথের বিরোধ হওয়াই স্বাভাবিক। যারা আমার বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় মিথ্যার ঝড় তুলছেন তারাও জানেন যে, ভিনদেশি মতাদর্শে বিশ্বাসী গুটিকতক লোক বিভ্রান্ত হলেও এ দেশের বৃহত্তর জনতা এ কথা ভালো করেই উপলব্ধি করে যে, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের গতিরোধ করাই এ প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম হওয়ার পর বিদেশে আমার বাংলাদেশবিরোধী ভূমিকার নতুন নতুন যেসব হাস্যকর অভিযোগ তোলা হচ্ছে তার সত্যতা প্রমাণ করার দায়িত্ব তাদেরই। বাংলাদেশ কায়েম হওয়ার পর আমি এ সিদ্ধান্তই নিয়েছি যে, আমার নিজ জন্মভূমিতেই আল্লাহর দীন কায়েমের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করব। আর এ কারণে প্রথম সুযোগেই দেশে ফিরে এসেছি এবং কারো নির্দেশে দেশ ছেড়ে চলে যেতে রাজি হইনি।

যারা আমাকে মহব্বত করেন তাদের প্রতি আরয

যারা আমাকে দীনের কারণেই মহব্বত করেন তাদের খিদমতে আরয করছি, 'আপনারা দোআ করুন, মোটেই পেরেশান হবেন না। আমি তো আল্লাহর এক নগণ্য গোলাম মাত্র। আল্লাহর রাসূলগণও অত্যাচার ও হত্যার শিকার হয়েছেন। যদি আল্লাহ তাআলা

আমাকে শাহাদাত নসীব করেন, তাহলে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে! আপনাদের নিকট এ দোআই চাই যে, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত ইকামাতে দীনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার তাওফীক দান করেন।'

কুরআন মাজীদ এ কথার সাক্ষী যে, ইকামাতে দীনের আন্দোলন যখনই হয়েছে তখনই সকল কায়েমী স্বার্থ এর গতিরোধ করার অপচেষ্টা করেছে। যে দেশে আল্লাহর আইন চালু ছিল না, সে দেশের সরকার প্রত্যেক নবীর যুগেই চরম বিরোধী ভূমিকা পালন করেছে। আজো এর ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ নেই। যারা শুধু দীনের খিদমতে আছেন তাদেরকে বাতিল শক্তি বরদাশত করতে পারে; কিন্তু দীনে হক কায়েমের আন্দোলনকে বাতিল শক্তি কী করে সহ্য করবে? তাই আমার বিরুদ্ধে যাকিছু হচ্ছে তাতে আমি অন্তরে তৃপ্তিবোধ করছি যে, আমি আল্লাহর পথেই এগিয়ে চলেছি। এর জন্য মহান মনিবের দরবারেই শুকরিয়া জানাই।

আমি ঐসব অগণিত রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, আলেম ও সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে দোআ করছি– যাঁরা গত ১০ বছরে আমার জন্মগত নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন এবং আমার প্রতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

কারো প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই

আমি যে মহান ব্যক্তিদের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে চাই তাঁরা নবী ও রাসূল। তাই তাঁদের নীতি অনুযায়ী আমি কারো প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করি না। আদর্শের খাতিরে যাদের পথকে আমি ভ্রান্ত মনে করি তাদের সমালোচনা অবশ্যই করি; কিন্তু আমার সমালোচনার ভাষাই এ কথা প্রমাণ করে যে, তাদের পথকে আমি ভ্রান্ত মনে করলেও অশালীন ভাষায় তা উল্লেখ করি না। আল্লাহ তাআলা যেন এ বিষয়ে আমাকে ভুল করা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

সংক্ষেপে আমি আমার কথা পেশ করলাম। আসল ফায়সালার মালিক আল্লাহ তাআলা। দুনিয়ার বিচারে আমার প্রতি কী আচরণ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে জনগণের আদালতেই আমি নিজেকে পেশ করলাম। আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করে যে দেশে পাঠিয়েছেন, আমি মৃত্যু পর্যন্ত সে দেশেরই খিদমত করতে চাই। প্রায় সাত বছর বাধ্য হয়ে বিদেশে পড়ে থাকাকালে আল্লাহ তাআলার নিকট এ দোআই করেছি যে, তিনি যেন আমাকে দেশে এসে ইসলাম, দেশ ও জনগণের খিদমত করার সুযোগ দান করেন। আমার সে দোআ কবুল করে দয়াময় রব আমাকে দেশে আসার তাওফীক দান করেছেন। যতদিন তিনি হায়াত রেখেছেন ততদিন যেন দীন, দেশ ও জাতির কল্যাণে আমার দেহ, মন ও মগজের সামান্য যোগ্যতাটুকু কাজে লাগাতে পারি– এ বাসনাই অন্তরে পোষণ করছি। আপনাদের নিকটও এ দোআই চাই। বাকি আল্লাহ তাআলার মর্জি।

যারা আমার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন তাদের জন্যও দোআ করি। আমার সাথে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের লড়াই নেই। তারা যদি ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান

হিসেবে বুঝতে পারেন তাহলে তাদের বর্তমান মতাদর্শ পরিত্যাগ করে আল্লাহর দীনের খিদমতে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। এমন উদাহরণ ক্রমেই বাড়ছে। অনেকেই না বুঝে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও একসময় ইসলামের দাওয়াত ও সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত করেছেন এবং আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

প্রিয় দেশবাসী!

আপনারাই বিবেচনা করুন−

১. আমি জন্মসূত্রে এ দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও আমাকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করা কি বেআইনি নয়?

২. যদি আমি বেআইনি কোনো কাজ করে থাকি তাহলে আইনমতো আমার বিচার করা হলো না কেন?

৩. যদি বিদেশে থাকার কারণে আমার বিচার করা সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে গত ১০ বছর দেশে থাকা সত্ত্বেও কেন বিচার করা হয়নি?

৪. আমার মতো একই অজুহাতে যাদের নাগরিকত্ব অবৈধভাবে হরণ করা হয়েছিল, তাদের সবারই নাগরিকত্ব বহাল হওয়া সত্ত্বেও আমার বেলায় হচ্ছে না কেন?

৫. দেশের অগণিত রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, আলেম ও সর্বশ্রেণীর মানুষ আমার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে পত্রিকায় বিবৃতি দেওয়া সত্ত্বেও সরকার এ বিষয়ে নীরব কেন?

নাগরিকত্ব ও মাতৃভাষা আল্লাহরই দান। কে কোন্ দেশে এবং কোন্ মায়ের গর্ভে জন্মলাভ করবে সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সিদ্ধান্ত নেন। আমি চেষ্টা করে বাংলাদেশে জন্মলাভ করিনি। আমার আল্লাহই এ দেশকে আমার জন্মভূমি হিসেবে বাছাই করেছেন। তাই যারা আমার নাগরিকত্বের অধিকার কেড়ে নিয়েছেন তারা আমার উপর কত বড় যুলুম করেছেন, তা আপনারাই বিবেচনা করুন। আর যারা আমার ঐ জন্মগত অধিকার ফিরিয়ে দিচ্ছেন না, তারা কত বড় জঘন্য অন্যায় করছেন তা-ও আপনারা চিন্তা করে দেখুন।

কোনো নাগরিক দেশের আইনের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করলে ঐ আইন অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। এমনকি তাকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করা চরম মানবতাবিরোধী কাজ। দুনিয়ার কোনো দেশে এমন উদ্ভট ব্যাপার ঘটেছে কি না, আমার জানা নেই।

দেশবাসী সবার প্রতি আবেদন

সর্বশেষে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, উপজাতি, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে আমার জন্মভূমির সকলের প্রতি আমার আবেদন− আমরা কেউ যেন অন্ধতার বশবর্তী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করি। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

এটা কারো একচেটিয়া সম্পদ নয়। ইসলাম থেকে প্রতিটি মানবসন্তানই কল্যাণলাভের অধিকারী। আল্লাহর সৃষ্ট সূর্যের আলো যেমন সবার জন্য, আল্লাহর দীন ইসলামও সকলের জন্যই। যারা দরজা-জানালা খুলে রেখে সূর্যের আলো ঘরে ঢোকার সুযোগ দেয় তারাই আলো পায়। তেমনি মনের কপাট খুলে যদি কেউ আল্লাহর দেওয়া বিধানকে জানতে ও বুঝতে চায় তাহলে ইসলামের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে মানুষের মনের উপর জোর খাটে না। এটা প্রতিটি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে তাঁর বিধান থেকে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতে মুক্তি লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব

আমার উপরিউক্ত বক্তব্য সমাপ্ত হওয়ার পর সাংবাদিকগণ আমাকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। আমি প্রশ্নগুলোর জবাব স্পষ্ট ভাষায় দিয়েছি। কোনো প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে যাইনি। একটি প্রশ্ন ছিল, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের জন্য কে দায়ী? জবাবে বলেছি, এ দেশের জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা আসুক— এটাই চেয়েছে। তারা মুক্তিযুদ্ধ চায়নি। সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহইয়া খান ও ক্ষমতালোভী মি. ভুট্টো জনগণের উপর এ যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছেন। ভয়েস অব আমেরিকার রিপোর্টার জনাব গিয়াস কামাল চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, এ বাড়ির মালিক কে এবং মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স কার নামে দেওয়া হয়? জবাবে বললাম, পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এ বাড়ির মালিকানা আমার এবং ট্যাক্স আমার নামেই জমা হচ্ছে।

'৭১ সালে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে আমার রচিত 'পলাশী থেকে বাংলাদেশ' বইটি সাংবাদিকদের নিকট বিলি করা হয়। এত বড় প্রশ্নের জবাব দু-চার কথায় দেওয়া সম্ভব নয় বলেই মৌখিক কোনো জবাব দিলাম না।

পুস্তিকাটি কয়েক বছর আগেই রচনা করে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাহী পরিষদকে পড়ে শুনিয়েছি। জামায়াতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৮ সালেই এটি মুদ্রিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনের পূর্বে বাঁধাইও হয়নি। তাড়াহুড়া করে বাঁধাই করে সর্বপ্রথম সাংবাদিকদের মাঝেই সেদিন বিলি করা হয়।

সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি

১৯৮৮ সালের ৩১ মে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ পূর্বঘোষণা অনুযায়ী আমার বাংলাদেশে অবস্থান করা সম্পর্কে সরকারি বিবৃতি দেন। তিনি বললেন, 'অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশি নাগরিকত্ব লাভের উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট যে আবেদন করেছেন, তা সরকার এখনো বিবেচনা করেনি। ঐ আবেদন এখনো নাকচ করা হয়নি বলে তিনি বাংলাদেশে অবস্থান করছেন।'

কিন্তু আমি যদি বিদেশি হয়ে থাকি তাহলে বিনা ভিসায় কেমন করে আছি? কোনো ব্যক্তি কোনো দেশে বসবাস করতে হলে– হয় সে দেশের নাগরিক হিসেবে অবস্থান করতে পারে, না হয় সে দেশের ভিসা নিয়ে থাকতে পারে। আমাকে সরকার তখনো পর্যন্ত

নাগরিক বলে স্বীকার করেনি। অথচ আমি ১৯৭৮ সালের ১০ ডিসেম্বরের পর থেকে বিনা ভিসায়ই দেশে অবস্থান করছি।

অনেক বিদেশি লুকিয়ে-পালিয়ে বিনা ভিসায় দেশে থাকতে পারে। আমি রাজধানী শহরে প্রকাশ্যে নিজের বাড়িতেই আছি। রাষ্ট্রপ্রধানসহ সরকারের নিকট আমি সরাসরি পরিচিত। দুনিয়ায় এমন উদাহরণ আছে কি না আমার জানা নেই যে– একজন পরিচিত ব্যক্তি একটি দেশে অবস্থান করছে, যাকে সরকার দেশের নাগরিক বলে স্বীকার করে না; অথচ বিনা ভিসায় বছরের পর বছর রাজধানীতে বসবাস করছে।

আমাকে যখন ১৯৭৮ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে লিখিত নির্দেশ দেওয়া হলো যে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে আমাকে দেশ থেকে চলে যেতে হবে, তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি সরকারি নির্দেশ অমান্য করব। আমার জন্মভূমি থেকে আমাকে আইনমতো তাড়ানোর কোনো ক্ষমতা সরকারের নেই। বিনা বিচারে জেলে আটক রাখতে পারে মাত্র। জেলে আটক রাখলে হাইকোর্টে মামলা করলে আটকাদেশ টিকবে না বলেই আমাকে গ্রেফতার করতেও পারছে না।

পলাশী থেকে বাংলাদেশ

সাংবাদিক সম্মেলনে আমার বক্তব্য জাতীয় পত্রিকায় আশাতীত গুরুত্ব পাওয়ায় আমার ধারণা ছিল, যারা আমার ও জামায়াতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন তারা ঐ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাবেন। কিন্তু তেমন কিছুই না ঘটায় বিস্মিত হলাম।

'পলাশী থেকে বাংলাদেশ' বইটির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে '৭১ সালে জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে আবার নতুন করে হৈ চৈ করা হবে বলে আশঙ্কায় ছিলাম। বিস্ময়ের বিষয় যে, যারা আমাকে অশালীন ভাষায় গালাগালি অব্যাহত রেখেছেন, তারাও ঐ বইয়ের বক্তব্য নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনবোধ করেননি।

মাত্র ৩২ পৃষ্ঠার বইটিতে উপমহাদেশে ইংরেজ-রাজত্ব, ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, আইয়ুব খানের যুগ, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনে, ভারতের ভূমিকা, ভুট্টো-ইয়াহইয়ার ষড়যন্ত্র, বাংলাদেশ আন্দোলনে ইসলামপন্থিদের সংকট, '৭১-এ জামায়াতের ভূমিকা ইত্যাদি আলোচনা করা হয়। শেষদিকে 'যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শরীক হয়নি তারা কি স্বাধীনতার বিরোধী ছিল?' এবং 'এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্ষক কারা'– এ দুটো বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।

২০০১ সালের নির্বাচনপরবর্তী অবস্থা

২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের শোচনীয় পরাজয় ও চারদলীয় জোটের অভাবনীয় বিজয়ের পর পরাজিত শক্তির ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, যারা দেশকে স্বাধীন করেছে বলে গালভরা বুলি আওড়ায়, তারাই স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তুলেছে। তারা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার ব্যাপারে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে প্রতিবেশী দেশ এবং আমেরিকা ও ইউরোপের হস্তক্ষেপ কামনা করছে। বাংলাদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকলে বর্তমান গণতান্ত্রিক পরিবেশে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নিরপেক্ষ

নির্বাচন হতে থাকলে এ দেশে ইসলামের বিজয়ের আশঙ্কায় তারা অগণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতাসীন হওয়ার চোরাপথ তালাশ করছে।

১৯৮৯ সালের গতানুগতিক আন্দোলন

রাজনৈতিক ময়দানে বিএনপির নেতৃত্বে সাতদলীয় জোট, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আটদলীয় জোট ও বামপন্থিদের পাঁচদলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী যুগপৎভাবে এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিভিন্ন মাত্রায় সক্রিয় ছিল। তবে এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজোঁ কমিটি বিশেষ করে কমিটির আহ্বায়ক মুজাহিদ সাহেব সকল জোটের নেতৃবৃন্দের সাথে আন্দোলনের পক্ষে যে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছেন, অন্য কোনো দল বা জোটের পক্ষ থেকে তেমন তৎপরতা লক্ষ করা যায়নি।

এর কারণ দুটো : প্রথমত, জামায়াত যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা চালায় এর জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশ জরুরি। তাই আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জামায়াতের বলিষ্ঠ ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে আইয়ুব খান ১৯৬৪ সালে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীকেই বেআইনি ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয়ত, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন স্তিমিত হলেই ৫ দলীয় বামজোটের জামায়াতবিরোধী তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা স্বৈরশাসনের বদলে জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রধান দুই দলের নেতৃবৃন্দকে উসকে দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

১৯৮৯ সালের ১৬ জানুয়ারি কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা কায়েমের দাবিতে হরতাল হয়। সাত ও আটদলীয় জোট জামায়াতের প্রস্তাবিত ফর্মুলা অনুযায়ী কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা কায়েমের দাবি না করলেও তারা কোনো ফর্মুলা না দিয়ে 'নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার দাবি করেন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের দিনটিকে জামায়াত প্রতি বছরের মতো ১৯৮৯ সালেও 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' নামে পালন করে। অন্যরা বিভিন্ন নামে এ দিবসটি পালন করে থাকে।

১৯৮৯ সালের জুন ও জুলাই মাসে কোনো কর্মসূচিই দেওয়া যায়নি। ৭ আগস্ট বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ দিবস, ১৬ অক্টোবর গণজাগরণ দিবস, ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ দিবস সবাই গতানুগতিকভাবে পালন করে। আন্দোলনের দৃষ্টিতে '৮৯ সাল প্রাণহীন ছিল বলেই মনে হয়।

১৯৮৭ সালের ৩ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর ১০ জন এমপি স্বৈরশাসনের অবসানের লক্ষ্যে পদত্যাগ করে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এর ফলে জেনারেল এরশাদ জাতীয় সংসদ ভেঙে দিতে বাধ্য হন। এ কারণে জামায়াতে ইসলামী দিবসটিকে এককভাবেই 'গণঅধিকার দিবস' হিসেবে ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালে পালন করে।

১৯৮৯ সালে ইসলামের ইস্যুতে ঐতিহাসিক হরতাল

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক সালমান রুশদীর লেখা কুখ্যাত বই 'দি স্যাটানিক ভার্সেস'-এর প্রতিবাদে ২১ মার্চ বাংলাদেশে নজিরবিহীন সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়। কোনো রাজনৈতিক ইস্যুতে এমন পূর্ণাঙ্গ হরতাল পালিত হয়নি।

ঐ বইয়ে কুরআন ও রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে এমন জঘন্য কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা হয়, যা কোনো কাফিরও করেনি। ইরানের ইমাম খোমেনী লেখকের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলে ব্রিটেন ও পাশ্চাত্যজগৎ ঐ ঘৃণ্য লেখকের জীবনরক্ষার জন্য নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। তারা মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে বিশ্বের প্রায় দেড় শ' কোটি মুসলমানের প্রাণে আঘাত দেওয়ার মতো জঘন্য অপরাধীর পৃষ্ঠপোষকতা করে। অথচ বাইবেল বা তাদের ক্রাইস্টের বিরুদ্ধে কেউ এ জাতীয় অপরাধ করলে তাদের আইনেই শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

দেশের বিশিষ্ট আলেমগণের পক্ষ থেকে রুশদীর বিরুদ্ধে হরতাল আহ্বান করা হয়। জামায়াত ঐ হরতালকে সমর্থন দিয়ে এর সাফল্যের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। জামায়াত হরতাল আহ্বান করলে কিছু লোক এটাকে শুধু রাজনৈতিক ইস্যু মনে করতে পারে– এ আশঙ্কা করেই জামায়াত চেয়েছে যে, আলেমসমাজের পক্ষ থেকেই হরতালের ডাক আসা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট আলেমগণের সাথে যোগাযোগ করা হয়।

অভূতপূর্ব সফল এ হরতাল প্রমাণ করে যে, এ দেশের জনগণ আল্লাহ, রাসূল ও কুরআনের প্রতি বিদ্বেষ কিছুতেই বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। জামায়াতে ইসলামী সেদিন জনতার কণ্ঠের ভূমিকা পালন করে। মিছিল ও সমাবেশে জনগণের ক্ষোভ জামায়াতের বক্তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়।

সেদিন ছোট-বড় কোনো দোকানই খোলা হয়নি। একটি রিকশাও রাস্তায় বের হয়নি। গোটা দেশ যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এর পূর্বে ও পরে আজ পর্যন্ত এমন হরতাল আর দেখা যায়নি। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, এ হরতালের পক্ষে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলগুলো একেবারেই নিশ্চুপ ছিল। সমর্থনসূচক সামান্য বিবৃতিও ঐসব দলের নেতৃবৃন্দ দেননি।

২৪৩.

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় আমার নাগরিকত্ব সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

১৯৮৯ সালের ১০ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠকে নাগরিক অধিকার কমিটির চেয়ারম্যান এডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম কমিটির পক্ষ থেকে নিম্নরূপ সুপারিশ পেশ করেন :

'আমীরে জামায়াতের নাগরিকত্ব বহালের বিষয়টি জামায়াতের এক নম্বর সমস্যা। নাগরিক অধিকার লাভের জন্য জামায়াতকে পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে হবে। আমীরে জামায়াত বিগত ১১ বছর দেশে অবস্থান করায় আইনগত পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ এসেছে। আইনবিশেষজ্ঞগণ কোর্টে যাওয়ার পক্ষে অভিমত দিলে তা গ্রহণ করা যেতে পারে।'

এ বিষয়ে মজলিসে শূরার সদস্যগণের অনেকে মতামত প্রকাশ করেন। আমীরে জামায়াত জানতে চান যে, 'আইনবিশেষজ্ঞদের অভিমতের ভিত্তিতে কর্মপরিষদ নাগরিক

অধিকার বহাল করার উদ্দেশ্যে কোর্টে মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কি না?' সর্বসম্মতিক্রমে মজলিসে শূরা কর্মপরিষদকে এ বিষয়ে ইখতিয়ার প্রদান করে। এ ইখতিয়ার দেওয়ার ফলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মজলিসে শূরার বৈঠক আহ্বানের প্রয়োজন রইল না।

আইনবিশেষজ্ঞদের মতামত সংগ্রহ করতে গিয়ে জানা গেল, বিনা ভিসায় দেশে অবস্থানের কারণে কোনো অভিযোগ করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় কোর্টে নালিশ করার সুযোগ নেই। যদি আমি দেশে থাকার ব্যাপারে সরকার আপত্তি জানায় বা আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তুলে গ্রেফতার করে তাহলে কোর্টে মামলা করার সুযোগ হবে। সরকারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করার কারণ ছাড়া কোর্টে যাওয়া যাচ্ছে না।

১৯৯২ সালের মার্চ মাসে যখন সরকার আমাকে বিদেশি নাগরিক হিসেবে গ্রেফতার করে জেলে পাঠাল, তখন হাইকোর্টে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করার সুযোগ সৃষ্টি হলো।

এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন

জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজোঁ কমিটি দুই জোটের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। তারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে আগ্রহ প্রকাশ করলেও যুগপৎ কর্মসূচি দিয়ে এগিয়ে আসছিল না। বিএনপি ও আওয়ামী লীগ পরস্পরকে দায়ী করছিল। পাঁচ দলও সমস্যা সৃষ্টি করছিল। আন্দোলন জোরদার না হওয়ায় স্বৈরশাসনের দাপট বেড়ে চলছিল।

১৯৯০ সালের জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে ৫, ৭, ৮ দলীয় জোট ও জামায়াতের কয়েকটি যুগপৎ কর্মসূচিতে জনগণের সমর্থন লক্ষ করা গেল। নেত্রীদ্বয়ের সাথে ঘন ঘন যোগাযোগ অব্যাহত রইল। সম্ভবত আন্দোলনের পক্ষে জামায়াতকে অত্যন্ত আন্তরিক ও সিরিয়াস দেখে উভয় নেত্রীই মুজাহিদ সাহেবকে গুরুত্ব দেন এবং যেকোনো সময় যোগাযোগ করার সুযোগ দেন।

অক্টোবর মাসে আন্দোলনের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। ১০ অক্টোবর বিক্ষোভ সমাবেশ এবং ১৫ ও ১৬ অক্টোবর অর্ধদিবস হরতাল সফলভাবে পালিত হলো। সরকার দমননীতির পথ বেছে নিল। আন্দোলনেও প্রচণ্ড গতি সঞ্চার হলো। বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ব্যবহার করা হয়। ঢাকায় গুলিও চালানো হয়।

নভেম্বরের পয়লা তারিখ থেকেই ব্যাপকভাবে সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল চলে। ১০ নভেম্বর সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়। হরতাল শেষে ১১ থেকে ১৯ নভেম্বর একটানা সমাবেশ ও মিছিলের ঘোষণা দেওয়া হয়। গোটা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

আন্দোলন এ পর্যায়ে পৌঁছার পরও দুটো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অভাবে আন্দোলনকে যৌক্তিক পর্যায়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। একটি হলো 'এরশাদ সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাব না' বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা, আরেকটি হলো 'আমরা সংসদীয় সরকার

পদ্ধতি চাই' বলে দাবি করা। আওয়ামী লীগ প্রথমটি ঘোষণা দিতে সম্মত হচ্ছিল না। আর বিএনপি দ্বিতীয় দাবিটি করতে চাচ্ছিল না।

যারা একসাথে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন তারা যদি আন্দোলনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একমত না হন, তাহলে সে আন্দোলন কখনো সফল হতে পারে না। ১৯৮৮ সালে ৭ ও ৮ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী এরশাদের অধীনে নির্বাচন বর্জন করা সত্ত্বেও ১৯৯০ সালে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিতে দ্বিধা করা বিস্ময়কর। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগকে সম্মত করার ব্যাপারে জামায়াতের অবদানই মুখ্য।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারই পরিচালনা করে গেছেন। এরশাদের আমলে ঐ পদ্ধতির দোহাই দিয়েই স্বৈরশাসন চালু রাখা হয়। বিএনপি ঐ পদ্ধতি বহাল রাখার পক্ষে ছিল। এ বিষয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। শেষ পর্যন্ত বিএনপি ঘোষণা দেয়, জনগণের নির্বাচিত সংসদই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

কেয়ারটেকার সরকারের ফর্মুলা চূড়ান্তকরণ

জামায়াতে ইসলামী তো ১৯৮০ সাল থেকেই স্পষ্ট ভাষায় কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলা কায়েমের দাবি করে এসেছে। ৭ ও ৮ দলীয় জোট 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' কায়েমের দাবি করলেও তারা কোনো ফর্মুলা পেশ করেনি। ১৯৯০ সালে যখন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সাফল্যের দুয়ারে পৌঁছে গেল, তখন ফর্মুলা চূড়ান্ত না হলে এরশাদের পদত্যাগের পর নতুন সরকার কেমন করে গঠন করা যাবে? আন্দোলন এরশাদের পদত্যাগ দাবি করছে। পদত্যাগ করলে দেশে বিকল্প সরকার কায়েমের ব্যবস্থা করা না হলে দেশ কি সরকারবিহীন থাকবে? তাই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে একদিনও বিলম্ব করা চলে না। তবুও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে বিলম্ব হচ্ছে।

আন্দোলন যখন তুঙ্গে

২০ নভেম্বর সারা দেশে সর্বাত্মক হরতাল ঠেকানোর জন্য সরকার মরিয়া হয়ে ১৪৪ ধারা জারি করে। জনতার মিছিল ১৪৪ ধারা ভেঙে ছারখার করে দেয়। আন্দোলন যতই তীব্র হতে লাগল সরকারের দমননীতি ততই উগ্র হয়ে উঠল। বিডিআর ও পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খাচ্ছিল।

মুজাহিদ সাহেবের 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন' শিরোনামের লেখায় এ সময়কার চিত্র নিম্নরূপে অঙ্কিত হয় :

'বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ, বিডিআর এবং সেনাবাহিনীর সাথে জনতার সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। নিহত ও আহতের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। কিন্তু আন্দোলনে ভাটা পড়েনি; বরং গোটা পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ব্যাপক ধরপাকড় ও কারফিউ ইত্যাদির কারণে নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়। তারপরও যোগাযোগ চলে এবং আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা হতে থাকে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মহানগরীসহ গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।'

আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে

বাঁধভাঙা বন্যার মতো বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিল রাজধানীর মতিঝিল থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত বিস্তৃত। পুলিশ-বিডিআর ফাঁকে ফাঁকে টিয়ার গ্যাস এবং প্রয়োজনে ফাঁকা গুলিও ছুড়ে। একপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির পাশের সড়কে ২৭ নভেম্বর রিকশায় বসা অবস্থায় গুলিতে ডাক্তার শামসুল আলম মিলন নিহত হন। তিনি বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের যুগ্মসচিব ছিলেন। ছাত্রজীবনে ছাত্রনেতা ছিলেন। অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে গণ্য করা হতো। এর প্রতিক্রিয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সকল ছাত্রসংগঠন বিশেষ করে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ 'সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য' নামে বিক্ষুব্ধ জনতার সমুদ্রে প্রবল জোয়ার সৃষ্টি করায় আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির পূর্বের চেয়েও বেশি তৎপরতা চালায়। ঢাকা ও খুলনায় জামায়াতের দুজন শাহাদাতবরণ করেন। ১ ও ২ ডিসেম্বর নিহতদের জন্য মসজিদে মসজিদে দোআ ও গায়েবানা জানাযার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর কড়া পাহারায় গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জানাযায় জামায়াতের তদান্তীন সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও দ্বিতীয় জানাযায় তদান্তীনন ঢাকা মহানগরী আমীর জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ইমামতি করেন।

আন্দোলন দমন করার জন্য পুলিশ ও বিডিআরই প্রধান ভূমিকা পালন করছিল। কোথাও কোথাও অল্পসংখ্যক সেনাবাহিনী উপস্থিত থাকলেও জনগণের বিরুদ্ধে তেমন সক্রিয় ছিল না। পুলিশ ও বিডিআর ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব পূর্ণরূপে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সেনাবাহিনী লক্ষ করেছে যে, এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ চরমভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সেনাবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সম্মত না হওয়ায় এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান কে হবেন?

আন্দোলন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেল। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এরশাদকে পদত্যাগ করে কেয়ারটেকার সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানাচ্ছেন। কিন্তু কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান কে হবেন, সে বিষয়ে তাঁরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছেননি। এটা বড়ই বিস্ময়কর।

জামায়াতে ইসলামী ১৯৮০ সালেই ফর্মুলা দিয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত প্রধান বিচারপতি কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হবেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর তিনি আবার স্বপদে বহাল হবেন। এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হলো, এমন ব্যক্তির নেতৃত্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক, যার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাসের কোনো সুযোগ থাকবে না এবং যিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে নির্বাচন পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন।

রাজনৈতিক ময়দানটা এমনই প্রতিযোগিতামূলক ও প্রতিহিংসামূলক যে, কোনো একটি রাজনৈতিক দল দেশের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কোনো প্রস্তাব পেশ করলে অন্য কোনো দল

তা সমর্থন করতে চায় না। প্রস্তাবটি যতই যুক্তিপূর্ণ হোক এবং দেশের জন্য যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, তা সমর্থন করার মতো নৈতিক সাহস অন্য দলের মধ্যে দেখা যায় না। এ ধরনের সমর্থনকে তারা প্রস্তাবকের বিজয় ও সমর্থকের পরাজয় বলে গণ্য করে।

আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বায়ক জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ হন্যে হয়ে ৭ ও ৮ দলীয় নেতৃবৃন্দের নিকট ধরনা দিতে থাকেন। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যে অন্য কোনো দলের পক্ষ থেকে কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়নি। ফোনে যোগাযোগ করা ছাড়া তখন উপায়ও ছিল না। ফোনে মুজাহিদ সাহেব ৮ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার মতামত জানতে চাইলে তিনি অবসরপ্রাপ্ত সেনাপ্রধানের নাম প্রস্তাব করলেন। ৭ দলীয় জোট থেকে কোনো প্রস্তাব পাওয়া গেল না।

অবিরাম যোগাযোগের পর শেষ পর্যন্ত ৭, ৮ ও ৫ দলীয় জোট প্রধান বিচারপতিকে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান করার ব্যাপারে একমত হয়।

'বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন' শিরোনামের লেখায় মুজাহিদ সাহেব উল্লেখ করেছেন, "আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম, আমাদের প্রস্তাব কার্যকর হতে যাচ্ছে দেখে। আমীর হোসেন আমু ভাইয়ের (আওয়ামী লীগনেতা) সাথে আলাপ করলাম টেলিফোনে। তিনি বললেন, 'আপনাদের ষড়যন্ত্রই বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। সারা দিনই তো ষড়যন্ত্র করলেন।' আমি বললাম, 'প্রধান বিচারপতিকে সরকারপ্রধান করা আমাদের পুরনো প্রস্তাব। এতে ষড়যন্ত্রের কিছুই নেই।' তিনি বললেন, 'না, এমনি বললাম আর কি।' সন্ধ্যার পর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বে প্রধান বিচারপতি জনাব সাহাবুদ্দিনের বাসায় গেলাম অভিনন্দন জানাতে। সেখানে জানতে পারলাম, আওয়ামী লীগ সর্বাগ্রে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। সর্বশেষে রাজি হয়ে সর্বাগ্রে অভিনন্দন জানানো দেখে আওয়ামী লীগের যোগ্যতার প্রশংসা না করে পারলাম না।"

এরশাদের পদত্যাগের ঘোষণা

ডিসেম্বরের ৪ তারিখ সকাল ১০টায় বঙ্গভবন থেকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ঘোষণা করলেন যে, তিনি পদত্যাগ করেছেন। গত কয়েকদিনের মতো সেদিনও সর্বস্তরের জনগণ ও ছাত্রসমাজ সকাল থেকেই মতিঝিল, গুলিস্তান, সচিবালয় এলাকায় এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে অবস্থান গ্রহণ করে। পদত্যাগের ঘোষণার সাথে সাথে গোটা জনতা বিজয়োল্লাসে ফেটে পড়ে। সচিবালয় থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ দলে দলে ঐ বিজয়োৎসবে শামিল হয়। রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক থেকেও সবাই জনতার উল্লাসে শরীক হয়। সারা দেশে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। কিন্তু তখনো জানা যায়নি যে, কে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

কেয়ারটেকার সরকারের ফর্মুলা ঘোষণা

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হিসেবে ফরমালি ঘোষণা করার সময় ৭, ৮ ও ৫ দলীয় জোট শেষ মুহূর্তে জামায়াতের দেওয়া ফর্মুলাই ঘোষণা করতে সম্মত হলো বটে; কিন্তু সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করার সময় শুধু

তিন জোটের পক্ষ থেকেই পেশ করা হলো। জামায়াতে ইসলামীর নাম সেখানে উল্লেখ করতে রাজি হলো না।

৫ দলীয় বামজোট তো নামকাওয়াস্তে আন্দোলনে ছিল। ঢাকার কতক নেতাসর্বস্ব এ জোটের দেশভিত্তিক তেমন সাংগঠনিক অস্তিত্বই নেই; কিন্তু তাদের দাবির নিকট ৭ ও ৮ দলীয় জোট জামায়াতের ব্যাপারে নতি স্বীকার করে নিল। ৮ দলীয় জোটের পক্ষে বামদের প্রস্তাব গ্রহণ করা বিস্ময়ের ব্যাপার নয়; কিন্তু ৭ দলীয় জোটও জামায়াতের নাম শামিল করার পক্ষে কথা বলার নৈতিক সাহস পেল না।

জামায়াতে ইসলামী ১৯৮০ সালে এক কর্মীসম্মেলনে সর্বপ্রথম কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির প্রস্তাব পেশ করে এবং ১৯৮৩ সালে জনসভায় এ দাবি জানায়। ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে স্বৈরশাসক এরশাদের সাথে সংলাপের পূর্বে ৭ ও ১৫ দলীয় জোটকে এ ফর্মুলা অনুযায়ী এরশাদের নিকট দাবি জানানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তারা তা গ্রহণ করতে সম্মত হননি। একমাত্র জামায়াতই সংলাপের সময় এরশাদের নিকট এ দাবি পেশ করে। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে সব জোট অন্য কোনো বিকল্প জোগাড় করতে ব্যর্থ হয়ে এ ফর্মুলা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়; কিন্তু এর সামান্য কোনো কৃতিত্ব যাতে জামায়াত না পায়, সে বিষয়ে তারা একমত হয়।

এতে জামায়াতের কিছুই আসে-যায় না। গোটা রাজনৈতিক মহল জানে যে, জামায়াতই কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলার রূপকার। শেখ হাসিনা এর রূপকার বলে দাবি করে হাস্যাস্পদ হয়েছেন। দেশের সকল অর্জনের কৃতিত্ব দাবি করা তাঁর মজ্জাগত অভ্যাস। দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, কেয়ারটেকার ফর্মুলা ইত্যাদি সবকিছুর কৃতিত্বই তাঁর। তাঁর শাসনামল স্বর্ণযুগ ছিল বলে দাবি করতেও তিনি লজ্জাবোধ করেননি।

ক্ষমতা থেকে এরশাদের বিদায়

কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রথমে তদানীন্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ পদত্যাগ করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করেন। বিচারপ্রতি সাহাবুদ্দিন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথগ্রহণের পর প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগ করেন। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এ শূন্যপদে ভাইস প্রেসিডেন্ট ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একই দিনে জাদুক্রিয়ার মতো এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল। দিন ছিল ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এ দিনটি ঐতিহাসিক মর্যাদার অধিকারী হলো।

ঐ দিনটি এরশাদের মন্ত্রীদের জন্য মহাবিপদের দিন ছিল। বিক্ষুব্ধ জনতার একাংশ মন্ত্রীদের বাসস্থানে হামলা করে বসল। মন্ত্রীরা বিপদের আশঙ্কায় সপরিবারে অন্যত্র সরে গেলেও তাদের আবাসস্থল আক্রান্ত হলো। মগবাজারস্থ আমাদের মহল্লায় মন্ত্রী বেগম রাজিয়া ফয়েজের বাড়িতেও হামলা করা হলো। নিচতলায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলে পাড়ার ছেলেরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে আগুন নিভিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

টিভি ও রেডিওতে নেতৃবৃন্দের ভাষণ

স্বৈরাচারবিরোধী দীর্ঘ আন্দোলনে নির্যাতিত ও বিক্ষুব্ধ জনতার স্বাভাবিক রুদ্ররোষ যাতে বিশৃঙ্খলার আকারে প্রকাশ না পায় সে উদ্দেশ্যে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর টিভি ও রেডিওতে ভাষণ দেন। ৭ দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ৮ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা, জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান ও ৫ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে জনাব রাশেদ খান মেনন ভাষণ দেন।

ভাষণে নেতৃবৃন্দ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের জন্য সংগ্রামী জনগণকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানান; বিজয়োল্লাসকে দেশ গড়ার কাজে লাগানোর জন্য আহ্বান জানান; গণতন্ত্রের বিজয় যেন স্থায়ী হয়, সে উদ্দেশ্যে সবাইকে ভূমিকা পালনের পরামর্শ দেন; কেয়ারটেকার সরকার যাতে নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সফল হয় সেজন্য সবাইকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেন।

আন্দোলনে যাঁরা জীবন দিলেন তাঁদের ত্যাগকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। যাঁরা আহত ও নির্যাতিত হয়েছেন তাঁদেরকে বিজয়াভিনন্দন জানানো হয়। সরকার পরিবর্তনের এ শুভ সুযোগে যাতে কেউ শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মে লিপ্ত না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্যও উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়।

নেতৃবৃন্দের ভাষণের ত্বরিত সুফল পাওয়া গেল। বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের সরকার পরিচালনায় ঐসব ভাষণ অত্যন্ত সহায়ক প্রমাণিত হয়। জনগণের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। প্রায় তিন সপ্তাহ রাজধানীতে চরম অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল। বিজয়ের আনন্দে আন্দোলনরত সবাই তৃপ্তিবোধ করল। দেশে শান্ত রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হলো। সরকারি সকল পর্যায়েই সান্ত্বনাবোধ দেখা গেল।

কেয়ারটেকার ফর্মুলা যদি ৭ ও ৮ দলীয় জোট আগেই সমর্থন করতে সক্ষম হতো, তাহলে ১৯৮৪ সালে এরশাদের সাথে সংলাপের মাধ্যমেই এ বিজয় অর্জন করা সম্ভব হতো। দীর্ঘ ছয়টি বছর জনগণকে এত ভোগান্তি পোহাতে হতো না। রাজনৈতিক দলগুলোকে এত দীর্ঘ সময় আন্দোলন করতে হতো না। গণতন্ত্র অনেক আগেই দেশে কায়েম হয়ে যেত। 'দল থেকে দেশ বড়' সবাই মুখে উচ্চারণ করলেও বাস্তবে 'দেশ থেকে দল বড়' বলেই তাদের আচরণ থেকে প্রমাণিত হয়।

সব ভালো, যার শেষ ভালো

সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে অযৌক্তিক ও চরম অন্যায়ভাবে সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৮১ সালের নভেম্বরে বিচারপতি আবদুস সাত্তার সরাসরি জনগণের ভোটে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তাঁর দুর্বল ব্যক্তিত্বের সুযোগ নিয়ে দেশের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। অথচ এ শাসনতন্ত্র রক্ষার পবিত্র শপথ নিয়েই তিনি সেনাপ্রধান হয়েছিলেন। নির্বাচিত সরকারের আনুগত্য করার শপথ ভঙ্গ করে দেশের শাসনকর্তা সাজার কোনো আইনগত ও নৈতিক অধিকার তাঁর ছিল না। দেশরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাবাহিনীকে তিনি দেশ শাসনের বেআইনি কর্মে নিয়োগ করেন।

ইতিহাসে এ জাতীয় ক্ষমতালিপ্সুদের শেষ পরিণাম এ রকমই হয়ে থাকে। তাদেরকে অপদস্থ হয়েই ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু ইতিহাসের এ শিক্ষা থেকে ক্ষমতালোভীরা কখনো উপদেশ গ্রহণ করে না।

'সব ভালো, যার শেষ ভালো' প্রবচনটি থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সেনাপ্রধানের যে মর্যাদায় জেনারেল এরশাদ অধিষ্ঠিত ছিলেন তাতে যদি তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন এবং রাজনৈতিক অন্যায় উচ্চাভিলাষের নেশায় মত্ত না হতেন, তাহলে নয় বছর শাসক থাকার পর জনগণের নিকট এতটা হেয় প্রতিপন্ন হতেন না।

২৪৪.

কেয়ারটেকার সরকারের উপদেষ্টা নিয়োগ

কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হিসেবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর দায়িত্ব গ্রহণের পর ৮ ডিসেম্বর তিনি মন্ত্রী পদমর্যাদায় নিম্নলিখিত ছয়জনকে উপদেষ্টা নিয়োগ করেন :

১. জনাব কফিলুদ্দীন মাহমুদ (সাবেক অর্থসচিব)
২. জনাব ফখরুদ্দীন আহমদ (সাবেক পররাষ্ট্রসচিব)
৩. অধ্যাপক ডা. এম এ মাজেদ (সাবেক সভাপতি, বিএমএ)
৪. ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (সাবেক ভিসি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)
৫. জনাব এম জি কিবরিয়া (সাবেক আইজি, পুলিশ)
৬. মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম (বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা)

পরদিন ৯ ডিসেম্বর সরকারপ্রধান আরো তিনজনকে উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। তাঁরা হলেন :

১. ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ (সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী)
২. ড. রেহমান সুবহান (অর্থনীতিবিদ ও প্রফেসর)
৩. জনাব আবদুল খালেক (সাবেক আইজি, পুলিশ)

কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের মন্ত্রিসভার মর্যাদা নিয়ে উপরিউক্ত উপদেষ্টাগণ দায়িত্ব পালন করেন। এ সরকারের প্রধান দায়িত্ব জাতীয় সংসদের নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

পদত্যাগী প্রেসিডেন্ট এরশাদকে গণরোষ থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকার প্রথমে তাঁকে একটি বাড়িতে আটক করে রাখে। সেখানেও নিরাপদ নয় বলে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়।

গতানুগতিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়া পলিসিগত কোনো সিদ্ধান্ত সরকারের নেওয়ার কথা নয়। প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আইনের সংরক্ষকের চেতনা নিয়ে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবেন বলে সবাই আস্থাশীল বলে মনে হলো।

ইরাকের কুয়েত দখল

'জীবনে যা দেখলাম' পঞ্চম খণ্ডে ইরাকের স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেনের ইরান আক্রমণ সম্পর্কে আলোচনার পর প্রসঙ্গক্রমে তার কুয়েত দখলের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৯০ সালের ২ আগস্ট সাদ্দাম হোসেনের সেনাবাহিনী রাতের অন্ধকারে অতর্কিতভাবে ছোট্ট কুয়েত রাষ্ট্রটি বিনা বাধায় দখল করে নেয়। কুয়েতের আমীর (শাসক), তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, রাজপরিবারের প্রায় সবাই, বড় ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আক্রমণের আশঙ্কায় কোনো রকমে সীমান্ত অতিক্রম করে সৌদি আরব গিয়ে আশ্রয় নেন। সৌদি সরকার অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁদেরকে সসম্মানে গ্রহণ করে। জেদ্দাস্থ রাজপ্রাসাদে কুয়েতের রাজপরিবারকে আশ্রয় দেওয়া হয় এবং কুয়েত সরকারের প্রবাসী অফিস হিসেবে রাজপ্রাসাদকে ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হয়।

কুয়েত দখলের প্রতিক্রিয়া

সাদ্দাম হোসেন ইসলামী বিশ্বে ইসলামবিরোধী হিসেবেই গণ্য ছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত সবাই তাঁকে রাশিয়ার এজেন্টই মনে করতেন। তার বা'ছ পার্টির আদর্শ ছিল সমাজতন্ত্র। আসলে দুনিয়ার স্বৈরশাসকরা তাদের একনায়কত্বের সহায়ক হিসেবেই সমাজতন্ত্রের দোহাই দিত। সাদ্দাম হোসেন ইরানে হামলা করার পর আমেরিকার এজেন্ট হিসেবে গণ্য হন।

প্রথমদিকে কুয়েত দখল করার কারণে মুসলিম বিশ্ব সাদ্দামের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু যখন আমেরিকা সাদ্দামের দখল থেকে কুয়েতকে উদ্ধার করার জন্য সাদ্দামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল তখন গোটা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আমেরিকার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার সামরিক আধিপত্য কায়েম হওয়ার আশঙ্কায়ই তাঁরা এ ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন।

মহাধূর্ত সাদ্দাম হোসেন ইসরাইলের উপর কয়েকটি মিসাইল নিক্ষেপ করে মুসলিম উম্মাহকে সাফল্যের সাথে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হলেন। মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া ইসরাইলের বিরুদ্ধে গোটা উম্মাহ চরমভাবে ক্ষিপ্ত। আর ইসরাইলের অভিভাবক আমেরিকার প্রতি তো উম্মাহ দীর্ঘদিন থেকেই চরম ঘৃণাবোধ করছে। উম্মাহর এ মনোভাবকে সাদ্দাম হোসেন অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছেন। ভাবখানা এমন যে, তিনি এ যুগের গাজী সালাহ উদ্দীন এবং ইসরাইলের খপ্পর থেকে ফিলিস্তিনকে উদ্ধার করার জন্য তিনি জিহাদ করছেন।

অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ছাড়া সারা দুনিয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সাদ্দামের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তাকে সমর্থন জানালেন। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানও সাদ্দাম হোসেনকে ইসলামের হিরোর মর্যাদা দিয়ে বসল। সারা বিশ্বেই সাদ্দামের পক্ষে মুসলিম উম্মাহর সমর্থন রয়েছে বলে অনুভূত হলো।

ইউরোপ ও আমেরিকায় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দও ঐ একই ভূমিকা পালন করলেন। লন্ডনে টেলিফোনে তাঁদের সাথে কথা

বলতে গিয়ে আমি বিব্রতকর অবস্থায় পড়লাম। তাঁরা আমাকে ঐ মত সমর্থন করার জন্য চাপ দিলেন। আমি তাঁদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ভূমিকা

সাদ্দামের কুয়েত দখলের সিদ্ধান্তকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ জঘন্য হঠকারী বলে মনে করল। এর মাধ্যমে আমেরিকাকে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক আধিপত্য কায়েমের মহাসুযোগ করে দেওয়া হলো। যদি সত্যিই ইসরাইলের বিরুদ্ধে জিহাদ করার সামান্য ইচ্ছাও সাদ্দামের থাকত, তাহলে কুয়েত দখলের সিদ্ধান্ত কোনো যুক্তিতেই এর সহায়ক বলে গণ্য হতে পারে না। ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে সকল মুসলিম রাষ্ট্রের সমর্থন হাসিলের প্রয়োজন ছিল। ইরানের উপর হামলা করে এমনিই তো সাদ্দাম ইসলামের দুশমন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। এরপর কুয়েত দখল করে সম্প্রসারণবাদী হিসেবে পরিচিত হলেন এবং এর মাধ্যমে সৌদি আরবকে আতঙ্কগ্রস্ত করার কারণে তিনি মুসলিম সরকারসমূহের আস্থা হারালেন।

সাদ্দামের এ আত্মঘাতী ভূমিকার বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সোচ্চার হওয়া কর্তব্য মনে করল। ১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফের নেতৃত্বে জামায়াতের ঢাকা মহানগরী শাখার উদ্যোগে বায়তুল মুকাররমের উত্তর গেটে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন মহানগরী আমীর জনাব আবদুল কাদের মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে মাওলানা এ কে এম ইউসুফ প্রধান অতিথি এবং মহানগরী শাখার নেতৃবৃন্দের মধ্যে এডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার ও সাইফুল আলম খান মিলন বক্তব্য রাখেন।

বক্তাগণ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত দখলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি বিশ্বে ইসলামের দুশমন হিসেবে পরিচিত হন। তিনি ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান ও কাশ্মীরের মুজাহিদদের কখনো সাহায্য করেননি। কিন্তু যে কুয়েত ঐ মুজাহিদদের হামেশা বিপুল পরিমাণ সাহায্য করেছে, সে দেশটিকে দখল করে তিনি ইসরাইল, রাশিয়া ও ভারতকেই সাহায্য করলেন।

সমাবেশের পর মাওলানা ইউসুফ ও জনাব আবদুল কাদের মোল্লার নেতৃত্বে বিশাল এক বিক্ষোভ মিছিল রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং কুয়েত থেকে ইরাকি বাহিনী অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জোর দাবি জানায়। সম্ভবত সারা বিশ্বে এটাই প্রথম ত্বরিত প্রতিবাদ। কুয়েত দখলের খবর পাওয়ার সাথে সাথেই এ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী শাখা ১৯৯০ সালের ১৫ আগস্ট আরো একটি বিক্ষোভ মিছিল করে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আগস্টের শেষদিকে অনুরূপ মিছিল বের করে।

১২ আগস্ট ইসলামী ছাত্রশিবির বিরাট এক বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ইরাকি দূতাবাসের নিকট কুয়েত দখলের প্রতিবাদ জানাতে এবং কুয়েত থেকে ইরাকি বাহিনী প্রত্যাহার

করার জন্য স্মারকলিপি পেশ করার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে পুলিশ বাধা দেয় এবং শিবিরের একটি প্রতিনিধি দলকে দূতাবাসে যেতে দেয়। ডা. মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম মুকুল তখন ছাত্রশিবিরের সভাপতি ছিলেন।

জামায়াতে ইসলামীর ওলামা-মাশায়েখ কমিটি, চাষীকল্যাণ সমিতি এবং জামায়াতের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে বিবৃতি দিয়ে কুয়েত থেকে ইরাকি বাহিনী প্রত্যাহারের দাবি অব্যাহতভাবে জানাতে থাকেন।

ঢাকাস্থ কুয়েতি দূতের মাধ্যমে পত্রালাপ

ঢাকাস্থ তৎকালীন কুয়েতি রাষ্ট্রদূত শায়খ মুহাম্মদ ইবরাহীম আন-নাজরানের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি কুয়েতের প্রবাসী আমীর আশ-শায়খ জাবির আল-আহমাদ আস-সাবাহকে সহানুভূতিমূলক এবং ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দিই। তিনি এর জবাবে আন্তরিক শুকরিয়া জানান এবং দোআ চান, যাতে কুয়েতের স্বাধীনতা উদ্ধার হয়। কুয়েতের প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও যুবরাজ শায়খ আবদুল্লাহ আস-সালেম আস-সাবাহকেও অনুরূপ পত্র লিখি।

সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আযীযকে এ বিষয়ে চিঠি লিখি। সে চিঠির দীর্ঘ জবাব সৌদি রাষ্ট্রদূত আবদুল লতিফ আল-মাইমানীর ফরওয়ার্ডিং লেটারসহ পেলাম।

জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা ইউসুফ কুয়েতের প্রবাসী সরকারের আমীর ও প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও প্রবাসী কয়েকজন কুয়েতি ইসলামী ব্যক্তিত্বের নিকটও চিঠি পাঠান। তাঁরা সবাই মাওলানার চিঠির জবাব দেন। মাওলানা সৌদি আরবেও অনেক চিঠি দিয়েছেন। গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায্, রাবিতা আলমে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ড. আবদুল্লাহ্ ওমর নাসীফ ও ওয়ামি'র সেক্রেটারি জেনারেল ড. মানে' আল-জুহানীকে তিনি চিঠি দেন। তাঁরা সবাই আন্তরিকতার সাথে জবাব দেন।

উপরিউক্ত সকল চিঠি, কুয়েত দখলের বিরুদ্ধে সকল প্রতিবাদের ছবি, পত্রিকায় প্রকাশিত জামায়াত-শিবিরের নেতৃবৃন্দের সকল বিবৃতির এক সংকলন জামায়াতের বৈদেশিক বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়— যা কুয়েত ও সৌদি আরবে যথাস্থানে বিলি করা হয়। বইটি আরবী ভাষায় 'উপসাগরের সংকটে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' নামে প্রকাশিত হয়।

আরবদের মধ্যে বইটি যাঁরাই পড়েছেন তাঁরাই বিস্ময়ের সাথে মন্তব্য করেছেন যে, সারা বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের নেতারা সাদ্দাম হোসেনের ধোঁকায় পড়ে গেলেন। একমাত্র জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কেমন করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হলো?

গোটা দেশ নির্বাচনমুখী হয়ে গেল

কেয়ারটেকার সরকার কায়েম হওয়ার সাথে সাথে দেশে রাজনৈতিক স্বস্তি ফিরে এল এবং সকল রাজনৈতিক দল ও জনগণ পূর্ণরূপে নির্বাচনমুখী হয়ে গেল। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনীতিতে সক্রিয় সকল দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ সৃষ্টি হলো। কোন্ দলের মনোভাব কেমন, নেতাদের মধ্যে কার মেজাজ কেমন, সে বিষয়েও মোটামুটি ধারণা পাওয়া গেল।

সকল আসনে নির্বাচনে নমিনি দেওয়ার জন্য জামায়াতে ইসলামীর প্রস্তুতি না থাকায় কোনো বড় দলের সাথে নির্বাচনী সমঝোতা করা যায় কি না, সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন মনে করা হলো। নির্বাহী পরিষদে আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হলো যে, নির্বাচনী সমঝোতার উদ্দেশ্যে একমাত্র বিএনপির সাথেই যোগাযোগ করা যায়, অন্য কোনো দল বিবেচ্য নয়।

নির্বাচনী সমঝোতা প্রচেষ্টা

যোগাযোগের পর বিএনপিনেতা কর্নেল (অব.) মুস্তাফিজুর রহমানের বাসভবনে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। আমার সাথে ছিলেন লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বায়ক জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও সদস্য জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান।

সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর নির্বাচনী সমঝোতার ব্যাপারে আলোচনা শুরু হলো। উভয় পক্ষই সমঝোতার গুরুত্ব স্বীকার করার পর আমি বললাম, বিএনপি বড় দল হিসেবে ২০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে বাকি ১০০ আসন জামায়াতকে ছেড়ে দিতে পারে। বেগম জিয়া বললেন, ছোট ছোট আরো কতক দলকে কিছু আসন দিতে হবে। আমি বললাম, তাদের জন্য ২০টি আসন রেখে জামায়াতকে ৮০টি ছেড়ে দিন।

নির্বাচনী সমঝোতা করার প্রয়োজন সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই বলে বেগম জিয়া কর্নেল মুস্তাফিজকে জামায়াতের সাথে এ বিষয়ে সংলাপের দায়িত্ব দিলেন। সংলাপে জামায়াতের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পান জনাব মুজাহিদ ও জনাব কামারুজ্জামান।

সংলাপের প্রথম দিনে কর্নেল সাহেব মাত্র ২০টি আসন জামায়াতকে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। জামায়াত এতে বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বিব্রতবোধ করেন। বেশ কয়েক দিন দর কষাকষির পর কর্নেল সাহেব শেষ পর্যন্ত ৫০টি আসন নিয়ে জামায়াতকে সম্মত হতে অনুরোধ করেন। সমঝোতার গুরুত্ব অনুভব করে জামায়াত এতে সম্মত হয়। কিন্তু বিএনপির পার্লামেন্টারি বোর্ডে কর্নেল সাহেব এ বিষয়ে রীতিমতো নাজেহাল হন। এত বেশি আসন জামায়াতকে ছেড়ে দিতে কেন তিনি সম্মত হলেন— এ অভিযোগের সম্মুখীন হলেন। সুতরাং নির্বাচনী সমঝোতার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার

এরশাদের আমলে নিযুক্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি সুলতান হোসেন খান পদত্যাগ করার পর ১৯৯০ সালের ২৫ ডিসেম্বর বিচারপতি আবদুর রউফ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সফল হওয়ার উদ্দেশ্যে বিচারপতিগণের মধ্যে তাঁকেই যোগ্যতম মনে করে নিয়োগ দেন। তিনি কর্মরত বিচারপতি থাকায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালেও বিচারপতি হিসেবেই বেতন গ্রহণ করতেন। ১৯৯৪ সালের এপ্রিলে তিনি পদত্যাগ করে সুপ্রিম কোর্টে তাঁর পূর্বপদে ফিরে যান। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদকাল পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি পদত্যাগ করেন।

তাঁর নিকট জানতে চাইলাম, 'মেয়াদ পূর্ণ না করেই নির্বাচন কমিশন থেকে বিদায় নিলেন 'কেন?' তিনি জবাবে বললেন, 'নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য ভোটারদের আইডেনটিটি কার্ড অপরিহার্য বিবেচনা করেই আমি এর উদ্যোগ নিয়েছিলাম; কিন্তু সরকারের সচিবগণ তা বাস্তবায়ন হতে না দেওয়ায় পদত্যাগ করলাম।'

বিচারপতি আবদুর রউফ অত্যন্ত গতিশীল চিন্তাবিদ। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে তিনি কর্মজীবনে প্রশংসিত। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হওয়ার পেছনে তাঁর অবদানই সবচেয়ে বেশি। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর মৌলিক গবেষণা রয়েছে। টঙ্গী পৌরসভা নির্বাচন ও ময়মনসিংহ সদর উপজেলার দাপুনিয়া ইউনিয়নে তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ পদ্ধতিতে মডেল ইলেকশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাফল্যের সাথে প্রমাণ করেছেন যে, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন ভোটারদের পরিচালনায়ই সম্ভব। সরকারি দায়িত্বশীলের শুধু পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করাই যথেষ্ট।

১৯৯১ সালের নির্বাচন পলিসি

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্দলীয় অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় এটাই প্রথম জাতীয় নির্বাচন। এ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর পলিসি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালের ১৯ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মজলিসে শূরার কার্যবিবরণী থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় উদ্ধৃত করছি :

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতের অগ্রণী ভূমিকা পালনের কারণ প্রসঙ্গে আমীরে জামায়াত বলেন, 'জামায়াতের আসল কাজ হচ্ছে দাওয়াতে দীন। আর জামায়াত সন্ত্রাসে বিশ্বাসী নয়। জামায়াত জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের সাহায্যেই ক্ষমতার পরিবর্তন করতে চায়। নবীদের কাজও এ পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়েছে। জনগণের মধ্যে দীনের দাওয়াত দেওয়ার পরিবেশ থাকা জরুরি এবং সরকার পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি জনগণের হাতে থাকা অপরিহার্য। তাই জামায়াত পরিবেশ সৃষ্টি এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে।'

নির্বাচন পলিসি সম্পর্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

১. এককভাবে নির্বাচন করার জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিতে হবে।
২. ইসলামী দল ও ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে আগ্রহ দেখা গেলে কিছু আসনে তাদেরকে ছাড় দেওয়া যেতে পারে।
৩. বিএনপির সাথে সমঝোতা হলে তা প্রকাশ্যে হতে হবে।
৪. জামায়াতের নিজস্ব প্রতীকেই নির্বাচন করতে হবে।
৫. স্থানীয়ভাবে কোনো সমঝোতা করা চলবে না।
৬. নির্বাচনী সমঝোতা সম্পর্কে পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্মপরিষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

নির্বাচন সম্পর্কে সমাপনী ভাষণে আমীরে জামায়াত বলেন, '১৯৯১ সালের নির্বাচন ছিল জামায়াতের জন্য অস্তিত্বের লড়াই। ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে জামায়াতের আইনগত স্বীকৃতি হাসিল হয়েছে। ১৯৯১-এর সংসদ নির্বাচনে জামায়াতকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি অর্জন করতে হবে। জামায়াতকে এমনসংখ্যক আসন দান করার জন্য আল্লাহর দরবারে ধরনা দিতে হবে, যাতে জামায়াতের সমর্থন ছাড়া কোনো দল সরকার গঠন করতে না পারে এবং কোনো দল বা জোটই যেন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী না হয়। তবেই জামায়াতের রাজনৈতিক স্বীকৃতি অর্জন করা সম্ভব হবে।'

পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী পরিবেশ

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক পরিবেশ বেশ ভালোই ছিল। স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে আট বছরব্যাপী আন্দোলনে বিজয়ের আনন্দ অত্যন্ত তাজা থাকা অবস্থায়ই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ আন্দোলনে যেসব দল যুগপৎ রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করেছে তাদের মধ্যে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা থাকলেও দলীয় পর্যায়ে বিদ্বেষের পরিবেশ ছিল না। প্রত্যেক দলই নির্বাচনী অভিযানে নিজ নিজ দলের পক্ষেই ব্যাপক প্রচারাভিযান চালায়। অন্য দলের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বক্তব্য তেমন জোরালো ছিল না।

বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা না হওয়ায় এবং এরশাদের জাতীয় পার্টিও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় আওয়ামী লীগ নিশ্চিত বিজয়ের আশা করেছিল। আওয়ামী লীগবিরোধী ভোট তিন দলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাবে মনে করে আওয়ামী লীগ বিজয়ের ব্যাপারে এতটা আস্থাশীল ছিল যে, জালভোট দেওয়া ও ভোটকেন্দ্রে সন্ত্রাস করার দলীয় যোগ্যতার পূর্ণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন মনে করেনি।

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে শেখ হাসিনা তাঁর পিতা-মাতা, তিন ভাই ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের নির্মমভাবে নিহত হওয়ার ঘটনার কথা উল্লেখ করে অত্যন্ত আবেগময় আকুতি জানিয়ে তাঁর দলকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার কৃতিত্বের সবটুকু তাঁর পিতার প্রাপ্য বলে উল্লেখ করে এ দেশকে গড়ে তোলার জন্য আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন করা জাতির কর্তব্য বলে তিনি দাবি করেন। 'জাতির পিতাকে তাঁর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ দেওয়া হয়নি' বলে তাঁর দলকে ঐ উদ্দেশ্যে সুযোগ দেওয়া উচিত বলে দেশবাসীকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

জামায়াতের নির্বাচনী অভিযান

নির্বাচনের সময় জনগণ আগ্রহের সাথে রাজনৈতিক দলের বক্তব্য শুনতে চায়। অন্য সময় জনসভা সাধারণত বিকালে হয়। নির্বাচনের সময় সকাল থেকে দুপুররাত পর্যন্ত নির্বাচনী সভায় জনগণকে হাজির হতে দেখা যায়।

জনগণের নিকট দীনের দাওয়াত পৌছানোর মহাসুযোগ পাওয়া যায় নির্বাচনী অভিযানে। ইসলাম যে শুধু কতক অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম নয়, ইসলাম যে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিতে এসেছে এবং ইসলামী দলকে ক্ষমতায় বসার সুযোগ দিলে যে আল্লাহর

আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম হতে পারে— এসব গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করার জন্য নির্বাচনী সমাবেশগুলো অত্যন্ত উপযোগী।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নির্বাচন উপলক্ষে একদিনে বিভিন্ন স্থানে জনসভায় বক্তব্য রাখেন। বিশেষ করে দলীয় প্রধানকে সারা দেশেই ঝটিকা সফর করতে হয়। একদিনে ৮-১০টি সমাবেশেও হাজির হতে হয়।

ঐ নির্বাচনের প্রচারাভিযান চলার সময় কুয়েত দখলকারী সাদ্দামের জনপ্রিয়তা বাংলাদেশেও ব্যাপক লক্ষ করা গেল। আমেরিকার বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর ঘৃণার কারণে সাদ্দাম হোসেন হিরোর ভূমিকায় অভিনয় করার মহাসুযোগ পেয়ে গেলেন। ঢাকাস্থ ইরাকি দূতাবাস গেঞ্জিতে সাদ্দামের ফটো ছাপিয়ে ফ্রি বিলি করায় রিকশাওয়ালাদের গায়ে তা প্রচুর দেখা গেল। সাদ্দামের ফটোসংবলিত ছবি সর্বত্র সেঁটে দেওয়া হয়। অনেকের হাতেও ফটো দেখা যায়।

জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে জনাব আব্বাস আলী খানকে সারা দেশেই নির্বাচনী সফরে যেতে হয়। তিনি আমাকে বললেন, আমরা সাদ্দামকে সমর্থন করি কি না, এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে বহু সমাবেশে। তাঁর ধারণা, হয়তো সাদ্দামকে সমর্থন না করায় অনেকে জামায়াতকে ভোট দেয়নি। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, যারা ইসলামী দল নয় তাদেরকে এ প্রশ্ন করা হয়নি। ভাবখানা এই যে, সাদ্দামকে সমর্থন না করলে কোনো দল ইসলামী দলের মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়।

২৪৫.

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৭৫টি রাজনৈতিক দল ঐ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে বিএনপি ১৪০টি, আওয়ামী লীগ ৮৮টি, এরশাদের জাতীয় পার্টি ৩৫টি এবং জামায়াতে ইসলামী ১৮টি আসন লাভ করে। অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বাকি ১৯টি আসনে জয়ী হয়।

নির্বাচনের পূর্বে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে দোআ করা হয় এবং সকলকে দোআ করতে বলা হয়– যেন জামায়াত এমনসংখ্যক আসনে জয়ী হয়, যার ফলে জামায়াতের রাজনৈতিক স্বীকৃতিলাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়; কোনো দলই যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন না পায় এবং জামায়াতের সমর্থন ছাড়া সরকার গঠন করতে না পারে।

এ দোআর উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে বড় দুটো দলের সাথে যুগপৎ কর্মসূচি প্রণয়ন করা সত্ত্বেও তারা পত্র-পত্রিকায় জামায়াতের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে বলে স্বীকার করত না। সাংবাদিক মহল তাদেরকে প্রশ্ন করতেন, আপনাদের ও জামায়াতের কর্মসূচি একই রকম কেমন করে হচ্ছে? জবাবে বলা হতো, 'কেউ আমাদের কর্মসূচি অনুসরণ করলে করতে পারে।' অথচ কর্মসূচি প্রণয়নে

জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটি শরীক ছিল। তাই আল্লাহর দরবারে জামায়াত ধরনা দেয়, যেন সরকার গঠনের জন্য বড় দলকে জামায়াতের দুয়ারে ধরনা দিতে হয়।

জামায়াত ২২২ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ১৮টি আসন পায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ ১৮টি আসনকেই ৩০০ আসনবিশিষ্ট সংসদে 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার'-এর মর্যাদা দিলেন। সরকার গঠনের জন্য কমপক্ষে ১৫১টি আসন প্রয়োজন। বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও নিরঙ্কুশ নয় বলে অন্য দলের সমর্থন প্রয়োজন। এরশাদের দলের সমর্থন চাওয়া তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। তাই তাদের জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন প্রয়োজন হয়।

টেলিভিশনে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল যারা ঘোষণা করেছেন তারা মন্তব্য করেন, সরকার গঠনের ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর হাতে 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' এসে গেল।

আমার চেম্বারে ড. জি ডব্লিউ চৌধুরীর আগমন

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি দিবাগত সারা রাতই নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফল টেলিভিশনে ঘোষণা হতে থাকায় কোন্ দল কত আসন পেল তা জানা হয়ে গেল। পরদিন ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালের নাশতার পর আমি চেম্বারে বসার সাথে সাথেই আমার পুরনো বন্ধু ড. জি ডব্লিউ চৌধুরী বিনা খবরে হাজির হয়ে গেলেন। আমি বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি বললেন, আমার ছাত্র সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নূরুদ্দীন খানের পক্ষ থেকে আসতে হলো। ব্যাপার কী– জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, নির্বাচনের ফলাফল আপনাদের হাতে সরকার গঠনের ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। আপনারা সমর্থন দিলেই বিএনপি সরকার গঠন করতে পারে। আরো বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সেনাপ্রধান কেন এ বিষয়ে ভূমিকা পালন করতে চান?

তিনি বললেন, নিরপেক্ষ নির্বাচন সফল করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই জনগণ যে দলকে সবচেয়ে বেশি আসনে বিজয়ী করেছে সে দলেরই ক্ষমতাসীন হওয়া উচিত বলে সেনাপ্রধান মনে করেন। আমি বললাম, বিএনপির পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসুক। তিনি বললেন, সেনাপ্রধান আপনার সাথে আজই দেখা করতে চান। বললাম, তিনি কেমন করে আমার সাথে দেখা করবেন? ড. চৌধুরী বললেন, আপনাকে আমি সেনাপ্রধানের বাসায় নিয়ে যাব। বললাম, আমার গাড়িতে আমি সেনানিবাসে যাব না। তিনি বললেন, আমার গাড়িতেই নিয়ে যাব।

সেদিনই সন্ধ্যার পর সেনাপ্রধানের সরকারি বাসভবনে পৌঁছলাম। আমার সাথে এর পূর্বে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। হাত মিলিয়ে প্রথমেই তিনি বললেন, আপনি আমার মুরব্বিস্থানীয়। আপনার ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যাম আমার বিয়েতে কনেপক্ষের উকিল ছিলেন। তিনি আমার উকিলবাপ। তিনি আপনার বড় না ছোট জানি না। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডা. বুরহানুদ্দীন আমার শ্বশুর। আমি খুশি হয়ে বললাম, বেশ! আত্মীয়তার সম্পর্কও পাওয়া গেল।

তিনি ধীরে-সুস্থে বললেন, দেশে এবারই প্রথম চমৎকার নির্বাচন হয়ে গেল। নির্বাচনের পূর্ব থেকেই 'র' (RAW)-প্রধান দেশে অবস্থান করছেন। আমার ভয় হয় যে, সরকার

গঠনে বিলম্ব হলে স্বতন্ত্রভাবে ও ক্ষুদ্র দলের নির্বাচিত এমপিদের অর্থের বিনিময়ে প্রলুব্ধ করে তারা তাদের পছন্দনীয় সরকার কায়েম করে ফেলতে পারে। যদি সরকার গঠন করা না যায় তাহলে সশস্ত্রবাহিনীকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে বাধ্য হতে হবে। যদি তা-ই করতে হয় তাহলে দেশ ও সেনাবাহিনী মহাবিপদে পড়বে। যারা এমপি হয়েছেন এবং যারা মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তারা জনগণকে সেনাশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করবেন। তখন এক লাখ বাহিনী দিয়ে ১০/১১ কোটি মানুষকে সামলানো সম্ভব হবে না। দেশও ধ্বংস হবে, সেনাবাহিনীও গণরোষের শিকার হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের অধিকারী দলকে যদি আপনি সরকার গঠনে সহযোগিতা করেন তাহলে গণতন্ত্র বহাল থাকবে এবং দেশ বিপর্যয় থেকে বেঁচে যাবে।

আমি বললাম, যদি ঐ দলটি আমাদের সহযোগিতা চায় তাহলে তারা যোগাযোগ করতে পারে। তিনি বললেন, আপনি চাইলে আজই বেগম জিয়ার সাথে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হতে পারে।

আমি বললাম, আমার দলের সাথে পরামর্শ করা ছাড়া আমি এ বিষয়ে কিছুই বলতে পারব না। তাদেরকে ফরমালি লিখিতভাবে সহযোগিতা চাইতে বলুন, আমরা বিবেচনা করব। বিদায়ের সময় বারবার তিনি অনুরোধ জানালেন আর আমি তাদের পক্ষ থেকে লিখিত অনুরোধের কথাই বললাম।

সরকার গঠনপ্রক্রিয়া

কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ বিবৃতি দিলেন, কোনো রাজনৈতিক দলই জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেনি। এ অবস্থায় সরকার গঠনে সমস্যা রয়েছে। কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠ এমপির সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত সরকার গঠনের জন্য কাউকে আহ্বান জানাতে পারছি না।

জাতীয় সংসদে 'ব্যালান্স অব পাওয়ার' জামায়াতের হাতে আসায় বিএনপির পক্ষ থেকে জামায়াতের সমর্থনের আশা করা স্বাভাবিক। জামায়াতের সমর্থনই সরকার গঠনের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু মহাবিস্ময়ের ব্যাপার যে, আওয়ামী লীগও জামায়াতের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে আগ্রহী হয়ে গেল। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জনাব আমির হোসেন আমু জামায়াতনেতা মুজাহিদ সাহেবের সাথে দৈনিক সংগ্রাম বিল্ডিংয়ে দেখা করতে এলেন। তিনি বললেন, আপনারা কয়টি মন্ত্রিত্ব চান ও কয়টি মহিলা আসন পেতে চান? আমরা আপনাদের সাথে মিলে সরকার গঠনে আগ্রহী।

মুজাহিদ সাহেব বললেন, আমরা সম্মত হলেও সরকার গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি বললেন, আমরা জাতীয় পার্টিকে ম্যানেজ করে ফেলেছি। মুজাহিদ সাহেব ঠাট্টা করে বললেন, আগে তারা আপনাদের ম্যানেজ করত, এখন আপনারা করেছেন। কিন্তু এরপরও সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় না। তিন দল মিলে ১৪১ আসন হয়। তারা কতক ছোট দল ও স্বতন্ত্র থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যা জোগাড় করতে পারবেন বলে জানালেন আমু সাহেব। জামায়াতে ইসলামী এতে সম্মত না হলে এ জাতীয় কোয়ালিশন সম্ভবপর নয়। মুজাহিদ

সাহেব দলের সাথে আলোচনা না করে কোনো মতামত দিতে অক্ষম বলে জানিয়ে আমু সাহেবকে বিদায় করলেন।

বিএনপি-জামায়াত কোয়ালিশন প্রস্তাব

নির্বাচনী ফলাফল যদি ঝুলন্ত পার্লামেন্টের জন্ম দেয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই কোয়ালিশন সরকার কায়েম হয়। এটাই সকল গণতান্ত্রিক দেশে প্রচলিত নিয়ম। সে হিসেবে বিএনপি ও জামায়াতের শুভাকাঙ্ক্ষীগণও এ বিষয়ে তৎপর হন। আওয়ামী লীগবিরোধী একটি মহল জামায়াতের সাথে যোগাযোগ না করেই বিএনপির নিকট জামায়াতের জন্য পাঁচটি মন্ত্রণালয় দাবি করলেন। তাঁরা আমাকে জানালেন, তিনটি মন্ত্রণালয়ের বেশি দিতে সম্মত করা গেল না।

আমরা কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় শরীক হব কি না, সে বিষয়ে আমাদের মতামত না জেনেই তাঁরা বিএনপির সাথে মন্ত্রীর সংখ্যা নিয়ে দর কষাকষি পর্যন্ত করে ফেললেন। এত বড় সুযোগ কোনো রাজনৈতিক দল ছেড়ে দিতে পারে না বলে ধারণা করাই স্বাভাবিক। ক্ষমতায় শরীক হওয়ার এ মহাসুযোগে জামায়াত বেশি সংখ্যায় মন্ত্রিত্ব ও সংসদে মহিলা আসন দাবি করতে পারত এবং তা আদায় করাও সম্ভব ছিল। জামায়াতের দাবি অগ্রাহ্য করার সাধ্য ছিল না।

জামায়াতের হিসাব আলাদা

জামায়াত ক্ষমতার রাজনীতি (Power-Politics) করে না। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে কল্যাণরাষ্ট্র কায়েমের উদ্দেশ্যেই জামায়াত তৎপর। তাই ক্ষমতায় শরীক হওয়ার এত বড় সুযোগ পেয়েও জামায়াত তা গ্রহণ করেনি। রাজনৈতিক মহল এতে বিস্মিত হওয়ারই কথা। জামায়াতকে কেউ হয়তো বোকাও মনে করে থাকতে পারেন। পরবর্তী সময়ে কোনো কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী, রাজনীতিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী আমাকে খোলা মনেই বলেছেন, ক্ষমতায় শরীক না হয়ে আপনারা ভুল করেছেন। আপনার নাগরিকত্ব সহজেই বহাল হয়ে যেত। বিদেশি হিসেবে আপনাকে জেলে যেতে হতো না। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁরা ঠিকই বলেছেন; কিন্তু জামায়াতের হিসাব আলাদা।

যারা জামায়াতের বাইরে তারা এ কথা জেনে নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন যে, জামায়াতের কোনো ফোরামেই ক্ষমতায় শরীক হওয়ার পক্ষে ও বিপক্ষে কোনো বিতর্ক হয়নি। কোনো একজন কর্মীও দাবি জানাননি যে, জামায়াতের ক্ষমতায় যাওয়া উচিত।

আমার সাংগঠনিক ঘনিষ্ঠ সাথীদের সাথে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনারও দরকার হয়নি। আমরা অনুভব করলাম যে, ৩০০ আসনের সংসদে ১৮ জন এমপির শক্তি নিয়ে কোনো আইন পাস করানো সম্ভব হবে না। কয়েকজন মন্ত্রীর মর্জিমতো কেবিনেটে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণও সম্ভব হবে না। তাই শুধু গণতন্ত্রের স্বার্থে সরকার গঠনে সহযোগিতা করে সংসদের ভেতরে ও বাইরে ইসলামী আন্দোলনের কর্মসূচি অনুযায়ী দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করাই উচিত। কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে থাকলে জনগণ স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। জামায়াত

সরকারে শরীক না হয়ে দেশকে ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্রে উন্নীত করার লক্ষ্যে একদিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে লোক তৈরি করা, ব্যাপকভাবে জনগণকে সংগঠিত করা ও জনমত গঠনে আত্মনিয়োগ করলেই আদর্শিক দিক দিয়ে বেশি লাভবান হওয়া যাবে।

২০০১ সালে জামায়াত সরকারে শরীক কেন?

এ প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়ল এবং ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে হতে লাগল। যদি আওয়ামী লীগের ক্ষমতা অব্যাহত থাকে তাহলে দেশে আবার ১৯৭২ সালের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও '৭৫ সালের বাকশাল কায়েম হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে একা এ অপশক্তিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় বলেই জামায়াত চারদলীয় জোটভুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে।

১৯৯৯ সালে চারদলীয় জোটের ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত করার সময় জোটভুক্ত সকল দল তীব্রভাবে অনুভব করেই ঘোষণা করা প্রয়োজন মনে করল যে, চারদলীয় জোট একই সাথে নির্বাচন করবে এবং সরকার গঠন করবে। সবাই একমত হয়েছেন যে, ঢিলেঢালা ঐক্য জনগণের মধ্যে তেমন আবেদন সৃষ্টি করতে পারবে না। তাই আওয়ামী লীগকে পরাজিত করতে হলে এমন মযবুত ঐক্য প্রয়োজন, যাতে জোটের বিজয়ের ব্যাপারে জনগণ নিশ্চিত হয়েই ব্যাপকভাবে ভোট দেয়।

আমি জোটের অন্যতম শীর্ষনেতা হিসেবে বেগম জিয়ার সাথে অনেকবারই একান্তে (অন্য দলের অনুপস্থিতিতে) আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। কয়েকবারই তিনি বলেছেন, 'আওয়ামী অপশক্তিকে দমন করতে হলে জোটের ঐক্য একটানা কয়েক নির্বাচন পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে।'

নির্বাচনের পর এককভাবে প্রায় দু-তৃতীয়াংশ আসন পাওয়া সত্ত্বেও বিএনপি জোট সরকার গঠন করা জরুরি মনে করে। বিশেষ করে নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ বিদেশে বাংলাদেশবিরোধী এমন জঘন্য প্রচারাভিযান চালায়, জোট নেতৃবৃন্দ ঐক্যকে আরো সুসংহত করা প্রয়োজন মনে করলেন। জোটের কোনো কোনো দলে অভ্যন্তরীণ বিরোধ থাকলেও সবাই জোটের ঐক্যকে আরো মযবুত করার পক্ষেই অভিমত প্রকাশ করেন।

নির্বাচিত জোট সরকারকে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত মেয়াদ পূর্ণ করতে না দিয়ে অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতাচ্যুত করার হীন উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ চৌদ্দদলীয় জোট গঠন করে দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র প্রমাণের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এ পরিস্থিতি চারদলীয় জোটকে আরো বৃহত্তর জোট গঠনে উদ্বুদ্ধ করবে। হয়তো জামায়াতে ইসলামীকে আরো দীর্ঘদিন দেশের স্বাধীন সত্তার হেফাযতের প্রয়োজনেই জোটবদ্ধ থাকতে হবে।

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট থেকে সুপরিকল্পিত ব্যাপক বোমা হামলার মাধ্যমে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যারা আগামী নির্বাচনকে বানচাল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে, তাদেরকে দমন করার জন্য আওয়ামী লীগ জোট সরকারের সাথে সহযোগিতা

করতে অস্বীকার করেছে। বোমাবাজিকে সরকার পতনের সহায়ক মনে করে পাগলের প্রলাপের মতো শেখ হাসিনা বলেছেন, 'সরকার নিজেই বোমাবাজি করছে'। এ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগবিরোধী সকল জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্যবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

দেশের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ইসলামকে হেফাযতের প্রয়োজনে আগামী নির্বাচনেও জামায়াতকে বাধ্য হয়ে জোটভুক্ত থেকে নির্বাচন ও সরকার গঠন করতে হতে পারে।

১৯৯১ সালে দেশে এ রকম বিপর্যয়কর পরিস্থিতি ছিল না। ১৯৭৫ সালের আগস্ট ও নভেম্বর বিপ্লবের পর দেশে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যে, আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে আর ক্ষমতাসীন হতে পারবে না বলেই ধারণা ছিল। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সকল নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যে সংখ্যক আসন পেয়েছে, এর চেয়ে অগ্রসর না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সুফল হিসেবে বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়া সত্ত্বেও তারা কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিকে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করার কারণে জামায়াতে ইসলামীকে বাধ্য হয়ে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিকে শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আওয়ামী লীগের সাথে সরকারবিরোধী আন্দোলন করতে হয়।

বিএনপির এ আজব ভূমিকার ফলেই ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তারা পরাজিত হয়, জামায়াত বিধ্বস্ত হয় এবং এরশাদের জাতীয় পার্টির সমর্থনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হতে সক্ষম হয়। ইতঃপূর্বে আমি কয়েক কিস্তিতে 'শেখ হাসিনা বাংলাদেশের কী কী সর্বনাশ করেছেন?' শিরোনামে তাঁর পাঁচ বছর শাসনামলের কাহিনী লিখেছি, যার বিবরণ 'জীবনে যা দেখলাম'-এর পঞ্চম খণ্ডে রয়েছে। তাঁর এ দুঃশাসন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতটা পাল্টে দিয়েছে যে, জামায়াত ১৯৯১ সালের পলিসি পরিবর্তন করে ২০০১ সালে জোট সরকারে যোগদান করা অপরিহার্য মনে করেছে।

বেগম খালেদা জিয়া সহযোগিতা চাইলেন

সাধারণত নির্বাচনের পর অবিলম্বেই রাষ্ট্রপ্রধান পার্লামেন্ট নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে সরকার গঠনের আহ্বান জানান। কিন্তু ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী না হওয়ায় প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিনকে ঘোষণা করতে হয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের সমর্থন কার পক্ষে, তা না জানা পর্যন্ত সরকার গঠন সম্ভব হচ্ছে না।

ড. জি ডব্লিউ চৌধুরী ঘটনাক্রমে আমার পুরনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ও সেনাপ্রধান জেনারেল নুরুদ্দীন খানের শিক্ষক। ড. চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক থাকাকালে ঐ দুজন তাঁর সরাসরি ছাত্র ছিলেন। বেগম খালেদা জিয়ার সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তিনিই নিলেন। আমি তাঁকে জানালাম, এ সাক্ষাৎকালে জেনারেল সাহেবকে উপস্থিত থাকতে হবে, যাতে একজন অরাজনৈতিক দায়িত্বশীল ব্যক্তি সাক্ষী থাকেন।

রাজনৈতিক নেতারা কথা দিয়ে কথা রাখেন না বলে গুজব রয়েছে। তাই বাইরের অন্তত দুজন সাক্ষী থাকলে ভালো হয়। একজন তো ড. চৌধুরী আছেনই, আরেকজন প্রয়োজন। দুটো রাজনৈতিক দলের নেতা উভয়ের সম্মতিতে যেকোনো জায়গায় সাক্ষাৎ করতে পারেন। কিন্তু তাদের সাথে সেনাপ্রধান অরাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত থাকা স্বাভাবিক নয়। তিনি আমাকে ফোন করে প্রস্তাবিত বৈঠকে উপস্থিত হতে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, আপনিই এ বৈঠকের প্রস্তাবক। আপনাকে ছাড়া আমি সাক্ষাৎ করব না। বাধ্য হয়ে তিনি রাজি হলেন।

ড. চৌধুরীর বাড়িতে বৈঠকের স্থান নির্ধারিত হলো। মার্চের প্রথম সপ্তাহের কোনো একদিন রাত ১০টায় বৈঠকের সময় ঠিক হয়, যাতে খাওয়ার ঝামেলা না থাকে। আমি জামায়াতের নির্বাচিত ১৮ জন এমপির প্রতিনিধি হিসেবে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে সাথে নিয়ে গেলাম। বেগম জিয়া তাঁর দলের পার্লামেন্টারি পার্টির লিডার, আর নিজামী সাহেব জামায়াতের পার্লামেন্টারি পার্টির লিডার। এ উপলক্ষে দুজনের সাথে পরিচয় হওয়াও প্রয়োজন।

ড. চৌধুরীর বাড়িতে রাত ১০টার পর বেগম জিয়া, আমি, নিজামী সাহেব ও জেনারেল খান আলোচনায় বসলাম। চৌধুরী সাহেব উপস্থিত থাকলেও আলোচনায় শরীক ছিলেন না। মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালনের কারণেই জেনারেল খান আলোচনায় অংশ নেন।

বেগম জিয়ার দিকে সবাই চেয়ে থাকায় তিনি বুঝলেন যে, তাঁকেই প্রথম কথা বলতে হবে। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমার এ ধারণা হয়েছে যে, বিএনপিকে সরকার গঠনে সহযোগিতা করার বিষয়টি জামায়াতে ইসলামী বিবেচনা করছে। তাই আমি আপনার সহযোগিতা পাওয়ার আশায় এখানে এসেছি।' আমি বললাম, 'মাওলানা নিজামীকে জামায়াতের এমপিগণের নেতা হিসেবে আপনার সাথে পরিচয়ের উদ্দেশ্যে সাথে এনেছি। এমন চমৎকার একটি জাতীয় নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর নির্বাচিতদের সরকার গঠনে বিলম্ব হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। জনগণ আপনাকে যেসংখ্যক আসন দিয়েছে এর সাথে জামায়াতের ১৮ জন এমপি সমর্থন দিলেই সরকার গঠন সম্ভব। তাই আপনি সমর্থন চাইলে আমরা সম্মতি দেব বলেই এসেছি। আমাদের সমর্থন নিয়ে আপনি সরকার গঠন করতে পারেন এবং প্রেসিডেন্টকে এ কথা জানাতে পারেন।

দৃশ্যত, তিনি খুবই উৎফুল্ল হয়ে শুকরিয়া জানালেন। স্বাভাবিক কারণেই তিনি তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বুঝতে পারলাম, আমরা সরকারে শরীক হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে তিনি কিছু জানতে চান। এ বিষয়ে প্রশ্ন না করাই বোধ হয় তিনি সমীচীন মনে করলেন। প্রশ্নের অপেক্ষায় না থেকে এবং তাঁকে প্রতীক্ষায় না রেখে আমি স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলাম, আপনি এককভাবেই সরকার গঠন করুন, মন্ত্রিত্বের প্রতি আমাদের লোভ নেই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে আমরা আপনাকে সরকার গঠনে সমর্থন জানাচ্ছি। আমাদের দলীয় কোনো স্বার্থই দাবি করছি না। তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত হলেন।

সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে ৩০ জন মহিলা এমপি নির্বাচিত হবেন। এ বিষয়ে তিনি কোনো কথা তুললেন না। তাই আমি বললাম, জামায়াতের ১৮ জন এমপি রয়েছে এবং তাঁরাও মহিলা এমপি নির্বাচনের ভোটার। সরকার গঠনে আমরা সহযোগিতা করছি বলে আমরা কোনো অতিরিক্ত দাবি করব না। বিএনপি ও জামায়াতের নির্বাচিত এমপির মোট সংখ্যার অনুপাতে কমপক্ষে তিনজন মহিলা এমপি জামায়াতের প্রাপ্য।

এ কথা শুনে তিনি এমনভাবে নড়েচড়ে উঠলেন, মনে হলো এ রকম দাবি জামায়াত করবে বলে তিনি কল্পনাও করেননি। হয়তো তিনি মনে করেছেন, জামায়াত মহিলাদের পর্দার পক্ষে হিসেবে মহিলা এমপি নিতেই চাইবে না। তাই আমার কথা শুনে তিনি হকচকিয়ে রইলেন। আমার কথার কোনো জবাবই দিতে পারছিলেন না। একেবারেই চুপ করে রইলেন। জেনারেল নুরুদ্দীন খান মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতে গিয়ে আমার সাথে কোনো পরামর্শ ছাড়াই বলে ফেললেন, ম্যাডাম! দুটো মহিলা আসন ছেড়ে দিলে ভালো হয়। কমপক্ষে তিনজন আমাদের ন্যায্য পাওনা হওয়া সত্ত্বেও মধ্যস্থতাকারী একটা মত প্রকাশ করলে আপত্তি করা শোভনীয় নয় বলে আমি তাতেই রাজি হয়ে গেলাম।

সর্বশেষ ইস্যু ছিল ১০টি আসনে উপনির্বাচন। নির্বাচনে বেগম জিয়া পাঁচটি, এরশাদ পাঁচটি, শেখ হাসিনা দুটি ও আওয়ামী লীগের আব্দুর রাজ্জাক দুটি আসনে বিজয়ী হন। তাই তাদের একটি আসন রেখে বাকি সব আসন থেকে পদত্যাগ করতে হবে। এভাবে বেগম জিয়ার চারটি, এরশাদের চারটি এবং শেখ হাসিনা ও আবদুর রাজ্জাকের একটি করে আসন শূন্য হবে। মোট ১০টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আমি বেগম জিয়াকে বললাম, আপনার চারটি শূন্য আসনের একটাও আমরা দাবি করব না, এরশাদের চারটি আসনের মধ্যে রংপুরের মিঠাপুকুর ও গঙ্গাচড়া আসন দুটিতে বিএনপি খুব কম ভোট পেয়েছে। এ দুই আসনে জামায়াত অনেক ভোট পেয়েছে। তাই উপনির্বাচনের ১০টি আসনের মধ্যে মাত্র এ দুটি আসনে বিএনপি যেন প্রার্থী দাঁড় না করায়। বাকি আটটি আসনে জামায়াত প্রার্থী দেবে না। কিঞ্চিৎ বিলম্বে হলেও তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। আমি শুকরিয়া জানালাম।

উক্ত বৈঠকে বেগম জিয়ার ইস্যু ছিল একটিই– জামায়াতের সমর্থন পাওয়া। আমার দুটো ইস্যু ছিল– মহিলা আসন ও উপনির্বাচন। এসবের মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পর পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করে আমরা সবাই ড. চৌধুরীকে শুকরিয়া জানিয়ে বিদায় নিলাম।

২৪৬.

প্রেসিডেন্টের সাথে জামায়াতনেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ

বেগম জিয়ার সাথে ৮ মার্চ (১৯৯১) দিবাগত রাতে সাক্ষাৎ হলো। পরদিন ৯ মার্চ ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতের একটি প্রতিনিধি দল প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের সাথে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করতে গেল। প্রতিনিধি দলে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এমপি, জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ

মুজাহিদ, এডভোকেট শেখ আনসার আলী এমপি, আবদুল কাদের মোল্লা ও মুহাম্মদ কামারুজ্জামান শামিল ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'জানতে পারলাম, আপনারা নাকি বিএনপিকে সরকার গঠনে সমর্থন দিচ্ছেন?' খান সাহেব ইতিবাচক জবাব দিলে তিনি বললেন, তাহলে আপনারা লিখিতভাবে আমাকে জানান।

খান সাহেব বললেন, 'ইনশাআল্লাহ আগামীকালই আমরা লিখিতভাবে জানাব। আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে এসেছি। আমি জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর। নির্বাচিত আমীর হলেন অধ্যাপক গোলাম আযম। তিনি জন্মসূত্রে এ দেশের নাগরিক। অন্যায়ভাবে তাঁর নাগরিকত্ব হরণ করা হয়েছে। তাঁর নাগরিক অধিকার বহাল করার জন্য ১৫ বছর ধরে দাবি জানানো হচ্ছে। আমরা আশা করি, আপনি তাঁর নাগরিকত্ব বহাল করে ঐ অন্যায়ের প্রতিকার করবেন। বিচারপতি হিসেবে আমরা এ সুবিচার আপনার নিকট আশা করি। রাজনৈতিক সরকারের নিকট সুবিচার আশা করা যায় না।'

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আমি তাঁর ফাইলটা ভালো করে দেখেছি। আমার বুঝেই আসে না যে, তাঁর নাগরিকত্ব এত দিন পর্যন্ত কেন বহাল করা হলো না। আমি ওয়াদা করছি, সরকার গঠন করে জাতীয় সংসদকে চালু করার আসল দায়িত্ব পালন করার পর আমি এ কাজ অবশ্যই করব। আমি কখনো ওয়াদা খেলাফ করি না। এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।'

বিএনপির পক্ষ থেকে চিঠি এল

প্রেসিডেন্ট জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে লিখিত আকারে বিএনপিকে সমর্থন করার কথা জানাতে বলায় জামায়াত বিএনপিকে অবহিত করল যে, আপনারা জামায়াতের সমর্থন চাইলে লিখিতভাবে জানান। ১০ মার্চ বিএনপির তৎকালীন মহাসচিব ব্যারিস্টার আবদুস সালাম তালুকদার জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বরাবর সরকার গঠনে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধপত্র পাঠালেন।

মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১০ মার্চ জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে আমীরে জামায়াত বললেন, 'নিবাচনে জয়-পরাজয় আমাদের সাফল্যের আসল মাপকাঠি নয়। আল্লাহ্ তাআলা এ নির্বাচনে আমাদেরকে অনেক এগিয়ে দিয়েছেন। বিএনপির সাথে নির্বাচনী সমঝোতা হলে হয়তো আমরা আরো বেশি আসন পেতাম; কিন্তু তাতে আমাদের একক কৃতিত্ব হতো না।'

মজলিসে শূরার জরুরি এ অধিবেশনে নির্বাচনী পর্যালোচনা হয়। প্রত্যেক জেলার পক্ষ থেকে একজন করে পর্যালোচনা পেশ করেন। জেলার নির্বাচনী ফলাফল, ফলাফলের বিশ্লেষণ, জামায়াত কী সুফল পেল এবং জামায়াতের কী কী দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে ইত্যাদি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

সরকার গঠনে জামায়াত বিএনপিকে সমর্থন দেবে কি না– এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ক্ষমতায় অংশীদার না হয়ে সরকার গঠনে সহযোগিতা করতে হবে, যাতে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্নত হয়। তবে এ সুযোগে আমীরে জামায়াতের নাগরিকত্ব বহাল করার শর্ত আরোপ করতে হবে। জামায়াত নিঃস্বার্থভাবে সরকার গঠনে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছে। অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেওয়া নাগরিক অধিকার এ সময়ই বহাল করতে বাধ্য করতে হবে।

জামায়াতের সম্মতিসূচক চিঠি নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ

১১ মার্চ মজলিসে শূরার বৈঠক থেকেই দুপুরে সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এমপির নেতৃত্বে চার সদস্যের এক ডেলিগেশন প্রেসিডেন্টের নিকট গেলেন। অপর তিনজন হলেন জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জান ও এডভোকেট শেখ আনসার আলী এমপি।

সন্ধ্যা ৭টায় মাওলানা নিজামী প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতের রিপোর্ট পেশ করেন। মজলিসে শূরার লিখিত কার্যবিবরণীর রেজিস্টার থেকে উদ্ধৃত করছি :

'জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের সাথে সাক্ষাতের রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি বলেন যে, জামায়াত ও বিএনপির প্রতিনিধিগণ একসাথেই সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন। জনাব নিজামী আরো জানান যে, রাষ্ট্রপতি আমীরে জামায়াতের নাগরিকত্ব বহাল করার আশ্বাস দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করার অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করার জন্যও বলেছেন। পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা মজলিসে শূরাকে অবহিত করেন যে, রাষ্ট্রপতির আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার গঠনে জামায়াতে ইসলামী বিএনপিকে সমর্থন দেবে মর্মে পত্রটি প্রেসিডেন্টের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।'

এ বিষয়ে ৩১.১২.০৫ তারিখে মাওলানা নিজামী থেকে জানলাম যে, প্রেসিডেন্ট নাগরিকত্ব বহাল করে দেবেন বলে ওয়াদা করার পর বলেছেন, 'আমি কখনো ওয়াদা খেলাফ করি না। যে ওয়াদা খেলাফ করে সে মুনাফিক আর মুনাফিক কাফিরের চেয়ে অধিক ঘৃণ্য।'

মাওলানা নিজামী থেকে আরো জানা গেল, তিনি প্রেসিডেন্টের নিকট আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, সরকার গঠন হয়ে গেলে নাগরিকত্ব বহাল করার ব্যাপারে বিএনপি বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এর জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'এটা আমার দায়িত্ব। যদি তাঁরা আপত্তি করেন তাহলে আমি বলব, It is not your business.'

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার পরবর্তী অধিবেশনের কার্যবিবরণী থেকে জানা গেল, ১১ মার্চ জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি দল প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎকালে বিএনপির প্রতিনিধি জনাব এম সাইফুর রহমান প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন, বেগম জিয়া নাগরিকত্ব বহাল করার জন্য সম্মতি দিয়েছেন।

সরকার গঠনে জামায়াতের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা

১২ মার্চ (১৯৯১) সকল দৈনিক পত্রিকায় ব্যানার হেডিং-এ খবর বের হলো, 'সরকার গঠনে বিএনপিকে জামায়াতের নিঃস্বার্থ সমর্থন'। এ খবরে রাজনৈতিক মহল একদিকে স্বস্তিবোধ করে, অপরদিকে জামায়াত কোয়ালিশনে শরীক না হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করে।

ঐ দিনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। আমার পুরনো বন্ধু ড. জি ডব্লিও চৌধুরী ঐ দিন সন্ধ্যার পর গুলশানের একটি গেস্ট হাউজে কূটনীতিকদের সম্মানে ডিনারের আয়োজন করেন। ১০টি দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনার তাতে যোগদান করেন। আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স এবং কয়েকটি মুসলিম দেশের কূটনীতিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ড. চৌধুরী কূটনীতিক মহলে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন বলেই তাঁর দাওয়াতে তাঁরা সাড়া দিয়েছেন। এ ডিনারে তিনি অতিথি হিসেবে বেগম জিয়া ও আমাকে দাওয়াত দেন। এতে বাংলাদেশি অন্য কোনো ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। ড. চৌধুরীর মধ্যস্থতায় বিএনপি জামায়াতের সহযোগিতা অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং ঝুলন্ত পার্লামেন্টে সরকার গঠনের সংকট দূরীভূত হয়। এ বিরাট কাজ সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে ড. চৌধুরীর বিরাট অবদান থাকায় এবং দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হবে বলে কূটনীতিকগণ উৎসাহ নিয়েই ডিনারে হাজির হন।

আমি যথাসময়ে (রাত ৮টায়) হাজির হই। ড. চৌধুরী প্রথমে অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনারের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। অন্যদের সাথে পরিচয় করানোর আগেই হাইকমিশনার সাহেব আমার হাত ধরে তাঁর পাশে বসিয়ে জেরা করা শুরু করলেন। প্রথমেই বললেন, 'এমন আজব কথা কখনো শুনিনি যে, কোনো রাজনৈতিক দল 'ব্যালান্স অব পাওয়ার' হাতে পেয়ে চড়া মূল্য দাবি না করে সমর্থন দেয়। আপনারা এটা কেন করলেন? আপনাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য কী? রাজনৈতিক দল তো ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রচেষ্টা চালায়। আপনারা ক্ষমতায় শরীক হলেন না কেন?'

তিনি বেশ উচ্চৈঃস্বরেই কথাগুলো বলায় আশপাশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের দৃষ্টি আমাদের দিকে আকৃষ্ট হলো। সামনেই আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ও ব্রিটেনের হাইকমিশনার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আলাপ করছিলেন। তাঁরাও আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম, 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এ দেশকে একটি ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। ৩০০ আসনবিশিষ্ট পার্লামেন্টে মাত্র ১৮ জন এমপির শক্তি দিয়ে ঐ উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব নয়। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নয় বছর আন্দোলন করেছি। নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামীই কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। চমৎকার একটি নির্বাচনে ঝুলন্ত পার্লামেন্ট সৃষ্টি হওয়ায় সরকার গঠনে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী গণতন্ত্রের স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দলকে সরকার গঠনে সহযোগিতা করা কর্তব্য মনে করেছে।

জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় অংশগ্রহণ না করে দেশবাসীকে এ ধারণা দিতে চায় যে, মন্ত্রিত্ব দখল ও ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধা হাসিল করা জামায়াতের আসল উদ্দেশ্য নয়। জামায়াত 'পাওয়ার পলিটিক্স্'-এ বিশ্বাসী নয়। জামায়াত যে কল্যাণরাষ্ট্র কায়েম করতে চায়, সে বিরাট উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে পার্লামেন্টে দেশপ্রেমিক, সৎ ও যোগ্য লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। জামায়াত ঐ জাতীয় লোকদেরকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই সুযোগ এসেছে বলেই ক্ষমতায় অংশীদার হওয়া জামায়াত প্রয়োজন মনে করেনি।'

আরো বললাম, 'জামায়াত গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে। সরকারকে কল্যাণকর কাজে সমর্থন দেবে। বিরোধিতার উদ্দেশ্যে বিরোধিতা করবে না। দেশ ও জনগণের মঙ্গলের স্বার্থে প্রয়োজনে সরকারি নীতির সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা করবে। জামায়াত গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন আদর্শে বিশ্বাসী। জনগণের সমর্থন নিয়ে জামায়াত ক্ষমতা পেতে চায়।'

বলতে গেলে সেখানে আমি একটা বক্তৃতাই করে ফেললাম। সেখানে উপস্থিত সবাই অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আমার কথাগুলো শুনছিলেন। আমার ধারণা ছিল, হয়তো কেউ আরো কোনো প্রশ্ন করবেন; কিন্তু কেউ কোনো প্রশ্ন না করে আমার দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। পরিবেশের গাম্ভীর্য দূর করার উদ্দেশ্যে আমি উঠে সবার সাথে মুসাফাহা করলাম। তখন পারস্পরিক আলাপচারিতা শুরু হয়ে গেল।

ততক্ষণে রাত পৌনে ৯টা বেজে গেল। ঠিক ৯টায় ডিনার শুরু হওয়ার কথা। আমি সবাইকে শুনিয়েই উচ্চকণ্ঠে মেজবান ড. চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলাম, প্রধান অতিথি কখন পৌঁছবেন? তিনি সকলকে অবহিত করলেন, বেগম জিয়া ফোনে জানালেন যে, তিনি এক নির্বাচনী আসনে আটকা পড়েছেন। তাই আসতে বিলম্ব হচ্ছে।

মুন্সিগঞ্জ জেলার একটি আসনে নির্বাচন মুলতবি ছিল। নির্বাচনের কিছু দিন আগে একজন প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় ২৭ ফেব্রুয়ারি ঐ আসনে নির্বাচন হয়নি। ১৪ মার্চ (১৯৯১) নির্বাচনের তারিখ ধার্য হওয়ায় ১২ তারিখ রাত ১২টা নির্বাচনী প্রচারাভিযানের শেষ সময় ছিল। বেগম জিয়া তাঁর দলীয় প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণার উদ্দেশ্যে সেখানে গেছেন।

বেগম জিয়ার অপেক্ষায় মেহমানরা বিভিন্ন টেবিলে বসে আলাপচারিতার মাধ্যমে সময় কাটাচ্ছিলেন। ড. চৌধুরী এক টেবিলে আমার সাথে বসে বিলম্বের জন্য অস্বস্তি প্রকাশ করছিলেন। এ টেবিলে মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার ও কুয়েতের রাষ্ট্রদূত আমার সাথে কুশল বিনিময় করলেন। আমরাও সময়ক্ষেপণের প্রয়োজনেই আলাপে মগ্ন হতে বাধ্য হলাম।

রাত সাড়ে ৯টায় বেগম জিয়া ফোনে দুঃখ প্রকাশ করে জানালেন যে, তাঁর দলীয় প্রার্থীর পক্ষে রাত ১২টা পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারণায় বাধ্য হয়ে সেখানে অবস্থান করতে হবে বিধায় তিনি ডিনারে উপস্থিত হতে অক্ষম।

ড. চৌধুরী হতাশার সুরে বেগম জিয়ার অনুপস্থিতির জন্য কূটনীতিকদের নিকট ক্ষমা চাইলেন এবং ডিনারে অংশগ্রহণের জন্য তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন। আমাকে কিছু বলার জন্য ড. চৌধুরী অনুরোধ করলেন। সম্মানিত রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারগণের সাথে আমাকে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ায় আমি ড. চৌধুরীর প্রতি শুকরিয়া জানালাম। এ দাওয়াতে হাজির হওয়ায় কূটনীতিকগণকে আমার পক্ষ থেকে মুবারকবাদ জানালাম। বেগম জিয়া উপস্থিত হতে অক্ষম হওয়ায় আমিও দুঃখ প্রকাশ করলাম।

আধঘণ্টার মধ্যে খাওয়া শেষ হলে রাত ১০টায় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলো। স্বাভাবিক কারণেই ড. চৌধুরীকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখা গেল। তাঁর ডিনারের আয়োজনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে গেল। বিদায়ের সময় আমাকে কূটনীতিকদের নিকট জামায়াতের রাজনৈতিক পরিচয় তুলে ধরার সুযোগ দেওয়ার জন্য আবারও আমি ড. চৌধুরীর প্রতি আন্তরিক শুকরিয়া জানালাম।

জামায়াতে ইসলামী মনোনীত নির্বাচিত এমপিগণ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, জামায়াতের পক্ষ থেকে ২২২ জনকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে মাত্র ১৮ জন নির্বাচিত হন। নিম্নে তাঁদের তালিকা পেশ করা হলো। কারা কোন্ জেলার কোন্ আসন থেকে নির্বাচিত হন তাও উল্লেখ করা হলো :

১. মাওলানা আজিজুর রহমান চৌধুরী, দিনাজপুর-৬
২. মাওলানা শাহাদাতুজ্জামান, বগুড়া-২
৩. জনাব লতিফুর রহমান, নবাবগঞ্জ-৩
৪. মাওলানা নাছির উদ্দিন, নওগাঁ-৪
৫. মাওলানা আবু বকর শেরকুলী, নাটোর-৩
৬. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, পাবনা-১
৭. মাওলানা আবদুস্ সুব্হান, পাবনা-৫
৮. মাওলানা হাবিবুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা-২
৯. মাওলানা শাখাওয়াত হোসাইন, যশোর-৪
১০. মুফতী মাওলানা আব্দুস সাত্তার, বাগেরহাট-৪
১১. অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, খুলনা-৬
১২. এডভোকেট শেখ আনসার আলী, সাতক্ষীরা-১
১৩. জনাব কাজী শামসুর রহমান, সাতক্ষীরা-২
১৪. মাওলানা এ এস এম রিয়াছত আলী, সাতক্ষীরা-৩
১৫. জনাব গাজী নজরুল ইসলাম, সাতক্ষীরা-৫
১৬. ডা. এ কে এম আসজাদ, রাজবাড়ী-২
১৭. জনাব শাহজাহান চৌধুরী, চট্টগ্রাম-১৪
১৮. জনাব এনামুল হক মঞ্জু, কক্সবাজার-১

জামায়াতের মহিলা এমপি

১৯৯১ সালের ২৮ থেকে ৩০ এপ্রিল কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে জাতীয় সংসদে জামায়াতের পক্ষ থেকে দুজন মহিলাকে এমপি হিসেবে নির্বাচিত করার সুযোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। সংসদে মহিলাদেরকে পাঠানো সঠিক হবে কি না– এ বিষয়ে মজলিসে শূরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি বিধায় এ বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়। মজলিসে শূরা সর্বসম্মতিক্রমে জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য দুজন মহিলাকে মনোনীত করার পক্ষে রায় দেয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যে ৩০০ জন এমপি নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের ভোটেই ৩০ জন মহিলা এমপি নির্বাচিত হওয়ার কথা। বিএনপির ১৪০ জন এমপির সাথে জামায়াতের ১৮ জন এমপির ভোট শামিল না হলে মহিলা আসনগুলোতে বিজয়ী হওয়া সম্ভব হবে না। তাই মজলিসে শূরা মহিলা আসনের নির্বাচনের ব্যাপারে শর্ত দিল যে, নাগরিকত্ব বহাল করা না হলে জামায়াতের এমপিগণ যেন ভোট না দেন। কিন্তু মহিলা আসনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হওয়ায় বিএনপির ২৮ জন এবং জামায়াতের ২ জন এমপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই নির্বাচিত হন।

জামায়াতের ঐ দুজন মহিলা এমপি হলেন–

১. বেগম হাফেযা আসমা খাতুন
২. বেগম খন্দকার রাশিদা খাতুন

পর্দার প্রশ্ন

আমার ধারণা ছিল, জামায়াতের পক্ষ থেকে সংসদে মহিলাদেরকে এমপি করার ব্যাপারে কোনো কোনো মহল থেকে আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। কারণ, বোরকা পরে সংসদে গেলেও সেখানে তাঁরা বক্তব্য রাখবেন। যারা মহিলাদের কণ্ঠস্বরকেও পর্দার মধ্যে শামিল মনে করেন তারা এতে আপত্তি করতে পারেন; কিন্তু কোনো মহল থেকেই আপত্তি আসেনি। বরং জামায়াতের বাইরের কয়েক জন সচেতন আলেম আমার নিকট মন্তব্য প্রকাশ করলেন, 'আপনারা পার্লামেন্টে বোরকা ঢুকিয়ে দিলেন বলে আমরা অত্যন্ত খুশি।'

এ দুজন এমপি নির্বাচন কমিশন অফিসে এমপি হিসেবে শপথ নেওয়ার দিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, শপথ নেওয়ার সময় নেকাব খোলা ঠিক হবে কি না? আমি বললাম, জামায়াত এমন বয়সের দুজনকেই মনোনয়ন দিয়েছে, যে বয়সে পর্দা ফরয থাকে না। আপনারা যেহেতু এখনো নেকাব পরেন, সেহেতু নেকাব পুরা না খুলে ইরানি মহিলাদের মতো গাল ঢাকা রেখে নাক ও ঠোঁট খুলে শপথ নিতে পারেন। তাঁদের শপথ অনুষ্ঠান টেলিভিশনে দেখে আমার স্ত্রী প্রতিবাদ করে বললেন, আমরা যদি নেকাব খুলে ফেলি তাহলে কম বয়সের মহিলারাও এটা জায়েয মনে করবে। এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই এ দুজন এমপি নেকাবপরা অবস্থায়ই সংসদে বক্তব্য রাখতেন। তাঁদের যোগ্যতার কারণে সংসদে তাঁদের বক্তব্য শ্রদ্ধার সাথে সবাই শুনতেন।

২৪৭.

পঞ্চম সংসদের প্রথম অধিবেশন

১৯৯১ সালের ১১ মার্চ জামায়াতে ইসলামী বিএনপিকে সরকার গঠনে সমর্থন জানানোর এক সপ্তাহ পর ১৯ মার্চ বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রেসিডেন্টের নিকট শপথ গ্রহণ করেন। তাঁর সাথে ১০ জন মন্ত্রী ও ২১ জন প্রতিমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন।

৫ এপ্রিল (১৯৯১) নবনির্বাচিত পঞ্চম সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ সদস্যগণের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের কার্যক্রম শুরু হয়ে গেল। সংসদ সদস্যদের প্রথম কাজ ছিল ৩০ জন মহিলা এমপি নির্বাচিত করা। বিএনপি ও জামায়াতের এমপি মিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় আওয়ামী লীগ কোনো মহিলা প্রার্থীকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দাঁড় না করানোয় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই বিএনপির ২৮ জন ও জামায়াতের দুজন মহিলা এমপি নির্বাচিত হন।

বর্তমান অষ্টম জাতীয় সংসদে বিএনপির প্রায় ২০০ আসন থাকায় মহিলা আসনগুলো দখল করার কোনো প্রয়োজন ছিল না বলে সংসদে বিভিন্ন দলের আসনসংখ্যার অনুপাতে মহিলা আসন বন্টন করা হয়। আওয়ামী লীগ মহিলা আসন গ্রহণ না করায় তাদের জন্য বরাদ্দকৃত আসনগুলো অন্যান্য দলের মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টন করে দেওয়া হয়। ১৯৯১ সালের পঞ্চম সংসদে বিএনপির আসনসংখ্যা কম থাকায় সবগুলো মহিলা আসন দখল করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার প্রয়োজন হয়। শুধু দুটো আসন জামায়াতকে চুক্তি অনুযায়ী ছেড়ে দেওয়া হয়।

সরকারপদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্য

আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকারের পক্ষে ছিল; কিন্তু বিএনপি প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি সমর্থন করছিল। বিষয়টা নিয়ে রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি হলো।

১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের প্রথম শাসনতন্ত্রে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকারের বিধানই ছিল। ১৯৭৫ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান শাসনতন্ত্রের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি চালু করেন। ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত এ পদ্ধতিই চালু ছিল। ঐ বছর নির্বাচনের পর নির্বাচিত দলগুলোর মধ্যে সরকারপদ্ধতি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

সংসদীয় (পার্লামেন্টারি) পদ্ধতির সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান হিসেবে পৃথক পৃথক ব্যক্তি দায়িত্ব পালন করেন এবং সংবিধানে তাদের ক্ষমতা নির্দিষ্ট থাকে। প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারে একই ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান হন। এ পদ্ধতির মডেল হলো আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশে হুবহু এ পদ্ধতির সরকার নেই। সংসদীয় পদ্ধতির মডেল হলো ব্রিটেন। সকল গণতান্ত্রিক দেশেই এ পদ্ধতি চালু রয়েছে। আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি চালু থাকলেও সে দেশে গণতন্ত্র বহাল আছে বলে সবাই স্বীকার করে।

এ অজুহাতে স্বৈরশাসকরা আমেরিকার সরকারপদ্ধতির দোহাই দিয়ে তাদের সরকারকে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার বলে দাবি করেন। অথচ এ জাতীয় কোনো দেশেই সত্যিকার গণতন্ত্র চালু নেই।

প্রায় আড়াই শ' বছর আগে আমেরিকার ১৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র 'ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা (USA)' নামে একীভূত হয়। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় সেখানে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি ও ফেডারেল পদ্ধতি চালু হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা তাদের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সিনেট (Upper House) ও কংগ্রেসের (Lower House) কমিটি সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করে। তাই রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এক ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্টের পক্ষে স্বৈরশাসক হওয়া সহজ নয়। কিন্তু বহু দেশে স্বৈরশাসকরা প্রহসনমূলক নির্বাচন করে প্রেসিডেন্ট হয়ে দাবি করেন যে, তারা আমেরিকান পদ্ধতি অনুসরণ করছেন।

সরকারপদ্ধতি নিয়ে সমস্যা ও তার সমাধান

বিএনপি প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির পক্ষে থাকায় সরকারপদ্ধতি নিয়ে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হলো। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে তাঁর প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে বলে ওয়াদা করায় তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন এবং দেশের প্রথম নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কৃতিত্ব অর্জন করেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর আবার প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাওয়ার কোনো বিধান সংবিধানে নেই। তাই সংবিধান সংশোধন করে এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এ ব্যবস্থায় বিরাট জটিলতা রয়েছে। সংবিধানে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারের বিধান থাকায় এ জটিলতা সৃষ্টি হয়। যদি এ পদ্ধতি বহাল রাখা হয় তাহলে জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ তাঁর পদে ফিরে যেতে পারবেন না। যদি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার চালু করার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে জনগণের ভোটে নির্বাচনের প্রয়োজন থাকে না। তাই শাসনতন্ত্র সংশোধন করে সংসদীয় পদ্ধতি চালু করা হবে কি না– এ বিষয়ে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে সংসদীয় সরকারপদ্ধতির পক্ষে সম্মত করার উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হয়। জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বায়ক জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের লেখা বই 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন' থেকে এ বিষয়ে উদ্ধৃত করছি :

'এ বিষয়ে বিএনপি নেতৃবৃন্দের সাথে অনেকবার আলোচনা হলো। দেখা গেল, তাদের মধ্যে দুরকম চিন্তাধারাই বর্তমান। যারা সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে তারা আমাদের দৃঢ় থাকতে বললেন এবং বোঝাতে চাইলেন, আমরা শক্ত থাকলে বিএনপি সংসদীয় পদ্ধতিতে আসতে বাধ্য হবে। আমি বিএনপির চেয়ারপার্সন ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে কয়েক দফা বৈঠক করলাম। টেলিফোনে আলাপ করলাম অনেকবার। .... এদিকে আওয়ামী লীগ সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেছে। আমরা বিএনপিকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, বিল তাদের পক্ষ থেকে আনা হলেই কল্যাণ বেশি।

একপর্যায়ে গভীর রাতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া টেলিফোন করলেন। বললেন, আপনাদের ভারপ্রাপ্ত আমীরসহ আপনাদের সাথে বসতে চাই। পরের দিন গেস্ট হাউজ সুগন্ধায় সন্ধ্যা ৭টায় বসার জন্য সময় চূড়ান্ত হলো। যথাসময়ে জামায়াত-বিএনপি বৈঠক হলো। ঐ পক্ষে ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া, জনাব আব্দুস সালাম তালুকদার ও কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমান। আর এদিকে জামায়াতের পক্ষে ছিলেন জনাব আব্বাস আলী খান, আমি ও মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। বিএনপিনেত্রী সরকারপদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের মতামত জানতে চাইলেন। আমরা সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে মতের পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পক্ষে কিছু কথা বললেন। আমরা তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলাম। .... আমরা বুঝতে পারলাম, নেত্রী আমাদের চূড়ান্ত মনোভাব বুঝতে চেয়েছিলেন। বৈঠক সফল হয়েছে বলে পরস্পর আশাবাদ ব্যক্ত করলাম। প্রকৃতপক্ষে ঘটেছেও তাই। ঐ রাতেই বিএনপি সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং বিল পেশের ব্যবস্থা নেয়।

বিএনপির পক্ষ থেকে বিল পেশ করার পর আবার নতুন করে জটিলতা দেখা দেয়। ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর পদ ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রেও আমাদেরকে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতে হয়। .... বহুবার উভয় নেত্রীর সাথে আলাপ করতে হয়েছে। অবশেষে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়। এ সময়টা কতখানি নাজুক ছিল তা উভয় নেত্রী তো জানেনই; জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, ডা. বি চৌধুরী এবং কর্নেল মুস্তাফিজুর রহমানও ভালো করেই জানেন। কারণ, তাঁরা আমাকে ভূমিকা পালনে অনেক উৎসাহ দিয়েছেন।'

একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস

পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সরকারপদ্ধতি সম্পর্কে ঐকমত্য সৃষ্টি না হওয়ায় সংবিধান সংশোধন সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় অধিবেশনে সংসদীয় সকল দলের ঐক্যের ফলে সকল সংসদ সদস্যের সম্মিলিত সমর্থনে একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস হয়। একাদশ সংশোধনীতে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাঁর পূর্বপদে বহাল হওয়ার বিধান রয়েছে। দ্বাদশ সংশোধনীতে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারের বিধানসমূহকে সংবিধান থেকে উৎখাত করে সংসদীয় পদ্ধতির বিধান প্রতিস্থাপন করা হয়।

১০ আগস্ট (১৯৯১) রাতে বিল দুটো পাস হয়। মুজাহিদ সাহেবের ভাষায়, 'সেই দিন গভীর রাতে জাতীয় সংসদ ভবনে জাতীয় ঐক্যের যে নজির স্থাপিত হয় তা ভুলবার নয়। এ ঐক্য যেভাবে উৎসাহিত করেছিল, যেভাবে সমগ্র জাতিকে নাড়া দিয়েছিল, তা কি ভুলে যাওয়ার মতো! জনগণের তো এটাই প্রত্যাশা। .... দীর্ঘদিন পর জনতার আকাঙ্ক্ষার জয় হলো।'

গণতন্ত্রের শুভ সূচনা

কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারপদ্ধতি সম্পর্কে সকল রাজনৈতিক দলের মতৈক্য, সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন ও

বিরোধী দলের ঘোষণার পর এ ধারণা সৃষ্টি হলো যে, বাংলাদেশে বিলম্বে হলেও সত্যিকার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার শুভ সূচনা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সংবিধান রচিত হলেও শেখ মুজিব সংবিধান সংশোধন করে স্বৈরশাসন কায়েম করেন। ১৯৭৫ সালের আগস্ট ও নভেম্বর বিপ্লবের ১৫ বছর পর গণতন্ত্রের নবযাত্রা শুরু হলো।

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার জুলাই (১৯৯১) মাসের অধিবেশন

জামায়াতের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বছরে কমপক্ষে মজলিসে শূরার দুটো অধিবেশন করা বাধ্যতামূলক। একটি বছরের মাঝামাঝি সময়ে, আরেকটি ডিসেম্বরে। মধ্যবর্ষ অধিবেশনে বিগত বছরের জামায়াত ও পার্শ্ব-সংগঠনসমূহের রিপোর্ট গ্রহণ ও পর্যালোচনা হয়ে থাকে। সাংগঠনিক রিপোর্ট, বায়তুল মাল ও রাজনৈতিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রস্তাবাবলি গ্রহণ করা হয়। মুহাসাবার ঐতিহ্য অনুযায়ী আমীরে জামায়াত থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সকল পদাধিকারীর সংশোধনমূলক সমালোচনা করা হয়। এ অভিনব পদ্ধতির বদৌলতে জামায়াত সবসময় নেতৃত্বের কোন্দল ও উপদল সৃষ্টি হওয়া থেকে নিরাপদে রয়েছে।

ডিসেম্বরে বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে পরবর্তী বছরের কার্যাবলির পরিকল্পনা, বার্ষিক বাজেট গ্রহণ ও বাজেটের অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জেলা সংগঠনের মধ্যে তাদের সামর্থ্যানুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট– এ দুটো প্রধান বিষয় ছাড়া সাংগঠনিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য জরুরি বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জের হিসেবে মার্চ ও এপ্রিলে দুটো অধিবেশন ডাকা হয়। মার্চের জরুরি অধিবেশনে বিএনপিকে সরকার গঠনে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং এপ্রিলে নির্বাচনের পর্যালোচনা করা হয়।

জুলাই মাসের মধ্যবর্ষ অধিবেশনে নিয়মিত বিষয়সমূহ ছাড়াও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দুটি বিশেষ ইস্যু নিয়ে পর্যালোচনা হয়। ইস্যু দুটি হলো মাওলানা নিজামীর উপর হামলা এবং আমার নাগরিকত্ব।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর উপর হামলা

১৯৯১ সালের ২৭ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. মনিরুজ্জামান মিঞার আহ্বানে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে ভিসির পক্ষ থেকে জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানকে দাওয়াত দেওয়া হয়। খান সাহেব ঐ দিন ঢাকায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে তদানীন্তন সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এমপিকে পাঠাবেন বলে ভিসিকে ফোনে জানিয়ে দেন।

ভিসির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সদস্যগণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ মিলে ৫০/৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক চলাকালে

ছাত্রলীগের একটি মিছিল নিজামী সাহেবের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে সম্মেলনকক্ষে ঢুকে নিজামী সাহেবকে বৈঠক থেকে বহিষ্কার করার দাবি জানায়। ভিসি তাদেরকে বললেন, তিনি একজন এমপি এবং পার্লামেন্টে তিনি তোমাদের নেতাদের সাথেই বসেন। ওরা বলল, পার্লামেন্টের রাজনীতি আলাদা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবির নিষিদ্ধ এবং এখানকার রাজনীতিও আলাদা। ভিসিসহ কয়েকজন বুঝিয়ে বলার পর ওরা চলে গেল।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বৈঠক আবার শুরু করার সাথে সাথেই জাসদ ছাত্রলীগ, মুজিববাদী ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন সম্মিলিত হয়ে সম্মেলনকক্ষে প্রবেশ করে নিজামী সাহেবের উপর হামলা চালায়। নিজামী সাহেবের সাথে শুধু তাঁর সেক্রেটারি ফরহাদ ও নিয়াজ নামক জামায়াতকর্মী ছিলেন। এ গুণ্ডাবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য কোনো সংগঠিত শক্তি ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর তাদেরকে থামাতে চেষ্টা করে আহত হন। আহত অবস্থায় যখন নিজামী সাহেব মেঝেতে পড়ে গেলেন তখন গুণ্ডাবাহিনী চলে গেল। তিনি জ্ঞানহারা অবস্থায় কতক্ষণ ছিলেন তা জানা গেল না। তাঁকে জিজ্ঞেস করে এটুকু জানতে পারলাম যে, হামলা চলাকালে কারা তাঁকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন তা স্মরণ করতে পারলেন না। পরে ঐ ঘটনার ছবি থেকে জানতে পারলেন, ঘটনার সময় ভিসি হাত জোড় করে হামলাকারীদের প্রতি চেয়ে আছেন এবং প্রক্টরসহ কয়েকজন তাঁকে ঘিরে ছিলেন।

পুলিশ এসে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে থাকাবস্থায় গুরুতর আহত নিজামী সাহেবকে উঠিয়ে ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাঁকে দুই মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। মাথায় কয়েক জায়গায় সেলাই করতে হয়েছে। কোমরে এখনো যে সমস্যা রয়েছে তা ঐ সময়কার আঘাতেরই জের। হত্যার উদ্দেশ্যেই যে হামলাকারীরা আঘাত হেনেছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো নিহত হয়ে গেছে মনে করেই ওরা চলে গিয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও মন্ত্রীদের অনেকে তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যান। এ কাপুরুষোচিত হিংস্রতার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বিবৃতি দেন। মাওলানা নিজামীর উপর হামলার খবর পরদিন ব্যানার হেডিং-এ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এ বিষয়ে মজলিসে শূরার পর্যালোচনায় জানা যায় যে, ভিসির পক্ষ থেকে দাওয়াত পেয়ে জনাব আব্বাস আলী খান ধারণাই করতে পারেননি, এ ধরনের হামলা হতে পারে। তাই তিনি আমীরে জামায়াতকেও জানাননি। এমন আশঙ্কা করলে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়েই যাওয়া হতো। আল্লাহর খাস রহমতেই নিজামী সাহেব রক্ষা পেয়েছেন বলে মনে হয়। জামায়াতের ইতিহাসে এটা একটা মর্মস্পর্শী ঘটনা।

আমার নাগরিকত্ব ইস্যু

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে জামায়াতের নেতৃবৃন্দের নিকট পাকা ওয়াদা দেন যে, সরকার গঠন ও সংসদ অধিবেশন বসানোর দায়িত্ব পালনের পরই তিনি আমার নাগরিকত্ব বহাল করে দেবেন। এরপর কয়েক মাস চলে গেল; কিন্তু তিনি ওয়াদা পালন করলেন না।

মজলিসে শূরার সামনে এ বিষয়ের বর্তমান অবস্থা, সরকারের সাথে যোগাযোগ, তাদের মনোভাব এবং মামলা দায়ের করার আইনগত দিক সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করা হয়। মজলিসে শূরা সদস্যগণ এ বিষয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। শেষ পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার পূর্বসিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উপর সবাই একমত হন। এ বিষয়ে যথাসময়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শূরার পক্ষ থেকে পূর্বেই কর্মপরিষদকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল।

এ বিষয়ে আমীরে জামায়াত মন্তব্য করেন, মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আইনজীবীদের পরামর্শ অনুযায়ীই কর্মপরিষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

আমীরে জামায়াত নির্বাচনের প্যানেল ঘোষণা

জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আমীরে জামায়াত তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত মেয়াদ শেষ হলে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ মেয়াদের জন্য ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরের পূর্বেই নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। তাই জুলাই মাসের অধিবেশনেই আমীর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে তিনজনের প্যানেল নির্বাচন করতে হবে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্যগণ ঐ তিনজন নির্বাচিত করেন। যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩১ জুলাই অধিবেশনের শেষ দিন প্রধান নির্বাচন পরিচালক অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন। তিনি ১৯৯২-৯৪ সালের মেয়াদের জন্য প্যানেলের তিনজনের নাম জানিয়ে দেন। তাঁরা হলেন অধ্যাপক গোলাম আযম, জনাব আব্বাস আলী খান ও মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

রুকনগণ এ তিনজনের যেকোনো একজনকে আমীর হিসেবে নির্বাচিত করার উদ্দেশ্যে ভোট দেবেন। কেউ ইচ্ছে করলে এ তিনজন ছাড়া যেকোনো রুকনকে ভোট দিতে পারবেন। প্যানেল নির্বাচনের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, রুকনগণ এ তিনজনের মধ্যে একজনকে ভোট দিতে বাধ্য। প্যানেলের উদ্দেশ্য হলো, পূর্বে নির্বাচিত আমীরে জামায়াত ছাড়া আমীর নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য আরো দুটো নাম জানিয়ে দেওয়া। আমীরে জামায়াতের নাম সবাই জানেন। হাজার হাজার রুকনের মধ্যে এমন অনেক রুকন থাকতে পারেন, যারা আমীরে জামায়াত ছাড়া এ পদের যোগ্য কে কে আছেন তা জানেন না। তারা হয়তো বর্তমান আমীরকেই ভোট দিতে নিজেদেরকে বাধ্য মনে করতে পারেন। তাই প্যানেলের মাধ্যমে তাদেরকে বাছাই করার সুযোগ দেওয়া হয়।

জামায়াতে প্রার্থিতার বিধান নেই বলেই প্যানেল পদ্ধতির প্রয়োজন। পদপ্রার্থী থাকলে প্রার্থীদের কোনো একজনকে ভোট দেওয়া যায়। জামায়াতের সাংগঠনিক নির্বাচনে কোনো পদের প্রার্থী থাকে না বলে প্যানেলের বিধান রাখা হয়েছে।

আমীরে জামায়াতের সমাপনী ভাষণ

জামায়াতের ঐতিহ্য অনুযায়ী আমীরে জামায়াত মজলিসে শূরার অধিবেশনে উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণ পেশ করেন। এ অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে আমীরে জামায়াত বলেন :

১. জামায়াতের দায়িত্বশীলগণ সর্বস্তরের জনগণকে এ কথা বোঝাবেন যে, কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব

হয়েছে। জামায়াতই সর্বপ্রথম ১৯৮৩ সালে কেয়ারটেকার সরকারের প্রস্তাব পেশ করেছিল। যদি প্রধান দুটো রাজনৈতিক দল এ প্রস্তাব পূর্বে সমর্থন করত, তাহলে তখনই স্বৈরশাসনের অবসান হতো।

২. এ কথাও জনগণকে বোঝাতে হবে যে, তারা অবাধে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। তারা যে ধরনের লোকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন, সে মানের খিদমতই তারা পাবেন। যথার্থ খিদমত পেতে চাইলে ভবিষ্যতে সৎ লোকদেরকেই নির্বাচিত করতে হবে।

৩. জনগণকে জানাতে হবে যে, গণতন্ত্রকে বহাল রাখার প্রয়োজনে জামায়াত ঐ দলকেই সরকার গঠনের সুযোগ করে দিয়েছে, যে দলকে জনগণ সংসদে সবচেয়ে বেশি আসনে বিজয়ী করেছে।

৪. জামায়াত ইচ্ছে করলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে সরকারি ক্ষমতার অংশীদার হতে পারত; কিন্তু জামায়াত সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে সমর্থন দিয়েছে। এখন জামায়াতে ইসলামী বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে। সরকারের ভালো কাজে সমর্থন দেবে, আর ভুল-ভ্রান্তি দেখলে সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা করবে– গণতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী এটাই বিরোধী দলের কর্তব্য।

৫. ব্যাপকভাবে জনগণের নিকট এ কথা পৌঁছাতে হবে যে, তাদের যত সমস্যা রয়েছে, এর সত্যিকার সমাধান যদি তারা চায় তাহলে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে হবে। কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তারা স্বাধীনভাবে আল্লাহর আইনের পক্ষে ভোট দিতে পারবে। তারা যে দলকে ক্ষমতায় বসাবে, সে দলের কার্যাবলির জন্য তারাই আল্লাহর কাছে দায়ী হবে।

২৪৮.

১৫ সেপ্টেম্বরের গণভোট

১৯৯১ সালের ১০ আগস্ট সংবিধানের ১১ ও ১২ নং সংশোধনী পাস হওয়ার পর সংবিধানের দাবি পূরণের জন্যই গণভোটের প্রয়োজন হলো। সংবিধান সংশোধনের সাধারণ ইখতিয়ার জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের থাকলেও কোনো মৌলিক পরিবর্তন করা হলে তা গণভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত করার নির্দেশ সংবিধানেই রয়েছে। এ কারণেই ১৯৭৭ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিবর্তন করার পর তা গণভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়। ঐ নীতি অনুযায়ীই ১২ নং সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন একটা মৌলিক সংশোধন বিধায় বিষয়টি গণভোটের জন্য পেশ করা হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর (১৯৯১) গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির বদলে সংসদীয় পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতিতে হওয়ায় গণভোটে এর পক্ষে জনগণ একচেটিয়া সমর্থন জানায়।

৮ অক্টোবরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

সংবিধানের ১২ নং সংশোধনী অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের ভোটেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি অনুযায়ী জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার বিধান সংবিধানে ছিল। সে অনুযায়ী '৭৮ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং ১৯৮১ সালের নভেম্বরে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার এবং স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদ দুবার প্রহসনমূলক নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন।

১৯৯১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিএনপির পক্ষ থেকে জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

জামায়াতের ২০ জন (দুজন মহিলা) এমপির ভোটের দাবি নিয়ে দুজনই আলাদা আলাদা সময় আমার বাড়িতে সাক্ষাৎ করতে এলেন। যে দুদলের পক্ষ থেকে তাঁরা প্রার্থী হলেন, সে দুদল আমাকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য করে না। কিন্তু গরজ বড়ই বালাই। তাঁরা জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীরের নিকট গেলেন না। তাঁরা আসল আমীর চিনতে ভুল করেননি। আমি তাঁদেরকে সাদরে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করলাম।

জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার দুই বছরের জুনিয়র ছিলেন এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকতেন। আমি ভিন্ন হলে থাকতাম। এ সত্ত্বেও তিনি আমার সাথে যোগাযোগ রাখতেন। ছাত্রজীবনের পর রাজনৈতিক জীবনেও দুজন দুদলে আছি। তবুও তাঁর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বহাল রইল। এর জন্য আমার চেয়ে তাঁর কৃতিত্বই বেশি।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ভোট দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি। আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে এরশাদের জাতীয় পার্টির ৩৫টি ভোট দিলেও জামায়াতের সমর্থন ব্যতীত এ দলের প্রার্থী জয়ী হতে পারে না। বিএনপি ২৮ জন মহিলা এমপিসহ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। জামায়াত ভোট দিচ্ছে না জেনে এরশাদের দলও ভোট দেওয়া থেকে বিরত রইল। তারা বুঝতে পারল, তারা ভোট দিলেও আওয়ামী লীগপ্রার্থী জয়ী হবে না।

আমি বন্ধু আবদুর রহমান বিশ্বাসকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে জানিয়ে দিলাম, জামায়াতের ভোটের প্রয়োজন হবে না; আপনি নিশ্চিতভাবেই জয়ী হচ্ছেন। জামায়াতের ভোট মাত্র ২০টি। জামায়াত ভোট না দেওয়ার ফলে এরশাদের জাতীয় পার্টির ৩৫টি ভোট আওয়ামী লীগ পেল না। এভাবে তিনি ভালো ব্যবধানে বিজয়ী হলেন। ৮ অক্টোবর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলো এবং পরদিনই তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন।

বন্ধুবর আবদুর রহমান বিশ্বাস প্রেসিডেন্ট হিসেবে পাঁচ বছর বঙ্গভবনে অবস্থানকালে বন্ধুত্বের হক আদায় করতে ভুলেননি। মাঝেমধ্যে ফোনে কুশল বিনিময় করতেন। বঙ্গভবনে যত অনুষ্ঠান হয়েছে, প্রত্যেকটিতেই আমি দাওয়াত পেয়েছি। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই বঙ্গভবনে আমন্ত্রিতদের তালিকা থেকে আমার নাম অপসারণ করা হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর আমারই

সাথে বেগম খালেদা জিয়া জামায়াতের সমর্থনলাভের উদ্দেশ্যে বৈঠকে বসেন এবং আমাদের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেন। কিন্তু বঙ্গভবনে আমন্ত্রিতদের তালিকায় আমার নাম আজ পর্যন্ত শামিল হয়নি।

সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা

সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে প্রধানমন্ত্রী সরকারপ্রধান। মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদ দেশ শাসন করে। আর রাষ্ট্রপ্রধান শাসনতন্ত্রের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন। সরকার শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কাজ করছে কি না, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইন বিভাগকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করছে কি না, ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় আছে কি না ইত্যাদির প্রতি লক্ষ রাখা এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের উপর ন্যস্ত রয়েছে। তিনি দেশের শাসনকর্তা নন; কিন্তু যারা দেশ শাসন করছেন তারা শাসনতন্ত্র মোতাবেক দায়িত্ব পালন করছেন কি না, সেদিকে লক্ষ রেখে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর।

রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হলে তাঁর মর্যাদা এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে সরকারপ্রধান তাঁকে সমীহ করেন এবং তাঁকে আজ্ঞাবহ মনে না করেন। আমাদের শাসনতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীকে সংসদনেতা হিসেবে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাতে প্রেসিডেন্ট নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। তাঁর মর্যাদা মোটেই এমন নয় যে, তিনি সরকারকে নিজের পক্ষ থেকে পরামর্শ দেওয়ার সাহস পাবেন। সরকার পরামর্শ চাইলে তা দিতে হিম্মত করতেও পারেন।

প্রধান বিচারপতি হিসেবে অবসরগ্রহণের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে জনৈক সাংবাদিক কোনো এক সময় প্রশ্ন করেন, সরকার যদি আপনাকে প্রেসিডেন্টের পদ দিতে চায় তাহলে আপনি তা গ্রহণ করবেন কি না? তিনি জবাবে বললেন, 'আমি এমন পদে যোগদান করতে ইচ্ছুক নই, যার কবর যিয়ারত করা ছাড়া অন্য কোনো দায়িত্ব নেই।'

জাতীয় সংসদে বছরের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ দেওয়ার বিধান রয়েছে; কিন্তু সরকারের মন্ত্রিসভায় সে ভাষণ অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হয়। সরকারের মর্জির খেলাফ রাষ্ট্রপতি কোনো অভিমত প্রকাশ করতে পারেন না। প্রশ্ন হলো, সরকারের যাবতীয় কার্যকলাপকে সমর্থন করে ভাষণ দেওয়ার প্রয়োজন কী? প্রধানমন্ত্রী ও সরকারি দলই এ উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিষ্প্রয়োজন। অতএব রাষ্ট্রপ্রধানের পদে এমন ব্যক্তিকেই অভিষিক্ত করা উচিত, যিনি সরকারকে উপদেশ দিতে পারেন, দেশ ও জাতির কল্যাণে কোনো পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন নিয়ে ভাষণ দিতে হলে তা অত্যন্ত বেমানান।

২০০১ সালে জোট সরকার ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। কিন্তু কোন্ আইনগত কারণে তাঁকে কয়েক মাস পরই পদত্যাগ করতে হলো, তা আমার জানা নেই। সরকারি দলের মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই পদত্যাগ করতে হতো না। এ অবস্থা রাষ্ট্রপতি পদের জন্য কোনোক্রমেই শোভনীয় নয়।

সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনপদ্ধতি

ইংল্যান্ড হলো সংসদীয় গণতন্ত্রের মডেল। সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান হলেন ব্রিটিশ ক্রাউন। তিনি নির্বাচিত নন। গণতন্ত্র চালু হওয়ার পূর্বে সেখানে রাজতন্ত্রই ছিল। তখন রাজা বা রানীই শাসক ছিলেন। গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ সত্ত্বেও তারা রাষ্ট্রপ্রধানের বেলায় রাজতন্ত্রকে বহাল রেখেছেন। ব্রিটিশ ক্রাউন (Crown) সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। জনগণের নিকটও অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। সরকার যেমন রাষ্ট্রপ্রধানকে উচ্চ মর্যাদা দেয়, তেমনি রাজা বা রানীও পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সরকারের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে উপদেশ ও পরামর্শ দেন, যা সরকার সাদরে গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের সংসদীয় গণতন্ত্রকেই সরকারপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছে; কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ব্রিটিশ ক্রাউন কোথায় পাবে? বর্তমানে যেভাবে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয় তাকে ব্রিটিশ ক্রাউনের মর্যাদা সম্পন্ন বিকল্প হিসেবে গণ্য করা যায় না। তিনি সরকারি দলের একান্ত অনুগৃহীত হওয়ায় পরম অনুগত হতে বাধ্য। কারণ, সরকারপ্রধান কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন।

বিভিন্ন দেশে এ সমস্যার সমাধান

অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা ব্রিটিশ ক্রাউনের বিকল্প হিসেবে গণ্য রাষ্ট্রপ্রধান জোগাড় করার জন্য ব্যবস্থা করেছে। তারা দলনিরপেক্ষ একজন ব্যক্তিকে বাছাই করে ব্রিটিশ ক্রাউনের নিকট পেশ করে এবং ব্রিটিশ ক্রাউন তাকে ঐ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করে। দেশের সরকার তাঁকে অপসারণ করার ক্ষমতা রাখে না। এমন রাষ্ট্রপ্রধান সরকারের আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য নয়। ব্রিটিশ ঐতিহ্য অনুযায়ী ঐ দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মূল ভূমিকা পালন করে থাকেন। ভারত ভিন্নভাবে এ সমস্যার সমাধান করেছে। ভারতে ফেডারেল সরকারপদ্ধতি চালু আছে। সে দেশে মোট ২৫টি প্রদেশ রয়েছে, যা রাজ্য নামে পরিচিত। প্রতিটি রাজ্যে জনগণের নির্বাচিত আইনপরিষদ রয়েছে। কেন্দ্রে যে দলের সরকার রয়েছে, সকল প্রদেশে সে দলের সরকার নেই। তা ছাড়া কেন্দ্রে ও রাজ্যসমূহের আইনপরিষদে বহু রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছে। কেন্দ্রের উচ্চপরিষদে ছোট-বড় সকল রাজ্যের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি রয়েছে। কেন্দ্রের উভয় পরিষদের সদস্যগণ ও সকল রাজ্য সরকারের আইনপরিষদের সদস্যগণের সমষ্টি মিলে ভোটার তালিকা বিরাটসংখ্যায় পরিণত হয়। তারাই রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করেন। তাই এভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান কেন্দ্রের সরকারি দলের আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য নন এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েই তাঁকে সহজে অপসারণ করার ক্ষমতা রাখে না।

বাংলাদেশে কীভাবে ব্রিটিশ ক্রাউনের বিকল্প জোগাড় করা যায়?

বাংলাদেশের জনগণ বেশ কয়েকবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছে। যদি রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন তাহলে তিনি এমন মর্যাদার অধিকারী হবেন, যা সরকারি দলের নিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে হাসিল করা কিছুতেই সম্ভব নয়। জনগণের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি দেশবাসীর মুরব্বি ও অভিভাবকের মর্যাদা ভোগ করবেন। সরকারের আজ্ঞাবহ ও

অনুগত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান দেশের শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন। শাসনতন্ত্রে এ বিধান রাখতে হবে যে, যদি কোনো সময় সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে কোনো বিষয়ে এমন মতবিরোধ দেখা দেয়, যা পারস্পরিক আলোচনায় মীমাংসা করা যায় না, তাহলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ এর ফায়সালা করে দেবে।

কেউ কেউ আপত্তি তুলতে পারেন যে, জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে বিশাল অংকের টাকা ব্যয় করতে হবে। সরকারপ্রধানের সর্বশক্তিমান হওয়ার শঙ্কা থেকে দেশকে রক্ষা করার প্রয়োজনে ও ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পাঁচ বছরের মধ্যে একবার এ অর্থ ব্যয় করা দেশের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর। যদি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য পৃথক ব্যালট বাক্স রাখা হয় তাহলে একই খরচে উভয় নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব। পৃথক ব্যালট বাক্সের জন্য সামান্য বেশি খরচ হবে মাত্র।

বাংলাদেশে ইংল্যান্ডের মতো রাজা বা রানী বানানো সম্ভব নয়। ভারতের মতো ব্যবস্থা করারও কোনো উপায় নেই। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার মতো ব্যবস্থা করাও সম্মানজনক নয়। এ দুটো রাষ্ট্র একসময় ব্রিটিশ কলোনি ছিল। তাই তারা এটা মেনে নিয়েছে। আমরা ব্রিটিশের গোলামির বিরুদ্ধে দুই শ' বছর সংগ্রাম করে স্বাধীন হয়েছি। আবার ব্রিটিশ ক্রাউনের অধীন হতে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রস্তুত হওয়া আমাদের জন্য অসম্ভব।

তাই ব্রিটিশ ক্রাউনের বিকল্প হিসেবে গণ্য হওয়ার মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্রপ্রধান পেতে হলে জনগণের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প আছে বলে মনে হয় না।

মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন

১৯৯১ সালের ২৫ থেকে ২৯ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৈঠকে প্রধান নির্বাচন পরিচালক অধ্যাপক নাজির আহমদ সভাপতিত্ব করেন। প্রথমে তিনি ১৯৯২-৯৪ সালের মেয়াদের জন্য নির্বাচিত আমীরে জামায়াতের নাম ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি নবনির্বাচিত আমীরে জামায়াত হিসেবে আমাকে শপথবাক্য পাঠ করান। শপথগ্রহণের পর আমি বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে জনাব আব্বাস আলী খানকে আমার জন্য দোআ করতে অনুরোধ জানালাম। তিনি দোআয় আমি যেন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারি, সেজন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চান; দীর্ঘকাল যাবৎ নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে আমার প্রতি যে যুলুম করা হচ্ছে এবং এ কারণে ইসলামী আন্দোলনকেও যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, এর অবসানের জন্য আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন জানান। দোআর পর বৈঠক মুলতবি করা হয়।

পরবর্তী বৈঠক আমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ থেকে '৯৪ সেশনের জন্য নির্বাচিত মজলিসে শূরা সদস্যগণের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান আমাকেই পরিচালনা করতে হয়। মজলিসে শূরার স্বাভাবিক এজেন্ডার অতিরিক্ত একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যা আমি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি।

নির্বাচিত আমীর হিসেবে আমার নাম প্রকাশ্যে ঘোষণা করা

১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে আমি দেশে ফিরে আসার পর সেপ্টেম্বর মাসেই মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তক্রমে আমীরে জামায়াতের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আমার উপর আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ শেষ হলে ১৯৮০-'৮২ সালের মেয়াদের জন্য ১৯৭৯ সালের শেষদিকেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে প্রতি তিন বছর পরপরই নির্বাচন হয়ে আসছে। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত একটানা চারবার আমি আমীর নির্বাচিত হয়েছি; কিন্তু কোনোবারই আমার নাম সঙ্গত কারণেই প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়নি। ১৯৭৯ সালের মে মাস থেকে জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্যে তৎপরতা চালালেও আমীরে জামায়াত আন্ডারগ্রাউন্ডেই থাকতে বাধ্য হওয়ায় ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে জনাব আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতের রাজনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়েছিল। আমীরে জামায়াত হিসেবে আমি জামায়াতের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছিলাম।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী জাতীয় সংসদে ব্যালেন্স অব পাওয়ারের মর্যাদা পেয়ে সরকার গঠনের গুরুদায়িত্ব পালনের পর ১৯৯২-'৯৪-এর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত আমীর হিসেবে আমার নাম প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনবোধ হয়।

ভারপ্রাপ্ত আমীর পরিভাষাটি এ কথাই প্রকাশ করে যে, জামায়াতের প্রকৃত আমীর আর কেউ আছেন। তিনি কে, সে কথা সরকারের অজানা নয়। তাই নির্বাচনের পর সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে জামায়াত-প্রধানের সাথে যোগাযোগের জন্য যাঁরাই উদ্যোগ নিলেন, তাঁরা ভারপ্রাপ্ত আমীরের পরিবর্তে আসল আমীরের দরবারেই ধরনা দিলেন। যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন, তিনি জামায়াতের সমর্থনলাভের উদ্দেশ্যে আমীরের সাথেই বৈঠক করলেন। জামায়াতের সমর্থনে সরকার গঠনের পর জামায়াতের নির্বাচিত আমীরের নাম ঘোষণা করা সম্ভব কি না বা জরুরি কি না, সে বিষয়ে মজলিসে শূরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে বিবেচিত হলো।

ইস্যুটি আমিই তুলে ধরি

একটানা ১৩ বছর জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচিত আমীরের নাম প্রকাশ করা যায়নি। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর জামায়াত সরকার গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা নিঃস্বার্থভাবে পালন করেছে। সরকার গঠনকালে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট আমার নাগরিকত্ব বহাল করার ওয়াদা করা সত্ত্বেও তিনি ওয়াদা পালন না করে প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে গেলেন। তাঁর নিকট জামায়াতের সমর্থনসূচক চিঠি হস্তান্তর করার সময় মাওলানা নিজামীর সামনে বিএনপির প্রতিনিধি হিসেবে জনাব সাইফুর রহমান প্রেসিডেন্টকে জানালেন যে, আমার নাগরিকত্ব বহালের পক্ষে বেগম জিয়ার সম্মতি রয়েছে। এর পরও নাগরিকত্ব বহাল না হওয়ায় আমার মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

নাগরিকত্বের দাবি নিয়ে আদালতে মামলা করার সুযোগও পাওয়া যাচ্ছিল না। আইনজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আপনাকে দেশে থাকতে দিতে সরকার কোনো আপত্তি করছে না। তাই সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো কোনো ইস্যু ছাড়া মামলা দায়ের করা চলে না।

নির্বাচিত আমীর হিসেবে আমি প্রকাশ্যে দায়িত্ব পালন করতে চাই। জামায়াতের পক্ষ থেকে জনগণের নিকট আমি হাজির হতে পারছি না। এ অবস্থার অবসান হওয়া অত্যাবশ্যক। আমি কর্মপরিষদকে জানালাম, আমি আর আন্ডারগ্রাউন্ড আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে চাই না। যদি জামায়াত আমাকে নির্বাচিত আমীর হিসেবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়ার সিদ্ধান্ত না নেয় তাহলে আমি পদত্যাগ করব। জামায়াত পুনর্নির্বাচন করে অন্য একজনকে আমীর নির্বাচিত করে নেবে। মজলিসে শূরার অধিবেশনের ফাঁকে কর্মপরিষদের বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করলাম, যাতে এ সম্পর্কে মজলিসে শূরায় আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্বাভাবিক কারণেই কর্মপরিষদের সদস্যগণ অত্যন্ত বিব্রতবোধ করেন। এমনকি কেউ কেউ আমার কথায় অসুন্তষ্টিও প্রকাশ করেন।

আমি বললাম, আমীরে জামায়াত নির্বাচনের পূর্বেই আমার এ কথা উত্থাপন করা উচিত ছিল; কিন্তু নাগরিকত্ব বহাল হবে মনে করে তা করা হয়নি। এখন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করছি। মজলিসে শূরায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমি দাবি জানালে কর্মপরিষদ সম্মত হয়।

২৪৯.

বিচারপতি সাহাবুদ্দিন সুপ্রিম কোর্টে ফিরে গেলেন

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে পঞ্চম জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করেন। ১৯৯১ সালের অক্টোবরে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস দায়িত্ব গ্রহণ করলে তিনি তাঁর পূর্বপদে বহাল হন। তিনি আমার নাগরিকত্ব বহাল করার পাকা ওয়াদা করা সত্ত্বেও তা পালন না করেই প্রধান বিচারপতি পদে ফিরে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আমি তাঁর প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলাম। বিএনপি সরকার গঠনের পর আমার নাগরিকত্ব বহাল করতে আপত্তি করার আশঙ্কা প্রকাশ করলে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'তাহলে আমি তাদেরকে বলব, এটা আপনাদের ব্যাপার নয়'। এরপরও সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রধান বিচারপতি কেমন করে এভাবে ওয়াদা খেলাফ করতে পারলেন, তা এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে আমার অন্তরে বিরাজ করছিল।

বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের অবসরগ্রহণের পর–

১৯৯৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ বছরই কোনো এক সময় হঠাৎ একদিন আমার বন্ধু ড. জি ডব্লিও চৌধুরী আমার চেম্বারে এসে হাজির। তিনি বললেন, 'আমার

ছাত্র বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আমাকে চায়ের দাওয়াত দিয়ে তাঁর বাসায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। যাওয়ার পথেই আপনার বাড়ি। ভাবলাম, আপনার নাগরিত্ব বহালের ওয়াদা তিনি কেন পালন করলেন না তা তাঁকে জিজ্ঞেস করব কি না, সে বিষয়ে আপনার অভিমত কী তা জেনে যাই। তাই বিনা খবরেই এলাম।' বললাম, আমি তো তিনি প্রধান বিচারপতি থাকাকালেই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ থেকে নাগরিকত্ব ফিরে পেলাম। তাই তাঁর প্রতি আমার ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন মনে করি না। তবে আপনি যদি নিজের পক্ষ থেকেই তাঁর কাছ থেকে জানতে চান তাতে আমার আপত্তি নেই।

তিনি বিচারপতির সাথে সাক্ষাতের পর ফেরার পথে আবার আমার চেম্বারে হাজির হয়ে বললেন, 'আমাকে জিজ্ঞেস করতে হয়নি। তিনি নিজেই আপনার নাগরিকত্বের বিষয়টা তুললেন। আমি বিস্মিত হলাম যে, তিনি শুধু এ উদ্দেশ্যেই আমাকে ডেকেছেন। আপনার সাথে আমার সম্পর্ক তিনি জেনেছেন। আমার মাধ্যমে খবরটা আপনার কাছে পৌছবে জেনেই আমার সাথে ঐ বিষয়ে কথা বললেন। বেগম জিয়ার সাথে আপনার বৈঠকটি যে আমারই বাড়িতে বসেছিল, সে খবরও তিনি জেনেছেন।'

ড. চৌধুরী বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বক্তব্য উদ্ধৃত করলেন, 'আমি জীবনে কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করিনি। একটি মাত্র ওয়াদা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভঙ্গ হয়ে গেল বলে বিগত কয়েক বছর থেকে বিবেকের দংশন ভোগ করছি। অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহাল করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েই আমি জামায়াতের নেতাদের নিকট পাকা ওয়াদা দিয়েছিলাম। আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট ফাইলটি ভালো করে দেখেই বিস্মিত হয়েছি যে, তাঁর নাগরিকত্ব বহাল করতে বিলম্ব করা হচ্ছে কেন?

বিএনপির সরকার গঠন ও সংসদের অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন হয়ে যাওয়ার পর আমি উপযুক্ত সময় মনে করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ফাইলটি তলব করি। বারবার তাকিদ দিয়েও যখন ফাইলটি পেলাম না, তখন আমি কৈফিয়ত তলব করলাম। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানাল যে, ফাইলটি তালাশ করে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি অত্যন্ত বিব্রতবোধ করলাম। এমন আশঙ্কা করলে সরকার গঠনের পূর্বেই আমি ফাইলটি বঙ্গভবনে এনে রাখতাম। আমার ওয়াদা খেলাফের কৈফিয়ত আপনার কাছে দিয়ে বিবেকের বোঝা লাঘব করলাম।'

ড. চৌধুরীর নিকট এ কৈফিয়ত শোনার পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের প্রতি আমার অন্তরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ দূর হয়ে গেল এবং তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ করলাম। তিনি ড. চৌধুরীকে আমার নিকট তাঁর কৈফিয়ত পৌছানোর জন্য অনুরোধ করেননি। যদি তা করতেন তাহলে আমি ফোন করে তাঁকে মুবারকবাদ জানাতাম। অবশ্য তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, খবর আমার কাছে পৌছবেই।

আমি ১৯৯১ সালের ঘটনাবলি লিখছি। এর মধ্যেই ১৯৯৫ সালের উক্ত ঘটনা উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করেছি। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের ওয়াদা খেলাফের কারণে আমি এবং গোটা জামায়াত বিক্ষুব্ধ বলে আমার লেখায় প্রকাশ করেছিলাম। তাই ওয়াদা খেলাফের

জন্য তিনি যে অপরাধী নন, সে কথা জানার কারণে এ প্রসঙ্গের সাথেই তাঁর কৈফিয়ত উল্লেখ করা কর্তব্য বলে বিবেচনা করলাম। এ লেখার পাঠক-পাঠিকাগণ তাঁর মতো একজন বিবেকবান ব্যক্তি সম্পর্কে যাতে সঠিক ধারণা পান, সে উদ্দেশ্যেই লিখলাম।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আচরণ

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ আমার নাগরিকত্ব সংক্রান্ত ফাইলটি তলব করা সত্ত্বেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'ফাইল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না' বলে যে কৈফিয়ত দিয়েছে তা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। নিশ্চয় মন্ত্রীর নির্দেশেই ফাইল গায়েব রাখা হয়েছে। মন্ত্রীও নিজের একক সিদ্ধান্তে এ কাজ করার সাহস দেখাননি। সরকারের সর্বোচ্চ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ছাড়া মন্ত্রণালয় এমন আচরণ করতে পারে না।

ঐ সময় বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন জনাব আবদুল মতিন চৌধুরী, যিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর বাড়ি থেকে আমার বাড়িতে হেঁটে আসতে মাত্র ৫-৬ মিনিট লাগে। প্রত্যেক ঈদুল ফিতরে তিনি ঈদের নামাযের পর ঈদের পোশাকেই আমার বাড়িতে এসে ঈদ মুবারকের কোলাকুলি করতেন। এটা হলো ব্যক্তিগত ব্যাপার। তিনি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে মন্ত্রী হিসেবে দলীয় প্রধানের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য।

১৯৯১ সালের ১১ মার্চ বঙ্গভবনে মাওলানা নিজামী যখন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট বিএনপিকে সরকার গঠনে জামায়াতের সমর্থনসূচক চিঠি হস্তান্তর করেন তখন বিএনপির প্রতিনিধি হিসেবে জনাব সাইফুর রহমান ও জনাব আবদুল মতিন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সে সময় জনাব এম সাইফুর রহমান রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছিলেন, 'অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহালের ব্যাপারে বেগম জিয়ার আপত্তি নেই'। হয়তো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর মতের পরিবর্তন হয়েছে।

রংপুরের দুটো সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনে জামায়াতের প্রার্থীর বিরুদ্ধে ওয়াদা খেলাফ করে যিনি প্রার্থী দিতে পারেন, তিনি আমার নাগরিকত্বের ব্যাপারে মত পরিবর্তন করতেই পারেন। দলীয় স্বার্থ অবশ্যই বড়। ব্যক্তির চেয়ে দলের মর্যাদা বড় হওয়াই স্বাভাবিক। রাজনীতিতে এটা অবৈধ নয় বলেই মনে করা হয়। প্রচলিত রাজনীতিতে নৈতিকতা মূল্যহীন আর সততা গুরুত্বহীন।

আমীরে জামায়াত হিসেবে আমার নাম প্রকাশের ইস্যু

সরকার আমাকে বাংলাদেশের নাগরিক বলে স্বীকার না করায় আইনগতভাবে আমি বিদেশি। রাজনৈতিক দলের পদাধিকারী হিসেবে কোনো বিদেশি ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা বৈধ হতে পারে না। প্রত্যেক রাজনৈতিক দল দলীয় সদস্য হওয়ার জন্য দেশের নাগরিক হওয়াকে প্রথম শর্ত হিসেবে ঘোষণা করে থাকে। তাই সরকারিভাবে আমাকে নাগরিক হিসেবে স্বীকার না করা পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ইস্যু। এ অজুহাতে জামায়াতকে বেআইনি ঘোষণা করার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

১৯৯২-৯৪ মেয়াদের জন্য আমি আমীর নির্বাচিত হওয়ার পর এ ইস্যু জামায়াতকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে তোলে। হয় জামায়াত আমাকে পদত্যাগের অনুমতি দেবে, আর না হয় আমার নাম প্রকাশ করে বেআইনি ঘোষিত হওয়ার ঝুঁকি নেবে। এ সিদ্ধান্ত একমাত্র কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরাই নিতে পারে।

জামায়াতের নিকট এ কথা স্পষ্ট যে, জামায়াতের অগ্রগতি রোধ করার হীন উদ্দেশ্যেই সরকার আমার জন্মগত নাগরিকত্ব বহাল করছে না। শুধু একজন ব্যক্তির নাগরিকত্ব হিসেবে বিবেচনা করলে আরো অনেকের মতো আমার নাগরিকত্বের অধিকারও অনেক আগেই স্বীকার করা হতো। জামায়াতের নেতৃত্বে অবস্থান করার অপরাধেই (!) সরকার রাজনৈতিক জঘন্য উদ্দেশ্যে ১৩ বছর পর্যন্ত বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছে। আমাকে দেশ থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলে আমি কোর্টের আশ্রয় নিতে পারি বলেই সরকার চুপ করে আছে। আমি যদি বিদেশি নাগরিক হয়ে থাকি তাহলে বিনা ভিসায় ১৩ বছর আমাকে কীভাবে দেশে থাকতে দিল? এতে বোঝা যায়, আমার ব্যাপারে সরকারের অবস্থান দুর্বল। নাগরিকত্ব বহাল না করে যত দিন সম্ভব ঝুলিয়ে রাখার সিদ্ধান্তই হয়তো তারা নিয়েছেন।

মজলিসে শূরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ

এ বিষয়ে মজলিসে শূরায় দুদিনব্যাপী আলোচনা হয়। প্রায় সকল সদস্যই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আমার পদত্যাগের প্রস্তাব কেউ গ্রহণ করেননি। নাম প্রকাশের পক্ষেই প্রায় সকলে মত দেন; কিছুসংখ্যক সদস্য এতে যে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে তা উল্লেখ করে নাম প্রকাশ না করার পক্ষে অভিমত দেন। আলোচনা সমাপ্ত হওয়ার পর আমার দীর্ঘ মন্তব্য মজলিসে শূরার কার্যবিবরণী থেকে উদ্ধৃত করছি :

"যারা নাম প্রকাশের বিরুদ্ধে বলেছেন তাদের প্রধান যুক্তি হচ্ছে দুটি– (১) নাম প্রকাশের মাধ্যমে দেশের আইন অমান্য করা হবে। (২) সকল বিরুদ্ধবাদী মহল একযোগে সন্ত্রাস করবে, যার মোকাবিলা করা জামায়াতের পক্ষে সম্ভব নয়। আমীরে জামায়াত বলেন, আইনগত দিক দিয়ে কোনো সমস্যা আছে বলে তিনি মনে করেন না। আইনের দিক দিয়ে সরকার যা পারে তা হলো, জামায়াতকে বেআইনি ঘোষণা করা; কিন্তু সেটা এত সহজ নয়। প্রথমত, নাগরিকত্ব দেওয়ার ওয়াদা করে তারা দুর্বল হয়ে আছে। দ্বিতীয়ত, ১৩ বছর বিনা ভিসায় তিনি দেশে রয়েছেন। সুতরাং আইন ভঙ্গের ব্যাপারটি কোনো সমস্যা নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। অতঃপর সরকার তাঁকে জেলে বন্দী করতে পারে। তিনি বলেন যে, জেলের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। আইনজ্ঞগণ নাগরিকত্বের ব্যাপারে আসামি হয়ে আদালতে যাওয়াই উত্তম বলে যে পরামর্শ দিয়েছেন, সে অবস্থায় এরও সুযোগ হবে।

অন্যান্য মহলের বিরোধিতা এবং সন্ত্রাস সম্পর্কে তিনি বলেন, 'অন্যরা বিরোধিতা ও সন্ত্রাস করতে পারে এবং জামায়াতকেই এর মোকাবিলা করতে হবে। সুতরাং সিদ্ধান্ত জামায়াতের দায়িত্বেই হওয়া দরকার। আমি নিজে জড়িত বলে নিজ মত দিতে পারছি না।'

আইনের কথা উল্লেখ করে তিনি আবার বলেন, 'সরকার তাঁকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু সকল আইনজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত যে, তাঁকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া সম্ভব নয়।'

সবশেষে তিনি বলেন, 'নাম প্রকাশ করার জন্য এখনকার চেয়ে বেশি অনুকূল পরিবেশ আর কখনো আসবে কি না আমার জানা নেই।' তিনি আরো বলেন, 'নাগরিকত্ব বহাল করা হলে দুষ্ট লোকেরা হৈ চৈ করবে। এ জন্যই সরকার সে ঝামেলা নিতে চায় না।'

অতঃপর নাম ঘোষণা করা হবে বলে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।"

উক্ত অধিবেশনে সমাপনী ভাষণ

নবনির্বাচিত আমীরে জামায়াত হিসেবে উক্ত অধিবেশনে প্রদত্ত সমাপনী ভাষণের কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি মজলিসে শূরার কার্যবিবরণী থেকে :

'বক্তব্যের প্রথমেই আমীরে জামায়াতের নাম প্রকাশের সিদ্ধান্তের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, এ সিদ্ধান্ত কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়; বরং বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ। তবে ঝুঁকি একটা বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য জরুরি। এতে মনমরা ভাব ও দুর্বলতা কেটে যাবে এবং আন্দোলনে গতি ও প্রাণসঞ্চার হবে। তিনি বলেন, ঝুঁকি দেখে দুর্বলরা পিছিয়ে যায়; কিন্তু যারা সবল তারা এগিয়ে আসে। অতীতে বিভিন্ন আঘাতের সময় এরই প্রমাণ পাওয়া গেছে।

তিনি বলেন, জামায়াত শুধু শুধুই সংঘাত সৃষ্টির জন্য এ সিদ্ধান্ত নেয়নি; বরং জামায়াতের এ দাবি সঙ্গত। যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা যথার্থই হয়েছে এবং যথাসময়েই হয়েছে।

তিনি বলেন, আমি জনসভায় এখন সময় খরচ করতে চাই না। আসল কাজ হচ্ছে লোক তৈরি করা। আমি লোক তৈরির উদ্দেশ্যে জনশক্তির কাছে যেতে চাই।

তিনি আরো বলেন, রাজনৈতিক সমালোচনা করে আমি বক্তৃতা দিতে চাই না। রাজনৈতিক বক্তব্যের জন্য আরো যারা আছেন তারাই যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে জনাব আব্বাস আলী খানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। তিনিই পূর্বের ন্যায় জনসভা চালাবেন।

আমীরে জামায়াত বলেন, জামায়াতকে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের যোগ্য হতে হবে, যাতে জনগণ জামায়াতকে বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করে। জামায়াতকে গণসংগঠনে পরিণত করতে হবে।

তিনি ওলামায়ে কেরামের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য জোর তাকিদ দেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে কাজ বৃদ্ধি করতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। মহিলাঙ্গনে সংগঠন ব্যাপক করা, ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে দাওয়াত ব্যাপক করার জন্য তিনি সবাইকে অনুরোধ জানান।'

১৫ বছর পর ১৯৯১ সালের ঘটনাবলি লিখছি

২০০১ সালের নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগনেত্রীর আজব রাজনীতি ২০০৬ সালে এসে সংঘাতের রূপ ধারণ করেছে। দেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র বানানোর প্রচেষ্টার অন্ত নেই। দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রকে অচল করার হীন উদ্দেশ্যে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর দেশকে অস্থিতিশীল করে ২০০৭ সালের সংসদ নির্বাচনকে বানচাল করার সর্বাত্মক ষড়যন্ত্রে তিনি জঘন্যভাবে লিপ্ত। গণতন্ত্রের প্রতি সামান্য বিশ্বাসী হলেও তিনি বিদেশে দেশের বদনাম না করে দেশের জনগণের দরবারে ধরনা দিতেন এবং সংসদে ও সংসদের বাইরে গণতান্ত্রিক বিরোধী দলের যোগ্য ভূমিকা পালনে মনোযোগী হতেন। দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বিনা নির্বাচনে ক্ষমতা হাসিলের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলেই তিনি অগণতান্ত্রিক রাজনীতি করছেন।

এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক ও প্রতিবেশীর আধিপত্যবিরোধী জনগণ বেগম খালেদা জিয়াকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার রক্ষক রাজনৈতিক শক্তির প্রতীক মনে করছে। তাই দেশের সকল উল্লেখযোগ্য ইসলামী দল ও আলেম সমাজ ইসলাম ও দেশের স্বার্থেই শেখ হাসিনার অপরাজনীতির বিরুদ্ধে বেগম জিয়াকে সমর্থন করছেন। কিন্তু তিনি একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে দলীয় স্বার্থে ১৯৯১ সালে আমার সাথে তাঁর একটি চুক্তি ভঙ্গ করার বিষয়টি উল্লেখ না করে পারছি না।

উপনির্বাচনে বেগম জিয়ার ওয়াদা খেলাফি

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে কয়েকজন একাধিক আসনে নির্বাচিত হওয়ায় তাদেরকে ১০টি আসন ছেড়ে দিতে হয়। ৮ মার্চ আমার সাথে বেগম জিয়া যে বৈঠকে জামায়াতের সমর্থন কামনা করেন, সে বৈঠকে যে চুক্তি হয় তাতে তিনি ঐ ১০টি আসনের মধ্যে মাত্র দুটি আসন জামায়াতকে ছেড়ে দিতে রাজি হন। বাকি আটটি আসনে বিএনপি প্রার্থী দেবে বলে আমি সম্মত হই। উক্ত দুটি আসন থেকে এরশাদ সাহেব নির্বাচিত হন। রংপুরের মিঠাপুকুর ও গঙ্গাছড়া আসনে উক্ত নির্বাচনে বিএনপিপ্রার্থী নগণ্যসংখ্যক ভোট পান এবং জামায়াতপ্রার্থী বহু গুণ বেশি ভোট পান। এরশাদ সাহেবের ছেড়ে দেওয়া রংপুরে আরো দুটো আসনে জামায়াতপ্রার্থী বিএনপি থেকে অধিক ভোট পাওয়া সত্ত্বেও জামায়াত ঐ দুটো আসন দাবি করেনি। কারণ, ঐ দুটো আসনে মিঠাপুকুর ও গঙ্গাচড়া আসনের তুলনায় জামায়াত কম ভোট পেয়েছে।

জামায়াতের পক্ষ থেকে অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই ঐ দুটো আসন দাবি করা হয় এবং বেগম জিয়া তাতে সম্মত হন; কিন্তু বিস্ময় ও দুঃখের বিষয় যে, উপনির্বাচনে তিনি ওয়াদা খেলাফ করে ঐ দুটো আসনেও বিএনপি থেকে প্রার্থী দাঁড় করান। সংসদে ২৮টি মহিলা আসন পাওয়ার ফলে তাঁর বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা হাসিল হওয়ার পর ঐ দুটো আসনের জন্য চুক্তি ভঙ্গ করায় আমি বিস্মিত হওয়ার চেয়ে দুঃখই বেশি বোধ করেছি। জামায়াত ঐ দুটি আসন না পাওয়ার কারণে দুঃখবোধ করিনি। তাঁর মতো একজন উচ্চ

মর্যাদাসম্পন্ন দেশনেত্রী এমনটা করতে পারলেন বলেই দুঃখিত হয়েছি। ঐ চুক্তির সাক্ষী হিসেবে সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নুরুদ্দীন খানও এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করে মন্তব্য করেছেন, 'এ পর্যায়ের ব্যক্তিও ওয়াদা খেলাফ করতে পারেন, এ ধারণা আমার ছিল না।'

জামায়াতের আমীর হিসেবে নাম প্রকাশের প্রতিক্রিয়া

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর নির্বাচিত আমীর হিসেবে আমার নাম পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থি দল ও নেতৃবৃন্দের গায়ে আগুন লেগে গেল। তাদের পত্রিকাগুলো রীতিমতো হৈ চৈ শুরু করে দিল। জামায়াত একজন বিদেশি নাগরিককে দলীয় প্রধান নির্বাচিত করায় দলটিকে বেআইনি ঘোষণা করার প্রবল দাবি উত্থাপিত হলো। আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার জোর দাবি উঠল।

এ জাতীয় বিরোধিতার জন্য জামায়াত প্রস্তুতই ছিল। কিন্তু এসব উৎপাত বরদাশত করা ছাড়া জামায়াতের করণীয় কিছুই ছিল না। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ যদি তাঁর পাকা ওয়াদা অনুযায়ী নাগরিকত্ব বহাল করতেন তাহলে এ সমস্যা সৃষ্টি হতো না। এ পরিস্থিতিতে বিএনপি সরকারের পক্ষে তামাশা দেখা ছাড়া আর কিছু করণীয় ছিল বলে তারা মনে করেনি।

আওয়ামী লীগ, বামপন্থি দলগুলো ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে জনৈকা অধ্যাপিকা জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে 'যুদ্ধাপরাধী' হিসেবে আমার বিচারের উদ্দেশ্যে গণ-আদালত কায়েম করে প্রহসনমূলক নাটক মঞ্চস্থ করল। তথাকথিত গণ-আদালতের জজ, বাদীর পক্ষের উকিল, আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষী ইত্যাদি পদে অভিনয় করার জন্য বিভিন্ন লোক নিয়োগ করা হলো।

মুক্তিযুদ্ধে জাহানারা ইমামের এক ছেলে নিহত হওয়ায় তাঁকে 'শহীদ-জননী' উপাধি দিয়ে সারা দেশে তাঁর নেতৃত্বে আমার ফাঁসির দাবিতে জনসভা ও মিছিলের আয়োজন করা হলো, যাতে গণ-আদালতের পক্ষে বিরাট জনমত সৃষ্টি করা যায়।

গণ-আদালত নাটক সফল করার জন্য ঢাকা শহরে প্রতিদিন মিছিল ও আমার কুশপুত্তলিকা দাহ হচ্ছিল। আর কতক পত্রিকায় তা ফলাও করে প্রকাশিত হতে লাগল।

২৫০.

আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন

আমি বিদেশে বাধ্য হয়ে নির্বাসন জীবনযাপনকালে বারবার বাংলাদেশ সরকারের নিকট আমার নাগরিকত্ব বহালের আবেদন করে ব্যর্থ হয়ে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে আপন জন্মভূমিতে ভিসা নিয়ে বিদেশি হিসেবে প্রবেশ করি। একজন বিদেশির মতোই সরকারের নিকট নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য আবেদন জানাই। আমার আবেদন সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাতীয় সংসদে ঘোষণা করেন।

১৯৯১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৩ বছরই আমি জামায়াতের আমীর ছিলাম। পত্রিকায় ঘোষণা না দিলেও জনাব আব্বাস আলী খান ভারপ্রাপ্ত আমীর থাকায় সকলেরই স্পষ্ট ধারণা ছিল যে, জামায়াতের আমীর কে। '৯১ সালের ডিসেম্বরের ২৯ তারিখে পত্রিকায় ঘোষণা করা হলো যে, আমি ১৯৯২-৯৪ মেয়াদের জন্য জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হয়েছি।

সকল বামপন্থি ও ধর্মনিরপেক্ষবাদী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহল আমার বিরুদ্ধে কয়েক দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করল। আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার ও গ্রেফতার করে বিচার করার দাবিতে তারা সোচ্চার হলো। '৭১ সালে কৃত আমার অপরাধের (!) ফিরিস্তি প্রকাশিত হতে লাগল।

অথচ ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বিগত ২০ বছরে কোনো থানায় আমার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ কিংবা কোনো আদালতে আমার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা হলো না। বিশেষ করে ১৯৭৮ সালে দেশে ফিরে আসার পর আমার অবস্থান সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি সকল মহল অবহিত থাকা সত্ত্বেও কোথাও একটি মামলা দায়ের করা গেল না। এত বছর পর তাদের চেতনা হলো যে, আমার বিচার হওয়া প্রয়োজন। আসলে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণই আমার আসল অপরাধ (!)।

গণ-আদালত গঠন

আন্দোলনকারীরা জানে যে, আইনের চোখে আমার কোনো অপরাধ নেই এবং আদালতে আমার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করার উপায় নেই। তাই প্রহসনমূলক গণ-আদালত কায়েম করা ছাড়া মনের ঝাল মেটানোর কোনো পথ পেল না। দেশে আইন আছে, আদালত আছে। সে আদালতে বিচার করার জন্য মামলা করারও যাদের সাধ্য হলো না, তারা নিজেরাই বিচারকের অভিনয় করা অত্যাবশ্যক মনে করল। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তারা গণ-আদালত গঠনের ঘোষণা দিল।

দেশের আইনে তাদের এ আদালত গঠন সম্পূর্ণ অবৈধ এবং প্রকারান্তরে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক আচরণ। তাই এ বেআইনি আদালতের বিচারক হওয়ার জন্য যারা সম্মত হয়েছিলেন, তারা ইতিহাসের আদালতে জঘন্য অপরাধী হিসেবে গণ্য হতে বাধ্য। তাই ঐ সময়কার সংবাদপত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তাদের নাম স্থায়ীভাবে রেকর্ড করার প্রয়োজনবোধ করছি।

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের প্রধান সহকারী জনাব আলী আহমদের প্রতি আন্তরিক শুকরিয়া জানাই। তিনি যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় করে আমার জন্য ঐ সময়কার পত্রিকার কপি জোগাড় করে দিলেন। ঐসব পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকেই এ লেখা পরিবেশন করছি।

আমার বিশ্বাস, তথাকথিত গণ-আদালতের আয়োজকরা এ দেশের ইসলামী আন্দালনকে প্রতিহত করার জঘন্য উদ্দেশ্যেই কাজ করেছেন। তাই তারা আদালতে আখিরাতে পাকড়াও হতে পারেন। পত্রিকা থেকে জজদের তালিকাটি এখানে পেশ করছি :

গণ-আদালতের সদস্যবৃন্দ

১. জানাহারা ইমাম, চেয়ারম্যান

সদস্যবৃন্দ

২. গাজিউল হক এডভোকেট
৩. ড. আহমদ শরীফ
৪. স্থপতি মাজহারুল ইসলাম
৫. ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ
৬. ফয়েজ আহমদ
৭. প্রফেসর কবীর চৌধুরী
৮. কলিম শরাফী
৯. মওলানা আবদুল আওয়াল
১০. লে. ক. (অব.) কাজী নুরুজ্জামান
১১. লে. ক. (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী
১২. ব্যারিস্টার শওকত আলী খান

পত্রিকায় ঘোষণা করা হলো যে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ গণ-আদালত বিচারকার্য পরিচালনা করবে এবং লাখ লাখ জনতা সেখানে উপস্থিত থাকবে। জনগণের আদালত প্রমাণ করতে হলে এ উপস্থিতি অবশ্যই জরুরি বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনাব আবদুল মতিন চৌধুরী তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' কায়েম করে যখন সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছিল তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। এ ঘাদানি কমিটি যখন গণ-আদালত কায়েমের ঘোষণা দিল, তখনো মন্ত্রণালয় নিশ্চুপই ছিল। ঘাদানি কমিটির উচ্ছৃঙ্খল তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং রাজধানীতে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো।

এসব অপতৎপরতা রোধ করার পরিবর্তে ২৩ মার্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমার প্রতি শো-কজ নোটিশ জারি করে। তাতে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আমাকে কেন বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে না এবং আমার বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। আমি দেশে আসার ১৪ বছর পর আমার উপর এ আজব কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা হলো।

যে নোটিশ দিয়ে সরকার গ্রেফতারের সূচনা করল

আমার প্রতি জারিকৃত ২৪ মার্চ (১৯৯২) রাত ৩টায় প্রাপ্ত শো-কজ নোটিশের অনুলিপি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হলো :

তারিখ : ২৩-০৩-৯২ ইং

"প্রতি
প্রফেসর গোলাম আযম
পিতা- মৌলানা গোলাম কবির
বর্তমানে অস্থায়ীভাবে ১১৯, কাজী অফিস লেন
বড় মগবাজার, থানা : রমনা
ঢাকা-১৭।

১। যেহেতু আপনি, প্রফেসর গোলাম আযম, পিতা- মৌলানা গোলাম কবির, বাংলাদেশী নাগরিক নহেন, কারণ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অধিকৃত বিজ্ঞপ্তি নং- 403-Imn/III তারিখ ঢাকা ১৮-৪-৭৩ ইং দ্বারা আপনাকে বাংলাদেশের নাগরিক থাকার অযোগ্য ঘোষণা করা হইয়াছিল।
এবং
২। যেহেতু আপনি নিবন্ধনকৃত বিদেশী।
এবং
৩। যেহেতু আপনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী কাজ করিয়া জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর হইয়াছেন।

এক্ষণে
অতএব, আপনাকে আগামী ২৪ মার্চ বেলা ১০ ঘটিকার মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, কেন আপনাকে বাংলাদেশ হইতে বহিষ্কার করা হইবে না এবং আইনগত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

(এম, এ, এন, ছিদ্দিক)
সিনিয়র সহকারী সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বহিরাগমন শাখা-১"

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নোটিশের জবাব

তারিখ : ২৪-০৩-৯২ ইং

Prof. Ghulam Azam
119. Kazi Office Lane, Maghbazar
Dhaka- 17, Bangladesh

প্রতি
এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সিনিয়র সহকারী সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বহিরাগমন শাখা-১

সূত্র স্বঃ মঃ ৯ বহিঃ- ১১/১৩৪ তাং : ২৩-০৩-৯২ ইং
কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব

জনাব,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্।

আমার উপরে উল্লেখিত কারণ দর্শানোর নোটিশ আজ ২৪ মার্চ রাত ৩টায় আমার স্বীয় বাসভবনে হস্তগত হইয়াছে।

২। উক্ত নোটিশে আমার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহা সবই মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

৩। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বিজ্ঞপ্তি নং 403-Imn/III তারিখ ঢাকা ১৮-৪-৭৩ ইং আমার উপরে জারি করা হয় নাই। উক্ত নোটিশটি ছিল তখনকার রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে পক্ষপাতদুষ্ট। তাহা ছাড়া উক্ত নোটিশে যাহাদেরকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাদের সকলেরই নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা হইয়াছিল।

৪। আমি ১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বর করাচি গিয়াছিলাম এবং ৩ ডিসেম্বর আমি বিমানযোগে ঢাকায় আসিতেছিলাম। কিন্তু যুদ্ধের কারণে আমাকে বহনকারী বিমান বন্দরে অবতরণ করিতে পারে নাই। তারপর আমাকে বহনকারী বিমান জেদ্দা অবতরণ করে এবং কয়েক মাস পর আমি লন্ডন চলে যাই। অতঃপর বাংলাদেশে আসিবার জন্য বারবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হই এবং অবশেষে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে নিজ দেশে ফিরিয়া আসি।

বাধ্য হইয়া আমি পাকিস্তানী পাসপোর্ট ট্রাভেল্‌স ডকুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করি। দেশে ফিরিয়া পাকিস্তানী পাসপোর্ট সরকারের নিকট জমা দিই এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্বের জন্য দরখাস্ত করি এবং বাংলাদেশের প্রতি আমার আনুগত্য শপথ Confirm করি।

৫। যেহেতু আমি এবং আমার পূর্বপুরুষগণ সকলে বাংলাদেশের ভূ-সীমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং যেহেতু আমি কখনো আমার নাগরিকত্ব পরিত্যাগ (Renounce) করি নাই, সেইহেতু জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর হইবার সম্পূর্ণ অধিকার আমার রহিয়াছে। সুতরাং ইহা বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী নহে।

৬। আমি গত ১৪ বছর যাবৎ বাংলাদেশে আমার নিজস্ব বাসভবনে নির্বিঘ্নে বসবাস করিয়া আসিতেছি। সরকার Law of acquiences মোতাবেক স্বীকার করিয়া নিয়াছেন যে, আমি বাংলাদেশের নাগরিক এবং ইহা সরকার এখন আইনত অস্বীকার করিতে পারে না। অধিকন্তু সংবিধানের ৩১, ৩৬, ৩৯ নং অনুচ্ছেদ দ্বারা আমার অধিকার সংরক্ষিত।

৭। রাজনৈতিক চাপ ও উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া আমাকে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় দেওয়া হইয়াছে। আমি যাহাতে সকল সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ করিতে পারি সেজন্য আপনার নিকট হইতে ব্যক্তিগত শুনানীর সময় চাই। সকল আইন মোতাবেক আমি জন্মগতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক এবং বিদেশী নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশ

হইতে আমাকে বহিষ্কার কিংবা আমার বিরুদ্ধে অন্য কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। যদি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহা বেআইনী এবং আইনের দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

(গোলাম আযম)
তারিখ : ২৪/০৩/৯২ ইং

নোটিশ প্রাপ্তির পর তাড়াহুড়া করে জবাব তৈরি করা হয় এবং জামায়াতের সংসদীয় দলের উপনেতা মাওলানা আবদুস্ সুব্হান এমপি সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট ২৪ মার্চ সকাল ১০টায় হস্তান্তর করেন। সচিব তখনই আমার জবাব নিয়ে বঙ্গভবনে চলে যান। সেখানে তখন মন্ত্রিসভার বৈঠক চলছিল।

সরকারের অমানবিক আচরণের প্রতিবাদ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বোক্ত নোটিশ যে অসভ্য পদ্ধতিতে আমার উপর জারি করা হয়েছে এবং ৭ ঘণ্টার মধ্যে নোটিশের জবাব দিতে বাধ্য করা হয়েছে এর প্রতিবাদে ২৪ মার্চ প্রদত্ত আমার নিম্ন বিবৃতি পরদিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় :

'আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তথাকথিত শো-কজ নোটিশ গত রাত ৩টার সময় আমার বেডরুমের বারান্দায় দুজন পুলিশ অফিসার আমার হাতে দিলেন। এরও ১ ঘণ্টা আগে রাত ২টায় আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে পুলিশ কর্মকর্তা কথা বলা প্রয়োজন মনে করেছেন। আমি কোথাও লুকিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম না। সরকার সকালে কি ঐ নোটিশ পৌঁছাতে পারত না? রমযানের রাতে এ আচরণের এমন কী প্রয়োজন ছিল?

আরো কৌতুকের বিষয় যে, রাত ৩টায় বিলিকৃত নোটিশে আজ সকাল ১০টার মধ্যে আমার বক্তব্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে নোটিশ গত ১৪ বছরেও দেওয়া সরকার কর্তব্য মনে করেনি তা এভাবে পরিবেশন করা কেন প্রয়োজন মনে করল, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

সাত বছর বাধ্য হয়ে বিদেশে থাকার সময়ও যেমন আমার বিরুদ্ধে সরকার অথবা অন্য কেউ কোথাও কোনো মামলা দায়ের করতে পারেননি, তেমনি দেশে ফিরে আসার পর গত ১৪ বছরেও কোনো অবৈধ কাজে জড়িত বলে কেউ অভিযোগ দায়ের করতে সক্ষম হননি।

কিছু দিন থেকে আমার কতক রাজনৈতিক বিরোধী ব্যক্তি ও সংগঠন নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে দেশে সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও সরকার নীরব ভূমিকা পালন করে। ফলে তারা যখন এ রকম পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনেক দূর এগিয়ে যায় তখন সরকার তাদের এ কাজকে অবৈধ ঘোষণা করে এবং তা থেকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দেয়। কিন্তু তারা আরো ব্যাপক সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতে থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর আইন প্রয়োগ করা হয়নি। অথচ আমার উপর নোটিশ জারি করা হলো।

প্রকৃতপক্ষে এ কাজের মাধ্যমে সরকার সন্ত্রাসীদের অযৌক্তিক দাবির কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে।

ইনসাফ ও সুবিচারের দৃষ্টিতে সরকারের এ আচরণ কতটুকু সঠিক, তা বিবেচনার ভার জনগণের উপরই দিলাম।

(অধ্যাপক গোলাম আযম)
আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত আমার সাক্ষাৎকার

২৪ মার্চ ১৯৯২ আমার বাড়ি পুলিশের ঘেরাও থাকা অবস্থায় দৈনিক সংগ্রামের দুজন রিপোর্টার আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, যা আমার গ্রেফতারের পরদিন ২৫ মার্চ প্রকাশিত হয়। সংগ্রামের ২৫ মার্চ ১৯৯২ সংখ্যা থেকেই উদ্ধৃত করছি :

"বিএনপিকে নিঃশর্ত সমর্থন করার পুরস্কার পেলাম

সালাহ উদ্দিন বাবর ও জাফর আলম : জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, আজ সরকারের কাছে আমি বিদেশি নাগরিক; কিন্তু যখন সরকার গঠনের ব্যাপারে জামায়াতের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল তখন আমার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে, বিএনপির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে এসে আমার সাথে দেখা করেছেন। তখন কিন্তু এসব প্রশ্ন আসেনি। আজ বিএনপিকে নিঃশর্ত সমর্থন করার পুরস্কার আমরা পেলাম। দৈনিক সংগ্রামের প্রতিনিধিদ্বয়ের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। সরকারের কাছ থেকে কারণ দর্শাও নোটিশ পাওয়ার পর এ সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, এই নোটিশ আমাকে বিস্মিত করেছে। সরকার দোষী ব্যক্তিদের সাথেই বরং অনেক নমনীয় আচরণ করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে মগবাজার কাজী অফিস লেনস্থ তাঁর দফতরে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, রাত ২টা থেকে পুলিশ অধ্যাপক গোলাম আযমের বাসভবনটি ঘেরাও করে রেখেছে। পুলিশের একজন এডিশনাল ডেপুটি কমিশনার ও একজন এসিস্ট্যান্ট কমিশনারের নেতৃত্বে এক প্লাটুন পুলিশ সেখানে কর্তব্যরত ছিল। পুলিশের এডিসি ও এসির সাথে যোগাযোগ করে অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে সাক্ষাৎ করার কথা জানালে তারা সেখানে কর্তব্যরত একজন এসবি কর্মকর্তার সাথে কথা বলতে বলেন। উক্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সেখানে উপস্থিত কয়েকজন রিপোর্টার-ফটোগ্রাফারের নাম লিখে তাদেরকে অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে দেখা করার অনুমতি দেন। এ সময় সেখানে বহু জামায়াতকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

লুঙ্গি এবং সাদা পাঞ্জাবি ও টুপি পরিহিত অধ্যাপক গোলাম আযম সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎ দেওয়ার পূর্বে তাঁর দলের সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খান ও নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমানের সাথে কিছু সময় আলোচনা করেন। সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা শেষে দুজন আইনজীবী এডভোকেট শেখ আনসার আলী এমপি ও ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে দেখা করেন।

অধ্যাপক আযমের রাত জেগে থাকার ছাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি সহাস্যে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি নোটিশপ্রাপ্তি সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলেন, দেখুন! রাত ২টার সময় কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে পুলিশ পাঠানো শিষ্টাচার নয়। আমি বিস্মিত হয়েছি, এত রাতে আমার বাসায় পুলিশ পাঠানোর জন্য। কেবল চোর-ডাকাত ও দুষ্কৃতকারীদের বেলায়ই এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। রমযানের সময় তারাবী ও মুনাজাত শেষ হতে প্রায় ১১টা বেজে যায়। তারপর কাজ-কর্ম সারতে সারতে রাত ১টার আগে ঘুমানো সম্ভব হয় না। গত রাতে ২টার সময় পুলিশ মোতায়েন করার পর থেকে আর ঘুমানো সম্ভব হয়নি। আমি আরো বিস্মিত হয়েছি এজন্য যে, নোটিশ দেওয়ার জন্য সরকার গভীর রাতকে বেছে নিল কেন?

নোটিশের জবাব কখন দিচ্ছেন জানতে চাইলে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, আমাকে আজ সকাল ১০টার মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। রমযানের দিনে মানুষ ফজরের নামায পড়ে খানিক ঘুমিয়ে নেয়। তাই এ সময় সকালটা শুরু হয় ৮টা থেকে। ১০টার মধ্যে জবাব দিতে হলে সময় মাত্র ২ ঘণ্টা। এত অল্প সময়ে কি সরকারের নোটিশের জবাব দেওয়া সম্ভব? অথচ যারা অন্যায় করছে, সরকারের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে, তাদেরকে সময় দেওয়া হয়েছে ২৪ ঘণ্টা। কেউ কি সরকারের এই আচরণকে ইনসাফ বলতে পারবেন?

৫ দলীয় জোটের কার্যক্রমকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন– এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে ইতোমধ্যে দেশবাসীই তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে। সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞ আইনজীবীগণসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আইনজীবীরা তাদের কার্যক্রমকে অবৈধ বলেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে তাদের কার্যক্রমকে অবৈধ বললেও এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি; বরং প্রশ্রয় দিয়েছেন। সারা দেশে তারা এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। জামায়াত ও শিবিরের কর্মীসহ সাধারণ মানুষ যাদের টুপি-দাড়ি রয়েছে তাদের উপর তারা হামলা চালিয়েছে। মানুষের জীবন এসব সন্ত্রাসী কার্যক্রমে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। দেশের বরেণ্য আলেমদের পর্যন্ত তারা গালমন্দ করেছে। অথচ সরকার এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। যারা এসব সন্ত্রাস করছে তাদের একটি নীল নকশা রয়েছে। বিদেশি প্রভুদের নীল নকশা অনুসারেই এসব হচ্ছে। আমরা চরম ধৈর্যধারণ করছি। সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের কর্মীদের সব রকম উসকানির বিরুদ্ধে শান্ত রাখছি, যাতে কোনো সংঘর্ষ বেধে না যায়। আমরা জানি, এসব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আল্লাহ্ না করুন, যদি কোনো অঘটন ঘটে যায় তবে দেশের আযাদি বিপন্ন হবে, তা আমরা জানি। আপনাকে জবরদস্তি করে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে কি না প্রশ্ন করা হলে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, আমাকে কোথায় পাঠাবে? আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার প্রিয় মাতৃভূমি থেকে আমাকে কীভাবে পাঠাবে?

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর প্রবীণ রাজনীতিক অধ্যাপক গোলাম আযম বিরাজমান পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করে বলেন, কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে

একটা নির্বাচন হওয়ার পর দেশটা যেন গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত না হয়, এজন্য দেশের স্বার্থে সরকার গঠনে বিএনপিকে নিঃশর্ত সমর্থন করি। তখন চাইলে অনেক শর্ত আরোপ করতে পারতাম। সরকার সন্ত্রাসীদের দাবির নিকট আত্মসমর্পণ করে বিনা অপরাধে আমার উপর যুলুম করছে। আজ বিএনপিকে নিঃশর্ত সমর্থন করার প্রতিদান পেলাম।

জাতির উদ্দেশে কিছু বলবেন কি না জানতে চাইলে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, আল্লাহ তাআলা বাংলাদেশকে হেফাযত করুক। বাংলাদেশ বর্তমানে সন্ত্রাসীদের হাতে বন্দী এবং বর্তমান সরকারও সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। আজ এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে।

অধ্যাপক গোলাম আযম বিস্ময় প্রকাশ করেন ও সরকারের কাছে প্রশ্ন রাখেন, সরকার নোটিশ দিয়েছে আমি বিদেশি নাগরিক। আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই, সরকার গঠনে সমর্থন চাওয়ার ব্যাপারে তার সাথে আমার যখন সাক্ষাৎ হয় তখন কি তিনি বিদেশি নাগরিক ভেবে কথা বলেছিলেন? বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বে দেখা করতে এসেছিলেন তখন কি বিদেশি ছিলাম?

তিনি তাঁর জামায়াতের আমীর হওয়ার ব্যাপারে বলেন, আমি ১৯৭৮ সাল থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর। গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাবে তা এতদিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়নি। জনাব আব্বাস আলী খান এতদিন ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন– এ কথা সবাই জানে।

অধ্যাপক গোলাম আযম আরো বলেন, কেয়ারটেকার সরকারের কনসেপ্ট জামায়াতে ইসলামীর কাছে আমি পেশ করি এবং জামায়াতের পক্ষ থেকে ১৯৮৩ সালের ২০ নভেম্বর বায়তুল মুকাররমের উত্তর গেটে এক জনসভায় ভারপ্রাপ্ত আমীর সর্বপ্রথম তা ঘোষণা করেন। কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে– এই আশায় বিএনপিকে সরকার গঠনে সহযোগিতা করি। তখন চাইলে আমরা অনেক শর্ত আরোপ করতে পারতাম। কিন্তু দেশটাকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচিয়ে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা দেশটা পরিচালনার জন্য নিঃশর্ত সমর্থন করে আজ এই প্রতিদান পেলাম। গুটিকয়েক সন্ত্রাসীর দাবির নিকট আত্মসমর্পণ করে সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে আমাকে গ্রেফতার করে এত বড় যুলুম যে সরকার করতে পারে, তাদের হাতে জনগণের নিরাপত্তার আশা আর কি করা যায়! আমি তো একজন ব্যক্তি। একজন ব্যক্তির অধিকার যে সরকার রক্ষা করতে পারল না। সে সরকার জনগণের জন্য কী করবে!

অধ্যাপক গোলাম আযম দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলেন, সন্ত্রাসের নিকট আত্মসমর্পণ করে সরকার দেশ চালাতে পারবে না। যাদের হাতে সরকার আত্মসমর্পণ করল তারা যে এই সরকারের পতন চায়, তা সরকারের বোঝার যোগ্যতা কতটুকু আছে তা-ই আমার সন্দেহ।

তিনি আরো বলেন, এ দেশের সব ধর্মের লোকই যার যার ধর্ম অনুসরণ করে। তারা সকলেই বিশ্বাস করে, ধর্মহীন লোক চরিত্রহীন হয়। চরিত্রবান লোকের হাতে যতদিন জাতির নেতৃত্ব আসবে না ততদিন জনগণের সুখ-শান্তি আসতে পারে না।

অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ অধ্যাপক গোলাম আযম ইসলামী আন্দোলনের কণ্টকাকীর্ণ পথের কথা উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহর আইন যারা পছন্দ করে না তারা কোনো নবীকেও বরদাশত করেনি।

তিনি জনগণকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, প্রিয় দেশবাসী! আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, হাজারো যুলুম-নিপীড়ন সত্ত্বেও আল্লাহর পথ থেকে চুল পরিমাণও পিছপা হব না। 'শাহাদাত' ছাড়া আমার অন্য কিছু কাম্য নেই। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর পথে যারা এগোতে চান, তাদের শহীদ হওয়ার জযবা নিয়েই এগোতে হয়। হায়াত-মউতের মালিক আল্লাহ। আমি যেন মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর পথে অটল থাকতে পারি, সে দোআই আপনারা করবেন।

জামায়াত নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীর সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ, রুকন, কর্মীবাহিনী, সমর্থক ও সুধীবৃন্দের নিকট আমার আবেদন– আমার উপর যে অন্যায় ও যুলুম করা হয়েছে তার সুবিচার যেন আল্লাহ করেন সে দোআ করুন। আমার জন্য চিন্তা না করে আল্লাহর দীন কায়েমের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করুন।"

গ্রেফতার হওয়ার প্রস্তুতি

আমি কারণ দর্শাও নোটিশ পেয়েই স্পষ্টরূপে বুঝে নিলাম যে, আমাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। পুলিশ তো বাড়ি ঘেরাও করেই আছে, যাতে আসামি পালিয়ে যেতে না পারে। আমার নোটিশের জবাব পেয়ে সরকার তা গ্রহণযোগ্য ও সন্তোষজনক নয় বলে সিদ্ধান্ত নেবে এবং আমাকে গ্রেফতার করে কারাগারে অন্তরীণ করবে।

কারাগারে যে অবসর পাওয়া যাবে সে মূল্যবান সময়টা কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে আমার পড়াশোনা ও লেখার জন্য প্রয়োজনীয় বই বাছাই করে একটা মাঝারি স্যুটকেস ভর্তি করতে সারাটা দিনই লেগে গেল। যেসব বই লেখার প্রয়োজনবোধ করছিলাম কিন্তু সময়াভাবে লেখা সম্ভব হয়নি, সেসবের জন্য কোন্ কোন্ বই প্রয়োজন তা আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করলাম। ২৪ মার্চ দিনটি ছিল ১৮ রমযান। দুই দিন পরই ই'তিকাফে বসার কথা। যেসব বই ই'তিকাফে নেওয়ার কথা ছিল সেসবও স্যুটকেসে নিলাম।

আরেকটি ছোট স্যুটকেসে কাপড়-চোপড় ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। ইতঃপূর্বে তিনবার গ্রেফতার হওয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে এসবের তালিকা মুখস্থই ছিল।

আমার গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা জেনে জামায়াতনেতৃবৃন্দ, পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন সারা দিনই দেখা করতে আসতে লাগলেন। আত্মীয়-স্বজন ছাড়া অন্যদেরকে পুলিশ আসতে দেয়নি। যারা দেখা করতে এসেছেন তাদের সাথে বসে কথা বলার সময় কমই ছিল। তারা লক্ষ করেছেন, আমি হাসিমুখে সবার সাথে কুশল বিনিময় করছি এবং মনোযোগের সাথে লাইব্রেরিতে বই সংগ্রহে ব্যস্ত আছি। তাদের সবাইকে বিমর্ষ দেখা যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

২৫১.

আমি গ্রেফতার হলাম

সারা শহরে ২৪ মার্চ (১৯৯২) দিনভর গুজব ছিল, আজই আমাকে গ্রেফতার করা হবে। আমি কীভাবে গ্রেফতার হলাম, এর বিবরণ দৈনিক সংগ্রামের ২৫ মার্চ (১৯৯২) সংখ্যায় নিম্নরূপে প্রকাশিত হয় :

"গোলাম আযমকে যেভাবে গ্রেফতার করা হলো

কয়েক সহস্র জামায়াতকর্মী ও জনতার গগনবিদারী স্লোগানের মধ্যদিয়ে গতকাল মঙ্গলবার মধ্যরাতে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে পুলিশ তাঁর মগবাজার কাজী অফিস লেনস্থ বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে গেছে। পুলিশের চারটি লরি ও তিনটি জিপ অধ্যাপক গোলাম আযমকে বহনকারী জিপটিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যায়।

গাড়িতে ওঠার পূর্বে সমবেত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতাকালে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, সন্ত্রাসের নিকট এ সরকার যেভাবে নতি স্বীকার করেছে তার পরিণতি ভোগ করতে হবে। তিনি জামায়াতকর্মীদের ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সন্ত্রাসের মোকাবিলা করতে হবে ধৈর্যধারণের মধ্যদিয়ে। তিনি ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের উদ্দেশে বলেন, জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় বসার সুযোগ করে দিয়েছিল। আপনারা জামায়াতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তখন কোন্ বিদেশির কাছে আপনারা এসেছিলেন?

গতকাল বিকেলে অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতার করা হবে বলে শোনা যায়। গত সোমবার মধ্যরাতে পুলিশ তাঁর বাসায় এসে হানা দেয়। কাজী অফিস লেনস্থ সড়কের মূল গেট তালাবদ্ধ থাকায় পুলিশ তালা ভেঙে এলাকায় প্রবেশ করে। পুলিশ এরপর তাঁর বাসায় গিয়ে শো-কজ নোটিশ প্রদান করে। সকাল ১০টার ভেতর তিনি নোটিশের জবাব দেন।

গতকাল আসরের নামাযের সময় অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতার করা হবে বলে শোনা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু তখনো জানা যায়নি। আসরের সময় থেকেই বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের ফটো-সাংবাদিকরা কাজী অফিস লেনে ভিড় জমাতে থাকে। সন্ধ্যার পর থেকে হাজার হাজার জামায়াতকর্মী এখানে সমবেত হতে থাকে। পুরো কাজী অফিস লেন ও মসজিদ ইশার নামাযের সময় পূর্ণ হয়ে যায়। ইশা ও তারাবীর নামায আদায়ের পর অধ্যাপক গোলাম আযম মসজিদে মুসল্লি ও কর্মীদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। এখানে তিনি বলেন, এ দেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ঈমানের স্ফুলিঙ্গে তেজ সৃষ্টির জন্য আমাকে হয়তো গ্রেফতারের প্রয়োজন আছে। এ গ্রেফতার আমাকে দ্রুত এগিয়ে দেবে।

যারা গালাগালি করছে তাতে কেবল একটা ইফেক্ট হয় না। ওলামায়ে কেরাম এখন বুঝতে পেরেছেন, গোলাম আযমের বিরুদ্ধে নয়, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে নেমেছে।

তারা চায় গৃহযুদ্ধ হোক। গৃহযুদ্ধ হলে ইসলাম কায়েম করব কোথায়? এ দেশকে আল্লাহর এ গযব থেকে বাঁচাতে হবে। তিনি ধৈর্যের সাথে জামায়াত ও শিবিরকর্মীদের সংগঠনের নির্দেশ মেনে চলার নির্দেশ দিয়ে বলেন, শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। কখনো সীমা লঙ্ঘন করবেন না। নবীগণ ধৈর্যের সাথে আন্দোলন করে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছেন।

তিনি বলেন, এ দেশে ইসলামের বিজয় অনিবার্য; এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। যারা ক্ষমতায় ছিল, যারা ক্ষমতায় আছে, যারা ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে তাদের কোনো আদর্শ নেই; আদর্শ লোক তৈরির কোনো পরিকল্পনা নেই। তাই এদের দ্বারা জনগণের সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তিনি বলেন, জনগণ যেন এখানে আশার আলো দেখতে পায়। হতাশার মাঝে মানুষ বাঁচতে পারে না।

সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর অধ্যাপক গোলাম আযম কেন্দ্রীয় কারাগারে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ঘরে চলে যান।

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মতিউর রহমান নিজামী তখন কর্মীদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়ে বলেন, নেতা বলে গেছেন সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না। সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে। সরকার আমাদের অসহনীয় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমরা যেন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ না করি।

এরপর মাওলানা নিজামী ইসলামী আন্দোলন ও এর নেতা এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে মুনাজাত করেন। মুনাজাতের সময় কান্নার শব্দে পুরো এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। আল্লাহর সাহায্য কামনা করে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলে চোখের পানিতে ভেসে যায় অনেকের বুক। এ সময় কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মুনাজাত থেমে গেলেও কান্নার রেশ চলতে থাকে দীর্ঘক্ষণ। মসজিদ থেকে বের হয়ে জামায়াতকর্মীরা অধ্যাপক আযমের বাসভবনের সম্মুখস্থ রাস্তায় বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকেন। এ সময় এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। জামায়াত নেতা ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোঃ তাহের কর্মীদের সংযত হওয়ার ও ধৈর্যধারণের আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁর সারগর্ভ বক্তৃতার পর কর্মীরা নিজেদের সংযত করে। এরপর কর্মীদের ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর উপর ভরসা করার আহ্বান জানিয়ে জামায়াত-নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। ইশার নামাযের পর থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এই বক্তৃতার পালা চলে।

রাত সাড়ে ১১টায় অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর অফিসকক্ষে সমবেত জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে কিছু কথা বলেন। তিনি পুলিশ কর্মকর্তাদের বলেন, সন্ত্রাস দিয়ে চরিত্রের মোকাবিলা করা যায় না। এ দেশে ইসলামের বিজয় অনিবার্য; এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এরপর তিনি কেন্দ্রীয় কারাগারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাইরে আসেন। কর্মী ও ফটো-সাংবাদিকদের ভিড় ঠেলে বাইরে বের হতে বেশ কিছু সময় কেটে যায়। সাদা পাঞ্জাবি, সাদা পায়জামা ও টুপি পরে তিনি ধীর পদক্ষেপে রাস্তায় এসে সমবেত কর্মীদের ধৈর্যধারণের আহ্বান জানান। তাঁকে দেখে জামায়াতকর্মীদের মাঝে কান্নার রোল পড়ে যায়।

গাড়িতে ওঠার পূর্বে তিনি জামায়াতকর্মী ও জনতার উদ্দেশে বক্তৃতাকালে বলেন, আপনাদের চোখে কেন পানি দেখছি? পানি ফেলবেন আল্লাহর দরবারে। আমি বাসায়ও একই কথা বলেছি। আমার সাথে যে আচরণ করা হচ্ছে, এটাই ইসলামী আন্দোলনের নিয়ম। আল্লাহর নবীরা শত যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছেন। আমি তো বেড়াতে যাচ্ছি। কত দিন নিরিবিলি লেখাপড়ার সুযোগ পাই না; সেখানে তা পাব। তিনি বলেন, এ দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ইসলামের দ্বারাই সম্ভব। যারা ইসলামের জন্য প্রাণ দেবে তারা দেশের স্বাধীনতার জন্যও প্রাণ দেবে। এ দেশের জমিন স্বাধীন রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।

সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শেষে অধ্যাপক গোলাম আযম জনতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধীর পদক্ষেপে গাড়ির দিকে এগিয়ে যান। সাদা টয়োটা জিপ (ঢাকা মেট্রো ভ ৭২৬৮)-এ ওঠেন তিনি। সাদা পোশাকে পুলিশের দুজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর পাশে বসেন। রাত পৌনে ১২টার সময় তিনি গাড়িতে ওঠেন। কিন্তু হাজার হাজার কর্মী ও জনতার ঢল বেয়ে কাজী অফিস লেনের ছোট্ট সড়কটি পার হতে প্রায় ২০ মিনিট সময় লেগে যায়।

জনতা ও জামায়াতকর্মীরা তখন 'নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবর', 'গোলাম আযম গ্রেফতার কেন– খালেদা জিয়া জবাব চাই' প্রভৃতি স্লোগানে পুরো এলাকা প্রকম্পিত করে তোলে। এ সময়ও অনেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে। কয়েকজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। পুলিশের চারটি লরি ও তিনটি জিপ অধ্যাপক গোলাম আযমের গাড়ি পাহারা দিয়ে যখন রমনা থানা অতিক্রম করে তখন রাত ১২টা বেজে ৫ মিনিট।"

গ্রেফতারের পূর্বে–

ইশা ও তারাবীহ নামাযের পর পুলিশ গ্রেফতার করবে বলে জানা গেল। তারাবীহ নামাযের সময়ই জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীসহ কয়েকজন জামায়াতনেতা মসজিদে হাজির ছিলেন। নামায শেষে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী মসজিদের ভেতরেই মাইকে উপস্থিত মুসল্লি এবং জামায়াত ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে লাগলেন। আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখি যে, গোটা রাস্তায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা বসে আছেন। আমাকে দেখে তারা আবেগাপ্লুত হয়ে কাঁদতে থাকলেন। আমি নীরবে বাড়িতে ঢুকে দেখলাম, মহিলা আত্মীয়ারা সবাই সমবেত। পুরুষ আত্মীয়গণ বারান্দা ও ঘরের বাইরে নির্বাক বিস্ময়ে আমার নির্বিকার প্রস্তুতি লক্ষ করছেন। মহিলাদের চোখে পানি ঝরছে, তারা মৃদু আওয়াজে কথা বলছে, কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আমার থাকার ঘরের পাশের বাড়িটি আমার ছোট ভাই ড. মাহদীর। আমার ঘর তখন দেয়ালের উপর টিনের চাল দিয়ে তৈরি। ভাইয়ের বাড়িটি বিল্ডিং। সেখানেই একটি ফ্লাটে আমার চেম্বার। জেলে আমার সাথে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা স্যুটকেস দুটো আগেই চেম্বারে নিয়ে রেখেছি। সেখানে জামায়াত-নেতৃবৃন্দ ও গ্রেফতার করার জন্য আগত পুলিশ অফিসাররা আমার অপেক্ষায় রয়েছেন। বাইরে গোটা রাস্তায় জামায়াত ও

শিবিরকর্মীদের কেউ কেউ শুয়ে আছে। তারা আমাকে নিয়ে যেতে দেবে না বলে ঘোষণা করায় পুলিশ অফিসারকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখলাম। আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় শক্তিপ্রয়োগ করতে হলে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হবে বলে আশঙ্কা করেই তারা পেরেশান।

আমি তাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, আপনারা জামায়াতে ইসলামীকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো মনে করবেন না। অন্য কোনো দলের নেতাকে গ্রেফতার করতে এভাবে প্রকাশ্যে গেলে রাস্তায় গাড়ি ভাঙচুর শুরু হয়ে যেত। জামায়াত এ জাতীয় উচ্ছৃঙ্খল আচরণ কর্মীদের শেখায় না। কর্মীরা আবেগের তাড়নায় হাজির হয়েছে, আমার প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে এসেছে। জামায়াত-নেতৃবৃন্দ তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। আপনাদের উদ্বেগের কোনো কারণ নেই।

গ্রেফতারের সময়কার তথ্যাবলি

ঐ সময়কার আবেগময় সময়ে যা ঘটেছিল, তা একটি আকর্ষণীয় স্মারকে সংরক্ষিত না থাকলে আমি এর বিবরণ সঠিকভাবে লিখতে পারতাম না। 'মযলুম' নামে ৮০ পৃষ্ঠার ম্যাগাজিন আকারের স্মারকটি ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ গোলাম সারওয়ার কর্তৃক সম্পাদিত ও সংকলিত। তিনি জামায়াতের রুকন, ব্যাংকার ও জামায়াতের কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের সাবেক সেক্রেটারি ও সাবেক এমপি মুহতারামা হাফিযা আসমার ছোট জামাতা।

ঐ স্মারকে যেসব তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে এর মধ্যে আমাকে গ্রেফতার করে পুলিশের গাড়িতে তুলে নেওয়ার পূর্বে রিকশায় দাঁড়িয়ে ঐ আবেগপ্রবণ মুহূর্তে মাইক হাতে নিয়ে আমি যে বক্তব্য রেখেছিলাম তা ম্যাগাজিনটির ব্যাক পেইজে আমার ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাগাজিনের কভার পেইজে বাংলাদেশের মানচিত্রে অগণিত মানুষের ছবি এবং ঠিক মাঝখানে আমার ভাষণরত চমৎকার ছবি রয়েছে। এ অদ্ভুত প্রচ্ছদ-পরিকল্পনাও সম্পাদকেরই।

সংকলনটির প্রকাশক নবীনগর ফোরাম, যার সভাপতি ডাক্তার মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্যাম এবং সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ গোলাম সারওয়ার। অনেক তথ্যের সাথে জনাব আব্বাস আলী খান ও দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক জনাব আবুল আসাদসহ অনেকের লেখা দ্বারা সংকলনটি সমৃদ্ধ। দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত গ্রেফতারে সময়কার তথ্য একটু আগেই উল্লেখ করেছি।

গ্রেফতার মুহূর্ত

১৯৯২ সালের ২৪ মার্চ দিবাগত রাত ১১টায় আমি আমার স্ত্রী-পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য চেম্বারসংলগ্ন আমার বাড়িতে ঢুকে ক্রন্দনরত সবাইকে আল্লাহ তাআলার কাছে কেঁদে কেঁদে দোআ করার পরামর্শ দিয়ে হাসিমুখে বিদায় নিলাম। আমার সে হাসি হৃদয়বিদারক ছিল বলে আমার স্ত্রী জেলখানায় গিয়ে জানালেন। আমার ভাই-বোনদের নিকট থেকেও বিদায় নিলাম। তারা নীরবে চোখের পানিতে বিদায় দিলেন।

সোয়া ১১টায় চেম্বার থেকে বের হয়ে দেখলাম, প্রায় ২০/২৫ জন ফটো-সাংবাদিক ক্যামেরা তাক করে আছেন। ফটো তোলার সময় তাদের একজনের মন্তব্য শুনলাম; 'হিস্টোরিক অকেশন' (ঐতিহাসিক ঘটনা)। ঘর থেকে রাস্তায় আমাকে মাওলানা নিজামী, কামারুজ্জামান, আবদুল কাদের মোল্লা ও অন্যান্য নেতা নিয়ে গেলেন। তাঁরা পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে একটা রিকশায় দাঁড় করিয়ে হাতে মাইক তুলে দিলেন।

একমাত্র দীনের সম্পর্কের কারণে যারা আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসেন এবং আমিও যাদেরকে একান্ত আপনজন মনে করি তাদের বিরাট সংখ্যায় দেখে আমার এত আনন্দবোধ হলো, যা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম। তারা সবাই আমাকে অপরাধী ও আসামি মনে করছেন না। আমাকে তারা তাদের হিরোর মর্যাদা দিয়ে বিদায় জানাতে এসেছেন বলে অনুভব করলাম। তাদের এ উপস্থিতি গ্রেফতারকারী পুলিশ অফিসারদের নিকট আমাকে গৌরবান্বিত করেছে। আমি প্রেরণা পেলাম যে, আমাকে জেলে আটক রাখা অবস্থায় তারাই আমাকে সারা দেশের জনগণের নিকট ঘনিষ্ঠ করে তুলবেন। আমি তাই শক্তিমান বোধ করলাম।

গ্রেফতারের পূর্বমুহূর্তে প্রদত্ত ভাষণ

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা সাইয়েদিল মুরসালীন, ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমায়ীন। সংগ্রামী ভাইয়েরা! আসসালামু আলাইকুম।

মনে রাখবেন, এই যে আমার সঙ্গে আচরণ করা হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের এটাই পাওনা, এটাই নিয়ম এবং এ পথেই নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়। আল্লাহর নবীগণকে যে যুলুম করা হয়েছে সে তুলনায় এটা তো কিছুই না। ময়দানে আপনাদের কী করতে হবে সে ব্যাপারে জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, কর্মপরিষদ এবং মজলিসে শূরা যে ফায়সালা দেবেন, সে অনুযায়ী কাজ করবেন। আপনারা মনে রাখবেন, ভাবপ্রবণ হয়ে জোশের চোটে যদি হুঁশ হারিয়ে ফেলেন, তাহলে কোনো কল্যাণ হবে না।

অন্যরা যত যুলুম আর অত্যাচারই করুক না কেন, আপনারা প্রতিশোধ নেবেন না। প্রতিশোধ নেওয়া আমাদের রাসূল (স)-এর তরীকা নয়। কেউ সন্ত্রাস করতে চাইলে আমরা সন্ত্রাস করব না এবং সন্ত্রাস না করেই তাদেরকে পরাজিত করব। সন্ত্রাসের মোকাবিলা সন্ত্রাস দিয়ে হবে না। সন্ত্রাসের মোকাবিলা ধৈর্য দিয়েই করতে হবে। আমি মনে করি, আল্লাহর কুরআন, রাসূল (স)-এর জীবনী– এ দুই পাথেয় আল্লাহর রাসূল (স) আমাদের জন্য রেখে গেছেন। এর উপর নির্ভর করে আমরা চলছি। জামায়াতে ইসলামী এর ভিত্তিতেই ফায়সালা করছে।

আমার দেশের জনগণকে আগেও বলেছি, জনগণ যদি চায় তাদের সমস্যার সমাধান হোক– তাহলে আমি সাফ বলছি, যারা এ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন এখনো আছেন আবার ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য স্বপ্ন দেখেন তাদের কাছে এমন কোনো আদর্শ নেই, এমন কোনো কর্মসূচি নেই, মানুষ তৈরির এমন কোনো পদ্ধতি নেই, যার দ্বারা এ দেশের জনগণের

সমস্যার সমাধান করা যাবে। এর জন্য রাসূল (স)-এর পদ্ধতিতেই জামায়াতে ইসলামী কাজ করছে। এ পদ্ধতিতেই এ দেশের জনগণের সমস্যার সমাধান হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ইতিহাস এ কথার সাক্ষী, কুরআন এ কথার সাক্ষী, রাসূল (স)-এর জীবন এ কথার সাক্ষী।

সমস্যা সমাধানের জন্য দুটো জিনিস দরকার– একটা হচ্ছে আদর্শ আরেকটা হচ্ছে আদর্শবান লোক। আমি শেষ কথা বলছি এই যে, এ দেশের জমিনে ইসলামের শিকড় অত্যন্ত মযবুত। এ দেশের জনগণকে ইসলাম এসে মুক্তি দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য এবং ক্ষত্রীয় গুটিকতক নেতৃত্বের অধীনে বশ্য এবং শূদ্র হিসেবে এ দেশের কোটি কোটি লোক যখন গোলাম হয়ে গিয়েছিল তখন ইসলামের সাম্যনীতি তাদের মুক্তি দিয়েছিল। ইসলামের শিকড় এ দেশে এত মযবুত যে, একে উৎখাত করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

এ দেশের স্বাধীনতা ইসলামের দ্বারাই কায়েম হয়েছে, আবার বহালও থাকবে। যারা ইসলামের জন্য জীবন দেবে, তারাই জীবন দেবে এ দেশের জন্য। এ দেশের প্রতিটি ইঞ্চি মাটি আমাদের জন্য পবিত্র আমানত। আমরা ইসলাম কায়েম করতে চাই এ জমিনেই। যদি জমিনই পরাধীন হয়ে যায়, তবে ইসলাম কায়েম করব কোথায়? তাই ইসলাম কায়েমের জন্য, এ দেশের জমিনকে স্বাধীন রাখার জন্য আমরা সকলেই বদ্ধপরিকর।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস চলছে, সারা দেশে সন্ত্রাস চলছে আর আমাকে কেন্দ্র করে যে চরম সন্ত্রাস হলো এবং যে সন্ত্রাসের নিকট এ সরকার নতি স্বীকার করল, এর পরিণতি ভোগ এ সরকারই করবে। সন্ত্রাসকে জিইয়ে রেখে, সন্ত্রাসকে লালন করে আপনারা গদিতে বসে থাকবেন– সে আশা করবেন না। জামায়াতে ইসলামী বড় আশা করে আপনাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল; কিন্তু আপনারা সেই সহযোগিতার যথার্থ মূল্যায়ন করেননি।

সরকার গঠনের জন্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যখন জামায়াতে ইসলামীর কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন তখন কার কাছে এসেছিলেন? বাংলাদেশির কাছে না পাকিস্তানির কাছে? এ দেশির কাছে না বিদেশির কাছে? প্রেসিডেন্ট সাহেব ভোটের জন্য এসেছিলেন এদেশির কাছে না বিদেশির কাছে? তারা আমাকে বিদেশি যতই বলুক– এ দেশেই আমার জন্ম, আল্লাহ নিজেই এ দেশকে আমার জন্মভূমি হিসেবে বাছাই করে দিয়েছেন। এ বাছাই বদলানোর কারো সাধ্য নেই। আপনারা ধৈর্য ধরবেন। জামায়াতের সিদ্ধান্ত মেনে চলবেন। ইনশাআল্লাহ, নাগরিকত্ব নিয়েই আমি আপনাদের কাছে ফিরে আসব। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ। ফী আমানিল্লাহ।

পুলিশের গাড়িতে–

এ বিষয়ে পূর্বে দৈনিক সংগ্রামের দেওয়া রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়েছি। পুলিশের গাড়িবহর আমাকে নিয়ে বাড়ি থেকে রওয়ানা হলো। দুপাশে আমার দীনী ভাইদের অসহায় চাহনি। আমি হাসিমুখে হাত তুলেই রইলাম। আমার ভাই ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মুকাররম জেলে দেখা করে বলল, আপনার হাসি আমার হৃদয় বিদীর্ণ করে দিল।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে অতি ধীরে পুলিশের গাড়িবহর আমার আন্দোলনের সাথীদের প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে কোনো রকমে আধঘণ্টায় রমনা থানা পার হয়ে এগিয়ে চলল। সুপ্রিম কোর্ট বিল্ডিং-এর কাছাকাছি পৌঁছার পর রমনা থানার ওসি সৈয়দ আখলাক হোসেন আমাকে বললেন, বিনা সংঘর্ষে আপনাকে নিয়ে আসতে আমাদের যেভাবে সাহায্য করলেন তাতে আপনি চিরদিন আমাদের হৃদয়ে অত্যন্ত উন্নত মর্যাদার আসনে থাকবেন। নেতাদেরকে গোপনে গ্রেফতার করতেই আমরা বাধ্য হই। আপনাকে প্রকাশ্যে গ্রেফতার করতে যে দৃশ্য দেখলাম, এর কোনো নজির নেই। আমি বললাম, 'আমরা আর কারো কাছ থেকে নয়, একমাত্র আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকেই এ আচরণ শিখেছি। তিনি যে আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে দেখিয়ে গেছেন, সে আন্দোলনই আমাদের আদর্শ।'

পঞ্চাশ বছর ধরে যে পথ অতি চেনা, যে পথের দুপাশের দালানকোঠা, গাছপালা অতি পরিচিত, সে পথ দিয়ে চলার সময় গাড়িতে বসা পুলিশ অফিসারদের জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়ার জন্য যা বলা প্রয়োজন তা বলতে বলতেই জেলগেটে পৌঁছে গেলাম। প্রধান ফটক না খুলে বিরাট গেটের ছোট দরজা দিয়ে যেতে আমি আপত্তি করলাম। কারণ, তাতে মাথা একটু নিচু করে ঢুকতে হয়। আমার অনমনীয় মনোভাব দেখে প্রধান ফটক খুলে দেওয়া হলো।

গ্রেফতারের খবর

পরদিন ২৫ মার্চ (১৯৯২) সকল পত্রিকার প্রধান খবরই নাকি ছিল আমার গ্রেফতারের সরকারি গৌরবময় কাহিনী ও ঘাদানি কমিটির সাফল্যের বাহাদুরির বিবরণ। আমি জেলে থাকায় কোন্ পত্রিকা এ বিষয়ে কতটুকু কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে তা জানতে পারিনি। আমি জেলখানায় শুধু দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা কেনার সুযোগ পেয়েছিলাম। জেল কর্তৃপক্ষ আমার জমা দেওয়া টাকা থেকে সংগ্রাম পত্রিকাটি আমাকে দিত।

দৈনিক সংগ্রাম আট কলামব্যাপী বিরাট হেডিং দেয় 'অধ্যাপক গোলাম আযম গ্রেফতার'। এ খবর পত্রিকাটিতে নিম্নরূপে এসেছে :

"জামায়াতে ইসলামীর আমীর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বর্ষীয়ান জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে গতকাল মধ্যরাতে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে তাঁকে শো-কজ নোটিশ প্রদান করে মগবাজারস্থ নিজ বাসভবনে নজরবন্দী করা হয়। রাত তিনটায় প্রদত্ত শো-কজ নোটিশের জবাব গতকাল সকালে প্রদানের পর মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে তা আলোচনা করা হয়। সরকার এই জবাব গ্রহণযোগ্য নয় বিবেচনা করে অধ্যাপক গোলাম আযমকে 'ফরেনার্স এ্যাক্ট'-এর অধীনে আটকাদেশ প্রদান করে।

দেশের গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বামপন্থি একটি গোষ্ঠী অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্বের প্রশ্ন নিয়ে বেশ কিছু দিন থেকে বেআইনি কার্যকলাপের মাধ্যমে সারা দেশে এক অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। সরকারের নীরবতায় আস্কারা পেয়ে তারা দেশে এমন একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, দেশে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের

ঔদ্ধত্যের সীমা এতটাই ছাড়িয়ে যায় যে, তারা বায়তুল মুকাররমের খতীবের সাথে চরম বেআদবিমূলক আচরণ করেছে এবং মসজিদ বন্ধের হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে। তারা টুপি-দাড়িওয়ালা মানুষের প্রতি হামলা করে তাদের কান ও রগ কাটা শুরু করে দিয়েছে। সরকার এই সকল নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে তাদের অন্যায় আবদারের কাছে নতি স্বীকার করে জামায়াতনেতাকে গ্রেফতারের পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপে গোটা জাতি একাধারে হতবাক ও ক্ষুব্ধ। গভীর রাতে শো-কজ নোটিশ জারির খবর সংবাদপত্রে প্রকাশের পর থেকে গতকাল সারা দিনই ঢাকাসহ সারা দেশে এটাই ছিল প্রধান আলোচনার বিষয়। রাজধানীর সর্বত্র উত্তেজনা-উৎকণ্ঠা বিরাজ করতে থাকে। সন্ধ্যার পর অধ্যাপক আযমকে গ্রেফতার করা হবে বলে নগরীতে খবর ছড়িয়ে পড়লে শত শত জামায়াতকর্মীসহ বহুসংখ্যক শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপক আযমের বাসভবনে ভিড় জমান। সকলের মধ্যেই ছিল উদ্বেগ ও ক্ষোভ।

যেভাবে তাঁকে গৃহবন্দী করে নোটিশ দেওয়া হয়

রাত ২টার দিকে প্রথমে রমনা থানার ওসি সৈয়দ আখলাক হোসেনের নেতৃত্বে একদল পুলিশ অধ্যাপক আযমের বাসভবনে যায়। বাসভবনের প্রধান ফটকে গিয়ে পুলিশ দরজা খুলতে বললে তাঁর পরিবারের সদস্যরা রাতে দরজা খুলতে না চাইলে পুলিশ তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে।

অধ্যাপক গোলাম আযমকে জাগিয়ে ওসি বলেন, 'আপনার নিরাপত্তার জন্যই আমরা এসেছি। এ কথা বলে তাঁর শয়নকক্ষসহ আশপাশের কক্ষ তল্লাশি করার পর পুলিশ দল তাঁর বাসভবনে অবস্থান নেয়।

রাত তিনটার দিকে পুলিশের এডিশনাল ডিসি নঈম আহমদ অধ্যাপক গোলাম আযমের বাসভবনে যান এবং তাঁকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেন। এই নোটিশের জবাব সকাল ১০টার মধ্যে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

অধ্যাপক গোলাম আযম ফজরের নামায তাঁর বাসভবনসংলগ্ন মসজিদেই আদায় করেন। সকালেই তাঁর বাসভবনে পুলিশ মোতায়েন ও নোটিশ প্রদানের খবর ছড়িয়ে পড়লে জামায়াত-নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলে পুলিশ ২/৪ জন জামায়াতনেতা ও কয়েকজন সাংবাদিক ছাড়া বাকিদের ফিরিয়ে দেয়। পুলিশ অধ্যাপক আযমের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখে।

দুপুরের পর থেকে সাংবাদিকদেরকে আর তাঁর সাথে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। দিনে তাঁর বাসভবন ও আশপাশে ৩০/৩৫ জন পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

গ্রেফতার সম্পর্কে সরকারি প্রেসনোট

প্রফেসর গোলাম আযম বাংলাদেশি নাগরিক না হওয়া সত্ত্বেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের বিধান লঙ্ঘন করে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর হন। তাকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কেন বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে

না অথবা তার বিরুদ্ধে কেন অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে না তার কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। তিনি উক্ত নোটিশের জবাব যথাসময়ে প্রদান করেন, যা সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। এমতাবস্থায় সরকার প্রফেসর গোলাম আযমকে 'ফরেনার্স এ্যাক্ট'-এর আওতায় আটকের আদেশ প্রদান করেছে।

সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যবৃন্দের প্রতিও কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে। উক্ত নোটিশে তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সংবিধানপরিপন্থী কার্যকলাপ, সংবিধানের আওতায় প্রতিষ্ঠিত আইন-আদালতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা এবং তার কার্যকারিতা চ্যালেঞ্জ করা, বিচারব্যবস্থা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতির চেষ্টা চালানোর অভিযোগ করা হয়। তাদের জবাবের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

যেহেতু সরকার কর্তৃক গৃহীত আইনগত ব্যবস্থার ফলে বর্তমানে তথাকথিত গণ-আদালত প্রতিষ্ঠার মূল কারণ অপসৃত হয়েছে, সেহেতু সরকার আশা করে যে, তথাকথিত গণ-আদালতের উদ্যোক্তাগণ এ ধরনের সংবিধানপরিপন্থী কার্যকলাপ হতে বিরত থাকবে।

সরকার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে চায় যে, যদি কেউ সংবিধান ও প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে তথাকথিত গণ-আদালত অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সরকার আশা করে যে, আপামর জনসাধারণ পরিস্থিতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবনক্রমে সংবিধান ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন এবং আইনকে তার নিজস্ব গতিতে পরিচালিত হতে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করবেন।

নির্মূল কমিটির প্রতি নোটিশ জারি– সরকারের নমনীয় আচরণ

সরকারের পক্ষ থেকে গণ-আদালতের উদ্যোক্তাদের প্রতি কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা হয়েছে। নির্মূল কমিটির নেত্রী জাহানারা ইমামকে বিকেল ৩টায় তার বাসায় এই নোটিশ প্রদান করা হয়।

এ ছাড়া আরো ১৯ জন নেতাকে একই ধরনের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নোটিশে ২৬ মার্চ গণ-আদালত গঠন করে আইন নিজের হাতে তুলে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা ও দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সৃষ্টি করার জন্য কেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে। নোটিশে সরকারের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টিরও অভিযোগ করা হয়েছে।

সোমবার গভীর রাতে সরকারি ঘোষণায় বলা হয়েছিল, নির্মূল কমিটির নেতাদের শো-কজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

গভীর রাতে অধ্যাপক আযমকে ঘুম থেকে ডেকে নোটিশ হাতে ধরিয়ে দেওয়া হলেও নির্মূল কমিটির নেতাদের সাথে অত্যন্ত নমনীয় আচরণ করা হয়েছে।

কমিটির নেতারা নাকি এই নোটিশ জারি করার জন্য সরকারের কর্মকর্তাদের ধমক দিয়েছেন। তারা গতকাল সন্ধ্যায় ন্যাপ কার্যালয়ে ৫ দলীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের নেতাদের সাথে বৈঠকে বসেন। আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ, তোফায়েল আহমদ প্রমুখ নেতা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, কমিটির নেতারা নানাভাবে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করবেন এবং আজ তারা সরকারের সাথে আলোচনায় বসার চেষ্টা করবেন। কয়েকজন মন্ত্রী এই আলোচনার ব্যাপারে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

গতকালের বৈঠকে কোনো কোনো নেতা নোটিশের জবাব না দেওয়ার পক্ষে মত দিলেও শেষ পর্যন্ত জবাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। দুজন বিশিষ্ট আইনজীবীকে জবাব লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সরকারের শো-কজ নোটিশ প্রদানের ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও গতকাল রাজধানীর সর্বত্র উত্তেজনাকর শ্লোগান দিয়ে মাইকিং ও সমাবেশ হয়েছে। কয়েকটি স্থানে জামায়াত-শিবিরকর্মী ও টুপিপরা লোকদের উপর হামলা হয়েছে। পুলিশ এদের কিছুই বলেনি।"

গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়া

আমার গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সরকারি দলের নীরবতা পালন করাই স্বাভাবিক ছিল। আমাকে গ্রেফতার করার মাধ্যমে সরকারের যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে কিছুটা হলেও লজ্জাবোধ করারই কথা।

কোনো ইসলামী দল ও ব্যক্তি কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে অন্তত দৈনিক সংগ্রামে তা প্রকাশিত হতো এবং আমি জেলে থাকাকালেই জানতে পারতাম। ধর্মনিরপেক্ষ ও বামঘেঁষা পত্রিকাগুলো উল্লাস প্রকাশ করে এবং সরকারের নিকট আমার ফাঁসি দাবি করতে থাকে। কিন্তু ঘাদানি কমিটি সরকারের বিচারের অপেক্ষা না করে নিজেরাই গণ-আদালত কায়েম করে বিচারের অভিনয়ে লিপ্ত হলো।

একমাত্র জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির সারা দেশে আমার গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল, প্রতিবাদ সভা ও বিবৃতির মাধ্যমে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলল। আমি দৈনিক সংগ্রামে এসব খবর পড়ে সান্ত্বনাবোধ করলাম।

জামায়াতের প্রেস কনফারেন্স

২৫ মার্চের (১৯৯২) দৈনিক সংগ্রামে জামায়াতে ইসলামীর সাংবাদিক সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান ও সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বক্তব্য পড়েছিলাম। নিম্নে তা পরিবেশন করছি, যাতে পাঠক-পাঠিকাগণ আমার গ্রেফতারের প্রতিবাদে জামায়াত কীরূপ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারেন। জামায়াতের ভূমিকা এ কথাই প্রমাণ করে যে, আমার গ্রেফতারকে জামায়াত শুধু এক ব্যক্তির উপর হামলা মনে করেনি; বরং গোটা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্র বলে গণ্য করেছে।

'সরকার নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের কাছে নতি স্বীকার করেছে' –আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খান সংগঠনের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রতি কারণ দর্শাও নোটিশ জারিকে একটি অন্যায় কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

গতকাল মঙ্গলবার দলের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব খান অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহালের ঘোষণা দিয়ে সকল বিভ্রান্তির অবসান ঘটানোর জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মগতভাবে বাংলাদেশি নাগরিক এবং তাঁর পূর্বপুরুষগণ বাংলাদেশের ভূ-সীমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। জনাব খান বলেন, অধ্যাপক গোলাম আযম যেহেতু কখনো তাঁর নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেননি, সেহেতু জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর রয়েছে। এটা বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী নয়।

জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, অধ্যাপক আযম বিগত ১৪ বছর ধরে বাংলাদেশে নিজ বাসভবনে বসবাস করে আসছেন। এতে করে সরকার ল' অব একুইসেন্স মোতাবেক স্বীকার করে নিয়েছে যে, অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক। এটা সরকার এখন আইনত অস্বীকার করতে পারে না।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক ইউসুফ আলী, জনাব মকবুল আহমদ, জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আব্দুস্ সুব্হান এমপি, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুল কাদের মোল্লা ও জামায়াত সংসদীয় দলের সচিব এডভোকেট শেখ আনসার আলী।

জনাব আব্বাস আলী খান তার লিখিত বক্তব্যে সরকারি পদক্ষেপে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, যারা ঘোষণা দিয়ে আইন হাতে তুলে নিল এবং দেশে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাল এবং এখনো যারা তৎপর, তাদের ব্যাপারে সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে উল্টো অধ্যাপক গোলাম আযমকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করল। যারা সংবিধান লঙ্ঘন করল, আদালত অবমাননা করল, প্রকারান্তরে সরকার তাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে একটি কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

অধ্যাপক গোলাম আযমকে দলের আমীর করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে জনাব খান বলেন, ১৯৮৬ সালে সাবেক সরকার অনুরূপ একটি নোটিশে জানতে চেয়েছিলেন যে, অধ্যাপক গোলাম আযম বিনা ভিসায় দীর্ঘদিন কীভাবে আছেন। তার জবাবে তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, 'আমি জন্মগতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক। জন্মগত নাগরিক অধিকার হরণ করার কোনো ইখতিয়ার কোনো সরকারের নেই।' তার এই জবাবের পর বিগত ২২ মার্চ (১৯৯২) পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য আসেনি। ফলে

আমরা আশ্বস্ত হয়েছি এবং অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতের গঠনতন্ত্র মোতাবেক আমীর নির্বাচিত হয়েছেন। এ সম্পর্কে আমরা গত ডিসেম্বর মাসেই আমাদের বক্তব্য দিয়েছি।

তথাকথিত নির্মূল কমিটি কর্তৃক জামায়াত-শিবিরের উপর বিভিন্ন ধরনের হুমকি, জামায়াত-শিবিরকর্মীদের উপর হামলা, দাড়ি-টুপিওয়ালাদের ধরে পৈশাচিক নির্যাতন করাসহ তথাকথিত গণ-আদালতওয়ালাদের সুইসাইড স্কোয়াড ও মৃত্যুঞ্জয় স্কোয়াড গঠনের মাধ্যমে হুমকি প্রদানের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে জনাব খান বলেন, গত ১০ মার্চ সাংবাদিক সম্মেলনে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী গণ-আদালতের উদ্যোক্তাদের দ্বারা নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে গৃহযুদ্ধ বাধানোর যে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন, তা অমূলক হয়নি। তিনি বলেন, সর্বসম্মতভাবে সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় গণতন্ত্রের যে ঐতিহাসিক শুভযাত্রা শুরু হয়েছিল তা যেন আজ গুটিকতক সন্ত্রাসী ও স্বেচ্ছাচারীর হাতে বন্দী।

অধ্যাপক গোলাম আযমকে ইস্যু বানানোর ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, নন-ইস্যুকে ইস্যু বানানোর রাজনীতি কিংবা অধ্যাপক গোলাম আযমের কথা তুলে নিজেদের নিদারুণ ব্যর্থতা ঢাকার রাজনীতির দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

জামায়াতের প্রবীণ নেতা বলেন, অধ্যাপক গোলাম আযম একজন ভাষাসৈনিক, সুযোগ্য রাজনীতিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী দেশের জনগণের নিকট এ কথা প্রমাণ করেছে যে, জামায়াত একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দল। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের সংগ্রাম চালিয়ে জামায়াত ইতোমধ্যেই দেশের জনগণকে একটি গঠনমূলক রাজনীতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

জনাব খান বলেন, অতীতে অনেকেই গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের জনগণের মূল সমস্যা চিহ্নিত করে সঠিক দিকনির্দেশনার জন্য যে ধরনের নেতৃত্ব প্রয়োজন, অধ্যাপক গোলাম আযমের মধ্যে সে গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছে। তাই সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা অধ্যাপক গোলাম আযমকে মৌলবাদের খুঁটি বলে আখ্যায়িত করছে। ওদের টার্গেট আপাতত অধ্যাপক গোলাম আযম হলেও আসলে টার্গেট ইসলাম।

তিনি পরিস্থিতির গভীরতা উপলব্ধি করে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সকলের প্রতি আবেদন জানান।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অধ্যাপক আযমের উপর আরোপিত অভিযোগ ভিত্তিহীন, মিথ্যা। আওয়ামী লীগ সাড়ে তিন বছর ক্ষমতায় ছিল। আমাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগও দাঁড় করাতে পারেনি। অভিযোগকারীরা নিজেদের আয়নায় আমাদের দেখে এ ধরনের কথা বলেন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ও রাজনৈতিক উভয় ধরনের ব্যবস্থা নেব।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, '৮১ সালে এমনি ধরনের স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি হিসেবে জাতিকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, যার পরিণতি জিয়া হত্যার মাধ্যমে শেষ হয়। ঠিক একই প্রক্রিয়ায় '৯২ সালের এই সময়ে আন্দোলন শুরু করা হয়েছে। যারা ঐ সময়ে এ কাজটি করেছিল, এবারের ষড়যন্ত্রেও তারাই সক্রিয়। এবারের ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে জিয়া হত্যার আসামিও রয়েছে।

২৫২.

গণ-আদালতের আইনগত ও নৈতিক মর্যাদা

সরকারি আদালত ছাড়া বেসরকারিভাবে কোনো আদালত গঠন করা দেশের শাসনতন্ত্র ও আইনে কোনোক্রমেই বৈধ নয়। এ জাতীয় কোনো আদালত গঠন করার কোনো ইখতিয়ার কারো নেই। অথচ আমার বিরুদ্ধে বিচারের উদ্দেশ্যে যারা গণ-আদালত গঠন করলেন, তারা সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ করলেন। পত্রিকায় ছবি বের হয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন অফিসে আইনজীবী-নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে তথাকথিত গণ-আদালতের জন্য ওকালতনামায় স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। যারা ঐ আদালতের বিচারক, উকিল ও সাক্ষীর ভূমিকা পালন করেছেন তারা জ্ঞানপাপী বলেই গণ্য হওয়ার যোগ্য। জেনেশুনে তারা বেআইনি কাজ করলেন।

ঐ আদালত, বিচারক, উকিল ও সাক্ষীদের নৈতিক মর্যাদা আরো জঘন্য। আমি যদি আইনের দৃষ্টিতে কোনো অপরাধ করে থাকি তাহলে তারা দেশের কোনো আদালতে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারতেন। তা না করে তারা নিজেরাই বিচার করার অধিকার কোথা থেকে পেলেন? নৈতিক বিবেচনায় তাদেরকে সন্ত্রাসী বলা ছাড়া আর কোন্ বিশেষণে বিশেষিত করা যায়? জনগণের নামে আদালত গঠনের ইখতিয়ার তারা কীভাবে পেলেন? আমার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জিঘাংসা চরিতার্থ করার কোনো উপায় না থাকায় তারা এমন অনৈতিক কাজে লিপ্ত হন।

এ জ্ঞানপাপীদের তালিকা যাতে ইতিহাস থেকে মুছে না যায়, বর্তমান দেশবাসী এবং পরবর্তী প্রজন্মের নিকট এরা যাতে ঘৃণিত হয়ে থাকেন, সে উদ্দেশ্যেই তাদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি।

গণ-আদালতের পক্ষের পত্রিকার বিবরণ

পূর্বঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ (১৯৯২) গণ-আদালতের বৈঠক হয়। পরের দিন ২৭ মার্চ দৈনিক জনতা পত্রিকায় 'কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারি হুঁশিয়ারি, ১৪৪ ধারা ও বিভিন্ন স্থানে পুলিশি ব্যারিকেড উপেক্ষিত' শোল্ডারের অধীনে ৫

কলামে হেডিং দেওয়া হয় 'সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখো জনতার ঢল'। পত্রিকাটিতে নিম্নরূপ ভাষায় এর খবর প্রকাশিত হয়েছে :

"কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সরকারি হুঁশিয়ারি, ১৪৪ ধারা জারি, ঢাকাসহ সারা দেশের স্থানে স্থানে পুলিশি ব্যারিকেড চৈত্রের খররোদ আর জামায়াত-শিবিরের হুমকি উপেক্ষা করে গতকাল বৃহস্পতিবার স্বাধীনতা দিবসে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণ-আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে। লাখ লাখ জনতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত আদালত পাক-হানাদার বাহিনীর দোসর ও 'নরঘাতক' পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমকে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন। আগামী ৩০ দিনের মধ্যে এই রায় কার্যকর করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। 'একাত্তরের ঘাতক গোলাম আযমের ফাঁসি চাই' স্লোগানে প্রকম্পিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এই ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করা হয়। রায় ঘোষণার সাথে উল্লাস ধ্বনিতে ফেটে পড়ে উপস্থিত জনতা। মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে রায়ের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেন তারা। রায় ঘোষণার সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। রায়ের সম্পূর্ণ অংশ পড়ে শোনানো হয়নি। এডভোকেট গাজিউল হক এবং আবদুর রাজ্জাক এমপি রায়ের প্রধান প্রধান অংশ পড়ে শোনান।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও '৭১-এর ঘাতক-দালাল সমন্বয় কমিটি আয়োজিত গণ-আদালতের বিচারকবৃন্দ ছিলেন চেয়ারপার্সন মুক্তিযোদ্ধাজননী জাহানারা ইমাম, বিচারকবৃন্দ : জনাব এডভোকেট গাজিউল হক, ড. আহমদ শরীফ, স্থপতি মাজহারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার শফিক আহমদ, ফয়েজ আহমদ, প্রফেসর কবির চৌধুরী, জনাব কলিম শরাফী, মওলানা আবদুল আওয়াল, লে. কর্নেল (অব.) নূরুজ্জামান, লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসামান এবং ব্যারিস্টার শওকত আলী খান।

১৯৭১ সালে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেখানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন সেখানেই বসেছিল গতকালের গণ-আদালত। জামায়াত-শিবির সুইসাইড স্কোয়ার্ড হামলার গুজব ছড়িয়েছিল। সরকার প্রেসনোটে এবং রেডিওতে বারবার গণ-আদালতের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিল। বলা হয়েছিল– তথাকথিত গণ-আদালতের নামে যারা অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ও ঘৃণা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের স্বাভাবিক জীবন বিঘ্নিত করার জন্য নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার বাধ্য হবে। গণ-আদালত সুশৃঙ্খল হলেও সরকারের পুলিশ বাহিনী কঠোর হয়েছিল। গণ-আদালতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু ধোপে টেকেনি। উত্তাল জনতার স্রোতে খড়কুটোর মতো ভেসে গেছে সেই প্রতিরোধ। তখন সকাল আনুমানিক আটটা। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের প্রবেশপথগুলোতে অবস্থান নিয়েছে পুলিশ। উদ্যানে ঢুকতে এবং সমবেত হতে বাধা দিচ্ছে পুলিশ। বেড়া ডিঙ্গিয়ে উদ্যানের ভেতর ঢুকেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের কাছাকাছি সমবেত হলো তারা। রমনা থানার সেই ওসি আখলাক, যার সহযোগিতায় ২৯ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পার্টির মহাসমাবেশে বিএনপির সশস্ত্র গুণ্ডারা হামলা চালিয়েছিল, সে এসে ঘোষণা দিল

'১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আপনারা সবাই উদ্যান ত্যাগ করুন।' সমবেত ছাত্রদের ঘটনাস্থল ত্যাগে বাধ্য করে আখলাক। কিন্তু ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন আন্দোলনে যে ছাত্রসমাজ ইতিহাস গড়েছে, তারা তো আর পিছু হটতে জানে না। উদ্যানের ভেতরে থেকে হাততালি দিয়ে তারা আকৃষ্ট করতে থাকে বাইরের জনতাকে। প্রবেশপথগুলো বন্ধ রেখে প্রেসক্লাব, শাহবাগ মোড়সহ বিভিন্ন স্থানে মিছিলের গতিরোধ করেও পুলিশ ঠেকাতে পারেনি জনতার ঢল। এ যেন সেই '৭১ সালের আগুনঝরা দিন। একে একে মানুষ এগিয়ে চলেছে উদ্যানের দিকে। সবুজ গাছে ভরা উদ্যানে জনতার পদচারণা-মিছিল স্লোগানে মুখরিত হচ্ছে। সাড়ে ৯ টার দিকে এল উত্তাল জনতার ঢল। মিছিলের জোয়ারে ভেসে গেল পুলিশের ব্যারিকেড। খুলে গেল উদ্যানের সবকটি গেট। ফাঁসিতে ঝুলন্ত গোলাম আযমের কুশপুত্তলিকা লাঠির মাথায় বেঁধে, ব্যানার, ফেস্টুন উঁচিয়ে, মাথায় রঙ-বেরঙের পট্টি বেঁধে মিছিলের পর মিছিল এল আদালত প্রাঙ্গণে। অশীতিপর বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে, স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনতে গিয়ে আহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা হুইল চেয়ারে করে, শিশু পিতার হাত ধরে, মা ছেলেকে কোলে নিয়ে, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী সর্বস্তরের লাখ লাখ জনতা সমবেত হন তাদের কাঙ্ক্ষিত আদালতে ফরিয়াদ নিয়ে। আওয়ামী লীগ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ১৪টি ছাত্র সংগঠনসহ স্বাধীনতার পক্ষের বিভিন্ন সংগঠন অবিরত স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত করে তোলে উদ্যানটি। 'গোলাম আযম, নিজামী– মুক্তিযুদ্ধের আসামি', 'মুক্তিযুদ্ধের ঘাতকদের ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই', 'জেগেছে আজ বীর জনতা– ঘাতক তোদের রক্ষা নেই', 'মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার', 'তুই রাজাকার' প্রভৃতি স্লোগানে এক অবর্ণনীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়। সোহরাওয়ার্দীর সবুজ উদ্যান পরিণত হয় জনসমুদ্রে। পুলিশি বাধার কারণে আগে মঞ্চ নির্মাণ সম্ভব হয়নি। তাই চারটি ট্রাক এনে বিকল্প মঞ্চ তৈরি করা হয়। চৈত্রের প্রখর রোদে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পুড়ছে জনগণ। কিন্তু সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। ১২টার দিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা সাজেদা চৌধুরী এবং আবদুল জলিল একটি চিঠি এগিয়ে দিলেন জাহানারা ইমামের হাতে। জানা যায়, চিঠিটি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার লেখা। চিঠিতে সকল প্রস্তুতি সম্পন্নের কথা লেখা ছিল। এর পরপরই জাহানারা ইমামসহ নেতৃবৃন্দ এগিয়ে যান মঞ্চের দিকে। কিন্তু মঞ্চে ওঠার পর আরেকটি বাধার সম্মুখীন হন তারা। হঠাৎ বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া হয় এই এলাকার। ফলে মাইক হয়ে পড়ে অকেজো। এই অবস্থায় মুখে রায় পড়ে শোনান এডভোকেট গাজিউল হক এবং আবদুর রাজ্জাক এমপি। রায় ঘোষণার সাথে সাথে উল্লাসে ফেটে পড়েন উপস্থিত জনতা। এ সময় এক বৃদ্ধ চিৎকার করে বলেন, 'গোলাম আযম আমার ছেলেকে খুন করিয়েছে– তার ফাঁসি চাই।'

এরপর জনতার তিনটি স্রোত তিন দিক দিয়ে (ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট গেট, টিএসসি গেট এবং শাহবাগ গেট) বের হয়ে যায়। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট দিয়ে বের হওয়া স্রোতটি মিছিল করে প্রেসক্লাব হয়ে মতিঝিল এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এই একটি অংশ দেখেই পথচারীগণ বলেছেন– এই গণজোয়ার '৯০-এর ৬ ডিসেম্বরের চেয়ে অনেক অনেক বেশি।"

এ বিবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্য

এ রিপোর্ট থেকে পাঠক-পাঠিকাগণ উপলব্ধি করতে পারবেন যে, আমাকে উপলক্ষ করে ইসলামবিরোধী শক্তি ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কতটা মারমুখী হয়েছিল; আর সরকার আমাকে গ্রেফতার করে তাদের সাহস কতটা বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। তাদের দাবি পূরণ করে গ্রেফতার করায় তারা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে গণ-আদালতের নাটক মঞ্চস্থ করতে সক্ষম হয়।

সরকারের দুর্বল প্রতিরোধে তাদেরকে অধিকতর উগ্রতার সাথে বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার প্রেরণা জোগায়। তাদেরকে এমনি ছেড়ে দিলে এ নাটক হয়তো জনতাকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হতো।

গণ-আদালতের বিচারপ্রক্রিয়া

দৈনিক খবর পত্রিকার ২৭ মার্চ (১৯৯২) সংখ্যার ফটোকপি জনাব আলী আহমদ থেকে পেয়ে জানতে পারলাম, ১২ জন বিচারকের বেঞ্চে ১৫ জন সাক্ষী আমার বিরুদ্ধে ১২টি মারাত্মক অভিযোগের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। পাকিস্তানের দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগের যে ফিরিস্তি রয়েছে, তা সবই তারা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে। বিচারের জন্য তাদেরকে তো নাগাল পাওয়া গেল না। আত্মসমর্পণের পর তাদের সবাইকে ভারতে যুদ্ধবন্দী হিসেবে নিয়ে যাওয়া হলো। ভারতের নিকট তাদেরকে বিচার করার দাবি যারা জানাতে পারল না, তারা সে বিচারে আমাকে আসামি করে মনের ঝাল মেটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল।

১২টি অভিযোগই সত্য বলে গণ-আদালতে যারা সাক্ষ্য দিলেন তারা আখিরাতের আদালতে আসামির মর্যাদা পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। তাদের নামগুলোও রেকর্ডে রাখা প্রয়োজন মনে করি। তারা হলেন :

১. ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২. ড. বোরহানুদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩. ড. মেঘনাদ গুহ ঠাকুরতা, শিক্ষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪. সৈয়দ শামসুল হক, কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার
৫. শাহরিয়ার কবির, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক
৬. মুশতারী শফি, লেখিকা
৭. সাইদুর রহমান
৮. অমিতাভ কায়সার
৯. হামিদা বানু
১০. মওলানা ইয়াহিয়া মাহমুদ
১১. আলী যাকের, বুদ্ধিজীবী
১২. ড. মুশতাক হোসেন

১৩ থেকে ১৫ নং সাক্ষীর নাম পত্রিকায় পেলাম না। অথচ তারা অন্য সব সাক্ষীকে সমর্থন করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগনামা

উপরিউক্ত সাক্ষীগণ যে অভিযোগ সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তা পত্রিকায় সংক্ষেপে নিম্নরূপে পরিবেশিত হয়েছে :

গণ-আদালত মোকদ্দমা নং ১/১৯৯২

বাংলাদেশের গণমানুষ, অভিযোগকারী

বনাম
জনাব গোলাম আযম
পিতা- মওলানা গোলাম কবির
সাকিন- পাকিস্তান

বর্তমান অবস্থান : ১১৯, কাজী অফিস লেন, মগবাজার, থানা- রমনা, জেলা- ঢাকা। অভিযুক্ত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, জনপদ ধ্বংস, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধজনক কাজে মদদকারী এবং স্বয়ং শান্তি কমিটি, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী গঠন করে এবং হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে রাজাকার বাহিনী গঠন করায় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, জনপদ ধ্বংস, নারী ধর্ষণের ন্যায় জঘন্য অপরাধ সংঘটনের নির্দেশ প্রদান, প্ররোচিতকরণ, বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনক্সা প্রণয়ন করে নিজস্ব বাহিনী আল-বদর, আল-শামসকে দিয়ে তাদের হত্যা করানো এবং মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে 'পূর্ব-পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি' গঠন করে বিদেশি শত্রুর চর হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে অপরাধ সংঘঠন করার অভিযোগে অভিযুক্ত।

অভিযোগকারীর পক্ষে কৌসুলিবৃন্দ :

১. এডভোকেট জেড আই পান্না
২. এডভোকেট শামসুদ্দিন বাবুল
৩. এডভোকেট উম্মে কুলসুম রেখা

অভিযুক্তের পক্ষে গণ-আদালতে নিযুক্তীয় কৌসুলি :

১. এডভোকেট মোঃ নজরুল ইসলাম

১২ দফা অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণও পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে।

এতে দাবি করা হয়েছে, বাংলাদেশের গণমানুষ অভিযোগকারী। যেসব মারাত্মক অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তা জনগণ কোথায় কীভাবে প্রকাশ করেছে তার কোনো উল্লেখ নেই। অভিযোগকারীদের পক্ষে ওকালতি করার জন্য যে তিনজন দায়িত্ব পালন করেছেন তাদেরকে জনগণ কখন নিয়োগ করেছে তাও জানানো হয়নি।

আমার পক্ষে ওকালতি করার জন্য এক ভদ্রলোককে নিযুক্ত করা হয়েছে বলে সর্বশেষে উল্লেখ করা হয়। আমি জেলে থাকলেও দেশের জেলেই ছিলাম। আমাকে উকিল নিয়োগ

করার কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাহলে তাকে কে নিয়োগ করল? তার কোনো ভূমিকা পত্রিকায় অনুপস্থিত।

গণ-আদালতের রায়

তথাকথিত গণ-আদালতে আমার বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, ১৫ জন সাক্ষী অভিযোগ সত্য বলে সাক্ষ্য দেন এবং ১২ জন বিচারকের বেঞ্চ সর্বসম্মতভাবে আসামিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন এবং সরকারের নিকট এ দণ্ড এক মাসের মধ্যে কার্যকর করার জন্য আহ্বান জানান। দৈনিক খবরের ২৭ মার্চ সংখ্যায় এ সংবাদ নিম্নরূপ ভাষায় প্রকাশ করা হয় :

'*খান মোহাম্মদ সালেক : স্বতঃস্ফূর্ত* এক বিশাল জনসমুদ্রে এ দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত গণ-আদালত ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হত্যা, নারী নির্যাতন, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের হোতাদের অন্যতম সহযোগী জামায়াতে ইসলামীর আমীর পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। বিপুল করতালির মধ্যে ১২ সদস্য নিয়ে গঠিত আদালত বেঞ্চের চেয়ারম্যান জাহানারা ইমাম রায় ঘোষণা করে এক মাসের মধ্যে রায় কার্যকর করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান। বাংলাদেশের গণমানুষ বনাম গোলাম আযম মামলায় আসামির বিরুদ্ধে ১২টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল। বাদী পক্ষে ১৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের ভিত্তিতে বিচার করা হয়। আসামি কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকায় তার অনুপস্থিতিতেই মামালার রায় দেওয়া হয়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের যে স্থান থেকে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন এবং ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল সেখানে আদালত বসার জন্য স্থান নির্ধারিত হয়।'

এ খবরটুকুর উপরে আট কলাম হেডিং-এ লেখা হয়– 'সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখ লাখ মানুষের ঢল ॥ গণ-আদালতে গোলাম আযমের মৃত্যুদণ্ড'।

সরকারের লোকদেখানো গ্রেফতারি পরোয়ানা

গণ-আদালত অনুষ্ঠানের বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরকার যে লোকদেখানো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা দৈনিক খবরের ২৯ মার্চ (১৯৯২) সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদের আট কলামের হেডিং ছিল নিম্নরূপ– 'গণ-আদালতের চেয়ারম্যানসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি॥ পুলিশ বাদী হয়ে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা'।

স্টাফ রিপোর্টার রাষ্ট্রদ্রোহিতা, দাঙ্গা, ভীতি প্রদর্শন, হত্যার হুমকিসহ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গণ-আদালতের চেয়ারম্যান এবং বিচারকসহ মোট ২৪ জনের বিরুদ্ধে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির আওতায় সরকারের পক্ষে রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা সৈয়দ আখলাক গতকাল শনিবার এ মামলা দায়ের করেন। মুখ্য মেট্রোপলিটন হাকিম আজিজুল হক ভুঁইয়ার আদালতে পুলিশবাদী এ মামলায় গত ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী

উদ্যানে আয়োজিত গণ-আদালতের ১২ জন বিচারক, চারজন আইনজীবী, দুজন অভিযোগকারী, পাঁচ জন মূল সাক্ষী ও নির্মূল কমিটির সদস্য-সচিবকে আসামি করা হয়েছে। আদালত থেকে বাদীপক্ষের অনুকূলে আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। হুলিয়াপ্রাপ্তরা হলেন– বেগম জাহানারা ইমাম, এডভোকেট গাজিউল হক, ড. আহমদ শরীফ, স্থপতি মাজহারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার শফিক আহমদ, ফয়েজ আহমদ, কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, মওলানা আবদুল আউয়াল, লে. কর্নেল (অব.) কাজী নূরুজ্জামান, লে. কর্নেল (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, এডভোকেট জেড আই পান্না, এডভোকেট শামসুদ্দিন বাবুল, এডভোকেট উম্মে কুলসুম রেখা, এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ড. আনিসুজ্জামান, সৈয়দ শামসুল হক, আলী যাকের, ড. মোস্তাক হোসেন, শাহরিয়ার কবির, মওলানা ইয়াহিয়া মাহমুদ ও অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী।

জানা গেছে, মামলাটি দায়েরের ব্যাপারে সরকারিভাবে কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হয়নি। সরকারি দলের নীতিনির্ধারক পর্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ মামলা দায়ের করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে মামলা দায়েরের জন্য কোনো নির্দেশপত্র ইস্যু করা হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে। এ ব্যাপারে রাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে তাঁকে পাওয়া যায়নি। স্বরাষ্ট্র-সচিব জানান, কিছুই বলতে পারব না। রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাও একই মন্তব্য করে বলেন, সরকারি ব্যাপার, যা বলার কোর্টে বলা ছাড়া বিচারাধীন মামলা সম্পর্কে কিছু বলব না। দয়া করে আমাকে কিছু বলতে বলবেন না। যা জানার কোর্টে গিয়ে জানুন। এদিকে বিবাদী পক্ষ সূত্রে জানা গেছে, তারা আইনগতভাবেই এ মামলা মোকাবিলা করবেন। তাদের মতে, দেশবাসী সবই দেখছে। সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি দায়িত্বশীল সূত্র বলেছে, সংশ্লিষ্ট থানাগুলোতে গণ-আদালতের আয়োজক ও বিচারকদের বিরুদ্ধে জারিকৃত হুলিয়া এবং মামলার প্রসঙ্গটি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

সরকার গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়

সরকার যে আসামিদেরকে কোর্টে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছিল, তাদের কতক কোর্টে গিয়ে ভাঙচুর করে দাপটের সাথে ফিরে গেছে। যে পুলিশ বাদী হয়ে পরোয়ানা জারি করেছিল, তারা আসামিদের হামলা থেকে কোর্টকেও রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি।

পুলিশ তাদের একজনকেও গ্রেফতার করতে সাহস পায়নি। আমাকে গ্রেফতার করার পর মহাবিজয়ের কারণে তাদের সাহস বেড়ে যাওয়ারই কথা। গণ-আদালত অনুষ্ঠানে বিপুল জনসমাগম হওয়ায় তারা সাফল্যের উত্তেজনায় চরম উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য প্রস্তুত ছিল।

সরকার আমাকে গ্রেফতার করলেও তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার হিম্মত করেনি। তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করেও সরকার আর কিছুই করতে পারেনি বা করেনি। তাদের দাপটের নিকট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশ্যে পরাজয়বরণ করতে বাধ্য হয়।

১৯৯২ সালের ৩০ জুন ক্ষমতাসীন বিএনপি ও প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের মধ্যে মধ্যরাতে এক রাজনৈতিক চুক্তি হয়। বিরোধী দল সংসদে অংশগ্রহণের জন্য সরকারি দল থেকে কতক দাবি আদায় করে নিয়েছে। এসব দাবির মধ্যে একটি হলো, ঐ রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা প্রত্যাহার করার দাবি। মামলা প্রত্যাহার করে সরকার স্বীকার করে নিয়েছিল, গণ-আদালত কায়েম করা রাষ্ট্রদ্রোহিতা ছিল না; বরং মামলা করে সরকার তাদের বৈধ তৎপরতায় অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছে। এভাবেই সরকার বিশৃঙ্খলাকারীদের নিকট চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ করল।

গণ-আদালত সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য

ঘাদানি কমিটি গণ-আদালতে আমার বিচার করা হবে বলে ঘোষণা করার পরপরই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল ও জামায়াতের সংসদীয় দলের নেতা ১০ মার্চ (১৯৯২) তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তথাকথিত গণ-আদালত সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত বক্তব্য পুস্তিকাকারেও ব্যাপক সংখ্যায় প্রচার করা হয়।

উক্ত বক্তব্যে গণ-আদালতের বৈধতাকে তিনি বলিষ্ঠ যুক্তিসহকারে চ্যালেঞ্জ করেন। এর উদ্যোক্তা কারা ও তাদের উদ্দেশ্য কী, তা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে সরকারের নীরব ভূমিকা সম্পর্কেও তিনি প্রশ্ন তোলেন। আমার বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্ষক কারা– সে প্রশ্ন তুলে প্রমাণ করেন যে, জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হিসেবে ঘাদানি কমিটি থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য।

ঐতিহাসিক ঐ বক্তব্যটিকে স্থায়ী রেকর্ডে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এখানে হুবহু তুলে ধরলাম :

"প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা কতটা আন্তরিক ও বলিষ্ঠ ছিল, তা আপনাদের অজানা নেই। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন যে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে হওয়ার কারণে অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে, এর প্রস্তাবনা ও দাবি জামায়াতে ইসলামীই সর্বপ্রথম ১৯৮৩ সালের নভেম্বরে পেশ করেছিল।

নির্বাচনে কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করায় সরকার গঠনে যখন সংকট সৃষ্টি হলো, তখন ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জামায়াতে ইসলামী সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে সংসদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠনে সহযোগিতা করেছে।

জামায়াতে ইসলামী আশা করেছিল, গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হলে সকল রাজনৈতিক মহল দেশ গড়ায় অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ লাভ করবে। সংসদীয় গণতন্ত্রে

উত্তরণের সময় রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে ঐতিহাসিক ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে দেশ গড়ার ব্যাপারে জাতীয় ঐক্যের সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

দেশের জনগণ বর্তমানে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয়সহ যেসব সমস্যায় জর্জরিত, তাতে রাজনৈতিক অঙ্গনে সত্যিকার ঐক্য সৃষ্টি করা সম্ভব না হলে দেশের উন্নয়ন তো দূরের কথা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু রাখাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। দেশের দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে দেশের প্রধান সমস্যাগুলোর সমাধানের উদ্দেশ্যে ঘনিষ্ঠ মতবিনিময় ও ঐকমত্য সৃষ্টি হওয়া অপরিহার্য। গণতন্ত্র বহাল রাখা ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য এটাই সময়ের দাবি, জাতীয় কর্তব্য ও জনগণের কামনা।

জামায়াতে ইসলামী বিস্ময় ও বেদনার সাথে লক্ষ করছে যে, একটি মহল জনগণের মূল সমস্যা আড়াল করে যা কোনো সমস্যা নয় সেটা ইস্যু বানিয়ে দেশকে একটি সংকটের দিকে ঠেলে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে। বেশ কিছুদিন যাবৎ পত্র-পত্রিকায় চরম উসকানিমূলক ও দায়িত্বহীন বক্তব্য দিয়ে দেশে হিংসা-বিদ্বেষের এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অথচ দেশের শান্তিকামী মানুষ এসব পছন্দ করে না। ৯টি বছর সংগ্রামের পর দেশের মানুষ চায় গণতন্ত্র বহাল থাকুক এবং তাদের অর্থনৈতিক দুর্গতির অবসান হোক ও তাদের অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা সমস্যার সমাধান হোক।

জামায়াত মনে করে, অধ্যাপক গোলাম আযমের ১৯৭১ সালের ভূমিকাকে অজুহাত বানিয়ে যারা গণ-আদালতের নামে হৈ চৈ করছে তারা সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে রাজনৈতিক পরিবেশকে ঘোলাটে করছে।

প্রথমত, যেখানে রাষ্ট্র ও সরকার আছে সেখানে আইনানুগ আদালতের বদলে কোনো গণ-আদালতের প্রশ্নই ওঠে না। এ ধরনের উদ্যোগ সরকারের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করার শামিল। জামায়াত মনে করে, সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা ব্যাহত করার জন্যই এই জঘন্য রকমের সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানো হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, তারা নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়ে দেশে সরকারের বিকল্প শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

তৃতীয়ত, দেশে আইন, আদালত ও সরকারের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে স্বেচ্ছাচারীভাবে গণ-আদালত গঠনের এ উদ্যোগ দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির অপতৎপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

চতুর্থত, জামায়াতে ইসলামী মনে করে যে, তথাকথিত গণ-আদালত গঠনের অপচেষ্টাকে সরকার আইনের শাসন ও গণতন্ত্রের স্বার্থেই প্রতিহত করবে। এটা সরকারের দায়িত্ব। কোনো অবস্থাতেই সরকার নীরবতা পালন করতে পারে না।

জামায়াত আরো মনে করে, এ ধরনের স্বেচ্ছাচার ও বেআইনি তৎপরতার প্রশ্রয় দেওয়া হলে তা দেশ ও সমাজের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

পঞ্চমত, যে কয়েকজন আইনবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীর দাবিদার ব্যক্তি এ উদ্যোগে অংশীদার হয়েছেন, তারা কোনো দিক দিয়েই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন না।

ষষ্ঠত, এমন কতক বাম রাজনীতিক প্রধান উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন, যারা দেশের জনগণের নিকট প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণে চরম হতাশায় ভুগছেন। তাদের পুরনো সব রাজনৈতিক স্লোগান অচল হয়ে পড়ায় তাদের নিকট এমন কোনো ইস্যু নেই, যা নিয়ে ময়দান গরম করা যায়। জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল কোনো দল ও নেতার পক্ষে তাদের এ অবাঞ্ছিত উদ্যোগে সাড়া দেওয়া স্বাভাবিক নয়।

গণ-আদালতের উদ্যোক্তা কারা?

গণ-আদালতের উদ্যোক্তারা সবাই রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, কতক সমাজতন্ত্রী আর সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

ইসলামের বিরুদ্ধে এদের চরম এলার্জি। এদের নিকট ইসলাম হলো সাম্প্রদায়িকতা ও তথাকথিত মৌলবাদ। এ দেশের জনগণের ঈমান-আকীদা, আদর্শিক চেতনা, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ নির্মূল করাই তাদের যাবতীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আসল উদ্দেশ্য। এ কারণেই ইসলামী আন্দোলনকে তারা তাদের পথে সবচেয়ে বড় বাধা মনে করে। তারা জামায়াতে ইসলামীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও অগ্রগতির মধ্যে তাদের পরাজয় দেখতে পায়। আর অধ্যাপক গোলাম আযমের মতো যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতা তাদের নিকট অসহনীয়।

তারা আসলে কী চান?

গণ-আদালতের উদ্যোগীরা যে ধরনের উসকানিমূলক ও বিদ্বেষসূচক বক্তব্য, স্লোগান ও কর্মসূচি দিয়ে চলেছেন তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তারা চান ইসলামী আন্দোলনের লাখ লাখ কর্মী ও সমর্থক তাদের বিরুদ্ধে নেমে পড়ুক এবং দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি হোক।

তারা হয়তো মনে করছেন যে, তাদের বাড়াবাড়িতে ইসলামী শক্তি একসময় অধৈর্য হয়ে তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে। এভাবে তারা দেশটাকে একটা গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারবেন। হয়তো গৃহযুদ্ধ তাদের বড়ই প্রয়োজন। তারা বিগত কয়েকটি নির্বাচন ও গণভোটে বুঝতে পেরেছেন যে, জনগণ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমতাসীন করবে না। আর তাদের পছন্দনীয় শক্তিকে ক্ষমতাসীন করতে হলে গৃহযুদ্ধের অন্ধকার পথই তাদেরকে ডেকে আনতে হবে। তাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে নস্যাৎ করাই তাদের লক্ষ্য।

গণতান্ত্রিক সরকার এ ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করতে সক্ষম কি না, তা তারাই জানেন। যদি খোদা না করুন, ষড়যন্ত্রকারীরা দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে সক্ষম হয় তাহলে বর্তমান সরকারের অস্তিত্ব টিকবে কি না, তাও উপলব্ধি করার দায়িত্ব সরকারেরই।

সরকার নীরব কেন?

গণ-আদালতের পাঁয়তারা এত দিন থেকে চলা সত্ত্বেও সরকার এ বিষয়ে নীরব কেন– এ জিজ্ঞাসা সবারই। একটি মহল কী করে আইন হাতে তুলে নিতে পারে, তার জবাব

দেওয়ার দায়িত্ব সরকারেরই। সরকারের নীরবতার এ অর্থই দাঁড়ায় যে, দেশে আইন ও আদালত নেই এবং যাদের সন্ত্রাসের যোগ্যতা আছে তারা আইন হাতে তুলে নিলে অরাজকতা সৃষ্টির পথে কোনো বাধা নেই।

আরো একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা

বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী কয়েকজন আইনবিদ ও সাবেক বিচারপতি বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনের কতক ধারার আওতায় অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচার করা যায় বলে সংবাদপত্রে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন। আইনের এ পণ্ডিতগণ যদি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে, দেশের প্রচলিত আইনেই অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচার হতে পারে, তাহলে তারা কেন সরকারি আদালতে মামলা দায়ের না করে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে গণ-আদালতের প্রহসনের সাথে নিজেদের জড়িত করছেন। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, অধ্যাপক গোলাম আযম এমন কোনো অপরাধ করেননি, যা আদালতে প্রমাণ করা সম্ভব। তাই যারা অভিযোগকারী তারাই বিচারকের অভিনয় করার উদ্দেশ্যে গণ-আদালত কায়েম করতে চান।

অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যাচার

একশ্রেণীর সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে এমন সব ভিত্তিহীন জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করে চলেছে, যার প্রমাণ করার কোনো সাধ্য তাদের নেই। মনে হয়, পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো সংবাদের সত্যতা প্রমাণ করার কোনো দায়িত্ব নেই। মিথ্যার বেসাতি যেন রাজনীতিতে দূষণীয় নয়। বোধ হয় এ কারণেই এরা ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করার মতো জোরদার দাবি করে। মিথ্যা সব ধর্মেই নিন্দনীয়। তাই রাজনীতি ধর্মনিরপেক্ষ না হলে তাদের মিথ্যার বেসাতি অচল হতে বাধ্য। তাদের প্রতিটি অভিযোগ শতকরা এক শ' ভাগই চরম মিথ্যা। এর কোনোটিই প্রমাণ করার সাধ্য কারো নেই। এসব অভিযোগ সঠিক নয় জেনেই রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্যে তারা গণ-আদালতের নামে আইন হাতে তুলে নিতে চাচ্ছেন।

আজ এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামী আন্দোলনের বিকল্প আদর্শ ও রাজনৈতিক কর্মসূচি দিতে ব্যর্থ এবং রাজনৈতিকভাবে জামায়াতে ইসলামীকে মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে প্রতিপক্ষ সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্ষক কারা?

অধ্যাপক গোলাম আযম ও জামায়াতে ইসলামীকে স্বাধীনতাবিরোধী বলে কোনো কোনো মহল অপপ্রচার চালাচ্ছে। '৭১-এ জামায়াতের ভূমিকাকে অজুহাত বানিয়েই তারা এখনো অপবাদ দিয়ে যাচ্ছে। অথচ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম হওয়ার পর জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আন্তরিকতার পরিচয় দিচ্ছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা কোন্ দেশটি থেকে বিপন্ন হতে পারে, এ বিষয়ে সামরিক ও বেসামরিক সকল বাংলাদেশি নাগরিকের ধারণা একই। প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি দ্বারা এ দেশ

প্রায় ঘেরাও হয়ে আছে। তাদের সাথে আমরা অবশ্যই বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলতে চাই; কিন্তু যদি কোনো সময় এ দেশের উপর কোনো দেশ থেকে হামলা হয়, তাহলে ঐ দেশ থেকে হওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

এখন প্রশ্ন হলো, যারা ফারাক্কা, তালপট্টি ও তিনবিঘা সম্পর্কে নীরব– এমনকি পার্বত্য জেলাসমূহে সশস্ত্র সন্ত্রাসের মতো জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকির ব্যাপারেও কোনো প্রতিবাদ না করে আধিপত্যবাদকে প্রশ্রয় দেন, তারা এ দেশের উপর হামলা হয়ে গেলে জীবন দিতে এগিয়ে আসবেন কি না তা যথাসময়েই বোঝা যাবে।

দেশে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিলে যারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় পান তারা জীবন দিয়ে এদেশকে রক্ষা করার প্রয়োজনবোধ করবেন কেন? কিন্তু দেশের তেমন কোনো সংকট দেখা দিলে জামায়াতে ইসলামী ইনশাআল্লাহ শাহাদাতের পবিত্র জযবা নিয়ে দেশের আযাদির হেফাযত করবে। কারণ, তাদের এ দেশের মাটির বাইরে কোথাও আশ্রয় নেই। বাঁচলেও এ দেশেই এবং মরলেও এ দেশেই তাদের একমাত্র স্থান।

বাংলাদেশের সবাই স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি

আমরা রাজনীতিসচেতন সকল মহলকে একটি বিষয় বিবেচনা করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা যদি রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে একদল আরেক দলকে স্বাধীনতার বিপক্ষ বলে প্রচার করতে থাকি, তাহলে এ বিতর্কের মীমাংসা কে করবে? সবার কার্যকলাপই জনগণের সামনে রয়েছে। নির্বাচনে জনগণই সিদ্ধান্ত দেয় যে, কাদের হাতে দেশ বেশি নিরাপদ। তাই এ দায়িত্ব জনগণের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমরা সবাইকে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলে গণ্য করে জনগণের সিদ্ধান্তকেই মেনে নেওয়া কর্তব্য মনে করি। কোনো এলাকার স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট চিরকাল এক থাকে না। ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতের দশ কোটি মুসলমান ভারত বিভাগকেই তাদের স্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য মনে করেছেন। ১৯৪৭ সালে এর ফলেই পাকিস্তান কায়েম হয়েছে।

'৭১ সালে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এ দেশের জনগণ পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়াকেই স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন মনে করেছে। তাই বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে দুনিয়ার মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশে এমন কোনো মহল নেই, যারা স্বাধীন বাংলাদেশকে অস্বীকার করে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাধীন বাংলাদেশের হেফাযত করা ও দেশটিকে সবদিক দিয়ে উন্নত মানে গড়ে তোলাই সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। এখন স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের বিতর্ক একেবারেই অবাস্তব।

জামায়াতের আকুল আবেদন

বাংলাদেশ ২০ বছর পূর্বে স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও এর সুফল জনগণের দুয়ারে এখনো পৌঁছেনি; বরং দেশে বিভেদ ও বিচ্ছেদ ছড়িয়ে কোনো কোনো মহল জনগণকে সন্ত্রাসের হাতে জিম্মি করে ফেলেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বড়ই করুণ। পরিবেশ উন্নত না হলে কোনো সরকারই জনগণের কল্যাণ করতে পারবে না। দীর্ঘ সংগ্রামের পর

কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ফলে দেশ গণতন্ত্রের পথে উত্তরণের সুযোগ পেয়েছে।

দেশে বর্তমানে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকার কারণে কয়েকটি রাজনৈতিক শক্তি নিজ নিজ কর্মসূচি নিয়ে সক্রিয় রয়েছে। কেউ যতই ক্ষুদ্র মনে করুক, জামায়াতে ইসলামীও এ দেশে একটি শক্তি। আমরা যদি এক শক্তি অপর শক্তিকে নির্মূল করার অভিযান চালাই তাহলে দেশকে চরম বিপর্যয়ের মুখেই ঠেলে দেওয়া হবে।

জামায়াতে ইসলামীকে জনগণ স্বাধীনতার হেফাযতকারী বলেই মনে করে। তাই জামায়াতের বিরুদ্ধে জনগণকে খেপানোর ব্যর্থ চেষ্টা কারো জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না।

যদি এভাবে রাজনৈতিক ময়দানকে উত্তপ্ত করা হয় তাহলে সরকারি দল ও বিরোধী দলের কেউ লাভবান হবে না। দেশে রাজনৈতিক বিদ্বেষ ছড়াতে থাকলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াও সফল হবে না। জামায়াত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী।

আসুন আমরা সবাই গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন নীতিমালা ও রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী রাজনীতি করি এবং কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণকে অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগের স্থায়ী ব্যবস্থা করি।

জামায়াতের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের নিকট আকুল আবেদন জানানো যাচ্ছে যে, আসুন আমরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ও এর বারো কোটি মানুষের কল্যাণ চিন্তা করি এবং সবাই মিলে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করি।

জামায়াতের পক্ষ থেকে এ কথাও ঘোষণা করা হচ্ছে যে, জামায়াতের সাথে যারা যে আচণরই করুক, জামায়াত কোনো মহলের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে না এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার চিন্তাও করে না। কারণ, ইসলাম ও রাসূল (স) মুসলমানদেরকে মানুষের কল্যাণ চিন্তা করারই নির্দেশ দিয়েছেন।

২৫৩.

কয়েকজন আপন লোকের ইনতিকাল

অল্প কয়েক মাসের মধ্যে পাঁচজনকে আপন লোককে হারালাম। এর মধ্যে মাত্র একজন রক্তের সম্পর্কে আপন, বাকি চারজনই দীনের সম্পর্কে আপন। রক্তের সম্পর্কে আপনজনের কথাই প্রথমে লিখছি।

আমার বোন আনওয়ারা

আমরা চার ভাই ও পাঁচ বোন ছিলাম। সম্প্রতি ২৯ ডিসেম্বর বোনদের মধ্যে যে তৃতীয়া ছিল, সে ৬৯ বছর বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল। নয় ভাই-বোনের মধ্যে আমি সবার বড়। এরপর ডাক্তার মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযাম। আমাদের এ দুই ভাইয়ের পরই

শামসুন নাহার নামে পাঁচ বোনের মধ্যে সবার বড় বোন ছিল। সে পাঁচ সন্তান রেখে আব্বা-আম্মার সামনেই চলে গেল।

এ বোনের পর আমার তৃতীয় ভাই ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ গোলাম মুকাররাম। এ ভাইয়ের পর দুই বোন নূরুন্নাহার ও আনওয়ারা। নূরুন্নাহার বিয়ের বয়স হওয়ার পর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। আনওয়ারার বিয়ে হয় আমার পরম বন্ধু সহপাঠী মসিহুর রহমানের সাথে। আমার এ ভগ্নিপতি মোমেনশাহীতে ওকালতি করতেন। তিনি ২০০১ সালে ইনতিকাল করেছেন। আমার বোনটি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দুই বছর ভোগান্তির পর ২৯ ডিসেম্বর (২০০৫) দিবাগত রাতে মৃত্যুবরণ করল।

গত ঈদুল ফিতরে আমি টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্টে আমার ছেলের সাথে ঈদ উদ্‌যাপন করি। ঈদের পরদিন ৬ নভেম্বর (২০০৫) আনওয়ারাকে দেখতে মোমেনশাহী গেলাম। খুবই দুর্বল অবস্থায় বোনকে দেখলাম। এটাই তার সাথে আমার শেষ দেখা।

এ বোনটি বড়ই দীনদার ছিল। চিকিৎসা-সুবিধার জন্য মৃত্যুর সপ্তাহ দুয়েক পূর্বে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। মৃত্যুর পূর্বদিন তার নয় ছেলে ও দুই মেয়ে হাসপাতালে বেশ ভালো অবস্থায় দেখে খুশি মনে যার যার কর্মস্থলে চলে গেল। অবস্থার উন্নতি অনুভব করে যারা দূরে থাকে তারা নিশ্চিন্তে ফিরে গেল। অথচ পরদিন রাত বারোটায় সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

তার মৃত্যুর সময়ের বিবরণ শুনে আমার এত ভালো লাগল যে, মৃত্যুসংবাদের বেদনা যেন দূর হয়ে গেল। তাকে ধরে বসিয়ে খাওয়ানো হচ্ছিল। একপর্যায়ে সে বলল, আমাকে শুইয়ে দাও। শুয়েই নীরবে চলে গেল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হুঁশ-জ্ঞান থাকা অবস্থায় মৃত্যু হওয়া খুবই বিরল ঘটনা।

মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকা অবস্থায় প্রায় সবসময়ই তার ঠোঁট নড়তে দেখা যেত। কোনো সূরা বা দোআ পড়তে থাকত। মৃত্যুর দিনও পুরো সূরা ইয়াসীন মুখস্থ পড়তে শোনা গেল।

তার তৃতীয় ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিস্টিক্সের অধ্যাপক শোয়াইবের নিকট ওর মায়ের কয়েকটি কথা শুনে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলাম। শয্যাগত থাকা অবস্থার কয়েকটি কথা ভবিষ্যদ্বাণীর মতো মনে হয়। যেমন– 'অমুকের ঘরে ছেলে হয়েছে, আমাকে বলনি কেন। অথচ তখনো ছেলে-মেয়ে কিছুই হয়নি। কয়েক দিন পর যখন সন্তান পয়দা হয়েছে তখন দেখা গেল ছেলেই হয়েছে। আরো একজনের ছেলে হওয়ার কথা বেশ কিছুদিন পূর্বেই সে ঐভাবে বলেছে। সবাই এতে বিস্মিত ও পুলকিত হয়েছে। আমার এ বোনটি যে আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দি ছিল, এ কথা অনুভব করে অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করছি। আল্লাহ তাআলা তাকে যথার্থ মর্যাদা দেবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আনওয়ারার ছোট আমাদের চতুর্থ ভাই ড. মু. মাহদীউয্‌যামান। এরপর আবার দুই বোন জাহান আরা ও জান্নাত আরা। জাহান আরা আযহারী অনেক বছর জামায়াতে ইসলামীর মহিলা বিভাগের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছে। ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পরও জামায়াত বিলম্বেই তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। চার ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে আমরা বর্তমানে (ফেব্রুয়ারি ২০০৬) চার ভাই ও দুই বোন বেঁচে আছি।

জনাব মু. নূরুয্যামান

পঞ্চাশের দশকে আমার সাথে জনাব নূরুয্যামানের যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি ডেইলি পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার তরুণ সাংবাদিক ছিলেন। ২০৫ নং নবাবপুর রোডে তখন জামায়াতে ইসলামীর অফিস। তখনো জামায়াতে ইসলামীর প্রাথমিক অবস্থা। ইংরেজি পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিক হিসেবে তাঁকে জামায়াতে সক্রিয় দেখে খুব খুশি লাগল। কয়েক মাস পর ঐ অফিসেই যখন দেখা হলো তখন তাঁর সুন্দর চেহারায় দাড়ি দেখে চমৎকার লাগলেও বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি দাড়ি না রাখলে চলত না?' জবাবে তিনি বললেন, সংগঠনের বৈঠকে যাঁদের সাথে বসি তাঁদের সাথে দাড়ি ছাড়া মানায় না।

তারপর তিনি সংগঠনে এগিয়ে যেতে যেতে রুকন হয়ে গেলেন। আমার সাথে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হতে লাগল। ১৯৬৯ সালে যখন পূর্ব-পাকিস্তানের আমীরের দায়িত্ব আমার উপর এল তখন তাঁকে জামায়াতের প্রাদেশিক প্রচার বিভাগের সেক্রেটারির দায়িত্ব দিই। '৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে পালন করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি যখন বিদেশে ছিলাম তখন জানতে পারলাম, তিনি সপরিবারে দুবাই আছেন। প্রতি বছর লন্ডন থেকে রমযান মাসে কুয়েত ও আরব আমিরাতে এবং রমযানের শেষ দশ দিন মক্কা ও মদীনা সফরে যেতাম। দুবাইয়ে নূরুয্যামান সাহেবের বাসা-ই আমার ঠিকানায় পরিণত হয়।

১৯৭৮ সালে আমি বাংলাদেশে চলে আসি। ১৯৮২ সাল থেকে তিনি দেশে আসা-যাওয়া শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে যখন ইসলামী ব্যাংক কায়েম হয় তখন তিনি এর স্পন্সরদের একজন হিসেবে ঘন ঘন ঢাকায় আসতেন। ১৯৮৪ সালে তিনি সপরিবারে দেশে চলে আসেন।

আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনর্বহাল হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। ২০০৫ সালের ৭ ডিসেম্বর, ২৪ রমযান তিনি ৬৮ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। বিছানায় দীর্ঘদিন পড়ে থাকেননি। পায়ে সমস্যা থাকায় চলাফেরায় কষ্ট হতো। মৃত্যুমুহূর্ত পর্যন্তও হুঁশ-জ্ঞান ছিল। ২৪টি রোযাই রেখেছিলেন। ২৪তম রোযার ইফতারের সময় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব থেকেই তিনি স্ত্রী-সন্তানদের বলতে থাকেন, আমার যাওয়ার সময় হয়েছে। তোমরা আমার কাছে বসে কুরআন তিলাওয়াত কর। আমি রোযাদার অবস্থায় আল্লাহর নিকট পৌঁছতে চাই। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এ বাসনা পূরণ করলেন।

তিনি অসিয়ত করে গেলেন যে, তাঁর জানাযার নামায যেন আমি পড়াই। আমি ই'তিকাফে থাকায় অন্যত্র যাওয়া সম্ভব ছিল না বলে আমাদের মহল্লার মসজিদেই জানাযা হয়। শেষবারের মতো কফিনে তাঁর চেহারা দেখে মনে হলো, সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় যেন ঘুমিয়ে আছেন। কপালে চুমু খেয়ে। প্রিয় বন্ধুকে চিরবিদায় জানালাম।

দুটো কাজ করে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করে গেছেন, যা তিনি না করলে হয়তো করাই হতো না। এ দুটো কাজে তাঁকে যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে। দুটো কাজই বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি বিবেচনা করি।

ঐ দুটো কাজের মধ্যে একটি হলো, ইংরেজি ভাষায় আমার জীবনের ঘটনাবলি ফটোসহ পৌনে দুই শ' পৃষ্ঠার একটা বই সংকলন করে নিজেই প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছেন। বইটির নাম রেখেছেন 'Prof. Ghulam Azam : A Profile of Struggle in the Cause of Islam'। বইটি আমি কারাগারে আবদ্ধ থাকাকালে গ্রেফতারের ৭ মাস পর প্রকাশিত হয়।

ঐ সময় আমার মুক্তির দাবিতে জামায়াত সারা দেশে আন্দোলন পরিচালনা করছিল। সরকারের বিরুদ্ধে আমার মামলার শুনানি চলছিল। পত্রিকায় মামলার খবর প্রকাশিত হচ্ছিল। সরকার আমাকে বিদেশি নাগরিক প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছিল। বাংলাদেশে বিদেশি রাষ্ট্রদূতগণও মামলার খবর আগ্রহ করে দেখছিলেন। জাতীয় সংসদে ২০ সদস্যবিশিষ্ট একটি দলের প্রধানকে বিদেশি নাগরিক হিসেবে গ্রেফতার করার বিরুদ্ধে এ মামলা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই স্বাভাবিক।

কূটনীতিক মহল ছাড়াও বিদেশি ব্যক্তিত্ব যারা বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে অবস্থান করেন, তাদের নিকট আমার সঠিক পরিচয় তুলে ধরার জন্য তাঁর বইটির বড়ই প্রয়োজন ছিল। আমার প্রতি ভালোবাসার টানে তিনি এ প্রয়োজন পূরণের উদ্যোগ নেন।

বইটির প্রচ্ছদে আমার রঙিন ফটো থাকায় সহজেই বইটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর্ট পেপারে উন্নত মানের মুদ্রণের ফলে বইটি যে কারো হাতে তুলে দেওয়ার মতো। কিছুদিন আগে প্রফেসর ড. মমতাজ আহমদ আমেরিকা থেকে এলেন। গত ১৫ বছর থেকে তিনি আমেরিকায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর। দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে এক্সপার্ট হওয়ার প্রয়োজনে বাংলাদেশে বহুবার এসেছেন। আমার সাথে আগেও দেখা হয়েছিল। এবার আমার সাথে দেখা করতে এসে বললেন, আমেরিকার রাজনৈতিক ও সরকারি মহলে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে জানার বেশ আগ্রহ রয়েছে। বাংলাদেশে জামায়াতের অগ্রগতিতে আপনার অবদান রয়েছে বলে আমি আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাই– যাতে যারা জামায়াত সম্পর্কে আমার নিকট থেকে জানতে চায়, তাদেরকে সঠিক ধারণা দিতে পারি।

এরপর তিনি বেশ কিছু প্রশ্ন করলেন এবং আমার প্রদত্ত জবাব নোট করতে থাকলেন। তিনি পাকিস্তান আমলের কোনো কোনো ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে নুরুয্যামান সাহেবের লেখা বইটি দেখতে দিলাম। তিনি একটু উল্টিয়ে বলতে গেলে লাফিয়ে উঠে বললেন, আর কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না; সবই এ বইয়ে রয়েছে।

আমার বড় নাতজামাই গত ডিসেম্বরে (২০০৫) লন্ডন থেকে ঢাকা বেড়াতে এল। সে বাংলা পড়তে পারে না। আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইল। এ বই পেয়ে সে খুব খুশি হয়ে বলল, যা জানতে চেয়েছি তা ছাড়াও বহু বিষয় এতে পেয়ে গেলাম। বইটির অল্প কিছু কপি এখনো আছে। শেষ হয়ে গেলে কী করব ভাবছি।

দ্বিতীয় বইটি তাঁর উদ্যোগ ও শ্রম ছাড়া আমার পক্ষে রেডি করা অসম্ভব ছিল। পাকিস্তান আমল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত আমার যত লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এর পেপার কাটিং ফাইলে রাখা ছিল। তিনি ঐ ফাইল চেয়ে নিয়ে গেলেন। মাসের পর

মাস পরিশ্রম করে সংকলন ও সম্পাদন করে প্রকাশনার জন্য প্রস্তুত করে দিলেন। ৩৬টি লেখা বিভিন্ন শিরোনামে সাজিয়ে দিলে আধুনিক প্রকাশনী তা ২৫৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। বইটির নাম রাখা হয় 'চিন্তাধারা'। ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তা প্রকাশিত হয়। তাঁরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকা আমার ৩৬টি প্রবন্ধ স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হলো।

তাঁর জন্য অন্তর থেকে দোআ করি, তিনি যেন আল্লাহর দরবারে উচ্চমর্যাদা পান।

কাজী শামসুর রহমান

সাবেক এমপি ও সাতক্ষীরা জেলার সাবেক আমীর কাযী শামসুর রহমান দীর্ঘ ছয় বছর রোগভোগের পর ১৭ ফেব্রুয়ারি (২০০৬) শুক্রবার সকালে চিরবিদায় নিলেন। ৬৯ বছর বয়সে তাঁর বহুমুখী কর্মময় জীবনের অবসান হলো।

১৯৬১ সালে তিনি আমার হাতেই জামায়াতের সংগঠনভুক্ত হন। সে হিসেবে তিনি ইসলামী আন্দোলনে আমার ৪৫ বছরের ঘনিষ্ঠ সাথী। সদা হাসিমুখ এ সাথীর সাথে দেখা হলে প্রায়ই বলতেন, 'আপনার হাত ধরেই আমি এ পথে এসেছি'।

তাঁর মতো কর্মবীর মানুষ কমই দেখা যায়। ইসলামী দাওয়াত ও সংগঠনের দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি এলাকার উন্নয়ন, জনগণের খিদমত ও সমাজসেবামূলক কাজে সদা ব্যস্ত থাকতেন। এ কারণেই তিনি এত জনপ্রিয় ছিলেন যে, সাতক্ষীরা জেলা সদর আসন থেকে ১৯৮৬, '৯১ ও '৯৬ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ২০০১ সালেও জামায়াত তাঁকেই নমিনি করতে চেয়েছিল। তাঁর অসুস্থতার দরুন তা সম্ভব হয়নি।

যে ছয় বছর তিনি অসুস্থ ছিলেন, সুস্থ থাকলে সে বছরগুলোতে আরো অনেক কাজ করতে পারতেন। আমার আফসোস হয় যে, এ কর্মপাগল মানুষটি স্বাস্থ্যের প্রতি সামান্য যত্নবানও ছিলেন না। হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে; কিন্তু সুস্থ থাকার দায়িত্ব আমাদের। স্বাস্থ্যবিধি আল্লাহরই তৈরি। তা অমান্য করলে এর জের পোহাতেই হয়। হার্টের বাইপাস অপারেশনের পরও তিনি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বিশ্রাম না নিয়ে কর্মব্যস্ত থাকতেন বলে তাঁর বড় ছেলের কাছে শুনেছি। আমি মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র)-এর নসীহত অনুযায়ী সবাইকে পরামর্শ দিই যে, স্বাস্থ্য আল্লাহর সেরা নিয়ামত। এর যত্ন ঠিকমতো করা আমাদের দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল নেক আমল কবুল করুন এবং তাঁর দীর্ঘ রোগযন্ত্রণাকে সকল ভুল-ত্রুটির কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করে তাঁকে তাঁর রহমতের পাত্র বানিয়ে নিন।

জানাযার পূর্বে খাটিয়াতে তাঁর চেহারা দেখে এত সুন্দর লাগল যে, ভালোবাসার টানে কপালে চুমু দিতে বাধ্য হলাম। রাসূল (স)-ও প্রিয়জনের কপালে চুমু দিতেন।

মাওলানা একিউএম ছিফাতুল্লাহ

মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ ২২ ডিসেম্বর (২০০৫) মাদরাসা শিক্ষক পরিষদের সম্মেলনে বক্তৃতারত অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'ফাযিলকে ডিগ্রি এবং কামিলকে মাস্টার্স-এর মান

দেওয়ার দাবি জানাই' বলার সাথে সাথেই তিনি পড়ে যান। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সম্মেলনে উপস্থিত সকলেই বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়েন। ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৮ বছর।

ইসলামী আন্দোলনে আমার সবচেয়ে পুরনো ও ঘনিষ্ঠ সাথীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯৫৬ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি রুকন হন এবং মাওলানা মওদূদীর হাতে শপথ গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। সে বছর মাওলানা মওদূদী প্রথম পূর্ব-পাকিস্তান সফরে আসেন।

বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার আমীর, চট্টগ্রাম বিভাগের সেক্রেটারি, পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক জামায়াতের মজলিসে শূরার সদস্য ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য হিসেবে ১৯৫৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তাঁকে আন্দোলনের সাথী হিসেবে পেয়েছি।

তিনি অত্যন্ত বড় আলেম ছিলেন। হাদীসের উস্তাদ হিসেবে তিনি হাজার হাজার আলেমের শিক্ষক। তাঁর দারসে কুরআন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। মাওলানা মওদূদীর উদ্দীপনাময় বিভিন্ন বক্তব্য বহুবার তাঁর মুখে উর্দু ভাষায় উচ্চারিত হতে শুনেছি। তিনি ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ও নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তিনি ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন দায়িত্ব আজীবন পালন করেছেন।

বক্তা হিসেবে তিনি অত্যন্ত সফল ছিলেন। যে বিষয়ে তিনি বক্তব্য রাখতেন, তা সাবলীল উচ্চমানের ভাষা ও যুক্তিতে সমৃদ্ধ হতো। তাঁর তিরোধানে ইসলামী আন্দোলন একজন বলিষ্ঠ বাগ্মী থেকে বঞ্চিত হলো। ময়দানে তাঁর অভাব দীর্ঘসময় অনুভূত হবে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর দীর্ঘ জীবনে দীনের বহু খিদমতের তাওফীক দান করেছেন। দোআ করি, মহান মা'বুদ যেন তাঁর যাবতীয় খিদমত কবুল করে তাঁকে সালেহ বান্দাহ হিসেবে মর্যাদা দান করেন।

রিয়াযুদ্দীন আহমদ

রিয়াযুদ্দীন আহমদ দূরসম্পর্কে আমার ভাতিজা। আমার একমাত্র ফুফার বড় ভাইয়ের নাতি। আত্মীয়তার সম্পর্কের চেয়ে ইসলামী আন্দোলনের সম্পর্কই বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে বিএসসি ক্লাসের ছাত্র থাকাকালে সে ইসলামী ছাত্রসংঘের দায়িত্বশীল ছিল। এ কারণেই ১৯৬০ সালে বিএসসি পাস করার পর ঢাকায় সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে কর্মরত থাকাকালে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী হিসেবে সে আমার সাথে যোগাযোগ করে।

১৯৬৭ সালে জামায়াতের ঢাকা শহর আমীর ইঞ্জিনিয়ার খুররম জাহ্ মুরাদের থেকে টাকা ধার নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য সে লন্ডন যায়। অনেকের মতো সেও সেখানে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। পরবর্তীতে যথাসময়ে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করে এবং তিন তলা একটি বাড়ি কিনে নেয়।

ইঞ্জিনিয়ার মুরাদ সাহেব থেকে ধার নেওয়ার খবর তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারলাম। 'অনেকেই টাকা ধার নিয়ে যথাসময়ে ফেরত দেয় না' শীর্ষক মুরাদ সাহেবের সাথে কারো প্রসঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। তখন মুরাদ সাহেব রিয়াযুদ্দীনের প্রশংসা করে বললেন, 'ঠিক ওয়াদামতো ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে এমন উদাহরণ বিরল'।

আমি যখন ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে নির্বাসন জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে লন্ডন গেলাম, তখন সেখানকার ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীল জনাব এম এ সালাম আমার থাকার জন্য একটা কামরা ভাড়া নেন। রিয়াযুদ্দীন ঢাকা থেকে চলে যাওয়ার পর তার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। সে আমার লন্ডনে উপস্থিতির খবর জানতে পেরে আমাকে তার ইস্ট-লন্ডনের বাড়িতে নিয়ে দোতলার বাথরুম সংলগ্ন বড় একটা কামরা আমার জন্য বরাদ্দ করল।

'৭৩-এর এপ্রিল থেকে '৭৮-এর জুলাই পর্যন্ত এ বাড়িটিই ছিল আমার স্থায়ী ঠিকানা। আমি কোনো সময়ই একটানা চার-পাঁচ মাস লন্ডনে থাকিনি। বিভিন্ন দেশে বারবার সফরে গেলেও আমার সাথে সবার যোগাযোগের ঠিকানা রিয়াযুদ্দীনের বাড়িটি ও তার টেলিফোন নম্বরই ছিল।

রিয়াযুদ্দীনের স্ত্রী মমতাজ আমাকে চাচা ডাকলেও পিতার মতোই যত্ন করেছে। আমি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নির্বাসন জীবনযাপন করছিলাম। তাদের বড় ছেলে ও পাঁচ মেয়েকে নাতি-নাতনী হিসেবে পেয়েছিলাম। ঐ বাড়িতে থাকাকালে প্রবাসজীবনের কোনো অসুবিধাই ভোগ করতে হয়নি। তাই তাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

রিয়াযুদ্দীন পাঁচ বছর ক্যান্সারে ভুগেছে। স্বাস্থ্যের প্রতি তার কোনো মনোযোগ ছিল না। সে ডাক্তারদের উপদেশের কোনো পরোয়া করত না। পরিবারের সবার মতকে অগ্রাহ্য করে অসুস্থ শরীর নিয়ে কয়েক মাস পরপরই সে একা ঢাকা এসে অনেক দিন থাকত। কারো বাড়িতে থাকাও সে পছন্দ করত না। কোনো কোনো সময় হোটেলে থাকলেও বেশি সময় মসজিদসংলগ্ন একটা কামরায় দিন কাটাত। আমার বাড়ি ছাড়াও তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ঢাকায় থাকা সত্ত্বেও সে কারো বাড়িতে থাকেনি।

ঢাকার মাদারটেক এলাকার নন্দীপাড়ায় একখণ্ড জমি কিনে সেখানে মসজিদ তৈরির কাজ দেখাশোনা করার জন্যই সে বারবার লন্ডন থেকে চলে আসত।

ইতঃপূর্বে যখনই সে ঢাকায় আসত, তখনই ফোনে আমার সাথে যোগাযোগ করত। কিন্তু গত দুই বছর আমি জানতেই পারিনি যে, সে কবে এল আর কবে গেল। গত ডিসেম্বরের ৬ তারিখ (২০০৫) সন্ধ্যার পর নিউইয়র্ক থেকে তার বড় ছেলে ড. শাহীন আমাকে ফোনে জানাল, আব্বা অসুস্থ অবস্থায় ইবনে সিনায় ভর্তি হয়েছেন। খবর নিয়ে জানলাম, সে ভর্তি হতে রাজি হয়নি। ডাক্তার অবিলম্বে অপারেশন করা প্রয়োজন বলায় সে ভর্তি হয়নি। লন্ডন গিয়ে অপারেশন করাবে বলে জানাল। রাত ৯টায় শাহজাহানপুর ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে তার সাথে আমার শেষবারের মতো ফোনে কথা হয়। ফজরের নামাযের পর খবর পেলাম, তার ভাগ্নি আনওয়ারার বাড়িতে ফজরের নামায পড়া

অবস্থায় বিছানায় এলিয়ে পড়ে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। সারা রাত নাকি সে ঘুমায়নি; কুরআন তিলাওয়াত করেছে। শেষরাতে গোসল করে বিছানায় বসে তাকে কিবলামুখী করে দিতে বলল। ফজরের নামাযরত অবস্থায়ই সে আল্লাহর নিকট চলে গেল। কত সুন্দর মৃত্যু! মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

লন্ডনে মারা গেলে লাশ দেশে আনা হতো। পাঁচ মেয়ে ও তিন ছেলের কেউ দেশে থাকে না। আল্লাহ তাআলা দেশের মাটিতে তার মৃত্যু নির্ধারিত করায় এ মাটিই তাকে টেনে এনেছে। সে যখন মারা যায় তখন তার স্ত্রী লন্ডন থেকে নিউইয়র্কের পথে উড়োজাহাজে ছিল। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তার বড় ছেলে মাকে নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে এবং এক ছেলে ও চার মেয়ে লন্ডন থেকে এলে দুই দিন পর লাশ দাফন করা হয়। এক ছেলে ও এক মেয়ে আসতে পারেনি।

তার বড় ছেলে শাহীনের বয়স তখন ১২ বছর– যখন '৭৩ সালে সে তার লন্ডনস্থ বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। শাহীন আমার আদরের নাতি ও আমি তার প্রিয় দাদা। সে ঢাকা এসে আমার বাড়িতে যখন শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদতে লাগল তখন আমার এত মায়া লাগল, যা প্রকাশের ভাষা নেই। ওর আফসোস এটাই যে, আমরা আট ভাই-বোন থাকতে আব্বা এভাবে একা মারা গেলেন, আমরা কোনো সেবা করার সুযোগ পেলাম না।

শাহীন ম্যাথামেটিক্সে পিএইচডি। আমেরিকার পারডিউ ইউনিভার্সিটিতে নয় বছর অধ্যাপনা করার পর অর্থশালী হয়ে দেশের জন্য কিছু করার নিয়তে ব্যবসা করছে। তার আব্বা যে মসজিদ নির্মাণের জন্য এভাবে জীবন দিয়ে গেল, ঐ মসজিদটি ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করে সে পিতার আত্মাকে শান্তি দিতে চায়। সে আমার নিকট ফোন করে ঢাকার একজন ভালো আর্কিটেক্টের নাম ও ফোন নম্বর নিল।

২৫৪.

জেলে প্রবেশ করলাম

১৯৯২ সালের ২৪ মার্চ দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় জেলগেটে পৌঁছলাম। জেল অফিসের ফর্মালিটি সমাধা হওয়ার পর গ্রেফতারকারী পুলিশ অফিসারগণ আমাকে জেল কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করেন। জেলগেটে আধঘণ্টা লেগে গেল। ডিআইজি (ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল) আমিনুর রহমান ও জেলার অত্যন্ত সম্মানের সাথে আমাকে গ্রহণ করেন। আমার বইভর্তি স্যুটকেসটা পরে ফেরত দেওয়া হবে বলে জানিয়ে স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ সরকারি অনুমতির জন্য নিয়ে গেল।

১৯৬৪ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সাড়ে পাঁচ মাস ছিলাম। জেলখানার অভ্যন্তরের বিভিন্ন এলাকা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা ছিল। কারাগারের বাইরের গেটের মতোই ভেতরে বড় গেট রয়েছে। দুই গেটের মাঝখানে কয়েকটি ছোট-বড় কামরা রয়েছে। ডিআইজি ও জেলারের অফিস, ডেপুটি জেলারদের কামরা, কয়েদিদের সাথে আত্মীয়দের দেখা-সাক্ষাতের কামরা ইত্যাদি সেখানে অবস্থিত।

ভেতরের গেট পার হয়ে জেলে ঢুকলাম। বিরাট জেলখানা। গেট থেকে সোজা রাস্তাটি যে এলাকায় গেল সেখানে ১৯৬৪ সালে আমি, মাওলানা আবদুর রহীম, জনাব আবদুল খালেক ও মাওলানা আবদুর রহমান ফকীর একসাথে একটা প্রশস্ত ঘরে ছিলাম। আমাদের পূর্বে ঐ ঘরে মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিব ছিলেন বলে জানলাম।

এবার আমাকে জেলখানার পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে '২৬ সেল' নামক দীর্ঘ দালানে নিয়ে গেল। ঐ দালান থেকে ১০০ গজ দূরেই জেলের উঁচু দেয়াল। ঐ দেয়ালের দক্ষিণেই চকবাজার চৌরাস্তা, পশ্চিমের দেয়ালের পরই উর্দু রোড ও লালবাগ থানা অফিস।

২৬ সেলে উঠলাম

দক্ষিণমুখী এ দালান পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ। মোট ১২টি কামরা। দুই কিনারার দুটো কামরায় তিনজন ও ১০টি কামরায় দুজন করে মোট ২৬ জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই এ দালান ২৬ সেল নামে পরিচিত। ১০/১২টি সিঁড়ি বেয়ে এ দালানে উঠতে হয়। ফলে জেলের দেয়াল উঁচু হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণের বাতাস ঘরে পৌঁছে।

১২টি কামরার মধ্যে ১ নং কামরাটি সবদিক দিয়ে সেরা বলে জানলাম। আমার জন্য ঐ কামরাই বরাদ্দ করা হলো। জেলার সাহেব বললেন, এখানে বিভিন্ন কামরায় মোট আটজন ছিলেন। আপনার নিরাপত্তার প্রয়োজনে সবাইকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আপনার এ কামরায় একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

লোহার তৈরি খাটে জেলের জাযিম ও কম্বলের উপর আমার সাথে বাড়ি থেকে নেওয়া বিছানা চাদর ও বালিশ দিয়ে আমার বিছানা তারাই গুছিয়ে দিলেন। কামরায় একটা টেবিল, একটা চেয়ার ও একটা শেল্‌ফ পেলাম। আমার কাপড়-চোপড় ও ব্যবহারের জিনিসপত্র যথাস্থানে রাখলাম। জেলার সাহেব তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে রাত দেড়টায় বিদায় হয়ে যাওয়ার সময় জানতে চাইলেন যে, সাহরী কখন খেতে চাই। হিসাব করে দেখলাম, সাড়ে ৪টায় সাহরী খেলেই চলে। তাই ঘুমানোর কিছু সময় পাওয়া যাবে বলে শুয়ে পড়লাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেও যখন ঘুম এল না তখন ওযূ করে নামায পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ইতঃপূর্বে লিখেছি, জেলে তাহাজ্জুদের নামাযে যে মজা পাওয়া যায় তা বাইরে অনুভব করা যায় না।

সাড়ে ৪টায় খাবার আনা হলো। খাওয়ার একটু পরই দেয়ালের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত চকবাজার শাহী মসজিদের উঁচু মিনার থেকে ফজরের আযানের আওয়াজ পেলাম। ফজরের নামায পড়ে ঘুমালাম। একটানা লম্বা ঘুম হলো। দক্ষিণমুখী দালানটিতে প্রশস্ত বারান্দা। প্রতিটি রুমের দক্ষিণ দিকে লোহার শিকের দরজা। কামরাটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। উত্তর কিনারে টয়লেট ও গোসলখানা।

মন্ত্রীদের জেলখানা

জেলের ভেতরে জেল– এর নাম হলো সেল। বিরাট উঁচু দেয়াল দিয়ে গোটা জেলখানা ঘেরাও করা আছে। জেলের ভেতরেও বিভিন্ন সেল পৃথকভাবে দেয়ালে ঘেরা। তাই সেলকে বলা হয় জেলের ভেতরে জেল। প্রত্যেক সেলে ঢোকার পৃথক গেট রয়েছে। এসব গেটে জেলপুলিশ পাহারা দেয়। জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কেউ এক সেল

থেকে অন্য সেলে ঢুকতে পারে না। সেলগুলোতে সাধারণ কয়েদিদের রাখা হয় না। তাদেরকে বড় বড় হলরুমে রাখা হয়। এসব হলকে ওয়ার্ড বলা হয়। সেলগুলোতে বিশিষ্ট বন্দীদের রাখা হয়। রাজনৈতিক বন্দী ও প্রথম শ্রেণীর কয়েদিরা সেলে থাকে। সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের মধ্যে যারা উচ্চশিক্ষিত, সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন, বিত্তবান, অফিসার ইত্যাদি তাদেরকে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দিয়ে সেলে রাখা হয়।

২৬ সেলে প্রথম শ্রেণীর কয়েদিও থাকতে পারে। তবে সাবেক মন্ত্রী, এমপি, রাজনৈতিক দলীয় প্রধান এবং এ মানের বন্দীদের ২৬ সেলেই রাখা হয়। তাই গোটা জেলখানায় ২৬ সেলের অপর নাম মন্ত্রীদের জেলখানা।

মন্ত্রীরা আমার রুমমেট

২৬ সেলের পুরনো বাসিন্দাদের থেকে ১ নং কামরায় আমার পূর্বে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে তিনটি নাম সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, কাজী জাফর আহমদ ও জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। প্রথম দুজন তো এরশাদের আমলে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আর মঞ্জু সাহেব এরশাদের দলের মহাসচিব থাকাকালে শেখ হাসিনা সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের অন্যতম মালিক। ঘটনাক্রমে এ তিন জন ও আমি বিভিন্ন সময়ে একই রুমে দীর্ঘদিন কাটালাম।

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ঐ তিনজনের সাথেই অন্তরঙ্গভাবে আলাপের সুযোগ হয়েছে। তাদের কারো সাথে একান্তে কথা বলার সময় নাটকীয় ভঙ্গিতে বলেছি, 'আরে আপনি তো আমার রুমমেট'। এ কথা শুনলে সাধারণত হোস্টেল বা হলে এক রুমে ছিলাম বলে ধারণা করা হয়। তাই আমার কথা শুনে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালে আমি বলেছি 'আপনি কি কারাগারে ২৬ সেলের ১ নং রুমে ছিলেন না?' এ প্রশ্ন শুনে উচ্চহাস্যে আমার সাথে হাত মিলিয়ে তারা আমার রসিকতার চমৎকারিত্ব উপভোগ করেছেন। আমি রসিকতাকে পূর্ণতা দান করে বলেছি, 'আমি মন্ত্রী না হয়েও জেলখানায় মন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করলাম'।

জেলারের আতিথেয়তা

২৫ মার্চ (১৯৯২) সকাল ১১টায় জেলার সাহেব জেলের বড় ডাক্তারকে নিয়ে আমার সেলে হাজির হলেন। আটজন ডেপুটি জেলারের নেতা হলেন জেলার সাহেব। একজন মহিলা ডাক্তারসহ তিনজন ডাক্তারের প্রধানকে নিয়েই জেলার সাহেব এলেন।

ডাক্তার সাহেব আমার দৈহিক উচ্চতা, ওজন, বয়স ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য নোট করার পর আমার শারীরিক অবস্থা জানার জন্য অনেক প্রশ্ন করলেন ও জবাব লিখতে থাকলেন। অতীতে আমার কোন্ কোন্ রোগ হয়েছে এবং এসবের কী চিকিৎসা করা হয়েছে, তা জানার পর তিনি জানতে চাইলেন যে, বর্তমানে আমি কোনো অসুখে ভুগছি কি না। হার্টপ্রবলেম, ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস নেই জেনে খুশি হলেন। জেলার সাহেব ডাক্তার সাহেবকে বললেন, আপনি ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখুন। আমাকে বিছানায় শুইয়ে ডাক্তার সাহেব অনেক সময় নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, তেমন কোনো সমস্যা নেই। শুধু ত্বকে সামান্য ত্রুটি আছে বলে মনে হয়।

জেলার সাহেব ডাক্তারকে নির্দেশ দিলেন, প্রফেসর সাহেবের জন্য প্রথম শ্রেণীর হসপিটাল ডাইয়েট বরাদ্দ করুন। তাঁর কথার ধরন থেকে মনে হলো, তিনি আমাকে হাসপাতালের ডাইয়েট দেওয়ার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যেই ডাক্তারকে নিয়ে এসেছেন।

ডাক্তার সাহেব লিখলেন, হাসপাতাল থেকে রোজ দুই ছটাক মাখন, একটা পাউরুটি, ২টা ডিম, ১টা বাচ্চা মুরগি, ২টা ডাব, ২টা সাগর কলা, ১টা পেঁপে ও দই ছটাক ছোট মাছ বরাদ্দ করা হলো।

জেলার সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু লাগবে কি না। বললাম, জেল কোডে আমার আইনত আমার যা পাওনা, এর বেশি আর কিছুই চাই না। তিনি বললেন, প্রথম শ্রেণীর বন্দী হিসেবে আপনার জন্য যে রেশন বরাদ্দ আছে, এর অতিরিক্ত হিসেবে আপনার জন্য হসপিটাল ডাইয়েট বরাদ্দ করা হলো, যাতে স্বাস্থ্য ঠিক থাকে। স্বাস্থ্য খারাপ হলে তো সরকারের অনেক টাকা ব্যয় হবে।

জেলারের আতিথেয়তায় আমি অভিভূত হলাম। পরদিন সকালে যখন মাখন ও পাউরুটি এল তখন আমি আটার রুটি, সবজি ও ডিমভাজা দিয়ে নাশতা সেরে ফেলেছি। আমি বাড়িতে এ নাশতায়ই অভ্যস্ত। মাখন-পাউরুটিতে আমি অভ্যস্ত নই। তাই জেল থেকে বরাদ্দ করা খাদেমকে পাউরুটি ও মাখন দিয়ে হাসপাতালে পাঠালাম এবং একটা নোটে হসপিটাল ডাইয়েট থেকে এ দুটো জিনিস বাদ দেওয়ার জন্য লিখে দিলাম।

রেশন হিসেবে ভাত ও তরিতরকারি যা পেতাম, এর সাথে হসপিটাল ডাইয়েট যোগ হওয়ায় খাদ্যের পরিমাণ দাঁড়াল যা তা খেয়ে শেষ করা সম্ভব ছিল না। আমার চেয়ে বেশি বয়সের সাজাপ্রাপ্ত একজন ইঞ্জিনিয়ার ঐ দালানে ছিলেন। তাঁকে বাচ্চা মুরগি ও ছোট মাছের পাক করা কিছু দিলে তিনি খুব খুশি হতেন। আরো দু-একজনকে মাঝেমধ্যে দিতাম। আর খাদেম তো প্রতিদিন উদ্বৃত্ত থেকে কিছু পেতই।

মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন

আমাকে গ্রেফতারের সপ্তম দিন ৩১ মার্চ (১৯৯২) জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আমাকে গ্রেফতারের পর জামায়াতের করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যেই শূরার এ বৈঠক ডাকা হয়।

আমাকে গ্রেফতারের পর কর্মপরিষদ এক জরুরি বৈঠকে সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত আমীর মনোনীত করে। সে হিসেবে তাঁরই সভাপতিত্বে শূরার অধিবেশন বসে। মজলিসে শূরার কার্যবিবরণী থেকে প্রয়োজনীয় অংশ করছি :

অধিবেশন উদ্বোধন করতে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত আমীর বলেন, ১৪ বছর ধরে যিনি শূরার অধিবেশন উদ্বোধন করে আসছেন সেই ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে আজ আমাকে উদ্বোধন করতে হচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সংকটের গুরুত্ব ও গভীরতা উপলব্ধি করে ভাবাবেগমুক্ত হয়ে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে আমাদের চলতে হবে।

সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এমপি প্রথমেই দীর্ঘ বক্তব্যে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেন, নাগরিকত্বের বিষয়টাকে ঝুলিয়ে রেখে সরকারই সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এ সরকারের আমলে প্রায় এক ডজন বামপন্থি পত্রিকা জন্ম নেয় এবং তারাই অধ্যাপক গোলাম আযমকে দেশ থেকে বহিষ্কারের দাবি করতে থাকে। আমীরে জামায়াত হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণার পর প্রথমে সংসদে ঝড় সৃষ্টি করা হয়। সংসদীয় রীতিনীতি ভঙ্গ করে মুলতবি প্রস্তাবের এক দিনে দুই ঘন্টার স্থলে দুই দিনে ৪ ঘন্টা আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে উদ্দেশ্যমূলক বিবৃতি প্রদান করেছেন। এরপরই ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি গঠন ও তথাকথিত গণ-আদালত ঘোষণা করা হয়।

বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রী পর্যায়ে এমনকি প্রধানমন্ত্রীর সাথে জামায়াতের প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেছে। প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। সরকারই সমস্যা সৃষ্টি করেছে; তাদেরই উচিত মীমাংসা করা এবং বেআইনি কাজ বন্ধ করা। জেলখানা থেকে আমীরে জামায়াত মেসেজ পাঠিয়েছেন, তিনি নাগরিকত্বের অধিকারসহ বেরিয়ে আসবেন, ইনশাআল্লাহ। তাই তিনি তাঁর জন্য পেরেশান না হওয়ার অনুরোধ করেছেন।

সেক্রেটারি জেনারেল আমীরে জামায়াতকে গ্রেফতারের পর থেকে এ যাবৎ পালিত কর্মসূচির বিবরণ দিয়ে জানান যে, আইনগত পদক্ষেপ হিসেবে হাইকোর্টে রিট পিটিশন পেশ করা হয়েছে এবং কোর্ট রুলও জারি করেছে।

তিনি বলেন, সাধ্যমতো সংঘাত-সংঘর্ষ এড়িয়ে ময়দানে থেকে আইনগতভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। তিনি এটাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফসল বলে উল্লেখ করে বলেন, এর ফলে ইসলামী আন্দোলনের উপর চরম আঘাতও আসতে পারে। এর মোকাবিলার জন্য কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য কর্মপরিষদকে ইখতিয়ার দেওয়ার পরামর্শ দেন।

এ দীর্ঘ বক্তব্যের পর ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে আব্বাস আলী খান সাহেবের নিয়োগ মজলিসে শূরা অনুমোদন করে।

মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত

মজলিসে শূরার সদস্যগণ নিজ নিজ জেলার পরিস্থিতি, জামায়াতের জনশক্তির মনোভাব ও জনমতের অবস্থা তুলে ধরে নিম্নলিখিত পরামর্শ প্রদান করেন :

১. ঢাকায় মহাসমাবেশ করা,
২. বৃহত্তর জেলাকেন্দ্রে গণসমাবেশ,
৩. ব্যাপক পোস্টারিং করা,
৪. পত্রিকায় কভারেজের ব্যবস্থা করা,
৫. বিভিন্ন দেশ থেকে সরকারের নিকট তারবার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

মজলিসে শূরা উপরিউক্ত পরামর্শ দেওয়ার পর কর্মপরিষদকে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার প্রদান করে।

প্রস্তাব গ্রহণ

মজলিসে শূরায় দুটো প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয় :

১. অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতারের নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং তাঁর আশু মুক্তি দাবি।

২. তথাকথিত গণ-আদালতীদের অপতৎপরতার নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন, তাদের অপপ্রচার বন্ধের দাবি এবং এর উদ্যোক্তাদের আইনগত শাস্তি দাবি।

সমাপনী ভাষণ

ভারপ্রাপ্ত আমীর অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে বলেন, বর্তমান সংকট আরো তীব্র হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। তবে সকল সংকটকে সবর, হিকমত ও ঈমানের সাথে মোকাবিলা করতে হবে। বিপদে পড়লেই মানুষ আল্লাহকে ডাকে। আমাদেরকে আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বিপদ চাইতে নেই; কিন্তু বিপদ এলে অবশ্যই মোকাবিলা করতে হবে। পরিস্থিতি মোকাবিলার উদ্দেশ্যে জামায়াত যে কর্মসূচি দেবে তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতির ফলে ভারতপন্থি ইসলামবিরোধী ও ভারতবিরোধী ইসলামপন্থিদের যে মেরুকরণ হচ্ছে, এটা যত শিগ্গির হয় ততই মঙ্গল।

সর্বশেষে তিনি মজলিসে শূরার সদস্যগণকে নিয়ে আল্লাহর দরবারে আবেগময় মিনতি পেশ করেন। সৃষ্ট সংকট থেকে ইসলামী আন্দোলনকে উদ্ধার করার জন্য তিনি কাতরভাবে মুনাজাত করেন। শেষরাতে আল্লাহর নিকট নিভৃতে চোখের পানি ফেলে দোআ করার জন্য তাওফীক কামনা করেন।

জামায়াতে ইসলামীর বলিষ্ঠ ভূমিকা

আমাকে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়েরকে জামায়াতে ইসলামী মোটেই যথেষ্ট মনে করেনি। ময়দানে প্রবল আন্দোলন ও মযবুত জনমত সৃষ্টি না হলে বিরোধীদের আন্দোলন দ্বারাও হাইকোর্ট প্রভাবান্বিত হতে পারে। ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির নামে সকল ইসলামবিরোধী ও ভারতপন্থি মহলের রাজধানীসহ গোটা দেশে গণ-আদালতের ফাঁসির রায় কার্যকর করার দাবিতে যে আন্দোলন চলছিল, এর মোকাবিলায় জামায়াতের আন্দোলন বলিষ্ঠতর হওয়া প্রয়োজন মনে করেই জামায়াত ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে।

১. বিরোধীদের তুলনায় আরো বড় আকারে সারা দেশে আমার মুক্তির দাবিতে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল হতে থাকল। দৈনিক সংগ্রামে এসব খবর পড়ে পরম এতমিনান বোধ করতাম।

২. বিরোধীরা আমার বিকৃত ছবির পোস্টার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার কার্যকর প্রতিকার হিসেবে আমার সঠিক ছবিসংবলিত পোস্টার জনগণের নিকট বিরোধীদের বিদ্বেষকে ঘৃণ্য কীর্তি হিসেবে তুলে ধরল। জেলখানায় পাহারারত পুলিশদের নিকট আমি পোস্টার সম্পর্কে জানতে পারি। তারা বলল, আপনার বিকৃত ছবির পোস্টারের

পাশে সঠিক ছবির পোস্টার দেখে সবাই ওদের বিরুদ্ধে ছিঃ ছিঃ ধ্বনি দিচ্ছে। পোস্টারে আপনার চমৎকার বিরাট ছবি দেখে মানুষ মুগ্ধ। এসব কথা পুলিশ থেকে জানার কয়েক মাস পর আমাকে হাইকোর্টে নিয়ে যাওয়ার পথে দেয়ালে ওদের অল্প ও জামায়াতের অধিক পোস্টার দেখলাম।

একদিন এক জেলপুলিশ সুবেদারের অনুমতি নিয়ে আমাকে দেখতে এসে বলল, 'আমার ডিউটি অমুক জায়গায়। আপনাকে দেখার প্রবল আগ্রহে অনুমতি নিয়ে দেখতে এলাম। জানতে চাইলাম, আমাকে দেখার আগ্রহ কেমন করে হলো। সে বলল, আমি টাঙ্গাইল জেলে ছিলাম। টাঙ্গাইল শহরে আপনার ছবি পোস্টারে দেখে বড়ই মহব্বত লাগল। ভাবলাম, এমন সুন্দর মানুষটিকে জেলে আটক করে রাখল? তখন থেকেই দেখার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। ঢাকা জেলে বদলি হওয়ায় আপনাকে দেখার সুযোগ পাব বলে খুবই আনন্দিত হলাম।

জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনী পোস্টারেও নমিনিদের ছবি ব্যবহার করত না; কিন্তু বিরোধীরা আমার চেহারাকে জঘন্যভাবে বিকৃত করে পোস্টার ছাপানোর ফলে জনগণকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সঠিক ছবি প্রকাশ করতে বাধ্য হলো।

৩. জামায়াতে ইসলামী বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের নিকট আমার গ্রেফতারি, হাইকোর্টে মামলা ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করে দোআ করার জন্য অনুরোধ জানায়। ইসলামী আন্দোলনের কয়েকটি বিদেশি মুখপত্রে এ খবর প্রকাশিত হয়।

৪. ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে 'অধ্যাপক গোলাম আযমের কলম থেকে' শিরোনামে ৭২ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশ করা হয়। তখন জামায়াতে ইসলামী প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী। তাঁর ছেলে মাসুদকে প্রকাশক উল্লেখ করে বইটি প্রকাশ করা হয়। জামায়াতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই বইটি সংকলিত হয়। আমার বিভিন্ন বই থেকে বহু রকম শিরোনামে আকর্ষণীয় বক্তব্য এতে সংকলন করা হয়েছে, যাতে পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমার সম্পর্কে সঠিক ধারণা জন্মে এবং বিরোধীদের অপপ্রচারে তারা বিভ্রান্ত না হয়।

ভারপ্রাপ্ত আমীর ও সেক্রেটারি জেনারেল বিভিন্ন সমাবেশে যে জোরালো বক্তব্য রাখতেন তা দৈনিক সংগ্রামে পড়ে অত্যন্ত উৎসাহবোধ করতাম এবং বন্দীদশার দুঃখ ভুলে যেতাম। জামায়াতের বলিষ্ঠ ভূমিকার বিরাট অবদান আজও আমাকে আনন্দ দান করে।

২৫৫.

ইসলামী শক্তির প্রদর্শনী সমাবেশ

ঘাদানি কমিটির পক্ষ থেকে তথাকথিত গণ-আদালতের রায় ঘোষণা দেওয়ার পর বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাঁরা অনুভব করেন, ইসলামবিরোধী শক্তি একজোট হয়ে একটি

ইসলামী দলের নেতার বিরুদ্ধে যে মারমুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, এর প্রতিবাদ হওয়া অত্যাবশ্যক। তারা একটি ইসলামী দল ও এর নেতাকে নির্মূল করতে সক্ষম হলে অন্যান্য ইসলামী দল ও নেতার বিরুদ্ধেও অনুরূপ অভিযান চালাবে।

আমাকে গ্রেফতারের চারদিন পূর্বে ২০ মার্চ ১৯৯২ তারিখে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের মুহ্তারাম খতীব মাওলানা উবায়দুল হকের উদ্যোগে বায়তুল মুকাররমের উত্তর গেটে ইসলামী শক্তির প্রদর্শনীমূলক একটি বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত সংবাদ

২১ মার্চের (১৯৯২) দৈনিক সংগ্রামে 'বায়তুল মুকাররমের বিশাল সমাবেশে দেশবরেণ্য আলেমবৃন্দ' শোল্ডার দিয়ে বড় অক্ষরে ৪ কলামের হেডিং লেখা হয়েছে, 'যারা উৎখাত ও নির্মূলের কথা বলছে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে'। হেডিং-এর নিচে রাইট-আপের লেখা নিম্নরূপ :

'দেশবরেণ্য বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের আহ্বানে বায়তুল মুকাররমের উত্তর গেটে আয়োজিত ইসলামী মহাসমাবেশে বক্তারা বলেছেন, আজ যারা উৎখাত ও নির্মূলের কথা বলছে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে উৎখাত করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। তারা এ দেশ থেকে টুপিওয়ালা, দাড়িওয়ালা তথা ইসলামের অনুসারীদের উৎখাতের তৎপরতা চালাচ্ছে।

বক্তারা আরো বলেন, ইসলামকে পদদলিত করার জন্য আজ মৌলবাদ উৎখাতের কথা বলা হচ্ছে। আর কয়েক দিন পর বলবে, মৌলভীদের ধর। বিদেশি শক্তি এ তৎপরতায় ইন্ধন জোগাচ্ছে। ঈমানী মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদেরকে আজ প্রতিটি মসজিদ থেকে আওয়াজ তুলতে হবে; ঈমানবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।'

নিম্নে মূল সংবাদ হুবহু উদ্ধৃত করছি :

"গতকাল শুক্রবার বাদ জুমুআ এ মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়। জুমুআর নামাযের পর বায়তুল মুকাররম উত্তর গেটে জনতার ঢল নামে। প্রায় অর্ধলক্ষাধিক লোকের এ মহাসমাবেশে মুহুর্মুহু স্লোগান ওঠে 'নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার', 'দেশবাসীর এক আওয়াজ– কায়েম কর খোদার রাজ', 'ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু– মানি না মানব না' ইত্যাদি। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক মহাসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। এতে অন্য আলেমগণের মধ্যে বক্তৃতা করেন শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, শায়খুল হাদীস আনিসুল হক, মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, বাংলাদেশ জমিয়তে হিযবুল্লাহ'র যুগ্ম মহাসম্পাদক মাওলানা রুহুল আমিন খান, শাহী চকবাজার মসজিদের খতীব মাওলানা কারী উবায়দুল্লাহ, লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়ার প্রিন্সিপ্যাল মুফতি ফজলুল হক আমিনী, নওয়াববাড়ী জামে মসজিদের খতীব মাওলানা রেজাউল করিম ইসলামাবাদী। মাওলানা হাফেজ এটিএম হেমায়েত উদ্দিন সমাবেশ পরিচালনা করেন। পবিত্র রমযানে মধ্যাহ্নের প্রখর রোদের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা ধরে

সুশৃঙ্খলভাবে দেশবরেণ্য আলেমগণের বক্তৃতা শুনেন। সমাবেশ চলাকালে ক্রীড়া ভবন গেট থেকে শুরু করে হাউজবিল্ডিং ফিন্যান্স ভবন পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে।

দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতীব মুফতি উবায়দুল হক সমাবেশের শুরুতে ইসলামী সমাবেশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, এ সমাবেশ কোনো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নয়। ইসলামের আবেদন অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার জন্য এ সমাবেশ। কুরআন-হাদীসের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের কী করতে হবে, বিশিষ্ট আলেমগণ এর উপর তাদের বক্তব্য রাখবেন।

সমাবেশ শেষে যখন তিনি আবার সভাপতির বক্তৃতা করতে দাঁড়ান, তখন সমাবেশের অর্ধলক্ষাধিক শ্রোতা তাঁর দিকনির্দেশিকা শোনার জন্য প্রখর রোদের মধ্যেও উদগ্রীব হয়ে থাকেন।

সমাবেশে কে কী বলেন

খতীব উবায়দুল হক তাঁর স্বভাবসুলভ রসমেশানো গাম্ভীর্য নিয়ে বলেন, আমাদের দেশে নতুন একটি শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে। তারা রাস্তাঘাটে গাড়ি দৌড়ায়, ভালো লেবাস পরে ভালো ঘরবাড়িতে থাকেন। তাদের কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য নেই। কী করেন জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, 'রাজনীতি করি'। কিছু মাস্তান আর চাঁদাবাজকে সম্বল করে তারা রাজনীতি করেন। এভাবে কদিন যাওয়ার পর নিজেদের মধ্যে প্রভু প্রভু ভাব সৃষ্টি হয়। এরপর তারা বলে, এটা হবে না, ওটা হবে; এটা চলবে না, ওটা করতে হবে ইত্যাদি।

মাওলানা উবায়দুল হক হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে সবাইকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

প্রবীণ আলেম শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক বলেন, ইসলামকে পদদলিত করার জন্য আজ মৌলবাদ উৎখাতের কথা বলা হচ্ছে। আর কদিন পর বলবে, মৌলভীদের ধর। বিদেশি শক্তি এ অপতৎপরতায় ইন্ধন জোগাচ্ছে। আমরা 'নারায়ে তাকবীর' স্লোগান দিয়েই এ দেশে থাকব।

তিনি বলেন, ১১ কোটি মুসলমানের এ দেশে মসজিদে ইসলামী রাজনীতি চলবে কি চলবে না, তা এ দেশের আলেম-ওলামাই ঠিক করবেন। যারা কোনোদিন মসজিদে যায় না তারা দেশের মসজিদ ও মসজিদের ইমামদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চায় এবং বড় গলায় কথা বলে, মসজিদে রাজনীতি চলবে না। এই সাহস তারা কোথায় পেয়েছে?

মাওলানা আজিজুল হক বলেন, এ দেশের প্রতিটি জায়গা মুসলমানদের জন্য জায়নামায। তারা এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হেফাযতের জন্য কাজ করবে। এদেশ ইসলামের দ্বারাই রক্ষিত হবে।

মাসিক মদীনা সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন, আজ গোটা জাতি বিস্ফোরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরির উপর দাঁড়িয়ে আছি। আর এই আগ্নেয়গিরির মধ্যে নতুন নতুন জ্বালানি দিয়ে গোটা জাতির অস্তিত্বকে ধ্বংস করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এ অবস্থায় কোনো বিবেকবান ব্যক্তি শঙ্কিত না হয়ে পারেন না।

তিনি বলেন, এ দেশের ঈমানদার মুসলমানদের অবস্থা রোহিঙ্গা-উদ্বাস্তুদের মতো করার জন্য ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। যারা আজ উৎখাত-নির্মূলের কথা বলছে, কোনো বিশেষ দল বা ব্যক্তিকে উৎখাত করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাদের উদ্দেশ্য এদেশ থেকে টুপিওয়ালা, দাড়িওয়ালা তথা ইসলামের অনুসারীদের উৎখাত করা। তাই আজ মাগুরা থেকে তারাবীর নামায পড়াতে আসা হাফেয মাসুমের রগ কেটে দেওয়া হয়েছে, দাড়িওয়ালা আওয়ামী লীগকর্মীকে প্রহার করা হয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন, অনেকেই টেলিফোনে হুমকি দেয়। তারা জানে না যে, আমরা গভীর রাতে আল্লাহর কাছে হাত তুলে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়ার জন্য মুনাজাত করি। আমরা এ ধরনের মৃত্যুকে শাহাদাতের সৌভাগ্য মনে করি। এ ছাড়া কাউকে মেরে ফেলা, ঝুলিয়ে দেওয়ার ফায়সালা এই জমিনে হয় না; তা নির্ধারিত হয় আসমানে।

মাওলানা রুহুল আমিন খান বলেন, মুসলমানরা এখনো মরে যায়নি। আমাদের শিরায় শিরায় ঈমানী রক্ত প্রবহমান। ইসলামের কোনো দুশমনের পক্ষে আমাদের নাম-নিশানা মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, তাওহীদের ছোট্ট দ্বীপ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দ্বীপের মতোই। আমাদের কোনো মামাবাড়ি বা পিতৃভূমি নেই। আমরা উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম কোনো দিকেই যেতে পারব না। ঈমান-আকীদা ও দীন ইসলামকে নিয়ে আমাদের এখানেই টিকে থাকতে হবে।

মাওলানা রুহুল আমিন বলেন, আমাদের সরকার, হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্ট আছে। কোনো ব্যক্তিই আইনের উর্ধ্বে নয়। আইনকে নিজের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। মুসলমানরা ভাই ভাই। যারা তাদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করতে চায়, জাতি তাদেরকে সহ্য করবে না।

মাওলানা কারী উবায়দুল্লাহ তার মিষ্টি মধুর কণ্ঠে সূরা সফ থেকে তিলাওয়াত করে বলেন, অজ্ঞতার কারণে একশ্রেণীর মুসলমান ইসলামকে অন্য ধর্মের মতো ধর্ম মনে করছে। না জানার কারণে তারা ইসলামের বৈরী হয়ে পড়ছে।

মাওলানা রেজাউল করিম ইসলামাবাদী বলেন, আমাদের হাজার রকমের সমস্যা রয়েছে। তাতে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ঘুম ভাঙে না; কিন্তু যখন দেশে কোনো ইসলামী আন্দোলন হয়, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হয়, তখন তারা দেশ ধ্বংস হলো বলে চিৎকার জুড়ে দেয়।

তিনি তথাকথিত গণ-আদালতের ভয়াবহতা তুলে ধরে বলেন, গণ-আদালত দেশের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। এক দলের বিরুদ্ধে গণ-আদালত গঠন করা হলে অন্য দল বলবে, ২৫ বছরের গোলামি চুক্তিকারীদের বিরুদ্ধে গণ-আদালত করতে হবে। গণ-আদালতে বিচার হতে হবে রক্ষীবাহিনীর নির্বিচারে মানুষ হত্যার। দেশ ও জাতির স্বার্থে এসব হানাহানি বন্ধ করা উচিত।

মাওলানা ফজলুল হক আমিনী বলেন, ইসলামকে যারা উৎখাত করতে চায় তারা আফগানিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখুক। রাশিয়া একদিন আফগানিস্তানকে গিলতে চেয়েছিল, পরিণামে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেছে।"

সমাবেশের প্রতিক্রিয়া

সমাবেশস্থল থেকে মিরপুরের জামায়াতকর্মী আবু মুজাফফর সাহেব আমার বাড়িতে এসে মহা-উল্লাসের সাথে বললেন, সকল ইসলামী দল ও নেতা জামায়াতের পক্ষে এসে গেছে। ঘাদানি কমিটির গণ-আদালতের বিরুদ্ধে সকল আলেম সোচ্চার। এটা বিরাট ঘটনা। অর্ধলক্ষাধিক লোকের সমাবেশে বক্তাগণ চমৎকার বক্তব্য রেখেছেন।

আমি অত্যন্ত আনন্দবোধ করলাম। শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হককে মুবারকবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে ফোন করলাম। তিনি উচ্ছ্বাসের আমেজ নিয়ে বললেন, 'আমি বিস্মিত ও অভিভূত যে, মাত্র দুই দিনের প্রচারে এত বিপুল সংখ্যায় জনগণ কেমন করে সমবেত হতে পারল। জনগণের সাড়া দেখে আমি মুগ্ধ।'

আমি বললাম, 'আমি মোটেই বিস্মিত নই। কারণ আমি জানি, মুসলিম জনগণ ইসলামী নেতাদের ঐক্য দেখার জন্য পাগল। এ সমাবেশে কারা বক্তব্য রাখবেন, তার তালিকা পত্রিকায় দেখে মানুষের আবেগে তাড়না সৃষ্টি হয়েছে। তারা বিভিন্ন দলের নেতাদের একমঞ্চে দেখার আগ্রহ নিয়ে দলে দলে সমবেত হয়েছে। তারা ঐক্যের পাগল। তারা নেতাদের একসাথে ইসলামকে বিজয়ী করার আন্দোলনে পেতে চায়।'

সদ্যপ্রকাশিত 'বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যপ্রচেষ্টার ইতিহাস' নামে প্রায় দেড় শ' পৃষ্ঠার বইটিতে আমি অত্যন্ত বেদনার সাথে উল্লেখ করেছি, মাত্র ৮/১০ জন ব্যক্তি একমঞ্চে হাজির হলেই পরিপূর্ণ ইসলামী ঐক্য সম্ভব। তারা কিছুতেই এক হতে সক্ষম হচ্ছেন না। তাই এ দেশে বিরাট ইসলামী শক্তি থাকা সত্ত্বেও নেতাদের ঐক্যের অভাবে জনগণ হতাশায় ভুগছে। ঐক্য না হওয়ার জন্য ঐ কয়েকজনই দায়ী, যে কয়জন ঐক্যবদ্ধ হতে সম্মত হলেই ঐক্য হতে পারে।

ঐ সমাবেশের প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যে গণ-আদালতীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসে।

মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। রেকর্ডকৃত কার্যবিবরণী থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করছি :

ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের অপারেশনের কারণে হাসপাতালে থাকায় অন্যতম নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে অধিবেশন বসে।

উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, 'বিভিন্ন সময়ে ইসলামী আন্দোলন যে সংকট মোকাবিলা করেছে, তার সাথে বর্তমান সংকটের তুলনা হয় না। আজ ঘরে ঘরে, রাস্তায় রাস্তায়,

রেলস্টেশনে, লঞ্চঘাটে, বিমানবন্দরে, কোর্ট-কাচারিতে, হাট-বাজারে সর্বত্র মোকাবিলা করতে হচ্ছে। অতীতে সংকট এতটা তীব্র কখনো ছিল না।'

তিনি সকলকে ধৈর্যধারণ ও অধিকতর কর্মতৎপর হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার আহ্বান জানান।

সরকারের বিরুদ্ধে আমীরে জামায়াতের দায়েরকৃত মামলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বর্তমানে মামলা স্থগিত আছে। আগামী মাসে (জানুয়ারি ১৯৯৩) শুনানি হতে পারে।'

অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা

ঘটনাক্রমে মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন শুরুর দিনেই ভারতের উগ্র হিন্দু জঙ্গিদের দ্বারা অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংসের মতো জঘন্য ঘটনা ঘটে। ঐ দিনই সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের জরুরি বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, পরের দিন এর প্রতিবাদে জামায়াত সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করবে। ৭ ডিসেম্বর (১৯৯২) মজলিসে শূরার সকালের বৈঠকে সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী কর্মপরিষদে গৃহীত নিম্নরূপ প্রস্তাব পেশ করেন :

১. কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার পক্ষ থেকে নিন্দাপ্রস্তাব গ্রহণ।
২. আজ (৭ ডিসেম্বর ১৯৯২) সারা দেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন।
৩. আগামীকাল ৮ তারিখে সারা দেশে সর্বাত্মক হরতাল।

মজলিসে শূরা সর্বসম্মতিক্রমে এসব প্রস্তাব অনুযায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করে।

নিন্দাপ্রস্তাব গ্রহণের সাথে উক্ত প্রস্তাবে ওআইসি এবং জাতিসংঘসহ বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশসমূহের প্রতি ভারতের উপর চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানানো হয়, যাতে ভারত যথাস্থানে বাবরী মসজিদ পুনর্নির্মাণ করে দেয়। বাংলাদেশ সরকার এ জঘন্য ঘটনার নিন্দা না করায় প্রস্তাবে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সফল হরতালের রিপোর্ট

৮ ডিসেম্বর (১৯৯২) সন্ধ্যার বৈঠকে সেক্রেটারি জেনারেল হরতাল সম্পর্কে নিম্নরূপ রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি বলেন, জনগণের মধ্য থেকে হরতালের পক্ষে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। একই দিনে অনেক আগে থেকেই ঘাদানি কমিটি হরতাল আহ্বান করেছিল। বাস্তব ময়দানে জামায়াতের হরতাল হিসেবেই জনগণ প্রমাণ করেছে।

তিনি বলেন, জামায়াত এককভাবে ঘাদানি কমিটিকে ঘরে তোলার ব্যাপারে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

ঘাদানিকের সাথে কোথাও কোথাও ছিটেফোঁটা সংঘর্ষ হয়েছে; তবে কর্মীরা মযবুতভাবে মোকাবিলা করেছে। দেশের প্রায় সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালিত হয়েছে। সরকার কয়েকটি জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে, চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় সমাবেশে যাওয়ার

পথে ঘাদানিকের সন্ত্রাসীরা গুলি করেছে, রাজশাহীতে সংঘর্ষ হয়েছে এবং ভোলায় কার্ফ্যু জারি করা হয়েছে।

তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি

সেক্রেটারি জেনারেল ঐ সময়কার রাজনৈতিক অবস্থার উপর নিম্নরূপ আলোকপাত করেন :

'সরকার আওয়ামী লীগকে ম্যানেজ করে চলতে চায়। সরকার এরশাদকে বরদাশত করতে রাজি নয়। তাই এরশাদ ছাড়া জাতীয় পার্টিকে ম্যানেজ করার কৌশল তালাশ করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে জামায়াতকে সরকার সহায়ক হিসেবে পেতে চায়। সরকারের একাংশের উদ্যোগেই ঘাদানি কমিটি গঠিত হয়েছে– যাতে জামায়াতকে চাপে রাখা যায়।'

ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্বের সাথে ঐক্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাদের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন হচ্ছে; তবে এক প্লাটফর্মে যাওয়ার পরিবেশ এখনো সৃষ্টি হয়নি।

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বিশেষ অধিবেশন

জামায়াতের গঠনতন্ত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে মজলিসে শূরার বিশেষ অধিবেশন ভারপ্রাপ্ত আমীরের সভাপতিত্বে ১৯৯৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে সেক্রেটারি জেনারেল রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, ১৯৯৩ সালের শুরুতে নির্মূল কমিটির কাজ কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ে। তাদের একাংশ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে চায়। আওয়ামী লীগ ও বামমহল সরকারকে জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চাচ্ছে বলে মনে হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও বিএনপিকে শিবিরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে শহীদ মিনারে অঘটন ঘটিয়ে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে মৌলবাদীদের দায়ী করা হচ্ছে। এ অপশক্তি খালেদা-হাসিনাকে ঐক্যবদ্ধ করে জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

সমাপনী ভাষণে জনাব আব্বাস আলী খান বর্তমান কঠিন সংকটে আত্মসংশোধন ও আল্লাহর সাহায্য কামনার আহ্বান জানান। সালাত ও রমযানকে এ উদ্দেশ্যে বড় সুযোগ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

হাইকোর্টে মামলা দায়ের

১৯৯২ সালের ২৪ মার্চ আমাকে গ্রেফতারের পর এপ্রিলেই জামায়াত আমার পক্ষ থেকে সরকারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে দুটো মামলা দায়ের করে।

বিচারপতি আবদুল জলিল ও বিচাপরপতি রুহুল আমিনের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে আমার গ্রেফতারিকে অবৈধ দাবি করে মামলা দায়ের করা হয়। আমাকে বিদেশি নাগরিক আইনে গ্রেফতার করা হয়। ঐ আইন আমার প্রতি প্রযোজ্য নয় বলে মামলায় দাবি করা হয়।

বিচারপতি ইসমাঈলুদ্দীন সরকার ও বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত অপর এক ডিভিশন বেঞ্চে নাগরিকত্ব মামলা দায়ের করা হয়। আমি জন্মসূত্রে এ দেশের নাগরিক। আইনের দৃষ্টিতে কোনো অপরাধ করে থাকলে আমার বিচার হতে পারে; কিন্তু

কোনো অপরাধের অজুহাতে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নাগরিকত্ব বাতিল করা বৈধ হতে পারে না। তাই আমাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করে সরকার যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, তা সম্পূর্ণ বেআইনি বলে এ মামলায় দাবি করা হয়।

মামলায় যারা ওকালতি করেন

জামায়াতের পক্ষ থেকে এ দুটো মামলা পরিচালনায় যা কিছু করণীয়, তা যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি জামায়াতের সাথে পরামর্শ করে এ দুটো মামলায় প্রধান আইনজ্ঞ হিসেবে ব্যারিস্টার এ আর ইউসুফকে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তাঁর প্রধান সহযোগী হিসেবে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাকের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। জনাব নোয়াব আলীর উপর অন রেকর্ড-এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

উপরিউক্ত দুজন ব্যারিস্টারকে মামলার ব্যাপারে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন– এডভোকেট শেখ আনসার আলী, এডভোকেট মুহাম্মদ রইসুদ্দীন, এডভোকেট এস এম এমদাদুল হক ও এডভোকেট এম আবদুস সালাম।

এ ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের অনেক ব্যারিস্টার ও সিনিয়র এডভোকেটসহ আরো ৭০ জন আইনজীবী শুনানির দিন অত্যন্ত আগ্রহ ও আবেগের সাথে মামলায় সাফল্যের উদ্দেশ্যে কোর্টে হাজির হয়েছেন। তাঁদের এ ধরনের উপস্থিতি বিচারপতিদের উপর হয়তো কিছু প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে।

মজলিসে শূরার জুলাই অধিবেশন

১৯৯৩ সালের ৭ জুলাই থেকে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন শুরু হয়। ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান এতে সভাপতিত্ব করেন। ৮ জুলাই বৈঠকে আমার পক্ষ থেকে দায়ের করা মামলা সম্পর্কে যে রিপোর্ট মজলিসে শূরায় পেশ করা হয় তা কার্যবিবরণী থেকে উদ্ধৃত করছি। মামলা সংক্রান্ত দায়িত্বশীল হিসেবে জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ নিম্নরূপ রিপোর্ট পেশ করেন :

আমীরে জামায়াত দুটো রিট পিটিশন করেছেন। একটি নাগরিকত্ব বাতিল আদেশ অবৈধ ঘোষণার প্রার্থনা করে এবং অপরটি তাঁর আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণার আবেদন জানিয়ে। হাইকোর্ট বিভাগ থেকে প্রথম মামলাটির রায় হয়েছে। রায়ে নাগরিকত্ব বাতিল আদেশকে বেআইনি ঘোষণা করে অধ্যাপক গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর হয়ে কোনো দোষ করেননি বলেও রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, সরকার এ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আবেদন করেছে। তাই সবাইকে দোআ করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

দ্বিতীয় মামলা সম্পর্কে তিনি জানান, গত ৫ জুলাই শুনানির জন্য ধার্য ছিল। কিন্তু সরকারপক্ষ সময় চাইলে ১২ জুলাই শুনানির তারিখ দেওয়া হয়। সরকার যাতে অযৌক্তিকভাবে বিলম্ব করতে না পারে সেজন্য চেষ্টা চলছে।

নাগরিকত্ব মামলার আরো তথ্য

নাগিরকত্ব মামলার রায় প্রথমে ১৯৯২ সালের ১২ আগস্ট ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দুজন বিচারপতির দুরকম রায় হওয়ায় তা হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায় হিসেবে গণ্য হয়নি। বিচারপতি ইসমাঈলুদ্দীন সরকার আমার নাগরিকত্ব বাতিলের পক্ষে রায় দেন; কিন্তু বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরী বাতিলের আদেশকে অবৈধ ঘোষণা করেন।

১৩ আগস্ট পত্রিকায় এ খবর জেনে আল্লাহর দরবারে ধরনা দিলাম। পত্রিকায় জানা গেল, নিয়ম অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি এ মামলা একজন তৃতীয় বিচারপতিকে দেবেন। তিনি যদি বদরুল ইসলাম চৌধুরীর অনুরূপ রায় দেন তাহলে হাইকোর্টের রায় আমার পক্ষে চূড়ান্ত হবে।

কয়েক দিন পর পত্রিকায় খবর পেলাম, বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী তৃতীয় বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছেন। জেলখানায় একজন সিনিয়র ডেপুটি জেলার এসে আমাকে মুবারকবাদ জানিয়ে বললেন, নিরপেক্ষতা ও সততার সুনাম আছে, এমন একজন বিচারপতির হাতে আপনার মামলার চূড়ান্ত ফায়সালা হবে। আট মাস পর ১৯৯৩-এর ২২ এপ্রিল বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী আমার পক্ষে রায় ঘোষণা করেন। কিন্তু এ রায়ের বিরুদ্ধে সরকার আপিল বিভাগে আবেদন জানানোর ফলে সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায়ের অপেক্ষায় থাকতে হয়।

তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি

মজলিসে শূরায় সেক্রেটারি জেনারেল ও জামায়াতের সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী রাজনৈতিক পরিস্থিতির সর্বশেষ চিত্র তুলে ধরে বলেন, বর্তমানে রাজনৈতিক ময়দানে প্রধান ইস্যু হচ্ছে আমীরে জামায়াত। বিএনপি সকল পর্যায়ে দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের অবস্থান সুসংহত করার চেষ্টা করছে। তারা আওয়ামী লীগকে ছাড় দিয়ে ও তোষণ করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। তারা আওয়ামী লীগ ও ঘাদানি কমিটির মাধ্যমে জামায়াতকে চাপে রাখতে চায়, যাতে আগামী নির্বাচনে জামায়াত অধিক আসন না পায়। আওয়ামী লীগ চায়, বিএনপি যেন জামায়াতকে দায় মনে করে এবং উভয়ের মাঝে ভালো সম্পর্ক না হয়। ইসলামী দল ও ব্যক্তিদের পেছনে বিএনপি লেগে আছে, যাতে জামায়াতের বিকল্প শক্তি হিসেবে দাঁড় করানো যায়।

জাতীয় সংসদে জামায়াতের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিএনপির অপকর্মের বিরোধিতা করলে জামায়াতের ভূমিকা আওয়ামী লীগের সাথে মিলে যায়। আবার কোনো ইস্যুতে আওয়ামী লীগের সাথে না গেলে বিএনপির বি-টিম হতে হয়। অতীতে কখনো এমন কঠিন পরিস্থিতি ছিল না।

সমাপনী ভাষণে ভারপ্রাপ্ত আমীর বলেন, আল্লাহ ছাড়া আমাদের আর কোনো বন্ধু নেই। এজন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণের প্রতি আমাদের অত্যন্ত সতর্ক ও যত্নবান হতে হবে। আল্লাহকে বন্ধু হিসেবে পেলে দুনিয়ার অন্য কোনো শত্রুই কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সকল অবস্থায় চরম ধৈর্য ও হিকমতের সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

২৫৬.

আমার জেলজীবন

এবারের জেলজীবনের পূর্বে আমাকে আরো তিনবার জেলে যেতে হয়েছে– ১৯৫২ ও ১৯৫৫ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে এবং ১৯৬৪ সালে জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল হওয়ার দোষে। প্রথমবার একমাস, দ্বিতীয়বার দুই মাস ও তৃতীয়বার সাত মাস জেলে থাকতে হয়েছে। আমার নাগরিকত্ব নিয়ে ১৬ বছর সরকার যেভাবে আমাকে ভোগান্তি পোহাতে বাধ্য করেছে, তাতে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে আইনের লড়াই দীর্ঘদিন চলাই স্বাভাবিক। তাই শেষবার তথা ১৯৯২ সালে পূর্বের চেয়ে বেশি সময় থাকার মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই কারাজীবন শুরু করলাম।

অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে-সুস্থে ২৪ ঘণ্টার রুটিন তৈরি করলাম। পূর্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অল্প সময়েই রুটিন তৈরি হয়ে গেল। রুটিন শুরু হবে শেষ রাতে নামায ও আল্লাহর দরবারে ধরনার মাধ্যমে। সংক্ষেপে ২৪ ঘণ্টার রুটিন নিম্নরূপ–

১. ফজরের নামাযের পূর্বে কুরআন অধ্যয়ন করা,
২. ফজরের পর বাগানে দৌড়ানো ও খালি হাতে ব্যায়াম করা,
৩. নাশতার পর দুপুর পর্যন্ত লেখাপড়া করা,
৪. যুহরের নামাযের পর খেয়ে আসরের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্রাম করা,
৫. আসরের নামাযের পর বাগানে ব্যায়াম ও বিচরণ করা,
৬. মাগরিবের নামাযের পর লেখাপড়া করা,
৭. ইশার নামাযের পর খেয়ে কিছুক্ষণ পড়ালেখা করে বিশ্রামে যাওয়া।

মাগরিবের পরপরই সেলের তালা বন্ধ করা হয় এবং ফজরের পর তালা খুলে দেওয়া হয়। তাই সারা রাতই সেলে আবদ্ধ থাকতে হয়।

২৬ সেলের বাগানটা বেশ প্রশস্ত ও ফুল গাছে সুসজ্জিত। বাগানের ফাঁকে পাকা রাস্তাটি দৌড়ানোর উপযোগী। গন্ধরাজ, কামিনী, রজনীগন্ধা, গোলাপ, বেলি ইত্যাদি ফুলে সাজানো বাগানে ব্যায়াম করতে বেশ ভালোই মনে হতো। বৃষ্টি হলে সেলের প্রশস্ত ও দীর্ঘ বারান্দা দৌড়ানোর জন্য যথেষ্ট উপযোগী ছিল।

লেখার পরিকল্পনা

জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি সংগঠনের আমীর পদে দায়িত্বরত অবস্থায় লেখার জন্য সময় ও সুযোগ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ১৯৭৮ সালে দেশে আসার পর প্রতি বছর ই'তিকাফে দিনের বেলার নির্দিষ্ট এক সময়ে দীন ইসলামের কোনো বিষয়ে লেখার সুযোগ গ্রহণ করেছি। অন্য কোনো সময়ে লেখার সুযোগ পাইনি। অবশ্য প্রতি তিন বছরে একবার কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলন উপলক্ষে আন্দোলন ও সংগঠনের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে আমীরে জামায়াতের প্রধান ভাষণ হিসেবে লিখিত বক্তব্য রচনা করা অত্যাবশ্যক মনে করেছি। ঐসব ভাষণ সংগঠনের স্থায়ী সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করায় আল্লাহর প্রতি গভীর শুকরিয়া জানাই।

জেলের দীর্ঘ অবকাশে কী কী শিখব, এর পরিকল্পনা তৈরি করে প্রয়োজনীয় বইপত্র স্যুটকেসে গুছিয়ে নিয়েছি। পরিকল্পিত বিষয়গুলো হলো–

১. তাফহীমুল কুরআনের ২৬ পারার অনুবাদ ও তাফসীরের সার-সংক্ষেপ রচনা।

২. মাওলানা মওদূদী (র) কর্তৃক উর্দু ভাষায় অনূদিত 'তরজমায়ে কুরআন মজীদ'-এর সহজ বাংলায় অনুবাদ করা। এতটা সহজ ভাষায়, যাতে যারা সামান্য লেখাপড়া জানে তারাও পড়ে বুঝতে পারে।

এ দুটো প্রধান কাজ ছাড়া কুরআন অধ্যয়নের সহজ পন্থা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, কুরআন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার কর্মসূচি, সৎ লোকের এত অভাব কেন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কেও লেখার পরিকল্পনা করি। ১৬ মাস জেলে থাকাকালে যেসব বই লেখা সম্ভব হয়েছে, এর তালিকা যথাসময়ে কোনো এক কিস্তিতে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ। পূর্বপরিকল্পনার বাইরেও দু-একটা চটি বই লেখা হয়েছে।

লেখা শুরু করতে বিলম্ব হয়ে গেল

জেলে প্রবেশ করার সময় পুলিশের বিশেষ বিভাগের লোকেরা বইয়ের স্যুটকেসটি সাথে আনতে দিল না। তাদের নিয়ম অনুযায়ী অফিসে নিয়ে এর তালিকা তৈরি করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেয়ে ফেরত দেবে বলে জানানো হলো। অনেক চাপাচাপি করে উর্দু ভাষায় রচিত তাফসীরটি সাথে নিতে সক্ষম হওয়ায় পড়ার কাজ বন্ধ থাকেনি। চার-পাঁচ দিন পর বইভর্তি স্যুটকেসটি পেলাম।

লেখার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ-কলম পেতে আরো এক দিন বিলম্ব হলো। নিয়ম অনুযায়ী জেল অফিসে বন্দীর নামে টাকা জমা করলে বন্দীর ফরমাশ অনুযায়ী কোনো জিনিস কিনে আনা হয়। কাগজ-কলম পাওয়ার পর লেখা শুরু হলো।

কারাগারের প্রথম লেখা

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তাদের সরাসরি কুরআন বোঝা প্রয়োজন। তাই ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী গঠিত হওয়ার পরই মাওলানা মওদূদী (র) 'তাফহীমুল কুরআন' নামক তাফসীর লেখা শুরু করেন। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম বাংলা ভাষায় এর যে অনুবাদ করেছেন, তা উচ্চ শিক্ষিতদের উপযোগী কঠিন ভাষায় রচিত। অথচ আন্দোলনের কর্মীদের অধিকাংশই স্বল্প শিক্ষিত। তাদের বোঝার উপযোগী সহজ-সরল ভাষায় অনুবাদের গুরুত্ব অনুভব করে আমি ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে দুটো ই'তিকাফে তাফহীমুল কুরআনের আমপারার সার-সংক্ষেপ ও সূরাসমূহের অনুবাদের কাজ শেষ করি। ১৯৮৩ সালে তা প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পাঠকপ্রিয়তার কথা জানতে পেরে এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (বিআইসি)-এর ডাইরেক্টর অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদের বারবার তাকিদে ২৯, ২৮ ও ২৭ পারার অনুবাদ (প্রতি পারা দুই বছরের ই'তিকাফে মোট ছয় বছরে) ১৯৯০ সালে সমাপ্ত হয়।

১৯৯১ সালের ই'তিকাফে ২৬ পারার অর্ধেক কাজ হয়েছিল। ১৯৯২ সালের ই'তিকাফে এ কাজ সমাপ্ত হওয়ার কথা। ই'তিকাফে ঢোকার এক দিন আগে গ্রেফতার হয়ে গেলাম। এ কাজটিই সবার আগে সমাপ্ত করা প্রয়োজন মনে করলাম। রমযানের শেষ দশ দিনের মধ্যেই লেখা শেষ করা যেত। কিন্তু লেখা শুরু করতে কয়েক দিন বিলম্ব হওয়ায় ঈদের পরও বেশ কিছুদিন লেগে গেল। ই'তিকাফের দিনগুলোতে লেখা শেষ করার যে তাকিদ থাকে জেলে তা না থাকায় ধীরে-সুস্থেই লেখা হয়েছে।

ই'তিকাফ শব্দের অর্থ হলো– কোনো স্থানে আটক হয়ে থাকা। মসজিদে নিজের ইচ্ছায় আটক থাকতে হয়, আর জেলে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটক হলাম– এটুকুই পার্থক্য। যাহোক জেলে ২৬ পারা লেখা প্রথমেই সমাপ্ত হয়ে গেল।

জেলে পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ

১৫ দিন পরপর স্পেশাল পুলিশ অফিসের অনুমতি নিয়ে পরিবারের লোকজন কারাগারের ফটকসংলগ্ন অফিসে এসে সাক্ষাৎ করতে পারে। একসাথে পাঁচজনের বেশি অনুমতি পায় না। প্রত্যেক সাক্ষাতেই আমার স্ত্রী উপস্থিত থাকতেন। বাকি চারজনের মধ্যে আমাদের ছেলেরা, ভাই-বোন ও জামায়াতের দায়িত্বশীলগণ থাকতেন। এপ্রিলের (১৯৯২) তৃতীয় সপ্তাহে সাক্ষাতের দিন ২৬ পারার লেখাটা সাথে নিয়ে অফিসে গেলাম, যাতে সম্ভব হলে মুদ্রণের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিতে পারি।

বন্দীদের কাছ থেকে কোনো লেখা স্পেশাল পুলিশের মাধ্যম ছাড়া বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। সাক্ষাতের সময় তো পুলিশ উপস্থিতই থাকে, যাতে বন্দীর কথা তারা শুনতে পারে এবং তাদের আগোচরে যেন কোনো লিখিত কাগজ পার করা না যায়। আমার লেখা ২৬ পারার ফাইলটা পুলিশের হাতে না দিয়ে পার করা যায় কি না, সে কথা চিন্তা করে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (ডিআইজি) আমিনুর রহমানের সাথে দেখা করার সুযোগ খুঁজছিলাম। আমার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগতদের বিদায় করার জন্য বারান্দায় যেতেই দেখা গেল, ডিআইজি সাহেব তার কামরায় যাচ্ছেন। আমি তাকে বললাম, কুরআনের অনুবাদের ফাইলটা কি দিয়ে দেয়া যায়? তিনি বললেন, দিয়ে দিতে পারেন। তাঁর সামনেই দিয়ে দিলাম। পুলিশ টের পেল কি না, বুঝতে পারলাম না।

বিআইসির কৃতিত্ব

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (বিআইসি)-এর ডাইরেক্টর অধ্যাপক এ.কে.এম. নাজির আহমদ আমার লেখা ২৬ পারার খসড়া পেয়ে এক মাসের মধ্যে তা মুদ্রিত করে আমাকে বিস্মিত করে দিলেন। আগেই বলেছি, তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ হিসেবে আমার লেখা আমপারা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই অধ্যাপক নাজির সাহেব অব্যাহতভাবে তাকিদ দিয়ে ২৯, ২৮ ও ২৭ পারার সার-সংক্ষেপ রচনা করিয়ে বিআইসি থেকেই তা প্রকাশ করেছেন। ২৬ পারা হাতে পেয়েই তিনি মুদ্রণের ব্যবস্থা করলেন। জুন (১৯৯২) মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমার স্ত্রী ২৬ পারার ৩ কপি সাথে নিয়ে জেলে

আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। আমি রীতিমতো বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম। পুলিশও কোনো আপত্তি করল না। এক কপি ডিআইজি সাহেবকে উপহার দিলাম।

অধ্যাপক নাজির সাহেব ২৬ থেকে ৩০ পারা একই গ্রন্থেও প্রকাশ করেছেন। আমপারা জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশনা থেকে মুদ্রিত হচ্ছে। ২০০৫ সাল পর্যন্ত ১৫তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ২৬ পারার পর তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ হিসেবে আর কোনো পারা রচনা করিনি। শেষ পাঁচ পারায় মোট ৬৯টি সূরা রয়েছে। সূরা ফাতিহা আমপারায় শামিল হওয়ায় মোট ৭০টি সূরার তাফসীরের সার-সংক্ষেপ তৈরি হয়ে গেল। এর মধ্যে অল্প কয়েকটি সূরা মাদানী, বাকি সবই মাক্কী। আন্দোলনের বর্তমান অবস্থায় মাক্কী সূরার প্রয়োজনই বেশি। তাই এ পর্যন্ত সার-সংক্ষেপ রচনা করাই আমি যথেষ্ট মনে করেছি।

সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ

২৬ পারা লেখা সমাপ্ত হওয়ার পরই আমি সহজ বাংলায় কুরআনের অনুবাদের কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। আমি নিজেকে কুরআনের সরাসরি অনুবাদ করার যোগ্য বলে কখনো মনে করিনি। তবে মাওলানা মওদূদী (র) উর্দু ভাষায় যে অনুবাদ করেছেন, ঐ অনুবাদের বাংলা অনুবাদ করা কর্তব্য মনে করেছি। তাফহীমুল কুরআনের মতো বিশাল তাফসীরের অনুবাদ করাও আমার পক্ষে সম্ভব মনে করিনি।

মাওলানা মওদূদী তাফহীমুল কুরআন ছাড়াও সংক্ষিপ্ত টীকা সংবলিত আরো একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'তরজমায়ে কুরআন মজীদ' নামে তা পরিচিত। যারা তাফসীর পড়ার বদলে শুধু অনুবাদ পড়েই মোটামুটি কুরআন বুঝতে চান তাদের প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যেই তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেটুকু ব্যাখ্যা না হলে কুরআন বোঝা সম্ভবই নয়, শুধু ঐ পরিমাণ সংক্ষিপ্ত টীকা এতে রয়েছে।

এ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদও একই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম অনূদিত তাফহীমুল কুরআনে আয়াতসমূহের যে অনুবাদ তিনি করেছেন, ঐ অনুবাদই এ গ্রন্থে রয়েছে। আর টীকাগুলো ভারতের জনাব নিযামুদ্দীন মোল্লা ও জনাব নূরুল ইসলাম খান অনুবাদ করেছেন। সাহিত্যিক মান উন্নত হলেও ঐ তিনজনের ভাষা এত কঠিন যে, উচ্চশিক্ষিত ছাড়া কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। অথচ ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় লোকদের অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত।

আমি তীব্রভাবে অনুভব করলাম, কর্মীদের সবাইকে কুরআন বোঝার সুযোগ দিতে হলে সহজ বাংলায় অনুবাদ অত্যন্ত প্রয়োজন। তাফসীরের অনুবাদ করা তো আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, অন্তত 'তরজমায়ে কুরআন মজীদ'-এর অনুবাদ করার চেষ্টা করব। শেষ পাঁচ পারার তাফসীরের সারসংক্ষেপ হয়ে গেল। শুরু থেকে ২৫ পারা পর্যন্ত আয়াতসমূহের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকাসমূহের অনুবাদ করতে পারলে স্বল্প শিক্ষিতদের প্রয়োজন কিছুটা পূরণ হতে পারে বলে মনে করলাম।

এ কাজটি অত্যাবশ্যক বিবেচনা করা সত্ত্বেও সময়াভাবে শুরু করা সম্ভব হয়নি। কারাগারে অবকাশ পেয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করলাম। আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখার প্রয়োজনে জেলে থাকার সবটুকু সময় শুধু কুরআনের অনুবাদে ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। ১৬ মাস সময়ে সূরা তাওবা পর্যন্ত (প্রথম দশ পারা) অনুবাদ করা হয়ে গেল।

গোটা কুরআনের অনুবাদ সম্পন্ন না হলে কোনো প্রকাশক শুধু দশ পারা প্রকাশ করতে রাজি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আধুনিক প্রকাশনীর তৎকালীন দায়িত্বশীল জনাব আবদুল গাফফার অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তা ছাপিয়ে দিলেন।

টীকাগুলো অনুবাদ করার সময় বের করা সম্ভব হবে না বিধায় ভারতে অনুবাদ করা লেখা নকল করিয়ে নিয়ে কঠিন ভাষাকে সহজ করে নিতেও বেশ শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হলো।

জেল থেকে বের হওয়ার পর থেকে ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ কাজে আর হাত দিতে পারিনি। ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকে জামায়াতের ইমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া সত্ত্বেও অন্য অনেক বিষয়ে লেখার কাজে ব্যস্ত থাকায় এ কাজ দুই বছর পর্যন্ত পড়েই রইল। ২০০৩ সালের শুরুতেই এ কাজটি সমাধা করার নিয়তে সৌদি আরবে আমার বড় ছেলের বাসায় চলে গেলাম। আল্লাহর রহমতে আয়াতের অনুবাদ সমাপ্ত করে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে ফিরে এলাম।

টীকাগুলো কঠিন ভাষা থেকে সহজ ভাষায় রূপান্তরিত করতে আরো কয়েক মাস লেগে গেল। প্রকাশের দায়িত্ব কামিয়াব প্রকাশন নিল। শেষের পাঁচ পারা তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ হিসেবে ৭১২ পৃষ্ঠার পৃথক খণ্ড পূর্বেই প্রকাশিত হয়ে আছে। সিদ্ধান্ত হলো যে, ১ম থেকে ২৫তম পারা পর্যন্ত দুই খণ্ডে এবং শেষ ৫ পারা এক খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। এভাবে মোট তিন খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

ইসলামী আন্দোলনে শামিল হওয়ার পর 'তাফহীমুল কুরআন' অধ্যয়নের মাধ্যমে দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হলাম। সূরা বাকারার চতুর্থ রুকূ'তে আদম সৃষ্টির ঘোষণা, ফেরেশতাদের বক্তব্য, আদমকে ফেরেশতাদের সিজদা করা ও ইবলিসের বিদ্রোহী ভূমিকার কথা যা জানা যায় তা আরো ছয়টি সূরায় বর্ণিত বিবরণ মিলে পূর্ণ কাহিনী সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করে জেলে থাকাকালেই 'আদম সৃষ্টির হাকীকত' নামে একটি বই রচনা করি। ঐ বইয়ের ভূমিকা এবং কয়েকটি পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যাতে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ৬৪ পৃষ্ঠার বইটিতে আদম সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের জুন মাসে আমি জেল থেকে মুক্তি পাই। ঐ বছরই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে অষ্টম মুদ্রণ চলছে। বইটির বিরুদ্ধে রংপুর, পটুয়াখালী ও কয়েকটি জেলাশহরে মামলা দায়ের করা হয়। আদালত পুলিশকে তদন্ত করার নির্দেশ দেন। ফলে বিচারক, উকিল ও পুলিশদের বইটি পড়তে হয়। আদালতে পুলিশের পক্ষ থেকে এমন রিপোর্ট পেশ করা হয়, যার ফলে মামলা এমনিতেই শেষ হয়ে যায়।

বইটির ভূমিকা

ছোট বয়স থেকেই আমার ওয়ায শোনার খুব শখ ছিল। বেশ দূরে গিয়েও ওয়ায শুনতাম। প্রায় সব ওয়াযেই আদম সৃষ্টি এবং আদম ও ইবলিসের কাহিনী এমন আকর্ষণীয় করে পেশ করা হতো, শুনতে শুনতে সব কথা মুখস্থ হয়ে গেছে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও গল্প হিসেবে শোনাতাম। এ কাহিনীর মধ্যে ফেরেশতার চেয়ে আদমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হওয়ার ঘটনা সবচেয়ে ভালো লাগত। আর বেহেশতে ইবলিসের ধোঁকায় পড়ে আদমের পরাজয়ের ঘটনায় খুব ব্যথা বোধ করতাম।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ঐ কাহিনীকে যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এমন কতক প্রশ্ন ও খটকা মনে জাগল, যার সন্তোষজনক কোনো জবাব তালাশ করে না পেয়ে ঐ কাহিনীর প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

মাওলানা মওদূদী (র)-এর লেখা তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে সূরা বাকারার ৪র্থ রুকূ'র ব্যাখ্যা আমাকে আদম ও ইবলিসের কাহিনীর ব্যাপারে পুরনো উৎসাহে নতুন জোয়ার এনে দিল। আমার মনের সব প্রশ্নের জবাব তো পেলামই, অনেক নতুন প্রশ্নের সন্ধান ও তার জবাব পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। সেই ১৯৫৪ সালের কথা, আমি তখন ইসলামী আন্দোলনের কর্মী।

এরপর থেকে মাদরাসার ছাত্র ও আলেম সমাজের মধ্যে কোথাও কুরআন চর্চার সুযোগ পেলে এ রুকূ'র তাফসীর আলোচনা করা কর্তব্য মনে করতাম। ইতঃপূর্বে এ রুকূ'র যে ব্যাখ্যা শুনে এসেছি, তার সংশোধনের জন্যই আলোচনা করা জরুরি মনে করতাম। সর্বত্রই আমি এ রুকূ'টির সঠিক ব্যাখ্যার গুরুত্ব তুলে ধরতাম। এ আলোচনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তা লিখিত আকারে তৈরি করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলাম। কিন্তু এর জন্য এতদিন পর্যন্ত সময় বের করা সম্ভব হয়নি।

সরকার আমাকে কারাগারে আটক করে অবসরে থাকার ব্যবস্থা করায় ঐ প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করতে পেরে অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করছি; আলহামদুলিল্লাহ। এ কাহিনীর সাথে সম্পর্কিত বহু প্রশ্নের জবাব এতে আমি দিয়েছি।

সূরা বাকারার ৪র্থ রুকূ'র প্রচলিত ভুল ব্যাখ্যার কারণেই মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম একটি অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম হিসেবে পরিচিত হয়েছে। এর সঠিক ব্যাখ্যা ছাড়া কুরআনের বিপ্লবী দাওয়াত ও রাসূল (স)-এর সংগ্রামী জীবনের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। এ কারণেই এ রুকূ'টিকে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। কুরআনের আলো পেতে চাইলে এ রুকূ'র সঠিক ব্যাখ্যা জানা অত্যন্ত জরুরি মনে করেই এ পুস্তকটি রচনা করা কর্তব্য মনে করেছি। এ রুকূ'র সঠিক ব্যাখ্যাই ঐ দৃষ্টিভঙ্গি দান করতে পারে, যা গোটা কুরআনকে ইসলামী আন্দোলনের সার্থক গাইড বুক হিসেবে বুঝতে সাহায্য করবে।

ওয়ায-মাহফিলে দেওয়া সূরা বাকারার ৪র্থ রুকূ'র প্রচলিত অর্থ

আল্লাহ তাআলা যখন ফেরেশতাদের জানালেন, তিনি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন, তখন ফেরেশতারা আপত্তি জানিয়ে বলল, 'আপনি কেন এমন এক জাতি সৃষ্টি করতে

চাচ্ছেন, যারা দুনিয়াতে ফিতনা-ফাসাদ ও খুনাখুনি করবে? আমরাই তো আপনার গুণকীর্তন করছি। এতে কি আপনার পোষায় না? আরেকটা সৃষ্টির কী দরকার হলো?' আল্লাহ্ বললেন, 'আমি যা জানি তোমরা তা জান না'।

এরপর আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করে তাকে যাবতীয় ইলম শিক্ষা দিলেন। তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাদের বললেন, বল দেখি ঐসব জ্ঞান তোমাদের কাছে আছে কি না, যা আদম জানে? ফেরেশতারা বলল, 'হে রব! তুমি যতটুকু জ্ঞান আমাদের দিয়েছ, এর বেশি আমরা আর কিছুই জানি না।' আল্লাহ্ তখন আদমকে বললেন, 'তোমার কাছে যে জ্ঞান আছে তা ওদেরকে শুনিয়ে দাও।' যখন আদম শুনিয়ে দিল এবং প্রমাণিত হয়ে গেল যে জ্ঞানের দিক দিয়ে আদম ফেরেশতার চেয়ে বড়, তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাদের আদেশ করলেন, তোমরা আদমকে সিজদা কর। সব ফেরেশতা সিজদা করল; শুধু ইবলিস গর্বভরে সিজদা করতে অস্বীকার করল। তারপর আল্লাহ্ আদমকে বললেন, 'তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেশতে গিয়ে বসবাস কর এবং যেখান থেকে যা ইচ্ছা সবকিছু খেতে পার; কিন্তু ঐ গাছটার কাছেও যেয়ো না, যদি যাও তাহলে যালিমে পরিণত হবে।'

ইবলিস আদমকে পথভ্রষ্ট করে আদম ও হাওয়াকে বেহেশত থেকে বের করার ব্যবস্থা করল। তখন আল্লাহ্ বললেন, 'হে আদম! বেহেশত থেকে বের হয়ে যাও। দুনিয়ায় কিছুদিন থাকতে হবে। ইবলিসকে তোমার দুশমন মনে করবে। পৃথিবীতে তোমার কাছে আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত পাঠাব। যারা হেদায়াত মেনে চলবে তাদের কোনো ভয় বা চিন্তার কারণ নেই। কিন্তু যারা তা মানবে না তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী দোযখ।'

এ তরজমার ভিত্তিতে ভুল ব্যাখ্যা

১. খলীফা সৃষ্টিতে ফেরেশতারা আপত্তি জানিয়েছিল।

২. আদমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ আদমকে এমন কিছু জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা ফেরেশতাদের দেননি।

৩. ইলমের দিক দিয়ে আদমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হওয়ার কারণে আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের হুকুম করা হয়েছিল।

৪. ইবলিস মুআল্লিমুল মালাইকা (ফেরেশতাদের উস্তাদ) ছিল বলে তারও সিজদা করা কর্তব্য ছিল। সে সিজদা না করায় অভিশপ্ত হয়েছে।

৫. বেহেশতে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করায় আদম ও হাওয়াকে শাস্তিস্বরূপ দুনিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল।

৬. আদম ও হাওয়াকে পৃথিবীর দুটো দূরবর্তী জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ৩০০ বছর পর্যন্ত তাঁরা আলাদা অবস্থায় থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে থাকলেন। অবশেষে তাঁরা আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হলেন। এ থেকে ঐ স্থানের নাম 'আরাফাত' হয়েছে, যার মানে পরিচিতি।

৭. বেহেশতে আল্লাহর নিষিদ্ধ ফল খাওয়ায় আদম-হাওয়ার পেটে পায়খানা তৈরি হয়েছে, যা ফেলার জায়গা বেহেশতে নেই। তাই দুনিয়ায় পায়খানা করতে আসতে হয়েছে। এখান থেকে পাক-সাফ হয়ে বিদায় নিতে পারলে আবার বেহেশতে যেতে পারবে।

এ ব্যাখ্যা গ্রহণে সমস্যা

এ জাতীয় ব্যাখ্যা দ্বারা নিম্নরূপ প্রশ্ন সৃষ্টি হয়– যার কোনো জবাব তাদের কাছে পাওয়া যায় না, যারা ঐ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন :

১. আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা বা আপত্তি জানানোর সামান্য ক্ষমতা বা অধিকারও কি ফেরেশতাদের আছে?

২. আল্লাহর পক্ষে কি পক্ষপাতিত্ব করা সাজে এবং আল্লাহকে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা চলে?

৩. আল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণা করা কি ঠিক যে, তিনি আদম ও ফেরেশতাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং আদমকে কোশ্চেন আউট করে দিয়ে অন্যায়ভাবে জিতিয়ে দিয়েছেন?

৪. কেউ জ্ঞানে বড় হলেই তাকে সিজদা করা জায়েয হলে শিক্ষকদের কি ছাত্রদেরও সিজদা করা উচিত?

৫. আল্লাহ ফেরেশতাদের সিজদা করার আদেশ দিয়েছেন। ইবলিস তো ফেরেশতা নয়, বরং জিন। তাহলে সে সিজদা না করায় কেন তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো? সে-ই বা কেন নিজেকে ঐ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত মনে করে সিজদা না করার অজুহাত প্রকাশ করেছিল?

৬. আদম সৃষ্টির আগেই আল্লাহ ঘোষণা করলেন, তিনি পৃথিবীতে খলীফা পাঠাবেন। তাহলে আদমকে পৃথিবীতে না পাঠিয়ে বেহেশতে কেন পাঠালেন?

৭. আদমকে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার কারণে যদি শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুনিয়ার জেলখানায় পাঠানো হয়ে থাকে তাহলে পৃথিবীতে খলীফা হিসেবে পাঠানোর যে ঘোষণা আগেই আল্লাহ দিয়েছেন, তার মূল্য কী? খলীফা হওয়া মর্যাদাপূর্ণ নাকি শাস্তির ব্যাপার?

৮. আচ্ছা আদম ও হাওয়াকে না হয় নাফরমানির কারণে দুনিয়ায় শাস্তি ভোগ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু অন্য সব মানুষকে কোন্ পাপের দরুন দুনিয়ায় পাঠানো হলো? একজনের পাপের জন্য তার সন্তানদেরও শাস্তি দেওয়া কি আল্লাহর বিধানে জায়েয আছে?

৯. কুরআনের আয়াত থেকে তো বোঝা যায়, আদম আল্লাহর কাছ থেকে তাওবা করার ভাষা শিখলেন এবং আল্লাহ তাওবা কবুলকারী ও মেহেরবান বলে তাওবা কবুল করে নিয়েছিলেন। সূরা ত্বাহার ১২২ নং আয়াতে মাফ করার কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, মাফ করে দেওয়ার পর আবার শাস্তি দেওয়া হবে কেন? শাস্তির জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়ে থাকলে মাফ করার মূল্য কী রইল?

১০. এক হাদীসে দুনিয়ার জীবনকে মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন বেহেশত বলা হয়েছে। এর দ্বারা কি দুনিয়াকে শাস্তির জায়গা বলে প্রমাণিত হয়?

১১. আল্লাহ কি বেহেশতে আদমের তাওবা কবুল করেননি? তিনি কি দুনিয়ায় এে তাওবা করেছিলন? তাহলে আদম (আ)-এর নবুওয়াত নিয়ে প্রশ্ন ওঠে যে, আল্লাহ কোনো নবী কি গুনাহগার হতে পারেন?

যারা এ রুকূ'র ভুল অর্থ করেন, তাদের নিকট থেকে এসব প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় না।

এ ভুল ব্যাখ্যা যা শিক্ষা দেয়

এ ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে মেনে নিলে ঐ রুকূ থেকে এমন ধরনের শিক্ষাই পাওয়া যায়, যা ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষার বিপরীত। যেমন :

১. আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফেরেশতারা আপত্তি তোলার অধিকার রাখেন– এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। তারা আল্লাহর পূর্ণ অনুগত কর্মচারী।

২. আল্লাহ আদমকে ফেরেশতাদের চেয়ে ইল্‌মের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে আদমের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন ও ফেরেশতাদের ফেল করিয়ে দিয়েছেন– ইনসাফের এমন স্পষ্ট খেলাফ কাজ আল্লাহর উপর আরোপ করা অত্যন্ত জঘন্য অপবাদ।

৩. ইলমের দিক দিয়ে আদম শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হওয়ায় আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ করা হয়েছে– এ কথাও যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

   আদম ও ইবলিসের মধ্যে জ্ঞানের কোনো প্রতিযোগিতা ছিল না। আদমের জ্ঞান ফেরেশতাদের চেয়ে বেশি– এ কথা প্রমাণ করাও কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আল্লাহ ফেরেশতাদের যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, এর উপযোগী জ্ঞানও তাদেরকে দিয়েছেন। আদমকে যে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা পালন করার জন্য যে জ্ঞান তাকে দেওয়া দরকার, তা-ই দিলেন। এখানে শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক।

   আমরা যাদেরকে চিকিৎসা করার দায়িত্ব দিতে চাই, তাদেরকে ডাক্তারি বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করি। ইঞ্জিনিয়ার যে হতে চায়, তাকে সে বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হয়। ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে জ্ঞানের দিক দিয়ে কে শ্রেষ্ঠ, সে প্রশ্ন হাস্যকর। উভয়ই যার যার ক্ষেত্রে জ্ঞানী।

   আদম ও ফেরেশতার জ্ঞানের ব্যাপারটা এ উদাহরণ থেকে সহজে বুঝে আসতে পারে। তাদের মধ্যে জ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে মনে করলে আল্লাহকে 'কোশ্চেন আউট' করে আদমকে জেতানোর দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করতে হয়। নাউযুবিল্লাহ!

৪. শয়তানের ধোঁকায় না পড়লে আদমকে বেহেশত থেকে বের হতে হতো না। চিরকাল তিনি সেখানে থাকতে পারতেন– এ কথা কুরআনের বক্তব্যের বিপরীত। কেননা, আল্লাহ তো আদমকে দুনিয়ায় পাঠানোর জন্যই পয়দা করেছেন।

৫. আদম বেহেশতে আল্লাহর যে নাফরমানি করেছিল, তার শাস্তি ভোগ করার জন্যই তাঁকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। অথচ কুরআন বলে, 'পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফার দায়িত্ব পালনের জন্য আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' বেহেশতে যে ভুল হয়েছিল তা সেখানেই মাফ করা হয়ে গেছে।

মারাত্মক শিক্ষা

'মানুষকে শাস্তি দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে'– এ শিক্ষাটাই সবচেয়ে মারাত্মক। যারা এ শিক্ষা গ্রহণ করেছে, তারাই বৈরাগ্য সাধনের পথ বাছাই করে নিয়েছে। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন কায়েম করার উদ্দেশ্যে বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ করে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে তারা তাদের কাল্‌বকে পাক-সাফ করার জন্য এমন সব তরীকা আবিষ্কার করেন, যা রাসূল (স) সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দেননি।

বলা হয় যে, রাসূল (স) হেরা গুহায় দীর্ঘ সাধনার পর নবুওয়াত পেয়েছিলেন। তাই এ সাধনার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ওহী নাযিল হওয়ার পর কি তিনি আর কখনো বনে-জঙ্গলে বা কোনো গুহায় গিয়ে সাধনা করেছেন? যাঁরা রাসূল (স)-এর উপর ঈমান এনেছেন তাঁদের কাউকে কি তিনি হেরা গুহায় সাধনা করতে পাঠিয়েছেন? ইতিহাস কী বলে? যখনই কোনো লোক রাসূল (স)-এর দাওয়াত কবুল করে ঈমান এনেছেন তখন তাকে যিক্‌র ও তাসবীহে বসিয়ে না দিয়ে তিনি অন্যদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। দাওয়াতী কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহর যিক্‌র স্বাভাবিকভাবে করতেই হয়।

'আদম সৃষ্টির হাকীকত' বইটিতে এ মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

২৫৭.

জেলে লেখা অন্যান্য বই

আমার নিকটাত্মীয়দের প্রতি আকুল আবেদন

উপরিউক্ত শিরোনামে ১৩/১৪ পৃষ্ঠার একটি চটি বইয়ের খসড়া রচনা করে আমার ছোট ভাই ডা. মু. গোলাম মুয়ায্‌যামের নিকট পাঠালাম। এটা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদেরকে সমবেত করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিলি করার জন্য তাকে পরামর্শ দিই। এ কাজটি সে অল্প সময়ের মধ্যেই সমাধা করতে সক্ষম হয়।

সূরা শুআরার ২১৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে নির্দেশ দিয়েছেন, 'আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন'। তাই আমাদেরও এ দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য মনে করেই আমি বইটি লিখলাম। আমার আবেদনে আত্মীয়দেরকে এ কথার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম হিসেবে পালন করাই যথেষ্ট নয়– আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার যে বিরাট দায়িত্ব দিয়ে রাসূল (স)-কে পাঠানো হয়েছে ঐ দায়িত্ব তাদেরও, যারা রাসূলের উপর ঈমান আনার দাবিদার।

চাচাতো, মামাতো, খালাতো ও ফুফাতো ভাই-বোন এবং তাদের স্বামী-স্ত্রীরাই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আমরা তাদের খুশিতে আনন্দিত হই ও দুঃখে বেদনাবোধ করি। তারা অসুস্থ হলে দেখতে যাই, মারা গেলে চোখের পানি ফেলি। তাহলে তারা যাতে মৃত্যুর পর আখিরাতে আযাব থেকে রক্ষা পায়, সেজন্য চেষ্টা করা কি আমাদের কর্তব্য নয়?

কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে বইটিতে দেখানো হয়েছে– বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তানাদির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে দুনিয়ায় একে অপরের সুখ-দুঃখের সাথী হওয়া সত্ত্বেও আখিরাতে যারা ডান হাতে আমলনামা পাওয়ার যোগ্য তাদের মধ্যকার সম্পর্কই সেখানে বহাল থাকবে; কিন্তু যারা বাম হাতে আমলনামা পাবে তারা একে অপরের থেকে পালিয়ে বেড়াবে। তাই সকলেরই দুনিয়ায় দীনী জীবনযাপন করা কর্তব্য, যাতে সেখানে পালাতে না হয়।

কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের ৪ দফা কর্মসূচি

দেশ শাসন ও সরকার পরিচালনায় নিয়োজিত সবাই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় গড়ে উঠেছেন। ইসলামকে তারা শুধু ধর্মই মনে করেন। ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষাটুকুও শিক্ষাব্যবস্থায় শামিল নেই। অথচ তাদের প্রায় সবাই মুসলিম। রাসূল (স) শুধু ধর্মনেতা ছিলেন না– তিনি যে রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজসংগঠক হিসেবে উন্নতমানের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করে আদর্শ মানবসমাজের নমুনা রেখে গেছেন, সে বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত মহল সঠিক ধারণা রাখেন না।

জন্মগতভাবে মুসলিম হলেও আমাদের শাসকগণ ইসলামী শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা রাখেন না। মুসলিম হিসেবে দাবি করলে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাসূল (স)-এর বাস্তব জীবন থেকে অনুকরণ করা অত্যাবশ্যক বলে তেমন চেতনাও তাদের নেই। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও আমরা মুসলিম হয়েও অমুসলিমদের আচরণ করি। তাই এ বিষয়ে 'কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের ৪ দফা কর্মসূচি' পুস্তিকাটি রচনা করি।

সূরা হাজ্জ-এর ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, '(তারাই আল্লাহর সাহায্য পাবে,) যাদেরকে আমি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করে, ভালো কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।'

এ আয়াতে মুসলিম শাসকদের যে ৪ দফা কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে, এর প্রতিটি দফার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বইটিতে লিখেছি– যাতে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, সরকারের জন্য এ কর্মসূচি অত্যন্ত ব্যাপক। এ ব্যাখ্যার পূর্বে বইটিতে নিম্নলিখিত শিরোনামে ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা তুলে ধরেছি– সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার রচিত বিধানই ইসলাম, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, ইসলামের সবটুকুই মানতে হবে, রাসূল (স)-এর জীবনই ইসলামের বাস্তব রূপ, আধুনিক শিক্ষিতদের দায়িত্ব, মুসলিমের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কর্তব্য। মাত্র ৪০ পৃষ্ঠার বইটিতে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিয়ে তালাক ফারায়েয

সকল মুসলিমের জীবনেই বিয়ে ও ফারায়েয অত্যাবশ্যক। তালাক সম্পর্কেও সবারই সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিয়ে, তালাক ও ফারায়েয (মৃত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টনের বিধান) মুসলিমদের পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত। এ কয়েকটি বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে এমন পূর্ণাঙ্গ বিধান রয়েছে, নতুন কোনো আইন রচনা করার প্রয়োজন নেই। এ আইন পরিবর্তন করারও কারো অধিকার থাকতে পারে না।

ইংরেজ শাসনামলে ইসলামী আইন উৎখাত করে তাদের নিজস্ব আইন এ দেশে চালু করলেও তারা মুসলিমদের পারিবারিক আইনে হাত দেয়নি। ইংরেজরা যাদেরকে খাঁটি গোলাম বানিয়ে গেছে, তাদের পক্ষ থেকে পাকিস্তান আমলে ১৯৬১ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসনের দাপট দেখিয়ে গোটা আলেমসমাজের কঠোর আপত্তি সত্ত্বেও ইসলামের পারিবারিক আইনকে সংশোধনের নামে বিকৃত করে। সত্তরের দশকের শেষদিকে জেনারেল জিয়াউল হকের শাসনামলে ওলামায়ে কেরামের সমবেত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঐ ইসলামবিরোধী সংশোধনী বাতিল করা হয়। আমরা পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়েছি বটে, কিন্তু আইয়ুবের অনৈসলামী আইন এখনো সংবিধানে বহাল রয়েছে।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, নগ্ন পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারী একশ্রেণীর মহিলা ইসলামের পারিবারিক আইনে আরো মৌলিক পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন করছে। তাই এ বিষয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি মনে করেই বইটি লিখেছি।

মাত্র ৪০ পৃষ্ঠার বইটিতে অতি সংক্ষেপে বিয়ে, তালাক ও ফারায়েযের ক্ষেত্রে যেসব কুসংস্কার সমাজে চালু আছে, সেসব চিহ্নিত করে ইসলামের সঠিক বিধান পেশ করা হয়েছে। আইয়ূব আমলে যেসব সমস্যার সমাধানের দোহাই দিয়ে পারিবারিক আইন সংশোধন করা হয়েছে তা তো সফলই হয়নি; বরং অনেক নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

মুসলিম নেতাদের এ দশা কেন? প্রতিকারই বা কী?

১৯৯২ সালে জেলে থাকাকালে পত্রিকায় দুজন মুসলিম নেতার বক্তব্য পড়ে আমি উপরিউক্ত শিরোনামে মাত্র ২২ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি রচনা করি। তাদের একজন হলেন জাতীয় সংসদের তদানীন্তন স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী, অপরজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর শামসুল হক।

১৯৯২ সালের ১৪ এপ্রিল (১ বৈশাখ) শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত এক প্রদর্শনী উদ্বোধনকালে শেখ রাজ্জাক আলী বলেন, 'রাজনীতিতে ধর্মের স্থান থাকা উচিত নয়। যতদিন ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী রাজনীতি বন্ধ করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের অগ্রগতি ও প্রগতি সম্ভব নয়।' তিনি যে দলের এমপি হয়ে স্পিকার হয়েছেন, সে দলটি তথা বিএনপিই দেশের শাসনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ উৎখাত এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের ধারা বাতিল করে।

জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে 'বিশ্ব শান্তি পরিষদ' আয়োজিত এক সেমিনারে প্রফেসর শামসুল হক সভাপতির ভাষণে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে একটি ইউনিয়ন অথবা শিথিল কনফেডারেশন গঠিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে এ পথে মৌলবাদের বাধা দূর করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'একবার ভাবুন, ভারতে বিজেপি এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী যদি ক্ষমতা দখল করে তাহলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে!'

প্রফেসর শামসুল হক কেমন করে ভারতের বিজেপির মতো একটা ধর্মান্ধ ও মুসলিমহন্তা চরম সন্ত্রাসী দলের সাথে জামায়াতে ইসলামীকে এক করে দেখলেন, তা বোঝার সাধ্য আমার নেই।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া উক্ত সেমিনার উদ্বোধন করেন এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতেই ভারতীয় কংগ্রেস দলের নেতা 'দৈনিক দেশবন্ধু' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী মায়ারাম সজ্জন মুরব্বিয়ানা ভাষায় ভারত বিভাগকে মুসলমানদের মহা ভুল হিসেবে উল্লেখ করে এর প্রতিকারস্বরূপ অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

ভারত বিভাগ না হলে 'বাংলাদেশ' নামের কোনো স্বাধীন দেশের যে জন্ম হতো না এবং বর্তমান বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের একটি প্রদেশ হয়ে থাকত, সেকথা বলার সৎ সাহস কারো হয়নি। 'ভারত বিভাগ করে মুসলমানরা ভুল করেছে' বলার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করার সাহসের প্রতিবাদ করার হিম্মত কারো ছিল না।

ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান কায়েম না হলে বর্তমান বাংলাদেশে মুসলিম নামধারী যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, সচিবালয়ের সেক্রেটারি, বড় বড় ব্যবসায়ী, সশস্ত্র বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার, হাইকোর্টের বিচারপতি ইত্যাদি মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আছেন তারা কি স্বপ্নেও ঐসব পদ দখল করতে সক্ষম হতেন?

মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও নেতাদের চিন্তা-চেতনার এ দুর্দশার কারণ ও প্রতিকার বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

মুমিনের জেলখানা

১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এ পুস্তিকা রচিত হয়। ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হলে ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনো না কোনো সময় গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শাসনামলে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের অনেকেই কারাবরণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতারকৃতরা বিনা বিচারেই জেলে থাকতে বাধ্য হন। সেখানে তাদেরকে কোনো কাজ করতে হয় না বলে ২৪ ঘণ্টার সময়টা কাটানোর জন্য নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী তারা রুটিন বানাতে পারেন। 'মুমিনের জেলখানা' বইটি প্রধানত তাদের জন্যই লেখা হয়েছে।

যারা কোনো অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার হয়, আদালতে তাদের বিচার নিষ্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সময়কালে তারা হাজতী হিসেবে গণ্য। তাদেরকেও কোনো কাজ করতে বাধ্য করা হয় না বিধায় তারাও নিজেদের মর্জিমতোই রুটিন বানাতে পারে।

আদালতের বিচারে যাদের সাজা হয় তাদেরকে কয়েদি বলা হয়। যেসব কয়েদিকে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় তারাও নিজেদের ইচ্ছামতো রুটিন বানাতে পারে। যারা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত তাদেরকে দিনের বেলায় কাজ করতে বাধ্য করা হয়। তারা সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত নিজস্ব রুটিন অনুযায়ী চলতে পারে। কয়েদিদের মধ্যে যারা প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পায় তারাও ২৪ ঘণ্টা নিজের ইচ্ছামতো কাটাতে পারে।

যেকোনো কারণে বা যে অবস্থায়ই কোনো মুমিন জেলখানায় থাকতে বাধ্য হন তিনি জেলজীবনটা কীভাবে কাটালে সবদিক দিয়ে লাভবান হতে পারেন, সে বিষয়েই আমি

বইটিতে আলোচনা করেছি। বইটির দুটো পরিচ্ছেদের শিরোনাম হচ্ছে 'জেলের ফযীলত' ও 'জেলে যা হাসিল করা যায়'। এটা পড়ার পর জেলের ভয় মন থেকে পালাবে। উল্লেখযোগ্য একটি প্যারা হচ্ছে : 'জেলখানার উঁচু দেয়াল যখন আপনজনদেরকে আড়াল করে রাখে, তখন সেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোরই আসা সম্ভব হয় না। সবাইকে হারিয়ে সেখানে একজনকেই কাছে পাওয়া যায়। অগতির গতি, নিরুপায়ের উপায়, নির্জনের বন্ধু, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ও হতাশের আশা হয়ে তিনি বিষণ্ন হৃদয়কে উৎফুল্ল করে দেন।'

মনটাকে কাজ দিন

আমাদের সবারই এ অভিজ্ঞতা আছে যে, আমাদের দেহ যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ে তখনো মন ক্লান্ত হয় না; বরং মন তখন অন্য সময়ের চেয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দেহ যখন ঘুমায় তখনো মন সজাগ থাকে বলে আমরা এত স্বপ্ন দেখি। আমরা যখন মনোযোগ দিয়ে কোনো কাজ করি তখন মন ঐ কাজের সাথে যুক্ত থাকে। যখন মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনি তখন অন্য কোনো ভাব মনে ঢোকার ফাঁক পায় না।

মনটা যখনই খালি থাকে তখনই হাজারো ভালো-মন্দ ভাব মনে ভিড় জমায়। সচেতনভাবে মনকে কাজ না দিলেই সে খালি থাকে। বিখ্যাত প্রবাদ আছে– Empty mind is devil's workshop. অর্থাৎ 'খালি মন শয়তানের কারখানা'। আমরা সবাই এ তিক্ত অভিজ্ঞতা রাখি। নামাযরত অবস্থায় মুখে সূরা, তাসবীহ ও দোআ পড়ার সময় কতই না বেহুদা ভাব মনে আসে! নামায শেখানোর সময় রুকূ'-সিজদা ইত্যাদি কীভাবে আদায় করতে হবে এবং কখন মুখে কী উচ্চারণ করতে হবে, তা অতি যত্নের সাথে শেখানো হয়। কিন্তু নামাযের মধ্যে বিভিন্ন সময় ও অবস্থায় মনে কী ভাবতে হবে, তা শেখানো হয় না। অর্থাৎ নামাযের সময় মনটাকে কোনো কাজ না দিয়ে বেকার রাখা হয়। তখন শয়তান মনকে নামাযের বাইরে নিয়ে যায়। দেহ মসজিদে সিজদারত থাকলেও মন হয়তো বাজারে ঘুরছে।

এ অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মনটাকে কখনো খালি রাখা উচিত নয়। সে যখন কাজ ছাড়া থাকতেই পারে না, তখন সচেতনভাবে তাকে সবসময় কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে হবে। তা না হলে শয়তান তাকে বেকার খাটাবে, যার কোনো ভালো ফল হতে পারে না।

'মনটাকে কাজ দিন' বইটি লেখার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। জেলে কেমন করে বইটি লেখার প্রয়োজনবোধ হলো, তা বইটির 'ভূমিকা' থেকে তুলে ধরছি :

"ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের '২৬ সেল' নামক ১২ কামরাবিশিষ্ট দীর্ঘ দালানের এক নম্বর কামরায় আমার ১৬ মাসের জেলজীবন কাটিয়েছি। দিনের বেলা আমার কামরার সামনে নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে একজন সিপাই সবসময় ডিউটিরত থাকত। সকাল ৬টা থেকে থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পালাক্রমে দুজন সিপাই ৬ ঘণ্টা করে অবস্থান করত। রাতে প্রত্যেককে ৩ ঘণ্টা করে ডিউটি করতে হতো।

দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা সময় তাদের যেভাবে কাটত তা দেখে আমার মায়াই লাগত। কখনো একটু পায়চারি করে, কখনো বারান্দার লোহার সিক ধরে দাঁড়িয়ে, একসময় দেয়ালে হেলান দিয়ে, মাঝেমধ্যে বসে একটু ঝিমিয়ে কোনো রকমে সময়টা পার করতে হতো। ২৬ সেলের চাবির ছড়া হাতে ডিউটিরত অপর একজন সিপাইর সাথে গেটের সিঁড়িতে বসে আলাপ করলে তার সময়টা ভালোই কাটত বলে মনে হয়েছে। আমি আলাপ করলে ঐ সিপাই খুব খুশি হতো।

ঐ এলাকার জমাদারকে এ দুজন সিপাইর সাথে গল্পরত অবস্থায় দেখলে আমি কয়েকজনকে একসাথে পেয়ে জিজ্ঞেস করতাম, 'আপনারা ডিউটিতে থাকাকালে শরীরটা তো দাঁড়িয়ে, বসে বা হেঁটে সময় কাটায়; কিন্তু মনটা এ সময় কোথায় থাকে এবং কী করে?' প্রশ্ন শুনে একে অপরের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে আমার দিকে অসহায় চোখে তাকালে আবার ঐ প্রশ্নই করতাম। তখন একটু ভেবে তারা বলত, 'মনে হাজারো চিন্তা-ভাবনা তোলপাড় করতে থাকে– পারিবারিক বিষয়, চাকরিতে সমস্যা, অভাব-অনটন নিয়ে দুশ্চিন্তা, আজেবাজে কত কথা যে মনে জাগে এর কি কোনো হিসাব থাকে?' তখন আমি আবার প্রশ্ন করতাম, 'আচ্ছা, এসব ভাবনা-চিন্তা কি নিজে নিজেই এসে ভিড় জমায়, না সচেতনভাবে একটা একটা করে বিষয় নিয়ে ভাবেন?' একটু হেসে তারা জবাব দিত, 'এর কোনো ঠিকানা নেই। কখন যে কোন্ কথা মনে হাজির হয়ে যায় তা টেরও পাওয়া যায় না।'

মূলত, এদের কথা বিবেচনা করেই আমার মনে খেয়াল আসল, মনটাকে সচেতনভাবে কাজ না দিলে শয়তান সহজেই খালি মনটাকে দখল করে বসে। শুধু পুলিশ, সিপাই, দারোয়ানের বেলায় নয়, সবার বেলায়ই এ কথা সত্য। তাই মনটাকে কাজ দেওয়ার গুরুত্ব অনুভব করেই পুস্তিকাটি রচনা করা হয়।"

আল্লাহর দরবারে ধরনা

রাসূল (স) বলেছেন, 'দোআ ইবাদতের মগজ।' আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দাহর সবচেয়ে আবেগময় প্রকাশই হলো দোআ। আর কে আছে, যার কাছে সবকিছু চাওয়া যায়? সবার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে যার কাছে ধরনা দেওয়া হয় তিনিই তো আল্লাহ।

ছোট সময় থেকেই দাদার কাছে আমার দোআ জানা শুরু হয়। তাবলীগ জামায়াতের চিল্লায় আরো অনেক দোআ শিখলাম। অনেকেই শেখা দোআও যথাস্থানে পড়তে অভ্যস্ত নয়। তাবলীগে দোআ প্র্যাকটিস করানো হয়। আইএ পড়ার সময় সহপাঠী বন্ধু মসিহুর রহমানকে (পরে ভগ্নিপতি) মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর 'মুনাজাতে মকবুল' ওযীফা হিসেবে নিয়মিত পড়তে দেখে আমিও তা জোগাড় করলাম। 'মুনাজাতে মকবুল' কুরআন ও হাদীসের দোআর সংকলন। আমি মাওলানা থানভী (র)-এর ওয়াজের বাংলা অনুবাদের খুব ভক্ত ছিলাম স্কুলজীবন থেকেই। আমি বেশ কিছুদিন ওযীফার মতো পড়েছি। পরে দোআ বাছাই করে মুখস্থ করা প্রয়োজন মনে করলাম। এভাবে বেশসংখ্যক দোআ শেখা হয়ে গেল।

বেশসংখ্যক দোআ মুখস্থ করা হয়ে গেছে; কিন্তু দোআ করার সময় অনেক দোআই স্মরণে আসে না। শেখা দোআ সবগুলোই আমলে আনার জন্য কী করা যায়, সে বিষয়ে ভাবতে লাগলাম। জেলের প্রচুর অবসরে এ বিষয়ে ভাবতে ভাবতে ফর্মুলা পেয়ে গেলাম। দোআগুলোকে বিষয়ভিত্তিক সাজিয়ে নিলে দোআ করার সময় কোনো বিষয়ের তালিকার দোআগুলো আলাদাভাবে মনে আসবে। যেমন– আল্লাহর সাথে মহব্বত সংক্রান্ত দোআ ৩টি, পিতামাতা ও সন্তানদের ব্যাপারে ৩টি, ঈমান সম্বন্ধে ৫টি, ইলম সম্পর্কে ৩টি, আমল সম্পর্কে ৩টি, মাগফিরাত সম্পর্কে ৩টি, আখিরাত সম্পর্কে ৩টি, আশ্রয় চাওয়া (তাআউয) সম্পর্কে ৫টি, ইলতিমাস (কাতর আবেদন) সম্পর্কে ৭টি, মৃতদের জন্য মাফ চাওয়া সম্পর্কে ২টি, ইসলামবিরোধীদের ব্যাপারে ৪টি। এ ব্যবস্থা করায় যে বিষয়কে কেন্দ্র করে দোআ করতে চাই, সে বিষয়ের দোআগুলো সহজেই মনে এসে যায়।

দ্বিতীয় ফর্মুলা অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তাহাজ্জুদের প্রতি ওয়াক্তে ৩ থেকে ৫টি দোআ নির্দিষ্ট করে নিয়ে পড়েছিলাম। এভাবে ভাগ করে নেওয়ার ফলে দোআগুলো প্র্যাকটিসে আনা সহজ হয়ে গেল। তা ছাড়া সকাল-সন্ধ্যা ও ঘুমের সময়ের দোআ নির্দিষ্ট করে নিলাম।

১৯৯২ সালের নভেম্বরে ভাবলাম, দোআগুলো এভাবে সাজিয়ে বই আকারে প্রকাশ করা হলে ইসলামী আন্দোলনে আমার প্রিয় দীনী ভাই-বোনেরাও এভাবে প্র্যাকটিস করা পছন্দ করতে পারেন। এ উদ্দেশ্যে জেলখানায় দোআগুলোর সংকলন 'আল্লাহর দরবারে ধরনা' নামে প্রস্তুত করা হয়। দোআর সংকলন ছাড়াও দোআ সংক্রান্ত অনেক কথা বিভিন্ন শিরোনামে রচনা করি। যেমন– আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও দোআ, দোআ সম্পর্কে জরুরি কথা, কাদের দোআ কবুল হয়, দোআপ্রার্থীর মানসিক অবস্থা, তাহাজ্জুদের গুরুত্ব, দরূদ শরীফ, নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় দোআ ইত্যাদি।

বইটির ভূমিকায় 'প্রসঙ্গ কথা' শিরোনামে নিম্নরূপ বক্তব্য রয়েছে :

"ধরনা মানে নাছোড়বান্দা হয়ে আবদার জানাতে থাকা। অভিধানে ধরনা শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'কারো দুয়ারে অনশনে পড়ে থেকে দাবি আদায়ের চেষ্টা'। এতে বিদ্রোহ নেই; এর মাধ্যমে আত্মসমর্পণের মনোভাবই প্রকাশ পায়। চাপ সৃষ্টি করে নয়, স্নেহ-অধিকার প্রয়োগ করে বাসনা পূরণের চেষ্টা। শিশু মায়ের কাছে যে বায়না ধরে, এর সাথে আল্লাহর কাছে ধরনার তুলনা করা যায়। মায়ের তো সব আবদার পূরণের ক্ষমতা নেই। কিন্তু আল্লাহর সে দুর্বলতা নেই বলে তাঁর দরবারে ধরনা দিতে অবহেলা করা বোকামি।

আল্লাহর কাছে ধরনা দেওয়ার মতো সম্পর্ক সৃষ্টি না করলে প্রাণবন্ত ধরনা হতে পারে না। সূরা ফাতিহার ৪ নং আয়াত 'আমি শুধু তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই' থেকে ঐ সম্পর্কের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একমাত্র আল্লাহর দাসত্বে নিবেদিত হলেই তাঁর নিকট সাহায্যের জন্য ধরনা দেওয়ার মতো সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে।

যে নিজের জীবনকে ইকামাতে দীনের জন্য কুরবান করতে প্রস্তুত হয়ে আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদে লিপ্ত, তার জন্য তো ধরনা দেওয়ার জায়গা একটাই। অন্য সব শক্তি ও আশ্রয় থেকে মুখ ফেরাতে পারলেই আল্লাহর দরবারে ধরনা দেওয়ার

যোগ্যতা লাভ করা যায়। দুনিয়ার সবাই যদি শত্রু হয়ে যায় তবুও তার কোনো পরোয়া হয় না। কারণ, সে যে আসল শক্তির নাগাল পেয়ে গেছে। তাঁকে ছাড়া সে কাউকেই ভয় পায় না। তাঁর চেয়ে বেশি সে কাউকেই ভালোবাসে না।

এ মনোভাব যার নেই, ইসলামী আন্দোলনের কঠিন পথে সে কেমন করে টিকবে? সকল বাতিল শক্তির মোকাবিলায় এ পথে মযবুত হয়ে এগিয়ে চলার সাধ্য শুধু তারই হতে পারে, যে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার জন্য লালায়িত। মনের এ অবস্থা যার, সে সব কিছুর জন্য শুধু আল্লাহর দরবারেই ধরনা দেয়। সেখান থেকেই সে শক্তি সংগ্রহ করে। ঐ অফুরন্ত শক্তির উৎসের নাগাল পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর সাথে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন, সেজন্যও মনিবের দরবারেই ধরনা দিতে হয়।"

২৫৮.

ইসলামী আন্দোলন : কর্মীদের সহীহ্ জযবা

আমি জেলে যাওয়ার পূর্বে এ বইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে 'ইসলামী আন্দোলন : কর্মীদের ৭ দফা' নামে এটা প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুভব করলাম, 'কর্মীদের সহীহ জযবা' শিরোনামই অধিকতর উপযোগী। ঐ বছরই কারাগারে আটকাবস্থায় নতুন শিরোনামে বইটি সাজানোর জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া সম্ভব হয়।

১৯৯১ সাল থেকেই কর্মী সম্মেলনে এ বিষয়ে বক্তব্য রাখছিলাম। ১৯৯২ সালের মার্চে কারাবন্দী হওয়ার ফলে কর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। জেলখানায় বন্দী হয়ে যাওয়ার পর আমি মনে মনে গুমরে মরছিলাম যে, আন্দোলনের প্রধান দায়িত্ব আমার উপর থাকা সত্ত্বেও বিরাট কর্মীবাহিনীকে আমি যা বলতে চাই তা পৌঁছাতে পারছি না। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি কারাগারে আটক থাকলেও আমার বক্তব্য লিখিত আকারে বাইরে পাঠিয়ে দেব, যাতে কর্মীদের কাছে পৌঁছে যায়। তাহলে আমি কিছুটা সান্ত্বনা পাব। ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে নিজের মুখে এ কথাগুলো আল্লাহর পথের মুজাহিদদের শোনাতে পারলে যে তৃপ্তি পেতাম তা থেকে বঞ্চিত থাকলেও অন্তত আমার বক্তব্য তাদের কাছে পৌঁছে যাবে– এ আশায় কলম ধরলাম।

আলহামদু লিল্লাহ! '৯২-এর মে মাসেই আমার লেখাটি তৈরি হয়ে যায়। আমি বন্দীদশায় থাকলেও আমার বক্তব্য মুক্ত ময়দানে পৌঁছে গেল এবং জুলাই মাসেই মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হলো। আমি জেলে থাকা অবস্থায়ই '৯৩-এর মে মাসে এর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়ে গেল।

বইটিতে নিম্নলিখিত ৬টি জযবা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

১. আল্লাহর প্রতি শুকরিয়ার জযবা,
২. সহীহ্ নিয়তের জযবা,

৩. বেহেশতে যাওয়ার জযবা,
৪. আল্লাহর গোলাম হওয়ার জযবা,
৫. আল্লাহর খলীফা হওয়ার জযবা,
৬. আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার জযবা।

আমার ধারণা, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে এ কয়েকটি জযবা সৃষ্টি করতে পারলে 'আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন' কায়েমের উদ্দেশ্যে লোক তৈরির গতি দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

দেশ গড়ার ডাক

এ বইয়ের ভূমিকা উদ্ধৃত করছি, যাতে অল্প কথায়ই স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় :

"১৯৯২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৯৩ সালের ১৫ জুলাই পর্যন্ত প্রায় ১৬ মাস ঢাকা কেন্দ্রীয় কারগারে অবস্থানকালে আমার প্রিয় জন্মভূমির উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সার্বিক কল্যাণ চিন্তা করা ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব ছিল না। জেলখানার বাইরে কখনো একসাথে এতটা সময় চিন্তা-ভাবনা করার জন্য পাওয়া যায় না। এ দুর্লভ অবকাশে লেখা-পড়ারও প্রচুর সুযোগ পাওয়া গেল।

কীভাবে এ দেশকে গড়ে তোলা যায়, এ বিষয়ে আমার চিন্তার নগণ্য ফসলটুকু দেশবাসীর নিকট পরিবেশনের উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে 'দেশ গড়ার ডাক' শিরোনামে এ লেখা রচনা করি।

কারাগার থেকে মুক্তির পর ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে দৈনিক সংগ্রামের উপ-সম্পাদকীয় কলামে চার কিস্তিতে লেখাটি প্রকাশিত হয়। এখন তা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হলো। এ পুস্তিকায় দেশ গড়ার ব্যাপারে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আকুল আবেদন জানানো হয়েছে। দেশ গড়ায় সকল মহলেরই অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার দায়িত্ব রয়েছে। অবশ্য রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। তাই এ পুস্তিকায় তাদের প্রতি আবেদনটি শামিল করা প্রয়োজন বোধ করেছি।"

আমাদের দেশে নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় ১৯৯১, '৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলে ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার সুযোগ নেই। তারা মেয়াদশেষে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য। নির্বাচনে জনগণ যে দল বা জোটকে ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগ দেয়, তারাই শুধু সরকার গঠন করতে পারে।

এমন চমৎকার নির্বাচনপদ্ধতির প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বজনীন গণতান্ত্রিক রাজনীতি এ দেশে এখনো চালু হয়নি। এর আসল কারণই হলো দেশ গড়ার রাজনীতির অভাব। যে রাজনীতি চালু আছে তা শুধু ক্ষমতার রাজনীতি। যেমন করেই হোক, ক্ষমতায় যেতে হবে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ী না হলে কিছুতেই ফলাফল মেনে নিতে চায় না। গত তিনটি নির্বাচনই নিরপেক্ষ ও অবাধ হয়েছে বলে দেশে স্বীকৃত ও বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে; কিন্তু '৯৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার কারণে আপত্তি না তুললেও '৯১ ও ২০০১ সালের নির্বাচনকে নিরপেক্ষ বলে তারা স্বীকার করেনি।

২০০১ সালের নির্বাচনে চারদলীয় জোট দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে। আওয়ামী লীগ শুরু থেকেই পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সরকারের পদত্যাগের দাবি করে আসছে। তারা সরকার পতনের আন্দোলন করে পতনের দিন-তারিখ পর্যন্ত ঘোষণা করেছে; গণ-আন্দোলন করে সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার ঘোষণা দিচ্ছে; কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কার দাবি করে হুমকি দিচ্ছে যে, এ দাবি না মানলে নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না; জোর করে সংস্কার প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য করারও হুমকি দিচ্ছে। দুনিয়ার কোথাও এ জাতীয় রাজনীতি আছে বলে আমার জানা নেই। মনে হয় তারা গণতন্ত্রের ভাষা জানেই না।

দেশ গড়ার প্রধান দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের। গণতান্ত্রিক দেশে সরকার পরিচালনার সুযোগ রাজনৈতিক দলকেই দেওয়া হয়। 'দেশ গড়ার ডাক' বইয়ে আমি অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনার পর রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি নিম্নরূপ আকুল আবেদন জানিয়েছি :

"১. আসুন, আমরা সবাই এ বিষয়ে একমত হই যে, গত '৯১-এর নির্বাচনের মতো প্রতিটি নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অবাধ হওয়ার নিশ্চয়তাবিধানের উদ্দেশ্যে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করি। (১৯৯৬ সালে তা করা হয়েছে)

২. আসুন, আমরা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিক্ষোভ মার্কা রাজনীতি (Agitational Politics)-এর বদলে গঠনমূলক রাজনীতি (Constructive Politics) দেশে চালু করি। কথায় কথায় হরতাল, ঘন ঘন হরতাল, গাড়ি ভাঙচুর ও পেশিশক্তি প্রয়োগের রাজনীতির অবসান হওয়া প্রয়োজন। আমাদের গরীব দেশ এ জাতীয় রাজনীতির ধাক্কা সামলাতে অক্ষম।

৩. যেহেতু কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকলে কোনো দলীয় সরকারই অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার সুযোগ পাবে না, সেহেতু নির্বাচিত সরকারকে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত দেশ পরিচালনার অধিকার দিতে হবে। সরকারের ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়া ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার সাথে সাথে দেশ গড়ার ব্যাপারে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে জনমত গঠনের দায়িত্ব বলিষ্ঠভাবে পালন করতে থাকাই বিরোধী দলের দায়িত্ব।

   সরকার পরিবর্তনের জন্য নির্বাচনকেই একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। অন্য উপায়ে সরকার পতনের চেষ্টা করা হলে সরকার গদি রক্ষায়ই মেধা, সময় ও শ্রম ব্যয় করতে বাধ্য হয়; দেশের কাজ করার ফুরসত পাবে কোথায়?

৪. উল্লেখযোগ্য দলগুলোর নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক আরচণবিধি প্রণয়ন করে তা মেনে চলার জন্য প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন। গণতন্ত্রকে স্থায়ীভাবে বহাল রাখার জন্য এটা অপরিহার্য।

৫. কোনো ব্যক্তিকে দলের স্থায়ী আদর্শের মর্যাদা দেওয়া গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশের পরিপন্থী। রাজনৈতিক দর্শন, দলীয় কর্মসূচি ও নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোকেই দলীয় আদর্শ হিসেবে জনগণের নিকট পেশ করা উচিত। কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে দলের

আদর্শ মেনে নিলে সে দলের নেতৃত্ব যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারণের পরিবর্তে উত্তরাধিকারের ভিত্তিতেই নির্দিষ্ট হতে বাধ্য।

৬. সকল দলের নিকটই আমি বিশেষ আবেদন জানাচ্ছি যে, ইসলামী জীবনবিধানকে দলীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা যায় কি না, তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করুন। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় যারা 'নৌকার মালিক তুই আল্লাহ' এবং 'ধানের শীষে বিসমিল্লাহ' শ্লোগান দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন, তারা নিশ্চয়ই কুরআনকে আল্লাহর বাণী এবং রাসূল (স)-কে আদর্শ মানব বলে বিশ্বাস করেন। তাহলে কুরআনের আইন ও রাসূল (স)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে বাধা কোথায়?

গণতন্ত্রের স্বার্থেই এ বিষয়টা বিবেচনার দাবি রাখে। কুরআনকে উৎখাত করার কোনো উপায় নেই বলে এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধান দেশে কায়েমের আন্দোলনকে নির্মূল করার সাধ্যও কারো নেই। রাজনৈতিক অঙ্গনকে আদর্শিক সংঘাত থেকে রক্ষা করতে না পারলে গণতন্ত্রের বিকাশ অসম্ভব। তাই 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে', 'ধর্মকে রাজনৈতিক ময়দানে আনা চলবে না', 'মসজিদে রাজনৈতিক কথা বলতে দেওয়া হবে না' ইত্যাদি সন্ত্রাসী ভাষা ব্যবহার না করে ইসলামকে জীবনবিধান হিসেবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলো ইসলামী আদর্শের ধারক না হওয়া পর্যন্ত আদর্শিক সংকট দূর হবে না।"

রাজনৈতিক দল ছাড়া আরো ১৩টি মহলকে সম্বোধন করে বইটিতে তাদের উপযোগী ভাষায় দেশ গড়ার ব্যাপারে আহ্বান জানানো হয়েছে। মহলগুলো হলো :

১. ওলামা-মাশায়েখ ২. ছাত্রসমাজ ৩. মহিলা মহল ৪. অমুসলিম নাগরিক ৫. শ্রমজীবী মহল ৬. শিক্ষকসমাজ ৭. আইনজীবীগণ ৮. সাংবাদিক মহল ৯. ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ ১০. ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য পেশাজীবী ১১. বামপন্থি মহল ১২. ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী মহল ১৩. মুসলিম জনগণ।

৬৪ পৃষ্ঠার এ বই সকল মহলে পৌছাতে পারলে দেশ গড়ার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, দেশের রাজনীতি এখনো প্রকৃতপক্ষে দেশগড়ামুখী হয়ে ওঠেনি; ক্ষমতার রাজনীতিই চালু আছে। বইটি রাজনৈতিক দলের দায়িত্বশীলগণের নিকট পৌছানো একান্ত প্রয়োজন।

স্টাডি সার্কেল

সাত বছর বাধ্য হয়ে বিদেশে অবস্থান করে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে দেশে আসার পরপরই ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের নিয়ে কয়েকটি স্টাডি সার্কেল (পাঠচক্র) পরিচালনা শুরু করি। প্রথমে জামায়াতের মহিলা বিভাগ ও ইসলামী ছাত্রীসংস্থার দায়িত্ব যাদের উপর ছিল, তাদেরকে নিয়েই শুরু হয়। মহিলা মহলে পাকিস্তান আমলে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরুই হয়নি বলা চলে। তাই আমি নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন কিছুসংখ্যক মহিলা ও নবগঠিত ইসলামী ছাত্রীসংস্থার নেত্রীবৃন্দকে নিয়ে

'স্টাডি সার্কেল' নামে তারবিয়াতী কর্মসূচি গ্রহণ করি; ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, ইসলামী সংগঠনের কর্মনীতি, রাসূল (স)-এর ব্যক্তি গঠনপদ্ধতি, ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধান ইত্যাদি বিষয়ে সিনপসিস আকারে পয়েন্টগুলো সাজিয়ে সবাইকে দিয়ে দিই। একটি সিনপসিসের বিষয় সম্পর্কে অধ্যয়নের জন্য এক বা একাধিক বই পড়ার পরামর্শ দিই; আলোচনার পর ঐ বিষয়ে কোনো দিক দিয়ে অস্পষ্টতা থাকলে তা প্রকাশ করার সুযোগ দিয়ে যেকোনো বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নেওয়ার ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহ দিতে থাকি।

ক্রমে ক্রমে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের দায়িত্বশীলদেরকে নিয়েও স্টাডি সার্কেল চালু করা হয়। আমার ও তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঈমানিয়াত, কুরআন অধ্যয়ন, ইসলামী জীবনবিধান, ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী সংগঠন, ইসলামী বিপ্লব, জামায়াতে ইসলামীর চিন্তাধারা, রাজনৈতিক গতিধারা, তারবিয়াতপদ্ধতি, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বিধান, সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা ইত্যাদি শিরোনামের অধীনে আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এসব বিষয়ে সিনপসিস রচনা চলতে থাকে।

১৯৯২ সালে কারাগারে প্রচুর অবসর পেয়ে ২৭টি বিষয়ে সিনপসিস তৈরি করি। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর স্টাডি সার্কেলে এগুলো ব্যবহার করতে গিয়ে আরো সংশোধন হতে থাকে। ১৯৯৯ সাল থেকে নেতৃস্থানীয়দের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে আরো ১০/১২টি বিষয়ে সিনপসিস রচনা করি। বইটির সর্বশেষ সংস্করণে ২২৩ পৃষ্ঠায় মোট ৫২টি সিনপসিস প্রকাশিত হয়।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, পুরুষ-মহিলা ও ছাত্রছাত্রীসহ সকল মহলেই এবং কেন্দ্র থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনে অগ্রসর কর্মীদের মধ্যে স্টাডি সার্কেলের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে।

যারা স্টাডি সার্কেল পরিচালনা করেন তাদের জন্য বইটি অত্যন্ত সহায়ক বিবেচনা করা হয় জেনে আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করছি; প্রতিটি সিনপসিসের বিষয় বোঝানোর ও বোঝার সুবিধার জন্য সংশ্লিষ্ট বইয়ের রেফারেন্স দিয়েছি। স্টাডি সার্কেল যারা পরিচালনা করেন তারাই জ্ঞান ও চিন্তার দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি লাভবান হন। জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা যত বেশি করা হয় ততই তা বৃদ্ধি পায়।

এসব সিনপসিসের প্রত্যেকটি বিষয়ে একেকটি বই লেখা যায়। এ পর্যন্ত 'ইসলাম ও দর্শন', 'মযবুত ঈমান', 'জীবন্ত নামায', 'খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব', 'ইসলামী আন্দোলন : কর্মীদের সহীহ জযবা', 'ইকামাতে দীন ও খিদমতে দীনে পার্থক্য', 'বাইয়াতের হাকীকত' ও 'রুকনিয়াতের আসল চেতনা' পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। 'কুরআন বোঝা সহজ' বইটিতে কুরআন সম্পর্কিত কয়েকটি সিনপসিসের আলোচনা এসে গেছে। 'কুরআনের মযলুম রুকু' নামের সিনপসিস সম্পর্কে জেলে থাকাকালেই 'আদম সৃষ্টির হাকীকত' নামের বইটি লেখা হয়। সম্ভব হলে অন্যান্য সিনপসিস নিয়েও বই লেখার ইচ্ছে আছে।

জেলের অধিবাসীদের বিবরণ

যারা জেলে বন্দী হিসেবে থাকে তারা ছাড়াও জেলে বাইরে থেকে এসে যারা কর্মরত হয় তাদেরকেও আমি জেলের অধিবাসী হিসেবে গণ্য করছি।

বন্দীদের কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

১. রাজবন্দী– যারা রাজনৈতিক কারণে বিনা বিচারে আটক।

২. হাজতি– যাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে; এরা কয়েদি নয়।

৩. কয়েদি– বিচারে আদালত থেকে যারা সাজাপ্রাপ্ত।

সাজাপ্রাপ্তদেরও কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

ক. বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত– তাদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার কারণে যারা ডিভিশন পায় তারা প্রথম শ্রেণীর কয়েদি। যারা ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত না হয়ে সিভিল কোর্টে সাজাপ্রাপ্ত, তারা ডিভিশন না পেলেও বিনাশ্রম কয়েদি। তাদেরকে কোনো কাজ করতে বাধ্য করা যায় না।

খ. সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত– জেল কর্তৃপক্ষ তাদের দিয়ে কাজ করায়। তাদের মধ্যে যারা ম্যাট্রিক, আইএ, বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অর্থাৎ শিক্ষিত, তাদের শ্রমিক হিসেবে কাজ দেওয়া হয় না। লেখা-পড়ার কাজই তাদেরকে দেওয়া হয়। অফিসে কেরানির কাজ, লাইব্রেরিতে বই বিতরণ, জেল হাসপাতালের বিভিন্ন কাজ, জেলে সব রকমের হিসাবের কাজ ইত্যাদিতে তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। যারা শিক্ষিত নয় তাদের শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন কাজ দেওয়া হয়।

গ. কয়েদিদের মধ্যে যারা ফাঁসির আসামি তাদেরকে সবসময় তাদের জন্য বরাদ্দকৃত নির্দিষ্ট সেলে আটক রাখা হয়।

ঘ. কয়েদিদের মধ্যে যারা দুর্ধর্ষ তাদের পায়ে লোহার শিকল লাগিয়ে রাখা হয়।

৪. জেলপুলিশ– এদেরকে জেলওয়ার্ডেন বলা হয়। এটাই অফিসের ভাষা। কয়েদিরা তাদেরকে 'মিয়া সাহেব' বলে। তাদেরকে পাহারার কাজে ব্যবহার করা হয়।

৫. জেলার, ডেপুটি জেলার ও হাসপাতালের ডাক্তার– সাত-আট জন ডেপুটি জেলার ও তিনজন ডাক্তারের মধ্যে মহিলা কয়েদি ও হাজতিদের জন্য একজন মহিলা থাকেন।

৬. ডিআইজি– ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল। ইনিই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান কর্মকর্তা। আইজি (ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন) সারা দেশের সকল কারাগারের প্রধান কর্মকর্তা। ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী ও যশোরে কেন্দ্রীয় কারাগার রয়েছে। প্রত্যেক জেলায়ই কারাগার আছে। কেন্দ্রীয় কারাগারে জেলা কারাগার থেকে বিশেষ ধরনের কয়েদিদের পাঠানো হয়। বিশেষ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের জেলায় রাখা হয় না।

কর্মকর্তাদের সাথে আমার সম্পর্ক

আমি জেলে প্রবেশকালে ডিআইজি ছিলেন আমিনুর রহমান। কয়েক মাস পর তিনি রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বদলি হন। প্রমোশন নিয়ে লিয়াকত আলী খান এ পদে আসেন। কয়েক দিন পরপরই তারা পরিদর্শনে আসতেন। তাদের সাথে সৌজন্যসুলভ কথা হতো। কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন; কোনো অসুবিধা আছে কি না জানতে চাইতেন। কোনো প্রয়োজন হলে আমি নোট লিখে হাবিলদারের মাধ্যমে পাঠাতাম। সর্বোপরি তাদের সাথে সুসম্পর্কই ছিল।

লিয়াকত আলী খান বেশ কম বয়সেই ডিআইজি হন। ১৯৭৪ সালে যুবলীগ নেতা হিসেবে তিনি সরাসরি ডেপুটি জেলার নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমার রুম থেকে জানালা দিয়ে ২৬ সেলে প্রবেশপথের গেট দেখা যেত। একদিন দেখা গেল, ডিআইজি সাহেব তার পিতার বয়সী জেলের সুবেদারকে রাগ করে জঘন্য ভাষায় গালাগালি করছেন। আমি তাকে উপদেশমূলক চিঠি লিখলাম। তার চাকরিজীবনের উন্নতি কামনা করে লিখলাম, 'আপনার কল্যাণকামী হিসেবে বলছি, আপনার অধীন যেকোনো কর্মচারীকে কোনো অপরাধের কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করার ক্ষমতা আপনার হাতে আছে। ভদ্র ব্যবহারের মাধ্যমে শাস্তি দিলে অপরাধীর মনে শাস্তিদাতার প্রতি শ্রদ্ধা থাকে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে দুর্ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন হয় না। কয়েকজন পুলিশ, জেলার ও ডেপুটি জেলারের উপস্থিতিতে আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড় একজন কর্মচারীকে যেভাবে ভর্ৎসনা করতে আপনাকে দেখলাম তা আপনার মতো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির জন্য মোটেই মানায় না।' পরবর্তী সময়ে তার দু-একটি আচরণে আমার উপর তিনি সন্তুষ্ট নন বলে টের পেলাম। তবুও বিদায়ের দিন তিনি আমাকে ভালোভাবেই বিদায় দিলেন।

আইজি সাহেবের সাথে সম্পর্ক হওয়ার সুযোগ হয়নি। ১৬ মাস জেলে থাকাকালে দু-একবারের বেশি তার সাথে দেখা হয়নি। কর্মকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল একজন ডেপুটি জেলারের সাথে, যিনি ২৬ সেলের দায়িত্বে ছিলেন। আমার নাগরিকত্ব মামলায় বিচারপতি আনওয়ারুল হক চৌধুরীকে তৃতীয় বিচারক নিয়োগের খবর পত্রিকায় দেখে তিনিই এসে খুশির সাথে খবর দিলেন যে, এ লোকের নিকট সুবিচার পাবেন। জেলার সাহেবের সাথে ঘন ঘন দেখা না হলেও তার পরম দরদি মনের পরিচয় আগেই দিয়েছি। আমি জেলে থাকাকালেই তিনি সিলেটে বদলি হন। এ খবর সিলেটের জেলা আমীরকে দেওয়া হয়, যাতে তিনি তার সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি যোগাযোগ করলে জেলার সাহেব অত্যন্ত খুশি হন।

আতর হুযূর

ডিআইজি থেকে শুরু করে সাধারণ জেলপুলিশ পর্যন্ত যার সাথেই দেখা হতো তাকেই আমি আতর লাগিয়ে দিতাম। এটা আমার দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। আমার কাছে যে-ই আসেন তাকে আতর দিয়ে অভ্যর্থনা জানাই। কয়েদিদের মধ্যে কেউ আমার নিকট এলে তাকেও লাগিয়ে দিতাম। আমার সেলের সামনে শুধু আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য যে

পুলিশ আসত, সে এসেই সালাম দিত। তাকে আতর লাগিয়ে দিলে খুশি হয়ে বারবার হাত নাকে লাগিয়ে আমার দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকাত।

কয়েদিদের মধ্যে যাকে আমার খাদেম হিসেবে দেওয়া হয়েছিল সে-ই আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিল। জেলের পরিভাষায় তাদেরকে 'ফালতু' বলা হয়। সকালে নাশতার সময় থেকে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত সে আমার কাছেই থাকত। সে আমার বেতনধারী কর্মচারী নয়, অথচ ব্যক্তিগত কর্মচারীর দায়িত্বই সে পালন করত। সে সযত্নে আমার সেবা করত। আমি তার সাথে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ আচরণ করতাম। আমার খাবারের বড় অংশই সে খেত। কারণ, আমি পরিমাণে কমই খেতাম।

প্রথম ফালতু তিন-চার মাস পর সাজার মেয়াদ মাসখানেক বাকি থাকতে তার নিজ জেলা ফরিদপুরে বদলি হয়ে যায়। এক মাস পরে মুক্তি পাওয়ার খুশি নিয়ে সে বিদায় হয়ে গেল।

সকালে-বিকেলে আমি বাগানে ব্যায়াম করি; কখনো দৌড়াই; গেটের পুলিশ ও জেলখানার দেয়ালের পাহারাদার পুলিশের সাথে দেখা হলে তাদেরকে আতর দিই; বাগানে কাজ করার জন্য যে কয়েদিরা আসে তাদেরকে ডেকে এনে আতর লাগিয়ে দিই। ধোপার কাজ, নাপিতের কাজে যারাই আসে তারা সবাই কয়েদি। সবাই আতর পেলে অত্যন্ত খুশি হয়। এরা জেলের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আসে। তাদের মাধ্যমে জেলে প্রায় সব কয়েদির নিকট আমার পরিচয় হয়ে গেল 'আতর হুযূর' হিসেবে।

২৬ সেল এলাকায়ই এখানকার বন্দীদের খাবার প্রস্তুত করার জন্য পাকঘর ছিল। বাবুর্চি ম্যাট্রিক পাস এক যুবক ছিল। তার সহকারী দুজন কয়েদি ছিল। ওরা তো নিয়মিতই আতর পেত। বাবুর্চি খুবই ভদ্র ঘরের ছেলে বলে বোঝা যেত। ওর জন্য আমার খুব মায়া লাগত। কারণ, সে বিনা অপরাধে কারাদণ্ডে ভুগতেছিল। তার এক বন্ধু একটা অবৈধ পিস্তল তার ঘরে রেখে গেলে পুলিশ এসে অস্ত্র পেয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসে। অস্ত্রটা কার, তা সে প্রকাশ করেনি। করলে তার বন্ধু গ্রেফতার হয়ে যাবে বিধায় সে বন্ধুকে বাঁচিয়ে দিল এবং নিজে সাজা খাটল।

আমার প্রিয় ফালতু

আমার প্রথম ফালতু চলে যাবে বলে যখন জানা গেল তখনই সুবেদার সাহেব আমাকে জানালেন, জেলখানার মধ্যে সবচেয়ে ভালো কয়েদিদের একজনকে আপনার খাদেম হিসেবে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। সে অনেক দিন জেলে থাকবে। একটানা আপনার খিদমতের জন্য আমি তাকে বাছাই করেছি। তার নামটা ভুলে গেলাম। সে পূর্ণ এক বছর আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও মহব্বতের সাথে আমার সন্তোষজনক খিদমত করেছে। সে ভদ্রঘরের সন্তান; বয়স চল্লিশের মতো; লেখাপড়া জানে না; আরব দেশে চাকরি করত; দেশে ফিরে আসার সময় কয়েক ভরি সোনা এনেছিল; বিমানবন্দরে ধরা খেয়ে মামলায় পড়ে তিন বছরের সাজা হয়।

তার বাড়ি কক্সবাজার। এত দূর থেকে পরিবারের কেউ এলেও কয়েক মাস পরপর আসে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিতাম। তার থেকে জানতে পারলাম, সে আমার কাছে

আসার আগে যার ফালতু হিসেবে কাজ করত তার ফাঁসি হয়ে গেছে। ঐ লোকের নাম পত্রিকায় বিস্তর প্রকাশিত হতো। তার নাম মনির। ঐ সময় সারা দেশেই তার নাম অতি পরিচিত ও ঘৃণ্য ছিল। তার পিতামাতা দুজনই নামকরা ডাক্তার ছিলেন। মনির তাদের একমাত্র পুত্র ছিল। সে তার চেয়েও বয়সে বড় এক দুশ্চরিত্রার খপ্পরে পড়ে নিজের যুবতী স্ত্রীকে হত্যা করেছিল। তার কুসংসর্গের অনেক ছবিও পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে।

ফালতু মনিরের নিকট বছরখানেক ছিল। মানুষ হিসেবে তার নিকট মনিরকে অত্যন্ত ভদ্র, উদার ও দরদিই মনে হয়েছে। ফালতু আমার স্মৃতি হিসেবে আমার নিকট একটা লুঙ্গি চাইল। আমার পরনের মালয়েশিয়ার লুঙ্গিটা তার খুব পছন্দ হলো। বাড়িতে মালয়েশিয়ার আরেকটা নতুন লুঙ্গি ছিল। ওটা বাড়ি থেকে আনিয়ে তাকে দিলাম। আমার মুক্তির ১১ মাস পর যখন আমার নাগরিকত্ব বহাল হয় তখন কক্সবাজার জেলার চকরিয়ায় সফরে গেলে ফালতু ঐ লুঙ্গিটি পরে আমার সাথে দেখা করতে এলে আমি তার সাথে উষ্ণ আলিঙ্গন করলাম। কিছুদিন পূর্বে সে মুক্তি পেয়েছে বলে জানাল।

২৫৯.

জেলখানায় আমার উকিলের সাথে সাক্ষাৎ

আমার উভয় মামলার প্রধান উকিল ব্যারিস্টার এ আর ইউসুফ আইনগত অধিকারবলে তাঁর মক্কেলের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে জেল-অফিসে আমার সাথে দুবার সাক্ষাৎ করেন। আমার নিকট থেকে যা কিছু জানা প্রয়োজন, তা তিনি জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন। গোয়েন্দা পুলিশের সেখানে উপস্থিত থাকার ক্ষমতা আইনত ছিল না। অন্যসব সাক্ষাতেই গোয়েন্দারা উপস্থিত থাকত।

মামলার অবস্থা সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, আপনাকে দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখতে পারবে না। তবে নাগরিকত্ব মামলাটি আপিল বিভাগ পর্যন্ত গড়াতে পারে। তিনি বললেন, নাগরিকত্ব মামলাটিই সবচেয়ে জটিল। তাই আমি নিজে তো আল্লাহর নিকট আকুল হয়ে দোআ করছি, যেন আদালতে শুনানির সময় যুক্তিগুলো যথাযথভাবে পেশ করতে পারি। আমি জামায়াতের লোকদেরও বেশি করে দোআ করতে বারবার পরামর্শ দিয়েছি।

জেলখানায় জেনারেল এরশাদের সাথে সালাম বিনিময়

আমার ২৬ সেলের অত্যন্ত নিকটেই দেয়ালের অপর পার্শ্বে সাবেক সেনাপ্রধান ও রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদের অবস্থান। নুরুজ্জামান নামে এক হাবিলদারের মাধ্যমে এরশাদ সাহেব আমার নিকট সালাম পাঠালেন। হাবিলদারের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, সে মানিকগঞ্জের এক পীর সাহেবের মুরিদ এবং সে এরশাদ সাহেবকে ঐ পীরের মুরিদ হতে সম্মত করেছে। আমি বললাম, এরশাদ সাহেব তো আটরশির পীর সাহেবের মুরিদ বলে জানতাম। হাবিলদার বলল, এখন তিনি আটরশির পীরকে বাদ

দিয়ে মানিকগঞ্জের পীরের মুরিদ হয়ে তার তরীকা অনুযায়ী যিক্‌র করেন। আমি ঐ যিক্‌র-এর পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে হাবিলদার আমাকে একটি বই দিল। বইটিতে যিক্‌র করার বিভিন্ন রকম আসন বা বৈঠকের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যার কোনো সনদ হাদীসে নেই। হিন্দু যোগীদের পদ্ধতি থেকেই এসব গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে হয়েছে।

মানিকগঞ্জের পীর সাহেবের ঐ বইটিতে তার নামের পূর্বে অধ্যাপক এবং নামের শেষে এমএসসি লেখা। হাবিলদার পীর সাহেবের কামেল হওয়ার প্রমাণস্বরূপ জানাল, তিনি ১২ বছর বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়-পর্বতে সাধনা করেছেন। কামেল হওয়ার জন্য এ জাতীয় সাধনা ও উপরিউক্ত পদ্ধতির যিক্‌র আল্লাহর রাসূল (স) শিক্ষা দিয়েছেন কি না– এ ধরনের কোনো প্রশ্ন আমি তাকে করিনি। সে বেচারা পরম ভক্তির সাথে পীর সাহেবকে মানে। ইসলামের সঠিক শিক্ষা তাকে দেওয়ার জন্য যে সময় ব্যয় করা প্রয়োজন, সে সময় কিংবা সুযোগ জেলখানায় পাওয়া অসম্ভব। সে বেচারা ডিউটি বাদ দিয়ে আমার নিকট দীর্ঘ সময় শিক্ষা গ্রহণ করতে অক্ষম এবং আমার পক্ষেও এত সময় ব্যয় করা অসম্ভব। আল্লাহর ওলী ও কামেল পীর হিসেবে খ্যাত আরো অনেকের এ জাতীয় সাধনার কথা আমি আগেও শুনেছি।

ঐ হাবিলদারের মাধ্যমে এরশাদ সাহেব একবার তাঁকে চিঠি লেখার জন্য আমার নিকট অনুরোধ জানালেন। তিনি চিঠি লিখলেও আমি জবাব লিখতাম না। আমার পক্ষ থেকে তাঁকে চিঠি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর সাথে ইতঃপূর্বে কখনো ফোনেও আমার কথা হয়নি। দু-একবার জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের সাথে তিনি ফোনে কথা বলেছেন। আর সংলাপ উপলক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এরশাদ সাহেবের সাথে খান সাহেবের দুবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। ১৯৯৮ থেকে ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চারদলীয় জোটের শীর্ষ নেতা হিসেবে বহুবারই তাঁর সাথে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনবার তিনি মেহেরবানী করে আমার বাড়িতে একান্ত সাক্ষাতে এসেছেন। আমিও একবার জোটনেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর বাড়িতে গিয়েছি।

বন্দী অবস্থায় হাইকোর্টে আমার হাজিরা

যে আইনে আমি গ্রেফতার হই, সেই আইন অনুযায়ী বন্দীকে ছয় মাসের বেশি আটক রাখতে হলে তাকে হাইকোর্টের বিচারপতির সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দিতে হয়। বিচারপতি বন্দীর বক্তব্য শোনার পরও যদি আটকাদেশ অব্যাহত রাখার অনুমতি দেন, তবেই সরকার আটকের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারে। ঐ আইন অনুযায়ী বিচারপতি আনছার উদ্দিন ও বিচারপতি আনছার আলী সমন্বয়ে এ্যাডভাইজারি কাউন্সিল গঠিত হয়।

এ বিধান অনুযায়ী একবার ছয় মাস পার হওয়ার পূর্বে এবং আরেকবার ১২ মাস অতিক্রমের পূর্বে আমাকে হাইকোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দীজীবনে জেলের সুউচ্চ দেয়ালের বাইরে আসার আনন্দ ও মানসিক প্রশান্তির বিবরণ লিখে প্রকাশ করার ভাষা কোথায় পাই! এটা শুধু উপলব্ধির বিষয়।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা আমার বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে নিত্যদিনের যাতায়াতের পথ। দুপাশের প্রতিটি বাড়ি ও স্থাপনা অতি পরিচিত। আমরা চকবাজার ও মৌলভীবাজারেই প্রয়োজনীয় সবকিছু কেনাকাটা করতাম। হাইকোর্টে যাওয়ার সময় দুবার এবং চিকিৎসা উপলক্ষে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একবার বন্দী অবস্থায় এ পথে যাতায়াত করার সুযোগ পেয়েছি। যাওয়ার সময় একদিকে এবং ফিরে আসার সময় অপরদিকে অপলক দৃষ্টিতে পরিচিত বাড়িগুলো দেখতে থাকলাম। প্রথমবার জেলের দেয়াল ও অন্যান্য দেয়ালে আমার সম্পর্কে দুরকম বড় বড় পোস্টার সাঁটা অবস্থায় দেখলাম। একটি ঘাদানি কমিটি এবং অপরটি জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক প্রচারিত। প্রথমটিতে এমন বিকৃত চেহারা দেখানো হয়েছে, দেখলেই মনে ঘৃণা সৃষ্টি হতে বাধ্য।

১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথমবার আমাকে হাইকোর্টে আনা হয়েছিল। পুলিশের জিপ গাড়িতে আমি বসা ছিলাম। কাচের জানালার বাইরে থেকে আমাকে দেখে যারা চিনতে পেরেছে তারা হাত তুলে সালাম দিয়েছে। দু-একজন এমন লোকও দেখলাম, যারা পরিচিত হলেও আমার দিকে তাকাননি বলে আমি হাতের ইশারাও করতে পারিনি।

যখন গাড়ি হাইকোর্টের গেট দিয়ে প্রবেশ করছে তখন বুঝতে পারলাম, আমাকে হাইকোর্টে নেওয়ার খবর আগেই জামায়াত জানতে পেরেছে। জনাব আবদুল কাদের মোল্লার সাথে ২৫/৩০ জন কর্মী গাড়ির পেছনে পেছনে হাইকোর্ট বিল্ডিং পর্যন্ত গেল। তাদের মধ্যে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সংখ্যাই বেশি। জানা গেল, পূর্বে খবর না পাওয়ায় কম লোক এসেছে।

বিচারপতির নিকট আমার বক্তব্য

স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ আমাকে এক আদালতকক্ষে নিয়ে বসালেন। কিছুক্ষণ পর এ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের দুজন বিচারপতি এসে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। তাঁদের সম্মানে আমরা (পুলিশসহ) দাঁড়ালাম। আমার পাশে বসা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অফিসার বিচারপতিগণের নিকট আমার পরিচয় দিলেন। সিনিয়র বিচারপতি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিজেই বক্তব্য পেশ করবেন, না অন্য কেউ আপনার পক্ষ থেকে বলবেন? আমি নিজেই বলব বলে জানালাম। বিচারপতি আমাকে বক্তব্য পেশ করতে আদেশ দিলে আমি নিম্নরূপ বিবৃতি দিলাম :

"১৯২২ সালে ঢাকা শহরেই আমার জন্ম। আমি জন্মসূত্রেই বাংলাদেশের নাগরিক। আমি কোনো অপরাধ করে থাকলে আইনমতো আমার বিচার হতে পারে এবং আদালতে দোষী প্রমাণিত হলে আমাকে শাস্তিও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু জন্মগতভাবে যে ব্যক্তি নাগরিক, তার নাগরিকত্ব বাতিল ঘোষণা করার কোনো ইখতিয়ার সরকারের থাকতে পারে না। অথচ ১৯৭৩ সালে তদানীন্তন সরকার আমাকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করে। আমার সাথে আরো অনেকে অনুরূপ ঘোষণার শিকার হন।

১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার ঘোষণা করে যে, ১৯৭৩ সালে যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল তারা নাগরিকত্ব বহাল করতে আগ্রহী হলে স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট

আবেদন জানাতে পারেন। আমি '৭৬ সালের মে মাসে লন্ডন থেকে আবেদন জানালাম। স্বরাষ্ট্র দফতর কোনো জবাবই দিল না।

১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রধান সামরিক প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হলে সরাসরি তাঁর বরাবর আমি আবেদন জানালাম। আবেদনে দুঃখ প্রকাশ করে জানালাম যে, আমি এমন এক দেশ থেকে দরখাস্ত দিলাম, যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান রানীকে যেকোনো সাধারণ নাগরিক চিঠি দিলেও জবাব পায়। অথচ বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র সচিব আমার আবেদনের কোনো জবাবই দিলেন না। আমার এ আবেদনের জবাবে স্বরাষ্ট্র সচিবালয়ের এক জয়েন্ট সেক্রেটারি জানালেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আমার নাগরিকত্ব বহাল করতে অক্ষম। ১৯৭৮ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান যখন জনগণের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন তখন আবার তাঁর বরাবর আবেদন জানালাম। পূর্বোক্ত ডেপুটি সেক্রেটারি পুনরায় একই জবাব দিলেন।

১৯৭৮ সালেই আমার বৃদ্ধা অসুস্থা আম্মা প্রেসিডেন্ট বরাবর আবেদন জানিয়ে লিখলেন, 'আমার মৃত্যুর পূর্বে আমার বড় ছেলেকে দেখতে চাই। তাই তার নাগরিকত্ব বহাল করে দেশে ফিরে আসতে দেওয়া হোক।' এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র সচিবালয় থেকে আমি NOC (No Objection Certificate) পেলাম। তাতে আমাকে অল্প সময়ের জন্য দেশে আসার অনুমতি দেওয়া হয়। লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিস থেকে তিন মাসের ভিসা নিয়ে ১৯৭৮ সালের ১১ জুলাই আমি জন্মভূমিতে ফিরে আসি। ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির দরখাস্ত দিলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক মাস করে দুবার মেয়াদ বৃদ্ধি করে এবং ১০ ডিসেম্বর আমাকে দেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়।

আমি সিদ্ধান্ত নেই যে, আমার জন্মভূমি থেকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য কারো হুকুমে কোথাও যাব না। সরকার আমাকে গ্রেফতার করলে আমার দেশের জেলেই থাকব। ১০ ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের এক অফিসার আমার বাড়িতে এসে বললেন, 'স্যার, আজ আপনার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।' বললাম, 'আমি নিজের বাড়িতেই বসবাস করছি। বিদেশে যাওয়ার আমার কোনো প্রয়োজন হলে যাব। আমি অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্বও গ্রহণ করিনি। আমি কোথায় যাব?' এরপর পুলিশ অফিসার বিদায় হয়ে গেলেন।

কয়েকদিন পর জামায়াতনেতা মাওলানা আবদুর রহিম ও মাওলানা আবদুস্ সুব্‌হান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাথে সাক্ষাতের সময় আমার কথা তুললেন। প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলে দিচ্ছি, যাতে তাকে আর বিরক্ত না করেন।' পরের দিন মাওলানা আবদুস্ সুব্‌হান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্নেল (অব.) মুস্তাফিজুর রহমানের সাথে দেখা করলে মন্ত্রী বললেন, 'রাষ্ট্রপতি আমাকে বলেছেন, যাতে প্রফেসর সাহেবকে বিরক্ত করা না হয়। তবে এ বিষয়ে লিখিত কোনো কিছু দেব না।' তখন থেকে আমি বিনা ভিসায় বা মৌখিক সম্মতির ভিত্তিতে দেশে আছি।

১৯৮০ সালে ন্যাপনেতা অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ এমপি জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করেন যে, অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের

নাগরিক নন। তিনি ভিসা নিয়ে এসেছিলেন। ভিসার মেয়াদ কি এখনো শেষ হয়নি? মন্ত্রী জবাবে জানালেন, ভিসার মেয়াদ ১৯৭৮ সালের ১০ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে; তবে তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন। সরকার তা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।

১৯৮৮ সালে জাতীয় সংসদে তদানীন্তন বিরোধীদলীয় নেতা আ স ম আবদুর রব আমার সম্পর্কে সরকারকে প্রশ্ন করেন যে, আমি বাংলাদেশের নাগরিক না হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে এত বছর এ দেশে বসবাস করছি। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ দুদিন পর এ বিষয়ে সংসদে বিবৃতি দেওয়ার ঘোষণা দেন। আমি এর আগেই আমার বাড়িতে বিরাট সাংবাদিক সম্মেলনে দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করি, যা জাতীয় দৈনিকসমূহে যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়। জাতীয় সংসদে আমার নাগরিকত্ব নিয়ে কয়েকদিন বিতর্ক হয়। আমি বাংলাদেশের নাগরিক কি না– এ বিতর্কে বিএনপির এমপি ব্যারিস্টার মুহম্মদ জমিরউদ্দিন সরকার মোটা মোটা আইনের বই নিয়ে আমার নাগরিকত্বের পক্ষে মযবুত যুক্তি পেশ করেন।

১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ না করায় ক্ষমতার ভারসাম্য জামায়াতে ইসলামীর ১৮ জন এমপির হাতে এসে যায়। প্রধান দুই দল সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে জামায়াতের নিকট ধরনা দেয়। আওয়ামী লীগের চেয়ে বিএনপি ৫০টিরও বেশি আসনে বিজয়ী হওয়ায় গণরায়ের পক্ষে জামায়াত গণতন্ত্রের স্বার্থে ক্ষমতায় শরীক না হয়েই নিঃস্বার্থভাবে বিএনপিকে সরকার গঠনে সাহায্য করে। বিএনপিনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জামায়াতের সমর্থন কামনা করে জামায়াতের আমীর গোলাম আযমের সাথেই বৈঠকে মিলিত হন। তিনি আমাকে বিদেশি নাগরিক মনে করে সাক্ষাৎ করেছিলেন বলে আমার মনে হয়নি।

১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে জামায়াতের নবনির্বাচিত আমীর হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করার পরই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও বামপন্থি মহল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। দেশে আইন-আদালত থাকা সত্ত্বেও এবং দেশের কোথাও কোনো থানায় বা কোনো আদালতে আমার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা সম্ভব না হলেও তারা আমার বিচার করার উদ্দেশ্যে 'গণ-আদালত' কায়েম করে। জামায়াতের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের দমন করার জন্য বারবার দাবি জানানো হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গণ-আদালতকে অবৈধ ও এর সংগঠকদের তৎপরতাকে রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক ঘোষণা করলেও তাদেরকে দমন করার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সরকার আমাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। আমি এ অন্যায় আটকাদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রিট-পিটিশন করেছি, যার শুনানি চলছে। আমার নাগরিকত্ব বাতিলের সরকারি নির্দেশের বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে অপর একটি মামলা দায়ের করেছি। ঐ মামলারও শুনানি চলছে।

মাননীয় বিচারপতিদ্বয়ের নিকট আমি দীর্ঘ ইতিহাস পেশ করলাম। এত সময় ব্যয় করার জন্য আমি দুঃখিত। আল্লাহ ছাড়া ফরিয়াদ জানানোর সুযোগ আর কোথাও নেই। আমার নাগরিকত্বের মামলা চলছে। আদালতের ফায়সালা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে বিগত সরকার আমাকে আটক করে রেখেছে। আশা করি আমি মাননীয় বিচারপতিদ্বয়ের নিকট সুবিচার পাব– যাতে আমার আটকাদেশ আর বৃদ্ধি করা না হয়।

আমাকে আটক রাখার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। আমি একদিনও কোথাও লুকিয়ে থাকিনি। আমি কোথাও লুকিয়ে-পালিয়ে থাকার সামান্য আশঙ্কাও সরকার নিশ্চয় করে না। আমি নিজ বাড়িতেই বসবাস করছি। রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে সবার নিকট আমি পরিচিত। দেশ থেকে চলে যাওয়ার সরকারি নির্দেশও আমি অমান্য করেছি। জেলে থাকাকালেই চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আমাকে বিদেশে পাঠানোর সরকারি প্রস্তাবও আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। এমতাবস্থায় কোন্ যুক্তিতে সরকার আমাকে কারাগারে আটক রাখা প্রয়োজন মনে করছে তা আমার বোধগম্য নয়।"

আমার দীর্ঘ বক্তব্য মাননীয় বিচারপতিদ্বয় অত্যন্ত মনোযোগ ও ধৈর্যের সাথে শুনেছিলেন। তারা কিছুই বলেননি। স্বরাষ্ট্র সচিবালয়ের কর্মকর্তাকে তাঁরা ইশারা করলে আমাকে কারাগারে ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। আদালতকক্ষের বাইরে জামায়াত-শিবিরের ভাইয়েরা অপেক্ষায় ছিলেন। বের হতেই তারা সালাম দিতে থাকলেন, আমিও হাসিমুখে জবাব দিতে দিতে এগিয়ে চললাম। আদালতকক্ষটি দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত ছিল। নিচে গাড়ির নিকট পৌঁছে একটু থেমে ইশারায় আবদুল কাদের মোল্লাকে কাছে আসতে বললাম। পুলিশ আপত্তি করল। আমি বললাম, 'মোল্লা সাহেব জামায়াতের নেতা, তাঁর সাথে একটু কুশল বিনিময় করতে দিন। আমি তো কোনো ফৌজদারি মামলার আসামি নই।' মোল্লা সাহেব কাছে এলে হাত মিলিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে কর্মী ভাইদের হাত তুলে সালাম জানিয়ে গাড়িতে উঠে গেলাম। এ ভাবনা নিয়ে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ ত্যাগ করলাম যে, আমার আটকাদেশ বৃদ্ধি করার জন্য বিচারপতিদ্বয় কোন্ যুক্তিতে সম্মতি দেবেন? কিন্তু সরকার আটকাদেশের মেয়াদ বাড়াতেই থাকল।

দ্বিতীয়বার হাইকোর্টে আগমন

১৯৯৩ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে বিধি মোতাবেক আমাকে আবার ঐ বিচারপতিদ্বয়ের সামনে হাজির করা হলো। এবার জামায়াত এ খবর জানার কারণে প্রায় শ' খানেক লোক হাইকোর্ট গেটে অপেক্ষা করতে থাকে।

প্রথমবার মুক্তির আশা নিয়ে এসেছিলাম। এবার জেলের বাইরে কিছুক্ষণ সময় কাটানোর উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উৎসাহ ছিল না। বিচারপতিদ্বয়ের নিকট এত দীর্ঘ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করা সত্ত্বেও আটকাদেশ বৃদ্ধি করায় বুঝতে পারলাম যে, আমাকে আইনের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যেই আনা হয়েছে। সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিচারপতিগণ কোনো রায় চাপিয়ে দেন না বলেই প্রমাণ পেলাম।

তাই এবার বিচারপতিদ্বয়ের নিকট সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলাম। বললাম, 'গত বছর সেপ্টেম্বরে আমার দীর্ঘ বিবৃতি সত্ত্বেও সরকার আমার আটকাদেশ বৃদ্ধি করে চলেছে। তাই এবার আমার কোনো বক্তব্য নেই। আটকাদেশের বিরুদ্ধে যে মামলা করেছি, সে মামলার রায়ে আদালতে আমি সুবিচার আশা করছি। যে আইনে আমাকে আটক করা হয়েছে, সে আইন আমার প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে না। বিদেশিদের প্রতি প্রযোজ্য আইন আমার উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাকে বিদেশি প্রমাণ করার কোনো সাধ্য সরকারের নেই। আমি এ আশায় আছি যে, হাইকোর্টের রায় আমার পক্ষে হলে আমি মুক্তি পাব। সে পর্যন্ত আমাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে।'

দ্বিতীয় ছয় মাস পার হওয়ার পর বিচারপতিদ্বয়ের সম্মতি পেয়ে সরকার আমার আটকাদেশের মেয়াদ আরো এক দফা বৃদ্ধি করল। কিন্তু চার মাস পরই হাইকোর্টের নির্দেশে সরকার আমাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। আটকাদেশ বৃদ্ধির ব্যাপারে বিচারপতির সম্মতির বিষয়টা আইনের বাধ্যবাধকতা মাত্র।

২৬০.

নবীনগর ফোরামের ঐতিহাসিক সেমিনার

আমাকে গ্রেফতারের পরপরই ইঞ্জিনিয়ার গোলাম সারওয়ারের প্রচেষ্টায় ডা. মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযামকে সভাপতি ও ইঞ্জিনিয়ার গোলাম সারওয়ারকে সেক্রেটারি করে 'নবীনগর ফোরাম' নামে সংস্থাটি কায়েম হয়। এ সংস্থার উদ্যোগে ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে 'অধ্যাপক গোলাম আযম : একটি বিপ্লবী চেতনা' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারকে 'ঐতিহাসিক' বলে আখ্যায়িত করার কারণ রয়েছে।

কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের বিশিষ্ট লোকগণ দুই ধরনের আলোচনা সভায় সমবেত হয়ে থাকেন। একটা হলো ঐ ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাকে সংবর্ধনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে; আরেকটা হলো তার মৃত্যুর পর স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্যে। উপরিউক্ত সেমিনারটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। আমি জেলে থাকাবস্থায়ই আমার সম্পর্কে এত গণ্যমান্য ব্যক্তি উপচেপড়া সমাবেশে আলোচনা করেছেন। এ কারণেই এ সেমিনারকে এর উদ্যোক্তারা 'ঐতিহাসিক' বলে দাবি করেছেন।

ঐ সেমিনারের বিবরণ ইঞ্জিনিয়ার গোলাম সারওয়ার লিখিতভাবে আমার নিকট দিলেন। তাই এ বিষয়ে আমার পক্ষ থেকে কিছুই লেখার প্রয়োজন নেই। আমি জেলে দৈনিক সংগ্রামে ঐ সেমিনারের রিপোর্ট পড়েছিলাম। পত্রিকার কপি সংগ্রহের ঝামেলা পোহানোর পরিবর্তে তার লেখাটিই হুবহু পরিবেশন করা যথেষ্ট মনে করছি :

"আপনাকে জেলে নিয়ে যাওয়ার পর হৃদয়পটে গড়েওঠা প্রচণ্ড ক্ষোভকে আমরা ইসলামী আন্দোলনের চেতনায় রূপান্তরিত করে ঢাকাস্থ নবীনগরবাসীদের নিয়ে গড়ে তুললাম

'নবীনগর ফোরাম'। এই ফোরামের মাধ্যমে আমরা আপনার মুক্তির পক্ষে দেশব্যাপী জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে পোস্টার, লিফলেট, 'মজলুম' নামে ম্যাগাজিন প্রকাশ, বৈঠক, মিছিল ও সভা-সেমিনারের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারকার্য পরিচালনা করি। আমাদের ঐ সকল কর্মসূচি ময়দানে অভূতপূর্ব সাড়া জাগাল। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হলো, নবীনগর ফোরামের উদ্যোগে ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে 'অধ্যাপক গোলাম আযম : একটি বিপ্লবী চেতনা' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন। সেমিনারে বাঁধভাঙা ঢলের মতো মানুষ উপচে পড়েছিল। মিলনায়তনের আশপাশের মতিঝিল এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। ঐ সেমিনারে আবেগাপ্লুত হয়ে যাঁরা বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁদের কথা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে তাঁরা হলেন– সর্বজনাব মরহুম কে এম সোলায়মান, মেজর (অব.) বজলুল হুদা, আনোয়ার জাহিদ, কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান, মরহুম আব্দুল মতিন (মুসলিম লীগ), মরহুম এডভোকেট আতাউল হক খান (মুসলিম লীগ), এডভোকেট নুরুল হক মজুমদার (পরবর্তী সময়ে এনডিএ'র চেয়ারম্যন), প্রোগ্রেসিভ পার্টির প্রতিনিধি, ফুরফুরা দরবারের প্রতিনিধি, শর্ষিনা দরবারের প্রতিনিধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক, মরহুম আব্বাস আলী খান, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মাওলানা আবদুস্ সুব্‌হান এমপি, আবদুল কাদের মোল্লাসহ জামায়াত-শিবিরের নেতৃবৃন্দ। কতক দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকগণও সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। বেশ কিছু ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরাম সেদিন বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁদের নাম এ মুহূর্তে স্মরণে আসছে না। মাঝে মাঝে মুহুর্মুহু গগনবিদারী স্লোগান এবং পিনপতন নীরবতার মধ্যে অনুষ্ঠিত অভূতপূর্ব ও ব্যতিক্রমধর্মী এ অনুষ্ঠান আমার স্মৃতির আকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে জ্বলছে। একজন জীবিত মানুষকে নিয়ে সেমিনারের আয়োজন পৃথিবীর অন্য কোথাও হয়েছে কি না আমার জানা নেই; তবে বাংলাদেশে যে হয়নি সেটা সেদিন সেমিনারে বক্তাদের বক্তব্যেই প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া একজন জীবিত মানুষের পক্ষে বিভিন্ন মত ও পথের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জোরালো ও বলিষ্ঠ বক্তব্য প্রদানের ঘটনা সংকীর্ণতাদূষণে আক্রান্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বোধ হয় এটাই প্রথম। সেমিনারের ছবিসহ সংবাদ জাতীয় দৈনিকগুলোতে ফলাও করে ছাপা হয়েছে। আমাদের প্রকাশিত 'মজলুম' ম্যাগাজিনটিতেও সেমিনারের ছবি ছাপা হয়েছে। এ সকল কিছুর জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে কৃতজ্ঞতা জানাই।"

আমার গ্রেফতারে জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া

আমি গ্রেফতার হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ার গোলাম সারওয়ার নিম্নোক্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মন্তব্য সংগ্রহ করেন :

কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান
চেয়ারম্যান, ফ্রিডম পার্টি

'অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে সরকার মূলত ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সরকারের এ সিদ্ধান্ত ভারতের এ দেশীয় চর এবং

পঞ্চম বাহিনীর ষড়যন্ত্রকে উৎসাহিত করল। অনতিবিলম্বে সরকারের উচিত তাঁকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া নতুবা দেশের সংগ্রামী তাওহীদী জনতা জেল ভেঙে তাঁকে মুক্ত করে নিয়ে আসবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর আশু নিঃশর্ত মুক্তি এবং জাতির খিদমতের জন্য তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।'

আনোয়ার জাহিদ

চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে যারা ভারতের কাছে বিকিয়ে দিতে চায়, তারা মজলুম জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের গতিশীল নেতৃত্বকে ভীতির চোখে দেখে থাকে। তারা যেকোনো মূল্যে এ দেশ থেকে তাঁকে উৎখাত করতে চায়। বিশ্বজুড়ে এ প্রক্রিয়ার বিস্তার ঘটছে। পৃথিবীর ইসলামবিরোধী শক্তি বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনর্জাগরণকে রুখে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে। একই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মাটিতেও সে ষড়যন্ত্রের শাখা-প্রশাখা ইতোমধ্যেই বিস্তার লাভ করেছে। সরকার এ ষড়যন্ত্রকারীদের অবৈধ ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে বৃদ্ধ বয়সে জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে কারাগারে প্রেরণ করেছে। এটা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। তবে নির্যাতন করে এ দেশে ইসলামের পুনর্জাগরণের পথে সাময়িকভাবে বাধা সৃষ্টি করা সম্ভব হলেও পূর্ণরূপে ইসলামকে রুখে দেওয়া সম্ভব নয়।

যুগে যুগে ইসলামবিরোধী শক্তি ইসলামকে উৎখাত করার জন্য ইসলামী নেতৃবৃন্দের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়েছিল; কিন্তু তাদের বিজয়কে ঠেকাতে পারেনি। ষড়যন্ত্রকারীদের ভুলের উপরেই ইসলামের বিজয় এসেছে। হুদাইবিয়া সন্ধিতে মুশরিকরা ভুল করেছিল বলেই মক্কা বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছে। অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে ষড়যন্ত্রকারীরা ইতিহাসের পথ ধরে আবারও ভুল করল। এ ভুলের উপরেই ইতিহাসের চাকায় চড়ে এ দেশের মাটিতে ইসলামের বিজয় সূচিত হবে, ইনশাআল্লাহ।'

এ এস এম সোলায়মান

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক পার্টি

'অধ্যাপক গোলাম আযমের গ্রেফতারে আমি যতটা ব্যথা অনুভব করেছি, তার চেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছি। কারণ, আমি তাঁর এ বৃদ্ধ বয়সের কুরবানীকে এ দেশের বুকে ইসলামের বিজয়ের একটি প্রধান কারণ হিসেবে অনুভব করছি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, বন্দী গোলাম আযম প্রতিদিনই দেশজুড়ে জনপ্রিয়তা লাভ করছেন। তাঁর ব্যাপারে দেশের সর্বস্তরের জনগণের কৌতূহল বাড়ছে। তাঁর সম্পর্কে বহু মানুষের ভুল ধারণা ভেঙে যাচ্ছে। তাঁর নূরানী চেহারার ছবি বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। এ সমস্ত কিছু যা-ই ঘটছে, সবই তাঁর কারাবরণকে কেন্দ্র করে। তিনি গ্রেফতার না হলে হয়তোবা এ কাজগুলো এ মুহূর্তে ঘটত না। একপর্যায়ে জনগণের দুর্বার গণ-আন্দোলনের চাপে সরকার তাঁকে মুক্ত করে দিতে বাধ্য হবে।'

আতাউল হক খান

আহ্বায়ক, মুসলিম লীগ ঐক্য প্রক্রিয়া

'অধ্যাপক গোলাম আযমকে আমি একজন পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ হিসেবেই চিনি। লন্ডনে থাকাকালে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ থেকেই তাঁকে অনেক লোভনীয় অফার দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেগুলো আখিরাতের বিনিময়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি এক অসাধারণ মহাপুরুষ। তিনি ইসলামবিরোধী শক্তির আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার। বাংলাদেশের মানুষ তাঁর নেতৃত্বে সমৃদ্ধশালী হবে বলে আমার বিশ্বাস। পৃথিবীতে যে ক'জন আল্লাহর বান্দার কথায় ও কাজে মিল রয়েছে, অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁদের অন্যতম।

আমি সরকারের কাছে তাঁর আশু মুক্তির জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি এবং আল্লাহর কাছে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।'

অধ্যক্ষ সিরাজুল হক গোরা (বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা)

সভাপতি, বাংলাদেশ মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল

"যারা সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী তারাই গোলাম আযমের মতো একটি নন-ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করছে। অধ্যাপক গোলাম আযম নিজে একজন মুসলমান এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন– এটাই তাঁর মূল অপরাধ! এ ছাড়া অধ্যাপক গোলাম আযম কোনো অপরাধ করেছেন, এমন কোনো প্রমাণ নেই। কাজেই এমতাবস্থায় ভারতীয় সেবাদাসদের ভয়ে ভীত না হয়ে সরকারের উচিত অনতিবিলম্বে জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে মুক্তি দেওয়া। আমি তাঁর দুনিয়া এবং আখিরাতের মঙ্গল কামনা করছি।"

চৌধুরী মুহাম্মদ ফারুক

সম্পাদক, দৈনিক মিল্লাত

'অধ্যাপক গোলাম আযম সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানার আমার সৌভাগ্য আমার হয়নি; তবে যতটুকু তাঁর সম্পর্কে জানতে পেরেছি তা ভালোই জেনেছি। একজন উঁচুমানের কঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে তাঁর পরিচয় পেয়েছি। জাতির খিদমতের জন্য এ ধরনের নেতা বেশি প্রয়োজন। তাঁর গ্রেফতারের ঘটনা সরকারের নতজানু পররাষ্ট্র নীতিকে আরো বেশি করে উন্মোচিত করেছে। সরকারের উচিত আর বিলম্ব না করে অধ্যাপক গোলাম আযমকে মুক্তি দিয়ে জাতির খিদমতের সুযোগ দেওয়া। আমি তাঁর সুন্দর-সুস্থ স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি।'

জেল থেকে মুক্তি

আগেই বলা হয়েছে, সরকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আমার পক্ষ থেকে দুটো মামলা দায়ের করা হয়। আমার নাগরিকত্ব বহাল করা সম্পর্কিত মামলাটির খবর গত কিস্তিতে এসেছে যে, হাইকোর্ট আমার পক্ষে রায় দিলেও সরকার এ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আবেদন করায় মামলার শুনানি আরো চলবে।

আমাকে গ্রেফতার করা অবৈধ দাবি করে যে মামলা করা হয়, তার রায় ১৩ জুলাই (১৯৯৩) হাইকোর্ট ডিভিশন ব্যাঞ্চ থেকে ঘোষিত হয়। ঐ রায়ে আমাকে আটক রাখা বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়। পরের দিন ১৪ জুলাই (১৯৯৩) পত্রিকায় খবরটি দেখে মুক্তির দিনক্ষণ গুণতে থাকলাম। জেলকর্তৃপক্ষ থেকে জানা গেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ ১৫ জুলাই (১৯৯৩) সকালে এখানে পৌঁছার আশা করা যায়।

১৪ তারিখে আমার কাপড়-চোপড়, বই-পত্র ও ব্যবহারের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। ১৬ মাস এক জায়গায় থাকায় ব্যবহৃত জিনিসের সংখ্যা বেশিই ছিল। নাগরিকত্ব বহাল না হলেও মুক্তি পাওয়ার আনন্দে রাতে ঘুম হলো না। বের হয়ে কী কী করব, লিখিত বইয়ের খসড়াগুলো কোন্‌টা কোন্‌ প্রকাশককে দেব ইত্যাদি চিন্তাস্রোত মন-মগজ দখল করে রইল। পূর্বেও জেল থেকে মুক্তির আগের রাতে নিদ্রাহীন ছিলাম। রাত ৩টা থেকে নামাযে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকায় ক্লান্তিবোধ হলো। তাই প্রথম ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়ে শুয়ে গেলাম। বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমালাম। জেল অফিস থেকে এক ডেপুটি জেলার এসে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললেন, আপনাকে বিদায় করার জন্য অফিস প্রস্তুত। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আপনাকে নিয়ে যাব। জেল-সুবেদার এসে খবর দিল, জেলগেটের সামনে শত শত লোক সমবেত হয়ে আছেন। সেখানে মাইকে বক্তব্য রাখা হচ্ছে। জেলগেট বিশাল জেলখানার পূর্ব মাথায় আর আমার ২৬ সেল পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। কান খাড়া করে মাইকের আওয়াজ একটু শুনতে পেলাম।

জেল অফিসের ফরমালিটি সমাধা করার পর বেলা সাড়ে ১১টায় জেলফটকের বাইরে আসার সাথে সাথে জামায়াত-শিবিরের নেতৃবৃন্দ ফুলের মালা দিয়ে অত্যন্ত আবেগময় অভিনন্দন জানালেন আর বিরাট কর্মীবাহিনী জিন্দাবাদ ধ্বনিতে এলাকা মুখরিত করে তুলল।

আমার ধারণা ছিল, হয়তো খোলা গাড়িতে আমাকে দাঁড় করিয়ে মিছিল সহকারেই বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে; কিন্তু দায়িত্বশীলগণ সঙ্গত কারণেই নিরাপত্তার স্বার্থে তা করতে দেননি। অব্যাহতভাবে শ্লোগান দিতে দিতে বিশাল মিছিল ধীর গতিতে মগবাজারের দিকে এগিয়ে চলল। আমার নাম নিয়ে জিন্দাবাদ ধ্বনির কারণে রাস্তার দুপাশে ও বাড়ির ছাদে মানুষ উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল আমাকে দেখার জন্য। কিন্তু গাড়িবহরের কোন্‌ গাড়িতে আমি আছি, তা তারা জানতে পারেনি।

আমার বাড়ির পাশের যে রাস্তায় গ্রেফতার হওয়ার সময় অশ্রুসজল অবস্থায় ও বিষণ্ন বদনে আন্দোলনের সাথীদের রেখে গিয়েছিলাম, আজ তাদেরকে আনন্দোচ্ছল অবস্থায় দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল এবং অন্তর প্রসন্ন হলো।

একটা ছোটখাটো মঞ্চ তৈরি করা ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলাম। রাস্তার পাশের সব বাড়ির বারান্দা ও ছাদে নারী-পুরুষ সমবেত অবস্থায় আমার বক্তব্য শুনলেন। আন্দোলনের সাথীগণ আমার প্রতি যে মহব্বত প্রদর্শন করলেন তার জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানালাম। গ্রেফতারের সময় বক্তব্যে বলে গিয়েছিলাম, ইনশাআল্লাহ নাগরিকত্ব নিয়েই ফিরে আসব। কিন্তু নাগরিকত্ব বহাল হওয়ার পূর্বেই যখন মুক্তি পেয়ে গেলাম তখন নাগরিকত্ব বহালের আশা আরো অধিক প্রবল হলো।

মিছিল অব্যাহত রইল

জেলগেটে জামায়াতের যে নেতৃবৃন্দ আমাকে সংবর্ধনা দিয়ে কর্মীদের মিছিলে নেতৃত্ব দেন তাঁরা আমাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়ার পরও ঐ মিছিলকে নিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে বায়তুল মুকাররম যান। এ তথ্য আমার জানা ছিল না। ঐ নেতৃবৃন্দের মধ্যে জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ছিলেন। জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস সেক্রেটারি অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম এ তথ্য তাঁর কাছ থেকে পেয়ে আমাকে দিলেন। নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরো যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন সর্বজনাব আবদুল কাদের মোল্লা, এটিএম আজহারুল ইসলাম, মমিনুল ইসলাম পাটওয়ারী, এডভোকেট জসিম উদ্দীন সরকার ও ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের।

জেল থেকে আমাকে নিয়ে মিছিলসহ বায়তুল মুকাররম হয়েই নাকি মগবাজার আসার কথা ছিল। এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের খবর না জানায় বেশ কিছু কর্মী বায়তুল মুকাররমে সমবেত থাকায় উক্ত নেতৃবৃন্দ মিছিল নিয়ে সেখানে গিয়ে সমাবেশে বক্তব্য রেখে কর্মীদের বিদায় করেন।

মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন

১৯৯৩ সালের ৭ থেকে ৯ জুলাই কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার মধ্যবর্ষ অধিবেশন হয়ে গেল। ১৫ জুলাই জেল থেকে আমার আমি মুক্তি পাওয়ার ১৮ জুলাই মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন আহ্বান করা হয়। অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে মজলিসে শূরার কার্যবিবরণী থেকে হুবহু তুলে ধরছি :

"ভারপ্রাপ্ত আমীর মুহতারাম আব্বাস আলী খানের সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়। জনাব সভাপতি সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে অধিবেশন উদ্বোধন করেন। তিনি হাম্‌দ, দরূদ ও সালামের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নির্বাচিত আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমকে অন্যায়ভাবে আটক করা হয়েছিল। দীর্ঘ পৌনে ১৬ মাস জেলখানায় থাকার পর আদালতের রায়ের মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে তিনি আবার আমাদের মাঝে এসেছেন। এজন্য আমরা সবাই আজ আনন্দিত। আমরা সবাই এজন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।'

জনাব খান আরো বলেন, 'সকলেই তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য অস্থির। তাই এই জরুরি অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে, যাতে সকলের সাথে একত্রে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় এবং আমীরে জামায়াতের কাছ থেকে মূল্যবান উপদেশ গ্রহণ করা যায়।' বর্ষীয়ান নেতা আল্লাহর রহমত ও তাওফীক কামনা করে অধিবেশনের উদ্বোধনী ঘোষণার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

অতঃপর আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে অধিবেশন চলে। এ পর্যায়ে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম বিগত '৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরার অধিবেশনে আমীরে জামায়াত হিসেবে তাঁর নাম প্রকাশ করার সিদ্ধান্তের পর থেকে গত দেড় বছরে ইসলামী আন্দোলনের কী কী লাভ হয়েছে, তার বিবরণ

দিয়ে পৌনে দুই ঘণ্টাব্যাপী এক দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। মুহতারাম আমীরে জামায়াত শূরার সিদ্ধান্তকে বলিষ্ঠ, সর্বসম্মত, যথার্থ ও বিশুদ্ধ বলে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুহতারাম আমীরে জামায়াত দীর্ঘ সময় বিচ্ছিন্ন থাকার পর আবার সকলের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, 'দুনিয়ার যেকোনো আন্দোলন বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের গতির জন্য তিনটি উপাদান অপরিহার্য। এই উপাদান তিনটি হচ্ছে :

১. আন্দোলনের নেতৃত্বের ইমেজ সৃষ্টি হওয়া,

২. আন্দোলনের জন্য সংগ্রামী কর্মীবাহিনী তৈরি হওয়া এবং

৩. আন্দোলনের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হওয়া।'

কিন্তু বিরোধী শক্তির সাথে সংঘর্ষ ছাড়া এসবের একটিও অর্জিত হতে পারে না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'জামায়াত তার আন্ডারগ্রাউন্ড আমীরের নাম প্রকাশ করে যে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে, বাতিল শক্তি তা বরদাশ্‌ত করতে রাজি হয়নি বলে তারা সরাসরি সংঘর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছে; আর জামায়াতনেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী মাঠে-ময়দানে এবং আইনগতভাবে তার মোকাবিলা করেছে।'

তিনি আরো বলেন, 'এভাবেই জামায়াতনেতৃত্বের ইমেজ বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মীবাহিনীর মধ্যে সাহস, দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে এবং দেশে-বিদেশে সর্বত্র ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে।'

তিনি দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, 'বিগত দেড় বছর বাতিল শক্তির প্রকাশ্য চরম বিরোধিতা ও সরকারের নীরবতা এবং সর্বোপরি জামায়াতকর্মীদের ত্যাগ-তিতিক্ষা এভাবেই জামায়াতকে উক্ত তিনটি উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করেছে।'

জামায়াতের সিদ্ধান্ত গ্রহণপদ্ধতি, এর কার্যকারিতা এবং বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমীরে জামায়াত বলেন, 'আমাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর দৃঢ় ও অটল থাকা এবং এ ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা।' তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, 'সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত আল্লাহর সাহায্যেই হয় এবং এরূপ সিদ্ধান্ত নির্ভুল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা রয়েছে।'

মুহতারাম আমীরে জামায়াত বলেন, 'এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ব্যাপক বিতর্ক ও মতপার্থক্য হতে পারে। কিন্তু যেহেতু আমরা একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে আলোচনা করি এবং আমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিস্বার্থ, গ্রুপিং বা উপদল নেই, সেহেতু এই আলোচনার মাধ্যমে অধিকাংশের মত বেরিয়ে আসে এবং অন্যরা তা মেনে নেন। এভাবেই আমাদের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হয়।'

প্রসঙ্গক্রমে আমীরে জামায়াত ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে আমীরে জামায়াতের নাম প্রকাশের বিষয়ে আলোচনার কথা স্মরণ করে বলেন, 'সে সময়ে মজলিসে শূরার অধিকাংশ সদস্য নাম প্রকাশের পক্ষে মত দেন; যারা বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন তাদের কেউ কেউ অধিকাংশের মত মেনে নেওয়ার কথা

ঘোষণা করেন; কেউ কেউ নীরব থাকেন এবং দু-একজন এ বিষয়ে প্রকাশ্যে বলার দরকার নেই বলে জানিয়েছিলেন।'

আমীরে জামায়াত আরো স্মরণ করেন যে, সেদিন এই আলোচনায় যারা নাম প্রকাশের বিপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন তারা দুটো আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তার একটি হলো, নাম প্রকাশ করলে জামায়াত আইনগতভাবে সমস্যায় পড়বে; আর অন্যটি হলো, বাতিল শক্তি চরম সন্ত্রাস করবে এবং জামায়াতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মুহতারাম আমীরে জামায়াত বলেন, 'এ আশঙ্কা ছিল খুবই যুক্তিপূর্ণ। আইনগত সমস্যা সম্পর্কে আমি তখন বলেছিলাম, আইনের দিক থেকে আমাদের কোনো দুর্বলতা নেই। অতীতে তারা দেশ থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু জামায়াত আমার থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমি থেকে গেছি; তারা কিছুই করতে পারেনি। এখনো তারা আইনগতভাবে কিছুই করতে পারবে না। এদিক থেকে আমি কোনো আশঙ্কা করি না; আর সন্ত্রাসের ব্যাপারে আপনারা হিম্মত করলে নাম প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।'

মুহতারাম আমীরে জামায়াত বলেন, 'অতঃপর আপনারা নাম প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আমি এ সিদ্ধান্তকে সর্বসম্মত মনে করেছি।' আমীরে জামায়াত মজলিসে শূরার সম্মানিত সদস্যদেরকে প্রশ্ন করেন, 'আপনারাও কি তাই মনে করেছেন?' উত্তরে সদস্যবৃন্দ সম্মতিসূচক সাড়া দেন।

আমীরে জামায়াত আরো স্মরণ করেন যে, 'আমীরে জামায়াত নির্বাচনের পূর্বে নাম প্রকাশ না করলে আমার নাম প্যানেলে না রাখার জন্য আমি অনুরোধ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, আন্ডারগ্রাউন্ড আমীর থাকতে আমি আর রাজি নই। এতে আমি কিছু জবরদস্তি করেছিলাম বলে ধারণা হলেও সে সময় তা করা প্রয়োজন মনে করেছিলাম।' মুহতারাম আমীরে জামায়াত দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'বিপ্লব কোনো দিন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হয় না; বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন কখনো অগ্রসর হয় না। আমি বুঝেছিলাম, এটাই নাগরিকত্ব বহালের একমাত্র পথ।'

তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন, 'সিদ্ধান্ত না নিলে নাগরিকত্ব কখনো বহাল হতো না; সর্বদাই আন্ডারগ্রাউন্ড থাকতে হতো। কোর্টে যাওয়ার জন্য Cause of Action দরকার ছিল। আর সিদ্ধান্তই হচ্ছে Cause of Action.' সিদ্ধান্ত– ফ্লাশ, গ্রেফতার– আদালত, এরপর বহাল– সিদ্ধান্ত না হলে এটা হতো না। তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।

অতঃপর আমীরে জামায়াত উক্ত সিদ্ধান্তের পর থেকে বিগত দেড় বছরে নিম্নলিখিত দশটি সুফলের কথা উল্লেখ করেন। সেগুলো হচ্ছে :

১. আদালতের রায়ের দ্বারা নাগরিকত্ব বহাল হওয়ায় জনগণের মধ্যে বিরাট ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে;

২. আদালতের ইতিবাচক রায়ের ফলে বাতিল শক্তির অপপ্রচারে সৃষ্ট বিভ্রান্তি অপসারিত হয়েছে, যা অন্য কোনোভাবে সম্ভব হতো না;

৩. ইসলামী আন্দোলনে গতি সঞ্চার হয়েছে;

৪. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সারা বিশ্বে পরিচিত হয়েছে;

৫. কর্মীদের মধ্যে তীব্র সন্ত্রাসী পরিস্থিতির মোকাবিলায় টিকে থাকার ট্রেনিং হওয়ার পাশাপাশি তাদের মধ্যে সাহস, দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে;

৬. জামায়াতের বিরুদ্ধে যারা লাফালাফি করেছে তারা ইসলামবিরোধী বলে চিহ্নিত হয়েছে এবং ইসলামপ্রিয় লোকেরা জামায়াতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে;

৭. সকল ক্ষেত্রে এবং সকল পেশার লোকদের মধ্যে পক্ষে ও বিপক্ষে মেরুকরণ হয়েছে;

৮. জামায়াতবিরোধীরা ইসলামবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত ও গণ্য হওয়ায় কারো পক্ষে জামায়াতের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে;

৯. জামায়াতনেতৃত্ব কারাগারে অবকাশ জীবনে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে ধীরে-সুস্থে চিন্তা-গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছেন, যা বাইরে থাকলে কখনো হয়ে উঠত না। এ প্রসঙ্গে মুহতারাম আমীরে জামায়াত জানান যে, তিনি কারাজীবনের দীর্ঘ পৌনে ১৬ মাসে ২০টি পুস্তক রচনা করেছেন, যা আন্দোলনের জন্য বিশেষ কাজ দেবে এবং

১০. এই সময়ে ইসলাম তৃতীয় বিকল্প শক্তি হিসেবে দাঁড়িয়েছে এবং জামায়াত পতাকাবাহী দল হিসেবে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

সবশেষে আমীরে জামায়াত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় এবং তাঁর সাহায্য কামনা করে দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করেন।

প্রস্তাব গ্রহণ

মুহতারাম আমীরে জামায়াতের বক্তব্যশেষে দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

আদালতের রায়ের মাধ্যমে আমীরে জামায়াত মুক্তি পাওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় এবং মুক্তির আন্দোলনে সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে প্রস্তাব পেশ করেন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। প্রস্তাবে শহীদদের শাহাদাত কবুলের জন্য দোআ করা হয়; আহত, ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিতদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের জন্য সকল রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও দলের প্রতি একযোগে কাজ করে যাওয়ার জন্য প্রস্তাবে উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। মজলিসে শূরায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবদুটি অনুমোদন লাভ করে।"

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত

কামিয়াব প্রকাশন। ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।